জীবনের কত রঙ্

বেলা দেবী

সাহিত্যলোক ৩২।৭ বিডন স্ট্রীট । কলিকাতা-৭০০০০৬

JIBANER KATO RANG

BY

BELA DEVI

প্রকাশক ঃ
শ্রীকিশোরকুমার ধর
২৯/ সি, যোগীপাড়া লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
২৫শে বৈশাখ ১৩৬৫

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
ও রঙিন ফটোগ্রাফ ঃ
শ্রীতপনলাল ধর
প্রচ্ছদের কাগজ-ভাস্কর্য ঃ
শ্রীশংকর নন্দী

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৫৭এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

গিরিশোত্তর যুগের প্রখ্যাত নাট্যকার
বাংলায় একাঙ্ক নাটকের প্রবর্তক
শ্রদ্ধেয় মন্মথ রায়
করকমলেষু

ভূমিকা

শ্রীমতী বেলাদেবী-রচিত গল্পসংগ্রহের গল্পগুলি পড়ে দেখলুম। বিরাট্ সংগ্রহ, এক জীবনে তিনি যত গল্প লিখেছেন তার মধ্য থেকে বাছাই করে কেবলমাত্র ওঁর সেরা গল্পগুলি দিয়ে এই গল্পের ডালি সাজিয়েছেন। তাতেও গল্পের সংখ্যা কোন্-না আশির কোঠা ছাড়িয়ে গেছে। এই বিপুলকলেবর বইখানি পড়ে অনাবিল আনন্দ লাভ করা গেল।

আমাদের সাহিত্যে যে-ধরনের গল্পরচনাকে 'ছোটগল্প' বলা হয় এই সংকলনে সংগৃহীত গল্পগুলি তার এক একটি নিটোল নমুনা। নিটোল মুক্তার মতই তাদের গড়ন—তেমনি উজ্জ্বল, সুডোল, পরিচ্ছন্ন। আকৃতিতে সেগুলি খুব বড়ও নয় আবার খুব ছোটও নয়, প্রত্যেকটির আয়তন কমবেশি একটি নির্দিষ্ট মাপের, যাতে মনে করিয়ে দেয় প্রমথ চৌধুরী -কৃত ছোটগল্পের এই সংজ্ঞা যে, ছোটগল্প ছোটও হওয়া চাই আবার গল্পও হওয়া চাই, তবেই রচনার 'ছোটগল্প' নাম সার্থক। প্রাথমিক এই মানদণ্ডে বেলাদেবীর লেখা এই গল্পগুলি নিঃসন্দেহে সার্থক রচনা। সাড়ে চারশো পৃষ্ঠারও অধিক বিস্তৃতিতে আশিটিরও অধিক গল্পের এই সংকলনের প্রত্যেকটি গল্পেই যে তিনি কাহিনীবিন্যাসের একটি বিশেষ দৈর্ঘ্য ও পরিমাণ—তার বেশিও নয় কমও নয়—অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন তাতেই প্রমাণ ছোটগল্প নামক শিল্পের বুননে তাঁর হাত কত পাকা। গল্পকথনে পরিমিতিবোধের এক একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই রচনাগুলি। আবার পরিমিতিবোধের সঙ্গে এসে মিলেছে স্নিগ্ধতার চেতনা। বেশ একটা সুমিষ্ট ভাব আছে লেখাগুলির ধারা-ধরনের ভিতর। এই লেখিকার সংবেদনশীল কবিচিত্তের সৌকুমার্যেরই সেটা প্রকাশ বলে মনে করি। একটা অন্তর্লীন সুবাসের মত ভাবের এই কমনীয়তা বইয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

গল্পগুলিতে বাঙালী মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজের গার্হস্থ্যজীবনের ছবিই বেশি। বলা যেতে পারে শহরে মধ্যবিত্ত সংসারের ছোট সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না অভাব-অভিযোগ স্বপ্ন-বাসনার কাঠামোয় আঁটা বিচিত্র সব ছবির সে এক সারিবন্ধ মিছিল। ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ক্বচিৎ-কখনও চোখে পড়ে। যে দু চারটি গল্পে ব্যতিক্রম আছে বলে মনে হয়, খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে তারও পশ্চাৎ-পটে মধ্যবিত্ত সমাজের পৃষ্ঠভূমিটিই বিলম্বিত। মোট কথা, বাঙালী মধ্যবিত্ত

সংসার-রসে গল্পগুলি ভরপুর। এক কথায় গল্পগুলির মূলবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয়, প্রায় সব কটি গল্পেরই স্থায়ী সুর হলো—গার্হস্থ্য ভাব-বিভাব। গানের ধুয়ার মতই সুরটির সর্বতঃসঞ্চারী উপস্থিতি।

এরকম হবার কারণ এই যে, লেখিকা একজন নিপুণা গৃহবধূ—একটি বৃহৎ মধ্যবিত্ত পরিবারের দায়িত্বশীলা সংসার-কর্ত্রী। সুতরাং প্রত্যাশিত রূপেই তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংগ্রহ-শালা থেকেই তাঁর গল্পগুলির মালমশল্লা মুখ্যত আহরণ করেছেন। এবং এই কাঁচা মালমশল্লার উপাদান-উপকরণগুলিকে কাজে লাগিয়ে তিনি তার ভিত্তিতেই সুদৃশ্য এবং সুদৃঢ় বিশাল এক শিল্পের ইমারত গড়ে তুলেছেন, যে-ইমারতের বেশ কয়েকটি তল এবং তার সব কটিতেই অনেকগুলি করে প্রকোষ্ঠ। প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠই বাঙালী মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের স্তরে সংঘটিত এক-একটি গল্পের জীবনরঙ্গ দিয়ে ঠাসা।

আজকের পরিভাষায় আমরা যাকে বলি 'সমাজ-চেতনা' তার পরিচয় হয়ত গল্পগুলির ভিতর তেমন নেই, কিন্তু ওই অভাবের পরিপূরণ হয়েছে বিলক্ষণ মাত্রায় বাঙালী জীবনের অনুষঙ্গে যাকে বলা যায় 'সংসার-চেতনা,' তার দ্বারা। আর ভেবে দেখতে গেলে, সংসার-চেতনা তো সমাজচেতনারই একটা সংকীর্ণ, সংকুচিত রূপ—সমাজের বৃহত্তর সীমানা থেকে সংসারের সীমাবদ্ধ সীমানায় দৃষ্টিকে এনে স্থাপন করাকেই তো বলে সংসার-চেতনা। এও বাস্তবতার একটি রূপ, তবে সীমিত তার ক্ষেত্র। বাস্তবতার রস এই ক্ষেত্র থেকেও যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ধারণ করা যায়, যদি লেখিকার বাস্তব দৃষ্টি থাকে। বেলাদেবী বারে বারেই এই বাস্তবদৃষ্টির প্রমাণ তাঁর গল্পগুলির ভিতর রেখেছেন। এই সংগ্রহের প্রায় প্রতিটি গল্পই বাস্তবনিষ্ঠতার প্রভাবসম্ভূত—কোন গল্পই নিছক কল্পনার আকাশ থেকে পেড়ে-আনা স্বপ্ন-কুসুম নয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সংকলনের প্রথম গল্পটির কথাই ধরা যেতে পারে। 'নিষ্ঠুর পৃথিবী'র নিষ্ঠুরতা একটি নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের সংসারভার-প্রপীড়িতা এক অনূঢ়া বয়স্থা কন্যার ব্যর্থ জীবনের অনুষঙ্গে কী মর্মান্তিক কারুণ্যেই না ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গল্পটির ভিতর। নিষ্করুণ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণজনিত নিত্য অভাব-অনটনের তাপে কেমন করে যৌবনের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ ঝলসে যায়, বয়স পেরিয়ে যৌবন যৌবনের কঙ্কালে পরিণত হয়, তারই এক অতিবাস্তব আলেখ্য। সুমিতার দুঃখে বাস্তবিকই মন করুণার্দ্র অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিংবা 'একটু রঙ' গল্পের কথাই ধরা যাক। এটিও নির্মম দারিদ্র্যের গল্প, তবে তার পরিবেশটি বা শেষটি অন্যরকম। একটি আশার সঞ্জীবনী সুরে গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। হয়ত এই আশা অবাস্তব, জীবনে সম্ভবতঃ কখনও ফলবতী হবে না, তবু ওই আশা

আঁকড়ে ধরে থাকতেও কত সুখ! 'বামুনদি' গল্পে বামুনদির যে চরিত্র আঁকা হয়েছে তা ষোল আনা খাঁটি এক চিত্র—আমাদের পরীক্ষিত অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই তার আহরণ। 'ফাটল' গল্পে এককালীন বনেদিয়ানার দম্ভের যুগোচিত পরাভব বড় সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। গল্পটিতে সমাজচেতনার যে-অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে তা তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করবার মত এক বস্তু।

এই সংগ্রহের পাঁচটি শ্রেষ্ঠ গল্প হলো 'দিদি,' 'সোনার কাঠি,' 'বিশ্বাস,' 'সেতু' ও 'বিচিত্র মন'। অবশ্য প্রথম দুটি গল্পের প্লটের কাঠামোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'গিন্নী' ও 'সমাপ্তি' গল্পের প্লটের খানিকটা আদল আছে, তবে তা ধর্তব্য নয় এই কারণে যে, লেখিকার অভিজ্ঞতার জগৎ আর 'গল্পগুচ্ছ' যখন লেখা হয়েছিল তখনকার পরিবেশ আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তবুও দুই ভিন্ন যুগের আবেষ্টনীতে কখনও কখনও নিতান্ত অজানিতেই মিল ধরা পড়ে যায়। 'বিশ্বাস' একটি আশ্চর্য রচনা। দারিদ্র্যের ভারে জরাজীর্ণ যে-কোন সংগ্রামী মধ্যবিত্ত জীবনকে উজ্জীবিত করে তোলবার পক্ষে এই গল্পের বক্তব্য অতিশয় প্রাণপ্রদ। পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একজোড়া স্বামী-স্ত্রীকে পুনরায় মিলিত করবার পক্ষে সন্তানই যে সবচেয়ে বড় সংযোজক, 'সেতু' গল্পে তারই মধুর ব্যঞ্জনা। এই সংকলনের সবচেয়ে কাব্যরসান্বিত গল্প 'বিচিত্র মন'। অসাধারণ এই গল্পের উপসংহার-ভাগে বিবৃত ঘটনাবলী পাঠেই গল্পের প্রকৃত স্বাদ, সুতরাং এখানে আর গল্পের আখ্যানাংশ নাই বা বিবৃত করলুম। তবে একটি প্রকৃত সুন্দরী অথচ জড়বুদ্ধি যৌবনবতী বালিকার যে ছবি এই গল্পে পরিবেশিত হয়েছে তার আভাস দেওয়া চলে। ছবিটি এক কথায় চমৎকার।

লেখিকা মূলতঃ নির্মল গার্হস্থ্যরসের গল্পকার হলেও এ-যুগের সমাজ-প্রবাহের কুটিল-বক্র গতিভঙ্গ সম্বন্ধেও যে বেশ কিছু-কিঞ্চিৎ সংবাদাদি রাখেন তার পরিচয় পাই এই তথ্যে যে, তিনি ডিভোর্স বা বিবাহবিচ্ছেদকে একাধিক গল্পের বিষয়ীভূত করেছেন। এমন কি প্রাক্-বিবাহ সন্তানবতিত্ব বা সন্তান-সম্ভাবনার ঘটনা চিত্রিত করতেও তাঁর হাত একটুও কাঁপেনি। 'দূর আকাশের তারা' কিংবা 'সেতু' এই জাতীয় গল্পের নিদর্শন। 'মরণোত্তর' ও 'ঘরে-বাইরে' গল্প দুটির মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক সুর স্পষ্ট। 'অশ্বত্থ চারা' ও 'হারানো স্বপ্ন' দুটি নির্মম দারিদ্র্যের গল্প কিন্তু আশাবাদের সুর অনুরণিত হয়ে আকাঙ্ক্ষিত পরিণতির বদলে গল্প দুটির ভিন্নতর পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। 'অসম্ভব' একটি অন্যথা-রুক্ষ গল্পের বড় মধুর পরিসমাপ্তি।

মোট কথা, এই বইয়ের গল্পগুলি যিনিই পড়বেন তিনিই অকৃত্রিম আনন্দ

পাবেন। গল্পগুলির বুননের মধ্যে হয়ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বৈদগ্ধ্য, বিদূষিতা বা তির্যক্ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় তেমন মিলবে না তবে ওই ক্ষতি পুষিয়ে যায় একটি অমলিন অকলুষ শিল্পীমনের সংস্পর্শে এসে, যে-মন এই লেখাগুলির মধ্যে একটি স্বচ্ছ দীঘির কাকচক্ষু জলের মতই টলটল করছে। লেখিকার ভাষার চালটি বড়ই শ্রীছাঁদ যুক্ত—মার্জিত সংযত অথচ লাবণ্যময়। বাহুল্য কথার ভার একেবারেই নেই তাতে বোঝা যায় লেখিকার ওজনের বোধ আছে। লেখিকা ঝরঝরে মিষ্ট ভাষার একজন নিপুণা কথাশিল্পী।

আমি এই গল্পগ্রন্থটির বহুল প্রচার ও নিবিড় শিল্পসমাদর কামনা করি।

নারায়ণ চৌধুরী

সূচীপত্র

জীবনের কত রঙ

নিষ্ঠুর পৃথিবী

পাঁচটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সুমিতা জ্যেষ্ঠ। মেয়ের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে নিখিলবাবুর মনে হয় শ্রেষ্ঠও বটে।

আরও চারটি সন্তান আছে তাঁর। সুমিতার পর সুশীল, সুনীল তারপর সুজাতা, সুলতা। কিন্তু সুমিতার মতো আর কেউ কি?

ভগবান যেন তাঁর শিল্পকীর্তির চূড়ান্ত পরিচয় দেবেন বলেই সুমিতাকে গড়েছিলেন। আর শুধুই কি রূপ? যেমন পড়াশুনায়, তেমনি চলাফেরায়—তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর সপ্রতিভ, আর তেমনি ওর স্বভাবমাধুর্য। মিষ্টিকথা আর মিষ্টি ব্যবহার। দরদী আর সংবেদনশীল অন্তর।

কি ভাবে যে তরতর করে একদিন বি.এ. পাশ করে ফেললো সুমিতা, নিখিলবাবু যেন তা টেরও পেলেন না। একটি দিনের জন্যেও সুমিতার পড়াশুনার চিন্তা তাঁকে করতে হয়নি। সুমিতার কোনো কিছুর জন্যে তাঁকে ভাবতে হয়নি। কিন্তু এবার ভাবতে হচ্ছে। সুমিতা বি. এ. পাশ করেছে। এবার তার জন্য একটি পাত্র চাই যে! তাঁর সেরা মেয়েটির জন্য একটি ভালো পাত্র।

নিখিলবাবুর অবস্থা মোটামুটি মন্দ নয়। যা উপার্জন করেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ভদ্রভাবেই চলে যায়। তার উপর গৃহিণীর মিতব্যয়িতার গুণে সামান্য দু'পয়সা সঞ্চয়ও হয়েছে। অন্তত সুমিতার বিয়ে দেবার সংস্থান তাঁর হাতেই আছে। এখন একটি ভাল পাত্র পেলেই হয়। আর সুলতা সুজাতার বিয়ে! ওরা এখনও ছোটো। ওরা বড় হতে হতে কি সুশীল সুনীল দাঁড়িয়ে যাবে না? কাজেই নিখিলবাবুর চিন্তার মধ্যেও একটা নিশ্চিন্ততার ভাব ছিলো। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর। কিছুদিন থেকেই নিখিলবাবুর ডান হাতটায় যন্ত্রণা বোধ হচ্ছিল। হাতটা ঈষৎ দুর্বল মনে হতো আর একটু একটু কাঁপতো। ডাক্তারি ইনজেকশন, কবিরাজী তেল, টোটকা ওষুধ, সবই ব্যবহার করা হচ্ছিল। ক্রমে সেই হাতটা অসাড় হয়ে গেল। সেই সঙ্গে চাকরিটিও গেল।

নিখিলবাবু হতাশায় ভেঙে পড়লেন। হাহাকার করে উঠলেন—এ আমার কি হলো! ছেলে দুটোও ছোটো ছোটো। এবার কি করে এ সংসার চলবে! কার উপর নির্ভর করে দাঁড়াবো। সুমিতা কাছেই ছিলো। বড়ো বড়ো দুটি চোখের সহানুভূতিভরা দৃষ্টি পিতার মুখের উপর রেখে বললো—'কেন বাবা, আমি তো আছি।' পিতার পঙ্গু হাতখানি পরম মমতায় টেনে নিয়ে নিজের কাঁধে স্থাপন করে বললো—'আমার কাঁধে ভর দিয়ে তুমি দাঁড়াবে।'

ভাঙা গলায় নিখিলবাবু বললেন—'তুই! তুই কি করবি মা? আমি যে কতো আশা করেছিলাম, এবার তোর বিয়ে দেবো। তা তো হলোই না। তার উপর এই বিরাট সংসার তোর উপর ফেলি কি করে! এ-ঘানি কি তুই টানতে পারবি?'

'কেন পারবো না বাবা? ছেলে হলে করতে হতো না? মেয়ে বুঝি পর!'

সুমিতার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ই বা কি। সুশীল সবেমাত্র স্কুল ফাইন্যালের জন্যে তৈরি হচ্ছে। সুনীল পড়ে নাইন-এ। সুজাতা সুলতা আরও নীচে।

সুমিতা একটা মেয়ে স্কুলে চাকরি নিলো। বেতন খুব বেশি নয়। তাই সেই সংগে ধরলো টিউশনি। তার উপর বি. টি. পড়তে লাগলো। বি. টি. পাশ করতে পারলে একটা ভদ্র মতো মাইনে পাওয়া যাবে।

সুমিতার উপার্জন আর সেই সংগে সঞ্চয়ের কিছু কিছু ভাঙিয়ে সংসার চলতে লাগলো!

নিখিলবাবু সুমিতাকে বললেন—'তুই খেটে মরবি আর আমি বসে বসে খাবো! আমাকে দুটো টিউশনি জুটিয়ে দে মিতু।'

'এই শরীর নিয়ে তুমি কোথায় টিউশনি করতে যাবে বাবা! তার চেয়ে বাড়িতে ওদের একটু পড়া বলে দিও। দুটো টিউটরের খরচা বাঁচবে। তাতে সংসারের কতোটা সাহায্য হবে বলো তো।'

দুঃখের দিনগুলো মন্থরগতিতে কেটে যায়। সুশীল স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে কলেজে ঢোকে। মা-বাবা বলেছিলেন একটা কিছু চাকরিতে ঢুকে যেতে। কিন্তু সুমিতা রাজী হয়নি। বলেছে—না, সমর্থ হোক, তবে তো বোঝা বইবে। অসময়ে বোঝা চাপিয়ে দিলে

বইতেও পারবে না, অথচ সংসারও চলবে না, মাঝ থেকে ওর জীবনটা নষ্ট হবে। আমি আছি, এই সুযোগে ও দাঁড়াক আগে। তবে তো উপার্জন করতে পারবে। কাজেই সকলেরই পড়াশুনো যথারীতি চলতে লাগলো। ইতিমধ্যে সুমিতা বি.টি. পাশ করায় চাকরিতে কিছুটা উন্নতি হলো। কিন্তু অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় এবং ক্রমশই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়াতে নিখিলবাবু একেবারে শয্যা নিলেন। সংসারের খরচের উপর ডাক্তার আর ওষুধের খরচা বাড়লো। সঞ্চয়ের ভাণ্ডার ক্রমেই শূন্য হয়ে এলো। নিখিলবাবু অসহায়ের মত নিজের অদৃষ্টকে বারবার ধিক্কার দিতে লাগলেন।

সুমিতা পরম মমতার বাবার মাথায় হাত রাখলো—'তুমি এতো অস্থির হচ্ছো কেন বাবা? আমি তো আছি।'

'তুই আর কতো করবি মা! এতো বড়ো সংসার ঠেলে আবার আমার জন্যে এক কাঁড়ি খরচা। ভগবান যদি তুলে নিতেন, তবুও তো একটা খরচ কমে যেতো।'

বাবার মাথায় মুখে আদরে হাত বুলিয়ে সুমিতা বলে—"ছিঃ বাবা, অমন করে বললে আমি এতো রাগ করবো আর তোমার সংগে কথাই বলবো না। আজকের এ-দুঃখ কি চিরদিন থাকবে? এই তো সুশীল এবার বি. এ. পাশ করে বেরোবে। অনেককে বলে-কয়ে রেখেছি, অনেকে ভরসাও দিয়েছেন। একটা হিল্লে হয়ে যাবেই। তারপর আর আমাদের দুঃখ কি বাবা!'

হলোও তাই। সুশীল পাশ করে বেরোতেই কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রচেষ্টায় তার একটা ভালো চাকরি হয়ে গেল। বাবা বললেন, 'এবার ওদের সংসার ওদেরই বুঝে নিতে দে। তুই বিয়ে কর। আমি দেখে যাই।'

সুমিতা বলে—এতো অস্থির হচ্ছো কেন বাবা! একজনের উপার্জনে এতো বড়ো সংসার চলে? তোমার কিছু সঞ্চয় যদি না থাকতো, তবে শুধু আমার রোজগারে সংসার চলতো? এখন সঞ্চয় শেষ হয়েছে। আমি না থাকলে সুশীলের পক্ষে একা এ-সংসার চালানো সম্ভব হবে? যাক না কিছুদিন। সুনীল দাঁড়াক। ওরা দুজনে মিলে যেদিন সংসারের দায়িত্ব নেবে, সেদিনই আমি ছুটি নেবো বাবা।'

নিখিলবাবু কথা বলেন না। সুমিতার কথার যৌক্তিকতা মেনে নেন।

দিন গড়িয়ে চলে, সেই সঙ্গে সুমিতার বয়সও।

কিন্তু দেহেরই শুধু বয়স বাড়ে। সুমিতার মনটি যে তখনও অক্ষত অনাঘ্রাত একটি কুসুম-কোরকের মত রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে নিটোল।

তারপর—একদিন সেই মনের উপর পড়লো প্রভাতের সূর্যালোক। আর কি কুঁড়ি কুঁড়ি থাকে। কোরক-মন দল মেলে মেলে শতদল হয়ে ফুটে উঠলো। কিন্তু দেবতার পায়ে তা দেবার উপায় কই! দায়িত্বের শৃংখলে যে হাত-পা বাঁধা।

সুরঞ্জন সেই দেবতা যে সোনালী আলো নিয়ে এসে সুমিতার জীবনে দাঁড়ালো—যে সুমিতার কোরক-মনটিকে রাতের নিদ্রা থেকে ভোরের জাগরণে নিয়ে এলো।

সুমিতা বলে—'নিজেকে নিবেদন করবার সামর্থ্য আমার নেই। আমি সূর্যমুখীর মত চিরদিন দূর থেকেই শুধু তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবো।'

সুরঞ্জন বলে—'সূর্যমুখীই শুধু সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে না সুমি। সূর্যও সূর্যমুখীর দিকে তাকিয়ে থাকে।'

'তুমি কেন তাকিয়ে থাকবে, কতদিন থাকবে?'

'যতদিন তুমি থাকো।'

সেই থেকে দু'জনেই প্রতীক্ষায় সুস্থির। আশা ও বিশ্বাসে অটল।

সুনীলের একটা কিছু হতে হতে কেটে গেল আরও গোটা কয় বছর। সুজাতা সুলতা কলেজে পড়তে লাগলো। আর সুমিতার চুলে সাদা রেখা জাগলো।

সুরঞ্জন বলে—'আর কতদিন সুমিতা! এ অন্তহীন প্রতীক্ষার শেষ কবে?'

'আমার জন্যে কেন তুমি নিজের জীবনটাকে বঞ্চিত করতে চলেছো রঞ্জন? আমি যতোদিন না এই দায়িত্বের বোঝা নামাতে পারি, ততোদিন যে আমার উপায় নেই।'

'বেশ! বোঝা নামাও। ততোদিন আমি অপেক্ষা করবো।'

সুনীল জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলে যখন সুমিতা ভাবছে—আর সুরঞ্জনকে প্রতীক্ষার দুঃসহ তপশ্চর্যায় কালক্ষেপ করতে দেবে না—সেই সময়ে পিতার মৃত্যু হলো। পরিবারে নামলো শোকের ঝড়। মা একেবারে ভেঙে পড়লেন।

এমনি গণ্ডগোলে আরও কিছুদিন। সুমিতার মনের ইচ্ছেটা মনের গহনকোণে চাপা পড়ে রইলো। চাপা পড়ে রইলো সংসারের সহস্র প্রয়োজনের তাগিদের তলায়।

তারপর একদিন পরিবারে সৃষ্টি হলো সুস্থ এবং শান্ত পরিবেশ। সুমিতা চারদিকে তাকিয়ে দেখলো—না, এবার তাকে ছাড়াও চলে যাবে সংসার।

সুমিতা বললো—'রঞ্জন, এতদিনে বুঝি দায়িত্বের বোঝা সত্যিই ঘাড় থেকে নামলো। কিন্তু আমাদের জীবনের অনেকগুলি দিন কি কেটে যায়নি? এখন কি আর নতুন করে ঘর বাঁধার সময় আমাদের আছে?'

'কেন থাকবে না সুমি! না-হয় বয়সের তহবিল থেকে কিছুটা খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু মনের দিকে তাকিয়ে দেখো তো! সেখানে যে আমাদের পূর্ণ ভাণ্ডার। সে-ভাণ্ডার থেকে তো এতটুকু অপচয় করিনি। আমাদের নতুন-বাঁধা ঘর সেই ভাণ্ডারের দৌলতেই পূর্ণ হয়ে উঠবে সুমি!'

পরিতৃপ্তির হাসি হাসে সুমিতা। বলে—'কিন্তু মাথার দিকে তাকিয়ে দেখেছো? লোকে হাসে যদি।'

সুরঞ্জনও হাসে—'আমি তোমার মাথার দিকে তাকাই না সুমি। তাকাই তোমার চোখ দুটোর দিকে। তোমার মনের দিকে। মাথার জন্য মাথা ঘামাই না। বাজারে অনেক কলপ বেরিয়েছে।'

সুমিতার মুখভরা তৃপ্তির হাসি। বুকভরা সুখের নিঃশ্বাস।

সুমিতা যখন মা'কে বলবে বলে মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে, অপেক্ষা করছে সুজাতা সুলতা আর সুশীল সুনীল যে-যার ঘরে চলে গেলে মাকে একান্ত নিরিবিলি করে পাবার—সেই সময়ে সকলের উপস্থিতিতে মা-ই কথাটা পাড়লেন—'মিতু সবই তো হলো। এবার তুই বিয়ে কর্। তোর এই যোগিনীর জীবন আর আমি চোখে দেখতে পারিনে।'

সুমিতা দুচোখ নত করলো।

সুনীল বলে উঠলো—'বিয়ে বড়দির!'

সুজাতা আর সুলতা মুখ বেঁকিয়ে হেসে উঠলো। সুজাতা বললো—'মা'র যতো আদিখ্যেতা!'

সুলতা অবজ্ঞায় ঠোঁটের কোণ কুঁচকে বললো—'কি যে মাথামুণ্ডু

বলে তার কোনো ঠিক নেই—আদ্দেক চুল সাদা হয়ে গেছে, এখন কি না বিয়ে! ছি, ছি!'

ওদের ব্যঙ্গের হাসিটা সুমিতার মনের সব স্বপ্নকে ভেঙে খান্ খান্ করে দিলো। শুধু চুলের রঙটাই ওদের চোখে পড়লো। মনের রঙটা পড়লো না। নিষ্ঠুর পৃথিবী। জীবনের অর্ধেক অপচয় হয়েছে বলে বাকিটাও সার্থক করে তুলতে পারবে না! কিসের মাশুল দিতে গিয়ে, কাদের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আজ তার চুলে সাদা রঙ ধরেছে, সেটা ওরা একবারও ভেবে দেখলো না।

সুমিতা নিজেই তো জানে, তার বয়স হয়েছে। তার চুলে পাক ধরেছে। কি ক্ষতি হতো ওদের, যদি ওরা শুধু একটু সহানুভূতি দেখাতো। যদি অমন ব্যঙ্গের হাসিতে খান্ খান্ হয়ে না পড়তো!

অকৃতজ্ঞ পৃথিবী! যাদের জন্য সুমিতা জীবনের একটা স্বর্ণময় যুগ বিলিয়ে দিলো, তারা একটু সহানুভূতি দেখালে সুমিতার জীবনে শত বঞ্চনার মধ্যেও একটু সান্ত্বনা আসতো, কিন্তু ক্ষতি তো হতো না কারও।

নিঃশ্বাস ফেললো সুমিতা। পৃথিবী কি নির্মম!

'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা'

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮

খাঁচা

সর্বাণী ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করছে মেয়েটাকে। দোরগোড়ায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। ছেঁড়া, বোতামখোলা, ময়লা চিটচিটে একটা জামা গায়ে। জামাটা বাঁ পাশে ঝুলে আছে তাই বাঁ কাঁধটা খোলা। মাথার চুলগুলো রুক্ষ উস্কো-খুস্কো। গায়ে ছোপ ছোপ ময়লা। রংটা ফর্সা বলে ময়লার ছোপটা বেশি স্পষ্ট। দু'টো টানা-টানা চোখ মেলে বাড়ির ভেতর দিকে তাকিয়ে থাকে। কি দেখে, সেই জানে। সর্বাণী ভিক্ষে দিয়েও দেখেছে, পয়সা-চাল হাতে পেয়েও মেয়েটা চলে যায় না। চুপটি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। সর্বাণী জিজ্ঞেস করেও দেখেছে—কি চাস ?

কিছু না।

দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

এমনি।

সর্বাণী আর কিছু বলে না। ভাবে—কি জানি, ছেলেমানুষের খেয়াল—নাকি মেয়েটার মাথায় ছিটটিট আছে।

আগের দিন মেয়েরা এক বিয়েবাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিল, তাই পরদিন রোদে মেলে দিয়েছিল আগের দিনের ব্যবহার করা শাড়ি জামা। বিয়েবাড়িতে ভিড়। গরম, ঘাম শাড়ি জামায় একটু রোদ লাগিয়ে না নিলে এগুলোর ইজ্জত থাকে না।

দুপুরবেলা বড় মেয়ে শিবানী বললো—মা, আমার শাড়িটা আর রুবেনীর ফ্রকটা বাইরে রোদে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। তুমি তুলেছো নাকি ?

না তো ! বোধ হয় রুবেনী তুলেছে। জিজ্ঞেস কর।

রুবেনী বললো—না রে দিদি, আমি তো তুলিনি।

সর্বনাশ ! চুরি হলো নাকি। এবারই পুজোয় কেনা আনকোরা নতুন শাড়ি জামা। একশো পঁচাত্তর টাকার শাড়ি আর আশি টাকার ফ্রক।

খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। না, কোনো সন্ধানই পাওয়া গেলো না।

বড়ো ছেলে মণ্টু বললো—খানিক আগেও দেখেছি দিদি। এর মধ্যে কে নিয়ে গেল ?

ছোটো ছেলে হাবুল বললো—আমার মনে হয় ঐ ভিখিরি মেয়েটা। সারাক্ষণ তো গেটের পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। আর এমন হয়েছে! পাঁচ ভাড়াটের বাড়ি, গেটটা সব সময় বন্ধ রাখারও জো নেই।

ঠিক বলেছিস। শিবানী কথাটা লুফে নিলো। ঐ মেয়েটাই নিয়েছে নিশ্চয়।

অমনি সবার মনোযোগ পড়লো ঐ মেয়েটার দিকে। হ্যাঁ, অনেকক্ষণ পর্যন্ত মেয়েটাকে দোরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। এখন মেয়েটাও নেই, শাড়ি জামাও হাওয়া।

শিবানী আর কুবেনী শোকে আত্মহারা। আহা! এমন চমৎকার শাড়িটা! এতো সুন্দর জামাটা!

তারপর আর তিনদিন মেয়েটার দেখা নেই। মণ্টু বললো—দেখলে মা, ঐ মেয়েটাই নিয়েছে কি না! নইলে রোজ যে দুবেলা এসে দাঁড়িয়ে থাকে, আজ তিনদিন তার পাত্তা নেই।

হাবুল বললো—দাঁড়াও না। আর একদিন দেখতে পেলে মজা বুঝিয়ে দেবো।

একাজ যে মেয়েটারই সে বিষয়ে কারও সন্দেহ রইলো না।

পরদিন। মণ্টুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—মা, মা, দেখে যাও।

সর্বাণী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখে সেই মেয়েটার হাত চেপে ধরে মণ্টু দাঁড়িয়ে। মেয়েটার মুখ ভয়ে বিবর্ণ!

দেখ মা, রাস্তায় দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে এসেছি, ক'দিন পালিয়ে বেড়াবে ?

হাবুল ধমকে বললো—এই, শাড়ি আর জামা কোথায় ?

মেয়েটা আড়ষ্ট কণ্ঠে বললো—আমি তো জানি না।

বটে! হাবুল ঠাস করে একচড় কষিয়ে দিলো মেয়েটার গালে তুমি জানো না তো জিনসগুলি কি হাওয়া হয়ে গেলো!

মণ্টু মেয়েটার রুক্ষ চুলের গোছা ধরে বার কয় ঝাঁকুনি দিয়ে বললো—সত্যি করে বল: কি করেছিস। নিয়ে বেচে দিয়েছিস ?

মেয়েটার দুই গালে জলের ধারা গড়িয়ে পড়লো। বললো—আমি নিইনি।

শরীরে চিড়-বিড় জ্বালাধরা শিবানী বললো—কষে লাগা না দু'ঘা, তবেই কবুল করবে।

শিবানী যেন ওদের দুজনকে আরও উস্কিয়ে দিলো।

ভয়ে বিবর্ণ বিভ্রান্ত মেয়েটা অসহায় দুটো চোখে সর্বাণীর দিকে তাকালো, দুই চোখে জলের প্লাবন।

সর্বাণী বললো—থাক্ বাপু, আর মারিস নে।

হাবুল বললো—হ্যাঁ, থাকবে বৈ কি, সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না জেনো।

মণ্টু বললো—যেমন কুকুর, তেমনি মুগুরের ব্যবস্থা করতে হয়। বলেই আর এক থাপ্পড়।

সর্বাণী বললো—দাঁড়া, খুব হয়েছে। হ্যাঁরে, সত্যি করে বল্ তো—নিয়েছিস না কি। স্বীকার করলে কেউ তোকে মারবে না।

নিঃশব্দ ক্রন্দনে মেয়েটা ঘাড় নেড়ে জানালো, সে নেয়নি।

মন্টু আর হাবুল গর্জে উঠলো। শিবানী বললো—বাপ্! কি ঝানু মেয়ে!

সর্বাণী বললো—তোরা একটু থাম্ তো। হ্যাঁরে খুকি, তুই রোজ এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস কেন?

চোখের জল দ্বিগুণ হলো। কিন্তু মেয়েটা মুখ খুললো না।

বল্, কেন দাঁড়িয়ে থাকতিস, বল্।

মেয়েটা নীরব। হাবুল আর মণ্টু গর্জে উঠল—বুঝলে মা, কথা বার করা কি ভীষণ শক্ত।

সর্বাণী ওর মাথায় হাত রাখলো—বল্ না কেন দাঁড়িয়ে থাকতিস?

মেয়েটা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—তোমাকে দেখতে।

আমাকে দেখতে! সর্বাণী অবাক্! হাবুল মণ্টু শিবানী কুবেনীও।

কেন রে খুকি! কেন বল্‌তো!

তুমি যে দেখতে ঠিক আমার মায়ের মতো।—এবার মেয়েটা সশব্দে কেঁদে উঠলো।

স্তব্ধ হয়ে যায় সর্বাণী। মেয়েটাকে কাছে টেনে নেয়। হাবুল মণ্টু যেন মিইয়ে গেছে।

সর্বাণী জিজ্ঞেস করে—তোর মা কোথায়?

অজস্র কান্নার ভেতর দিয়ে কোনোমতে দুটি কথা বোঝা যায়—মরে গেছে।

হাবুল মণ্টুর মুখের চেহারা যেন তেতো-খাওয়া। নাকি সেই মারগুলো ওদের পিঠে ফিরে এসে পড়ছে।

সর্বাণী দুই হাতে মেয়েটার মাথায় মুখে হাতে আধখোলা পিঠটায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। যেন ওর বাইরের মালিন্যটাকে মুছে ওর ভেতরটার মতোই চকচকে করে তুলতে চায়।

বললো—এ কয়দিন আসিসনি কেন খুকি?

বীরু কাকা আমার কেউ নয়। মা মরে যাবার সময় আমাকে ওর কাছে রেখে গেছে। বীরু কাকা ভিক্ষে করতে পাঠায়। আমি বেশি চাল নিয়ে যাই না বলে মারে। এই তিন দিন ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল। বেরোতেও দেয়নি, খেতেও দেয়নি। আজ আমি পালিয়ে এসেছি। এখানে আসছিলাম। অন্য বাড়িতে যেতে আমার ভালো লাগে না। তোমাকে দেখলে আমার মনেই থাকে না যে বাড়ি গেলে বীরু কাকা মারবে।

তুই আমার কাছে থাকবি খুকি?

মেয়েটার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ডাগর দুটো চোখের মায়াময় দৃষ্টি সর্বাণীর মুখের উপর ফেলে বললো—আমার নাম খুকি নয়তো। ময়না। মা বলত ময়না পাখি। তুমি আমায় ময়না পাখি বলবে তো!

সর্বাণী বুঝল ময়না পাখি একটা খাঁচা চায়। খাঁচায় আশ্রয় চায়। সে খাঁচাটা স্নেহের, মমতার, ভালোবাসার।

'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা'

১৪ আশ্বিন, ১৩৬৮

ফাটল

পঁচাশি বছর বয়স হলে কি হবে, দেখে বোঝার জো নেই।

এখনও মেরুদণ্ড সোজা করে চওড়া বুকটাকে টান টান করে সদর্প ভঙ্গীতে খড়ম পায়ে খটখট করে ঘুরে বেড়ান। চওড়া বুক আর পিঠের উপর শুভ্র উপবীত গুচ্ছ আড়াআড়িভাবে দোলে।

মাথায় চুল বারো আনা পাকা, চার আনা কাঁচার মেশাল এখনও। ললাটে কপোলে বলিরেখা পড়েছে বটে কিন্তু একেবারে চুপসে যায়নি মুখ। প্রশস্ত ললাট দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধরে একটা দৃপ্ত সদর্প ভঙ্গী।

না, যৌবনের মতোই এখনও বাড়িতে শিবশঙ্করবাবুর প্রবল প্রতাপ।

পূর্ববঙ্গে এক দোর্দণ্ড প্রতাপ-সম্পন্ন জমিদার ছিলেন তিনি। তাঁর ভয়ে আশেপাশের হিন্দু-মুসলমান সবাই ছিলো সন্ত্রস্ত। বাড়ির সবাই তাঁর ভয়ে কাঁপতো। পাকিস্তান হয়ে যাবার পর পূর্ববঙ্গের বসবাস তুলে দিয়ে কলকাতায় এসে পড়েছেন, সঙ্গে এনেছেন প্রচুর অর্থ এবং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দাপট, দম্ভ ও অহমিকা।

শচীপতি ছিল শিবশঙ্করবাবুর একমাত্র সন্তান। বিয়ের পর দু বছরের শিশুপুত্র অভিজিৎকে রেখে শচীপতি মাত্র তিরিশ বছর বয়সে মারা যায়। সেই অবধি শিবশঙ্করবাবুর একমাত্র বংশধর পৌত্র অভিজিৎ।

পাকিস্তান ত্যাগ করার বছর দুই আগে—'হাতে কাচ এবং মুখে মাছ' নিয়ে শ্বেত শুভ্র চুলে সিঁদুর এবং পায়ে আলতা পরে গৃহিণী জগত্তারিণী বিদায় নিয়েছেন। সেই থেকে শিবশঙ্করবাবুর আপনজন বলতে অকালবৈধব্যে ম্রিয়মাণা পুত্রবধূ সুলোচনা এবং পৌত্র অভিজিৎ। এছাড়া রয়েছে বিধবা বোন, ভাগ্নে-ভাগ্নি, ভ্রাতুষ্পুত্র, বধূ ইত্যাদি নিরুপায় ও অসহায় আশ্রিত পরিজনবর্গ। গুটিচারেক ঝি ঠাকুর চাকর।

তা আপনজন হোক, আশ্রিতই হোক বা ঝি-চাকর হোক—শিবশঙ্করবাবুর ভয়ে এখনও সবাই তটস্থ; সুলোচনার চুলে যদিও এতো দিনে পাক ধরেছে, এখনও শ্বশুরের চোখের দিকে চেয়ে বা উচ্চ কণ্ঠে কোনো কথা বলার সাহস তার নেই। এখনও যেন আগেকার দিনের নববধূটি।

ভয় যদিও সে করে—তবু সে বুঝতে পারে তার প্রতি মানুষটির স্নেহও বড়ো কম নয়। যেদিন শচীপতি মারা গেল সেদিন থেকে তার অকাল-বৈধব্যের দুঃখ অনুভব করেই বুঝি শিবশঙ্করবাবু মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। ছেড়ে দিয়েছিলেন জগত্তারিণীও। শেষে সুলোচনাই অনেক বলে কয়ে ফের তাঁকে মাছ ধরিয়েছিল। খেতে কি চান, অনেক ব্যর্থ চেষ্টার পর একদিন বলেছিল 'মা, সধবা মেয়েরা মাছ না খেলে যে স্বামীর অকল্যাণ হয়।' একথা শুনেই শেষে রাজি হয়েছিলেন শাশুড়ি, বাঁ হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে ডান হাতে মাছ মুখে তুলেছিলেন তিনি। মেয়েদের কাছে বুঝি সন্তানশোকের চাইতেও স্বামীর অকল্যাণ অসহ্য। শ্বশুরকে সুলোচনা চিরদিন বাঘের মতো ভয় করে। তবু একদিন সাহস করে—পরিপাটি করে রান্নাকরা দশ রকম নিরামিষ ব্যঞ্জনের পাশে এক বাটি মাছ দেবার ব্যবস্থা করেছিল সে।

কিন্তু শিবশঙ্কর তা স্পর্শ করলেন না। খাবার পর সুলোচনাকে ডেকে পাঠালেন।

বুক ঢিপ ঢিপ করছিল সুলোচনার। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শিবশঙ্কর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমাকে মাছ দেবার কথা কে বলে দিয়েছিল? তুমি?'

সুলোচনা মাথা নেড়ে স্বীকারোক্তি জানালো।

'তুমি জানো না, আমি হুকুম দিয়েছি—এবার থেকে মাছ খাবো না।'

'হুকুম' কথাটা শিবশঙ্কর খুবই ব্যবহার করেন। কথাটা উচ্চারণ করতেই তাঁর মনে আত্মপ্রসাদ জাগে।

এবারও মাথা নেড়ে সুলোচনা স্বীকৃতি জানালো!

'তবে—তবে কার হুকুমে তুমি আমায় মাছ দিতে বললে?'

অনেক কষ্টে এবার সুলোচনার মুখে কথা সরলো। খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে মরিয়া হয়ে বলে ফেলেছিল, 'শুধু শুধু আত্মাকে কষ্ট দিলে ভগবান কষ্ট পান বাবা!'

একটু যেন বিস্মিত হয়েই শিবশঙ্কর বধূর মুখের দিকে তাকালেন। একটু চুপ করে থেকে থমথমে গলায় বললেন, 'তোমার ভগবান কিসে কষ্ট পান তা আমি জানি না, তবে আমার বুকের ভিতর যে ভগবান আছেন মাছ খেলে তিনি আরও বেশি কষ্ট পাবেন। যাও বৌমা, তুমি

যদু বাঁড়ুজ্যের মেয়ে, যদু বাঁড়ুজ্যের মেয়ের মতই থাকো। শিবশঙ্করের মুখের উপর কথা কইতে এসো না। জেনো, আমার হুকুম আমি নিজে রদ না করা পর্যন্ত কিছুতেই তা রদ হয় না।'

মাথা নিচু করে ফিরে এসেছিল সুলোচনা। ঘরে বসে চোখের জলের ভিতর দিয়ে অনুভব করেছিল—দম্ভ আর কটূক্তির ভিতরও কতটা দরদ প্রচ্ছন্ন রয়েছে শিবশংকরের বুকের মধ্যে।

এর মধ্যেই যা দু' চারটে কথা বলে অভিজিৎ, সময় সময় একটু আব্দার বা জোর-জুলুমও করে। কিন্তু তা বলে দাদুর অমতে বা অন্যায় মতো কিছু করার সাহস তারও নেই।

সেই অভিজিৎ সদ্য সদ্য বিয়ে করেছে। উচ্চশিক্ষিত সুশ্রী যুবক। সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন ঘর। কাজেই শিবশঙ্কর খুঁজে পেতে বড়ো রুই-ই জালে ফেলেছিলেন। বড়ো ঘরের মেয়েই তাপ্তি। আর শিবশঙ্কর যেমনই এনে দিন অভিজিতের তাই শিরোধার্য। নিজে প্রেম করে বিয়ে করার মতো সাহস নেই তার। হয়তো প্রেমাস্পদার সামনেই দাদুর খড়মের ঘা খেয়ে তার দাঁতের পাটি উড়ে যাবে। তাই যেখানেই একটু প্রেম করার সুযোগ ঘটেছে, অভিজিৎ মনকে তীব্র কষাঘাত করে মনের লাগাম ঘুরিয়ে দিয়েছে বিপরীত দিকে। তবে শেষ পর্যন্ত অভিজিৎ দাদুর উপর খুশিই হয়েছে।

সেদিন দুপুরবেলা সবাই খেয়ে-দেয়ে যে-যার ঘরে দিবানিদ্রার আশ্রয় নিয়েছে। অভি আর তাপ্তি বালিসে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে সামনে খুলে ধরেছিল রবি ঠাকুরের কবিতা। দুজনে সুরে সুর মিলিয়ে মৃদু কণ্ঠে শুধু আবৃত্তি শুরু করেছিল—

'সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব
কেবল আঁখি দিয়ে—'

এমন সময় পর্দার ওপার থেকে দাদুর খাস ভৃত্য রামচরণের কণ্ঠ ভেসে এলো—'বৌদি!'

চট্ করে গায়ে মাথার কাপড় সামলে নিয়ে তাপ্তি খাটের উপর থেকে নেমে দাড়ালো। বললো, 'এই যে রামচরণ—এসো—'

রামচরণ ঘরে ঢুকে বললো, 'বাবু আপনার গয়নাগুলো সব দিতে বলেছেন বৌদি!'

'গয়নাগুলো !' তাপ্তি বিস্মিত হলো। 'গয়নাগুলো দিয়ে কি হবে ?'

'বাইরের ঘরে স্যাকরা এসেছে।'

স্যাকরা ! তাপ্তি ভ্রূকুঞ্চিত করলো।

চমকে উঠলো অভি। মনে মনে প্রমাদ গুনলো। দাদুর সাবেক রোগ কি আবার দেখা দিলো না কি ! তাপ্তি বাক্সসুদ্ধ গয়না রামচরণের হাতে তুলে দিলো। একটু পরেই রামচরণ ফিরে এলো। বললো, 'গায়ে যে কখানা আছে তাও বাবু খুলে দিতে বললেন।'

ততোধিক বিস্মিতা তাপ্তি গায়ের সব কটা গয়নাই খুলে রামচরণের হাতে দিয়ে দিলো। সে বেরিয়ে গেলে অভির পাশে বসে বললো, 'ব্যাপার কি বলতো !'

বিবর্ণ মুখে অভিজিৎ বললো, 'বুঝতে পারছি না তো !' বলে কবিতার বই বন্ধ করলো। রবি ঠাকুরের কবিতা তখন তার কাছে ক্রিমিনাশিনী বড়ির বিজ্ঞাপনের মতোই অরুচিকর ঠেকছিল। দাদুর যা কাণ্ড ! শেষ পর্যন্ত স্যাকরা দিয়ে গয়না যাচাই করা ! ছি ছি ! তাপ্তি কি যে মনে করবে ! খানিকবাদে রামচরণ আবার গয়নাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

সেদিন বিকালে গা ধোবার পর বৈকালিক প্রসাধন সেরে তাপ্তি সবে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় রামচরণ এসে জানালো, 'বৌদি, বাবু আপনাকে ডাকছেন।'

তখনই তাপ্তি শিবশংকরের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। বললো, 'আমায় ডেকেছিলেন দাদু।'

'হ্যাঁ। জানো, কথা দিয়ে কথা না রাখা মানে ঠকানো ? তোমার বিয়েতে আমাকে ঠকানো হয়েছে।' তাপ্তির মুখের উপর এক ঝলক রক্তিমা ছড়িয়ে পড়লো। ভ্রূকুঞ্চিত করে বললো, 'ঠকানো হয়েছে ?'

'তোমাকে যে ওজনের গয়না যৌতুক দেবার কথা ছিলো আজ ওজন করে দেখলাম এক ভরি কম আছে। এটা ঠকানো হলো না ?'

একটু চুপ করে থেকে সামলে নিয়ে তাপ্তি বললো, 'কম করে দেওয়া বা সামান্য জিনিসের জন্য ঠকাবার উদ্দেশ্য তাদের নিশ্চয়ই ছিলো না। অনেক সময় স্যাকরা জিনিস তৈরি করতে গিয়ে ওজন ঠিক রাখতে পারে না। সামান্য এদিক-ওদিক হয়ে যায়। তাই হয়তো সব ক'টা জিনিস মিলিয়ে এতোটা কম হয়ে গেছে।'

'সবগুলোতেই কম হয়ে গেলো ? যাক—যদি তাদের অজান্তে ব্যাপারটা হয়ে থাকে তবে এবার বাপের বাড়ি গেলে জানিয়ে দিও যেন সংশোধন করে নেয়।'

'তা আমি পারবো না।'

'কি বললে ?' শরীরটাকে ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন শিবশংকর। বিস্মিত চিত্তে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাপ্তির মুখের দিকে তাকিয়ে তার স্পর্ধার পরিমাপ করতে লাগলেন।

তাপ্তি ভ্রূক্ষেপ করলো না। বললো, 'না, আমি পারবো না। আপনার সম্বন্ধে তাদের ধারণা অনেক উঁচু। এই কথা শুনলে সে ধারণা নীচে নেমে যাবে।'

'শিবশংকরের সম্মান ফানুস নয় যে এতে চুপসে যাবে। বিশেষ করে—আমি দেনাদার নই, পাওনাদার।'

'তবুও না, এটা সে যুগ নয়। এ যুগে এ সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথা ঘামানোই অসম্মান। আপনার সম্মান রক্ষা করে চলা এখন আমার কর্তব্য। তাই এই সব তুচ্ছ কথা আমি কিছুতেই সেখানে জানাতে পারবো না।'

তুচ্ছ কথা! অসম্মান!

স্তব্ধ হয়ে গেলেন শিবশংকর। বুকের ভিতর ক্রোধের লাভাস্রোত টগবগ করে উঠলো। তাঁর কথার উত্তরে 'পারব না' জবাব শোনা তাঁর জীবনে এই প্রথম। তাও কিনা সম্মানহানির ভয় দেখিয়ে। পুত্রবধূ সুলোচনার বেলায়ও তো গয়না নিয়ে এমনি একটা ব্যাপার হয়েছিল। তিনি এজন্য সুলোচনার পিতাকে কতো কটূক্তি করেছিলেন। তিন বছর বাপের বাড়ি যেতে দেননি। নীরব চোখের জলে সুলোচনাও তাই মেনে নিয়েছিল। অভিজিতের জন্মের পর—নাতির মুখ দেখে বৈবাহিক যখন আগেকার কমতিটা সুদে-আসলে পুষিয়ে দিয়েছিলেন তখনই সুলোচনাকে বাপের বাড়ি যেতে দিয়েছিলেন। সেজন্য কি শিবশংকরের সম্মান প্রতিপত্তি কিছু কম ?

আগ্নেয়গিরির মতোই ফেটে পড়লেন তিনি—'বেশ, জেনে রাখো, তোমাকে আর বাপের বাড়ি পাঠাবো না আমি।'

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো তাপ্তি। বললো, 'আপনাকে

পাঠাতেও হবে না দাদু। আমি একা একা মধুপুর, রাঁচী, দিল্লি এমন কি বোম্বে পর্যন্ত ঘুরে আসতে পারি। বৌবাজার আর বালীগঞ্জ তো এপাড়া-ওপাড়া। একবেলায় মধ্যে গিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসা যায়।'

উঃ, অসহ্য!

অসহ্য বিস্ময়ে ছিটকে দাঁড়িয়ে পড়লেন শিবশংকর। অসহ্য রাগে চীৎকার করে মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লেন, 'তোমাকে—তোমার মতো মেয়েকে আমি ত্যাগ করবো। অভিজিৎকে আবার বিয়ে করাবো।'

এবার আরও হেসে অস্থির হল তাপ্তি। 'তার জন্য আটকাবে না দাদু। সে যুগ আর নেই। শোনেননি, হিন্দু কোড বিল পাশ হয়েছে? আপনার নাতি আর একটা বিয়ে করলে, আমিও আর একটা বিয়ে করে নেব।' তারপর হাসতে হাসতে বললে, 'ইজিচেয়ারটায় বসুন দিকিনি ভাল করে। রামচরণকে দিয়ে তামাক সেজে পাঠাচ্ছি। বিষ্ণুপুরী তামাক খেলে মেজাজ ঠাণ্ডা হবে। বলে গড়গড়ার উপর থেকে পুড়ে যাওয়া কল্কেটা তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল তাপ্তি।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শিবশংকর। পঁচাশি বছরের দেহটাকে হঠাৎ যেন বড়ো জীর্ণ মনে হলো তাঁর। তবে কি সত্যিই যুগ পালটে গেছে? তিনি জানেন 'ত্যাগ করবো' এই চরম শাস্তির কথা শুনে মেয়েরা পায়ের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়ে! অজস্র আকুতিতে আকুল হয়ে ওঠে। সে শাস্তি কি আজকের সমাজে এতোই তুচ্ছ? তিনি জানেন—তাঁর প্রতাপে সবাই ভয়ে কাঁপে। আজ কিনা ঐ কড়ে-আঙুল-প্রমাণ মেয়েটা তাঁর হুমকিকে নস্যাৎ করে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলো! তবে কি ভাঙন ধরেছে তাঁর পর্বতপ্রমাণ প্রতিপত্তিতে। ভিত টলে উঠেছে, ফাটল ধরেছে প্রকাণ্ড ইমারতের গায়ে?

বুকটা টান টান করে সোজা হয়ে যেন দাঁড়াতে পারছেন না শিবশংকর। দেহটা কুঁজো হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। থর থর করে কাঁপছে। তাপ্তির নির্দেশানুযায়ী ইজিচেয়ারটার উপরেই ধপ্ করে বসে পড়লেন শিবশংকর।

'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা'

৭ মাঘ ১৩৬৮

একটু রঙ

স্কুল ফাইনাল পাশ করে রীতা বাবাকে বললো—বাবা, আমি কলেজে পড়বো।

কলেজে! তোকে কলেজে পড়াবো! ছেলেটাকে পড়াতে পারি কিনা তাই দেখি! বুঝিস তো মা, তোকে এতটাই যে পড়িয়েছি সেও কত কষ্টে।

রীতা বোঝে সবই। বাবার ক্ষমতা কতটুকু তা সে জানে। তার পরেই তাদের একমাত্র ভাই বাবু। বাবুর পর আর দু'বোন—গীতা আর মিতা। বাবা একটা প্রেসে কাজ করেন। মাইনে আড়াই শো টাকা। ওই দিয়ে ছ'টি প্রাণীর সংসার সঙ্কুলান করতে হয়। মাঝে মাঝে বাবা ওভার-টাইম খাটেন। অভাবের শতছিদ্রভরা সংসারটাকে জোড়াতালি দেবার জন্য। কিন্তু জোড়া লাগে না। একদিকে জুড়লে আর একদিকের ছিদ্র বেরিয়ে পড়ে। মাঝখান থেকে—অতিরিক্ত খাটুনির ফলে বাবার দেহটাই রোগে রোগে শতছিদ্র হয়ে পড়ে। কাজেই রীতার কলেজে পড়া তো রীতিমতো বিলাস! তবু প্রাণটা চায়। পড়ার সংগীরা সবাই কলেজে ভর্তি হচ্ছে। বাকি শুধু রীতা। রীতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

কিন্তু সংসারের জোয়ালটাকে টেনে টেনে ক্লান্ত হয়ে বাবা যেদিন অকাল-বার্ধক্যজীর্ণ দেহটার মায়া ত্যাগ করলেন সেদিন রীতা বুঝলো আরও লেখাপড়া শেখাটা তার পক্ষে বিলাস ছিলো না, ছিলো প্রয়োজন। তখন স্কুল ফাইনালের বিদ্যে সম্বল করে তাকে চাকরির খোঁজে বেরোতে হয়। আর অনেক ঘাটের জল খেয়ে তারপর নেহাত কপালজোরেই বলতে হবে—একটা দু' শো দশ টাকা মাইনের চাকরি পেয়ে গেল।

যেন পায়ের নীচে মাটি পেলো এই সংসারটা। অকূল সমুদ্রে ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেল। অবিশ্যি বাঁচার মত বাঁচা নয়। নেহাত প্রাণটাকে দেহে ধারণ করা আর কি! রীতা সেই সংগে নিলো একটা টিউশনি। আয় সর্বসাকুল্যে দু' শো পঁচিশ টাকা। অর্থাৎ পৈত্রিক আমলের

মতই প্রায় মাথা-পিছু মাসিক বরাদ্দ। বাবা একজন গেছেন, পরিবারের আয়ও পঁচিশ টাকা কমেছে।

তবে বাবু টিউশনি করে নিজের পড়ার খরচটা চালিয়ে নিচ্ছে এই যা সাশ্রয়। আই. কম. পড়ছে বাবু। চাকরিও একটা খুঁজছে। যদি পেয়ে যায় তবে বি. কম.টাও পড়ার ইচ্ছে। বাবার খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল বাবু লেখাপড়া শেখে। বাবার সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার আগ্রহ বাবুরও কম নয়।

সেদিন বাবু বললো—দিদি, পাঁচটা টাকা দে না, পায়জামাটা বড্ড ছিঁড়ে গেছে। ওটা প'রে আর বেরোতে পারছি না।

খেঁকিয়ে উঠলো রীতা—পাঁচটা টাকা দাও! পাঁচটা টাকা খুব কম দেখলে, না? সারা মাসের অন্ন জুটবে কি করে! কেন, টিউশনির পয়সায় পায়জামা করতে পারিস না?

মুখ মলিন করে বাবু বললো—তা হলে কি চাইতাম! এই ছুটির মাসে যে কলেজের দু' মাসের মাইনে একসঙ্গে দিতে হলো।

বাবু চলে গেলে বড় মায়া হল রীতার। আহা, কেন ও বাবুকে অমন মুখঝামটা দিয়ে উঠলো। অপব্যয় নয়, অপচয় নয়, এমন কি প্রয়োজনমতোও নয়; প্রয়োজনেরও অনেক কম চায় ওরা। অনেক কম পায় ওরা। যে করে হোক চলবে, বাবুকে টাকা দেবে রীতা।

পাঁচটা টাকা হাতে নিয়ে রীতা বাবুর কাছে গেল—এই নে বাবু, টাকা।—তার পর বাবুর মাথায় হাত রেখে বললো—রাগ করেছিস!

বা রে! সংসার খরচ যে কুলোয় না, দেখতেই তো পাই। দিলে অসুবিধে হবে না দিদি? আমি না হয় যা হোক করে চালিয়ে নেবো। অবশ্য বাবু জানে না সে 'যা-হোক'টা কি?

রীতা বললো—চলে যাবে এক রকম। অসুবিধে সহ্য করতেই তো আমাদের জন্ম রে!

সত্যি—বাবু উদাস দৃষ্টি অসীমে মেলে দিলো—আমারও যদি একটা কিছু জুটে যেতো! একা খেটে খেটে তোর কি কষ্ট! তবু কি অভাব কমছে! রাতদিন শুধু অভাব আর অভাব।

সেদিন গীতা বাবুকে বলছিলো—হ্যাঁ রে দাদা, 'স্বর্ণতোরণ' ছবিটা নাকি খুব ভাল হয়েছে?

—কি করে বলবো। আমি কি দেখেছি ?

গীতা বললো—আমার বন্ধুরা বলছিল। ওরা সবাই দেখেছ কিনা।

মিতা বললো—হ্যাঁরে, আমারও সব বন্ধুরা দেখেছে। কেউ বাকি নেই। সবাই বলছে খুব চমৎকার হয়েছে।

বাবু বললো—তবে আর কি ! এবার তোমরা ছোটো।

অত আশা করে না ওরা। অতখানি বিলাসিতার স্বপ্ন দেখতে সাহস পায় না। একদিনের সিনেমা দেখার খরচে দু বোনের দুটো ব্লাউস হয়ে যাবে। ছ' মাস পরতে পারবে। বন্ধুদের মুখে ছবির গল্পটা বিশদভাবে শুনতে পেলেই তারা খুশি।

রীতা শোনে 'স্বর্ণতোরণ' নিয়ে ভাইবোনদের আলোচনা। তার সামনে এ আলোচনা করবার সাহস নেই, আড়ালে ফিসফিস করে। এক এক সময় রীতার ভারী মায়া হয়। আহা ! ছেলেমানুষ। জীবনের সব রূপ সব রস থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে ওরা।

সেদিন রবিবার। দুপুরে খাওয়ার পর সবাই অলসভাবে একটু গড়াগড়ি দিচ্ছিল। রীতা সর্বাগ্রে উঠে পড়ে বললো—গীতা, মিতা ওঠ্। এক জায়গায় যাবো।

—কোথায় দিদি ?

রীতা ওদের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হেসে বললো—সিনেমায় যাবি ? স্বর্ণতোরণ !

তড়াক্ করে দু' বোন লাফিয়ে উঠলো—সত্যি দিদি, সত্যি যাবো ?

কৌতুকে হেসে ফেললো রীতা—হ্যাঁ রে সত্যি। তৈরি হয়ে নে। বাবুকেও বল্ তৈরি হয়ে নিতে।

লাফাতে লাফাতে ওরা চললো বাবুকে খবর দিতে। বাবুর তো বিশ্বাসই হতে চায় না। সবাই মিলে দল বেঁধে সিনেমায় যাওয়া ! বাবা মারা যাওয়ার পর এই বছর তিনেকের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি। বললো—যাঃ, দিদি বোধ হয় ঠাট্টা করেছে।

—না রে না, সত্যি বলছি। দিদি তৈরি হচ্ছে। তাড়াতাড়ি কর।

হেঁটে পাঁচ-সাত মিনিটের রাস্তা। সারাটা পথ ওরা যেন হাঁটলো না, উড়লো। খুশির বাষ্পে-ভরা এক একটা ফানুশ যেন। রীতা ভাবে—কতো অল্পে ওরা কত বেশি খুশি। তাদের এটুকু মনের খোরাকও

রীতা জোগাতে পারে না!

সিনেমা দেখে কলরব করতে করতে বাড়ি ফিরলো সবাই। বৈকালিক কাজের পালা চুকিয়ে মা ঘরের দাওয়ায় বসেছিলেন। বাবু, মিতা, গীতা তাঁকে ঘিরে বসলো। কে কার আগে গল্পটা বলে মাকে শোনাবে!

বাবু বললো—জানো মা, ছেলেটার মা, বাবা ছিলো কী গরিব! আমাদের চেয়েও আরও গরিব। সবদিন খেতে পেতো না। সেই ছেলে বছর বছর ফার্স্ট হয়ে, স্কলারশিপ পেয়ে কি করে বড়ো হলো। এম.এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে গোল্ড মেডেল পেলো। তখন এক বিরাট বড়োলোক তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাকে পাঠালো বিলেত। সেখান থেকে ফিরে এসে মোটা মাইনের চাকরি। ভাগ্য ফিরে গেল ছেলেটার। বুঝলে মা, শুধু নিজের চেষ্টায়, নিজের ক্ষমতায় ভাগ্যের চাকাটার মোড় ফিরিয়ে দিলে সে। আমাদেরই মতো একটা অতি গরিব ঘরের ছেলে।—বলতে বলতে বাবুর চোখ-মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল। বুঝি ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত নিজেরও একটা উজ্জ্বল ভাগ্যের ছবি কল্পনায় ফুটে উঠলো তার মনে।

গীতা মিতার মুখ দুটোও চকচক্ করছে কি এক উদ্দীপনায়।

রীতা দেখলো—মা'র চোখমুখেও কি এক আশার আলো দপ্ করে জ্বলে উঠেছে। তাঁর নিষ্প্রভ প্রাণহীন দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বোধ হয়, এই মুহূর্তে মা ভাবছেন—তাঁর বাবুও কি পারে না এমনি করে ভাগ্যের চাকাটার মোড় ফিরিয়ে দিতে?

এই বা মন্দ কি! রীতা ভাবলো—তাদের এই দু' শো পঁচিশ টাকা আয়ের সংসারে এই যে একটু আশা, একটু আলো, একটু রঙ্—এর মূল্যই বা কম কি! নিঃস্ব সংসারের জমা-খরচে জমার ঘরে এই তো তাদের এক কণা সঞ্চয়।

'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা'

১৮ চৈত্র, ১৩৬৮

বামুনদি

তিন পুরুষ ধরে বাড়ির সবার সঙ্গে তার এক সম্পর্ক—বামুনদি। কর্তা-গিন্নী, ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনী সবাই বলে বামুনদি। কর্তার আমল থেকে বাড়িতে কাজ করছে বামুনদি। এ বাড়ির ছেলেদের জন্মাতে দেখেছে। একটু একটু করে বড়ো হ'তে দেখেছে। শৈশবের অনেক আব্দার-অত্যাচার সহ্য করেছে। কে কবে কী খাবে, কবে কাকে মাছের মুড়োটা দিতে হবে তা নিয়ে ছেলের দল আগে থেকেই বামুনদির সঙ্গে বায়নাপত্র করে রেখেছে। বামুনদি এতটুকু উত্যক্তবোধ করে নি। যথাসাধ্য মানিয়ে বনিয়ে সবাইকে খুশি করেছে। তারপর ছেলেরা বড়ো হয়েছে। শৈশবের দুরন্তপনা কৈশোরে এসে মিলিয়ে গেছে। যৌবনের সমারোহে হৃদয় যত ভরে উঠেছে, বাইরে এসেছে তত সংযম, স্থিরতা। বামুনদির দরবারে উৎপাত কমেছে। কিন্তু বামুনদিকে কেউ কখনও অমর্যাদা করেনি। বামুনদিও সবাইকে যত্ন করে খাইয়েছে। গিন্নীর নির্দেশের অপেক্ষা রাখেনি। গিন্নীও নিশ্চিন্ত। তিনি জানেন, ছেলেদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাঁর নিজের চেয়েও বামুনদির অভিজ্ঞতা বেশি। তিনি নিজে তাদের ক'দিন খাওয়ান কিন্তু বামুনদি খাওয়ায় নিত্যি তিরিশ দিন দু'বেলা। তাই ছেলেদের রুচি সে জানে। তারপর বাড়ির ছেলেরা একে একে বিয়ে করেছে। বামুনদি নিজের মাইনের টাকা দিয়ে রুপোর সিঁদুর কৌটো কিনে বৌদের উপহার দিয়েছে। গিন্নী বৌদের বলে দিয়েছেন—এই বামুনদি, আমার নিজের বোনের মত। সেই থেকে বৌয়েরাও বামুনদিকে সমীহ করে চলেছে। আবার ছেলেদের দিকে যখন নাতি-নাতনী হয়েছে তাদের অন্নপ্রাশনে বামুনদি ঝিনুক-বাটি খেলনা উপহার দিয়েছে। অন্যান্য ঝি-চাকররা মুখ মুচকে মন্তব্য করেছে—আদিখ্যেতা! বামুনদি ঝংকার দিয়ে জবাব দিয়েছে—সে তোরা বুঝবি কি? হাঁড়ি কালো না হতেই হাঁড়ি থেকে তোদের ভাত উঠে যায়। দশ বাড়ি চেখে বেড়াস্। আর আমার! এ বাড়ির ইঁট-কাঠের সঙ্গেও আমার সম্বন্ধ রয়েছে রে!

একদিন বাড়ির গিন্নী মারা গেলেন। বাড়ির সবার সঙ্গে বামুনদিও হৃদয় নিংড়ে চোখের জল ফেললো। তারই নির্দেশে বৌয়েরা গিন্নীকে চওড়া লাল পাড় শাড়িতে সিঁদুরে আলতায় সাজিয়ে দিলো।

গিন্নীর মৃত্যুর পর কর্ত্রী হলো বৌয়েরা। বড়ো বৌ আগে এসেছে সংসারে। শাশুড়ির আচার-আচরণ অনেকটা আয়ত্ত করে নিয়েছে। শান্ত ধীর মানুষটি। বামুনদিকে রীতিমত সমীহ করে চলে। মেজবৌ বামুনদির এতোটা আধিপত্য সহ্য করতে না পারলেও এবং আড়ালে দু কথা বললেও সামনে কিছু বলে না। তার সাংসারিক জ্ঞান টনটনে। বোঝে, এ বাজারে এই মাইনেয় এমন আর একটি রাঁধুনি যোগাড় করা শক্ত। কিন্তু মুশকিল হয়েছে ছোটো বৌকে নিয়ে। সে আধুনিক মেয়ে। বছর চারেক হলো বিয়ে হয়েছে। একটিমাত্র ছেলে। বাড়ির রাঁধুনির এতো সর্দারি সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। তাই কথায় কথায় বামুনদির সঙ্গে ছোটো বৌয়ের ঠোকাঠুকি চলে।

ছোটো বৌ বলে—বামুনদি, তোমাকে না বললাম, মাছের ঝোলে একগাদা তরকারি দিও না, আর পেঁপের ডালনায় ঝাল কম দিও। কোনো কথা যদি তোমার গ্রাহ্যি হয়। নিজে যা পারো না, বললে তো তা শুনতে হয়?

কি বললে বৌমা? আমি রাঁধতে পারি না! আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এ বাড়িতেই রান্না করছি। আর তুমি সেদিনের মেয়ে, দুদিন হলো এ বাড়ি এসেছো—তুমি আমাকে রান্না শেখাচ্ছো?

ঝি-চাকরের এতো আস্পর্ধা আর কখনও দেখিনি। মুখে মুখে এমনি তর্ক করা আর কোনো বাড়িতে চলবে না।

কি বললে? আমি ঝি চাকর!

মাইনে নিয়ে যারা কাজ করে তাদের এ ছাড়া আর কি বলে আমার জানা নেই। আমার কথা হচ্ছে, বাড়ির লোকেরা যেভাবে বলে সেভাবেই কাজ করতে হবে।

উনুনের উপর থেকে দুম্ করে কড়াটা নামিয়ে রেখে হেঁসেল থেকে বেরিয়ে পড়লো বামুনদি। বৈঠকখানায় কর্তার দরবারে কেঁদে পড়লো—কর্তাবাবু, আমাকে বিদেয় দিন। গিন্নিঠাকরুন কোনোদিন একটা মুখের কথা বলেননি, আজ কিনা পেটের মেয়ের বয়সী বৌয়েরা আমাকে

যা-নয়-তাই বলে।

অনেক বলে-কয়ে কর্তা তাকে ঠাণ্ডা করলেন—ছেলেমানুষের কথা ছেড়ে দাও বামুনদি। তোমার হাতে আজ পঁয়ত্রিশ বছর খাচ্ছি, যে ক'টা দিন আছি অন্তত সে ক'টা দিন অন্য কোথাও যেও না।

শান্ত হয়ে বামুনদি আবার হেঁসেলে ঢোকে। ছোটোবৌ মুখ বেঁকিয়ে মন্তব্য করে—আর এক ডিগ্রী বাড়িয়ে দিলেন আর কি!

কিন্তু কর্তা মারা যেতে আর ঠেকানো গেল না। যতোদিন মাথার উপর মা-বাপ ছিলেন বৌয়েরা চলতো একরকম। তারা মারা যেতে স্বাভাবিকভাবেই তাদের চলাফেরায় অনেকটা স্বাধীনতা এলো। সেটাই হলো বামুনদির চক্ষুশূল। সে কাউকে ছেড়ে কথা কইলো না। তাই নিয়ে ধূমায়িত হয়ে উঠলো অশান্তির আগুন।

হ্যাঁ মেজো বৌমা, ঐ কচি বাচ্চা তায় অসুখ, ওকে ফেলে তুমি রাত ন'টার শোতে সিনেমায় যাচ্ছ। বলিহারি শখ বাপু তোমাদের।

অসুখ আবার কোথায়। বোতলে দুধ ভরে রেখে যাচ্ছি। সময়মতো ওকে খাইয়ে দেবে। ও ঘুম থেকে জাগবেও না। যাচ্ছি তাতে ক্ষতি কি!

পরশুদিন মেয়েটার জ্বর হয়ে গেল না? অতোটা ভালো নয় মেজবৌমা, অতো ভালো নয়। বলি ও ছোটোবৌমা, পনেরো কাপ চা কি হবে?

দরকার আছে। ছোটোবাবুর বন্ধুরা এসেছেন।

পনেরো জন বন্ধু! বাড়িটাকে যে তোমরা কেলাব ঘর করে তুলেছো বৌমা। থাকতো দিদিঠাকরুন! এসব অনাছিষ্টি চলতো না। এখন সব সাপের পাঁচ পা দেখেছো।

ছেলেদেরও ছেড়ে কথা হয় না সে—কি গো বাবারা! সবাই যে-যার বৌ পুত্তুর নিয়ে অস্থির। সংসারের ভালো মন্দর দিকে যে কারও চোখ নেই।

মেজবৌ বলে—বামুনদির বড্ড বাড় বেড়েছে, ছোটোবৌ বলে—কি আস্পর্ধা! ছেলেরা বলে—অসহ্য!

সেদিন ছোটো বৌ-এর সঙ্গেই তুমুল ব্যাপারটা হয়ে গেল। মেজবৌয়ের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে বলতে বাচ্চার জন্য বাটিতে দুধ

ঢালছিল ছোটো বৌ। অন্যমনস্কতার সুযোগে দুধের বাটি হাত থেকে ফস্কে গেল। ছোটো বৌ অপ্রস্তুত। বামুনদি খন খন করে বলে উঠলো—গা করে একটা কাজও করতে পারো না ছোটো বৌমা? দিলে তো এক বাটি দুধ ফেলে! চব্বিশ ঘণ্টা ওঁাক হাসিমস্করা!

ছোটো বৌয়ের ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলে উঠলো রাগে। কঠিন চাপা গলায় বললো—কি সাহস! যা মুখে আসে তাই বলে! ছোটোলোককে আস্কারা দিলে এমনি হয়।

বুঝেসুঝে কথা বলো বৌমা। আমি বামুনের মেয়ে।

জানি। বামুন আর রাঁধুনি বামুনে অনেক তফাত।

কি বললে! বেশ, আমি আজই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

হ্যাঁ তাই। তুমি এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও। নইলে আমিই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।

তুমি যাবে কেন? তোমার বাড়ি-ঘর। আমিই যাচ্ছি।

সেই মুহূর্তেই চলে গেল বামুনদি। ছেলেরা তখন বাড়ি ছিলো না। অন্য কেউ বাধাও দিলো না। যেন সংসার থেকে একটা কাঁটা সরে গেল। চলতে ফিরতে আর খচ্-খচ্ করে বেঁধে না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো সবাই। বৌয়েরা উৎসাহে কোমরে আঁচল জড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো। ভাগাভাগি করে রান্নার ভার নিলো।

কিন্তু প্রাথমিক উৎসাহের জোয়ার থিতিয়ে যেতে বেশি সময় লাগলো না। বৌয়েরা বললো—রান্নার লোক দেখ। বামুনদি ছাড়া আর দেশে লোক নেই? কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে নিত্যি তিরিশদিন রান্না করা যায়!

খোঁজাখুঁজি করে এক রাঁধুনি বামুনকে ধরে আনা হলো। আলুনি আসিদ্ধ ইত্যাদি রকমারি খাইয়ে দিন সাতেক বাদে কিছু বাসনপত্র হাতিয়ে কেটে পড়লো।

আবার রান্নাঘরে বধূদের উৎসাহহীন পদার্পণ। কাজেই সময়ে চা হয় না, সময়ে ভাত জোটে না। বৌয়েরা বলে—আর একটা ঠাকুর খোঁজ কর।

কোথায় পাই! একটা তো সর্বনাশ করে পালালো। তার চেয়ে বামুনদিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি?

ফের বামুনদি! মান খুইয়ে!

প্রাণে বাঁচলে তবে তো মান। না খেয়ে অফিস করতে যে প্রাণ যায়। যাই বলো—ঐ মুখের দুটো কথা ছাড়া বামুনদির আর সবই ভালো, যেমন রান্না তেমনি সময়জ্ঞান। তেমনি দরদ।

অন্য পাড়ায় কাজ করছিল বামুনদি। বড়ো ছেলে গিয়ে ডাকতেই সঙ্গে সঙ্গে একুশদিনের মাইনে ফেলে কাপড়ের পুঁটুলি হাতে নিয়ে চলে এলো।

যেন কালীঘাট থেকে বেড়িয়ে ফিরলো তেমনি স্বাভাবিকভাবে বাড়ি ঢুকলো। বৌয়েরা একটু সংকোচ করছিল। বামুনদি বললো—কি গো বড় বৌমা, তোমার অম্বলের ব্যথাটা কমেছে কি? মেজবৌমা, খুকির আর জ্বরটর হয়নি তো? ছোটোবৌমা? এত রোগা হয়ে গেছো কেন মা! আহা! এ ক'দিন আমি বাড়ি নেই কে দেখে-শুনে খাওয়ায়। ওরে ক্ষেমি, উনুনে আঁচ দিয়ে দে, বাছাদের বাড়ি ফেরার সময় হলো।

উনুন ধরলো। বামুনদি তার পঁয়ত্রিশ বছরের রাজত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো। যথাসময়ে চা-জলখাবার ঘরে ঘরে পরিবেশিত হলো। রান্না চাপলো উনুনে। ক্ষেমি পাশে বসে গল্প শুরু করলো—বামুনদি, যেখানে কাজ করছিলে সে বাড়িটা কেমন ছিলো গো! বামুনদি বললো—বাড়ি তো ভালোই ছিল। কিন্তু আমার ভালো লাগলো কই! তিনজন মানুষ বাড়িতে। কি-ই বা কাজ! শুয়ে-বসে দিন কাটে না। আর এইটুকু এইটুকু তরকারি। রোজ নুনে পুড়ে যায় আর বকুনি খেয়ে মরি।—বলে বামুনদি এক কড়া-ভর্তি তরকারিতে পরম নিশ্চিন্তমনে এক-খাবলা নুন ছড়িয়ে দিলো।

'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার'
৪ কার্তিক, ১৩৬৯

পাল্লা বদল

একই পাড়ায় বাস করে ওরা, দু'নম্বর বাড়িতে প্রভাত সোম আর কনকলতা সোম এবং সাত নম্বর বাড়িতে আনন্দ গুপ্ত আর প্রতিমা গুপ্ত। আসতে যেতে পথে পাড়ার সবার সঙ্গেই সকলের দেখা হয়ে যায়। মোটামুটি ভদ্রতা ও সৌজন্য বজায় রেখে দু'একটি কথা বলে, পরস্পরকে দু'এক টুকরো হাসি উপহার দিয়ে যে-যার গন্তব্যপথে চলে যায়। এর মধ্যে কি করে কনকলতা ও প্রতিমা পরস্পরের খুব কাছাকাছি চলে এলেন। গভীর বন্ধুত্ব। কনকলতার চেয়ে প্রতিমা বয়সে কিছুটা ছোটো হবে। কিন্তু সেজন্য তাঁদের হৃদ্যতায় কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটলো না।

কনকলতার তিনটি ছেলে। বিনু বীরু বিশু। প্রিয়দর্শন। লেখাপড়ায় ভালো। ছেলেদের নিয়ে কনকলতার মনে মনে গৌরবের অন্ত নেই।

প্রতিমার আবার এর উল্টো। তার ছেলে নেই। শুধু তিনটি মেয়ে।

কনকলতা সহানুভূতি ভরে বলেন—তিনটি-ই মেয়ে হলো তোমার। একটি যদি ছেলে থাকতো তবে বেশ হতো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রতিমা বলেন—কি আর করা যায়! কিন্তু দিদি, আপনি সত্যিই ভাগ্যবতী। ভগবান তিনটি ছেলে দিয়েছেন আপনাকে। ঘরজোড়া হয়ে থাকে। আমি তো পরের বেগার খেটে মরছি দিদি। খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে পরের হাতে তুলে দিতে হবে। যা করছি সবই পরের জন্য। নিজের জন্য কিছু নয়।

কনকলতা মনে মনে বলেন—ভাগ্যিস আমার তিনটিই ছেলে হয়েছে। ওর মতো তিনটিই মেয়ে হলে আমি যে কি করতুম? মেয়ে নেই, এ অভাব সহ্য করা যায়। কিন্তু একটিও ছেলে হয়নি এ দুঃখু কি রাখবার জায়গা আছে!

তারপর অনেকগুলো বছর গড়িয়ে গেছে। কনকলতার তিনটি ছেলেই আজ কৃতী। তিনজনেরই বিয়ে হয়েছে। বড় ছেলে বিনুর

বিয়ে হয়েছে মস্ত বড়ো-লোকের ঘরে। বৌটি অতি সুশ্রী শিক্ষিতা। ধনী পিতা দু'হাত ভরে যৌতুক দিয়েছেন। দেখে পাড়ার লোকের চোখ টাটিয়েছে। কনকলতা বুকভরা গর্ব আর উপচেপড়া আহ্লাদ যথাসাধ্য চাপা দিয়ে বৌভাতে নিমন্ত্রিতাদের প্রশ্ন করেছেন—কেমন বৌ হলো দিদি? সবাই একবাক্যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। যতো বৌয়ের রূপগুণের ততো যৌতুকপত্রের। কনকলতা বুকের আহ্লাদকে কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা চেখে চেখে উপভোগ করেছেন। আর প্রতিমা চেপে চেপে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। ভেবেছেন—জীবনের জমাখরচে কারও ঘরে শুধু জমা আর কারও ঘরে শুধুই খরচ কেন?

কনকলতা, ভগবান তাকে পুত্র দিয়েছেন বলে আবার নতুন করে কৃতজ্ঞতা বোধ করেছেন।

সুখের ভরা পাল উড়িয়ে কনকলতার সংসারতরীটা চলছিল মন্দ নয়। কিন্তু হঠাৎ যেন ছন্দপতন হলো। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন কনকলতা, পুত্রবধূ সুতপার মনের নাগাল যেন তিনি কিছুতেই আর পাচ্ছেন না। বৌ তাঁকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। মুখভার করে থাকে। মন খুলে কথা বলে না। ইতিমধ্যে বিনুর একটি ছেলে হয়েছে। এবং এই নাতি কনকলতার জীবনের অনেকটা জুড়ে বসেছে।

কিন্তু এই নাতিকেও খুব বেশি কাছে পেতেন না কনকলতা। সুতপা প্রায়ই একটা অজুহাত দেখিয়ে বাপের বাড়ি চলে যেতো, কারও মতামতের অপেক্ষা না করেই। রওনা হওয়ার মুখে কনকলতাকে জানাতো—আমি বেহালা যাচ্ছি। দু'চারদিন পরে ফিরবো।

কনকলতা ঠাণ্ডাগলায় জিজ্ঞাসা করতেন—খবর দিয়েছে বুঝি যাবার জন্যে?

না, খোকনের শরীরটা তেমন ভালো নয়। তাই ভাবছি মার কাছে ক'দিন থেকে আসবো।

কনকলতার ইচ্ছে হতো জিজ্ঞাসা করেন—খোকনের শরীর ভাল না থাকলে সেজন্য বেহালা যেতে হবে কেন? এখানে কি তাকে দেখার কেউ নেই?

তবে বৌকে এ প্রশ্ন না করলেও মাঝে মাঝে কনকলতা ছেলেকে এসব প্রশ্ন করতে লাগলেন, ফলে বৌয়ের মুখের মেঘ ক্রমে ছেলের মুখে জমা

হতে লাগলো। মা ছেলের সম্পর্কেও বুঝি চিড় ধরলো। একটার পর একটা তিক্ততা। একদিন বিনু বৌ-ছেলে নিয়ে আলাদা বাড়িতে উঠে গেল।

কনকলতা স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

শ্বশুরবাড়ির পাশেই বিনু বাড়ি নিয়েছে। কনকলতা খবর পান, শ্বশুর বাড়ির লোকজন নিয়ে বিনুর বাড়িতে নিত্য উৎসব। সেই উৎসবে প্রভাত সোম ও কনকলতা সোম অনিমন্ত্রিত, অবাঞ্ছিত।

বীরুর বৌ মিতা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। সুতপার মতো দু'হাত ভরে যৌতুক আনতে পারেনি। তাতে কনকলতার মোটেও দুঃখ নেই। দুঃখ এই, বিনু আর সুতপার মতো ওদেরও তিনি কাছে রাখতে পারলেন না। তুচ্ছ একটা উপলক্ষ নিয়ে ওরাও বাড়ি ছেড়ে চলে গেল আলাদা বাড়িতে।

কনকলতা ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখলেন।

তার অনেক কল্পনার রেখা টানা স্বপ্নসৌধটা একটু একটু করে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে যাচ্ছিল।

ছোটোছেলে বিশু দিল্লীতে কাজ করে। বৌ-ছেলে নিয়ে সে সেখানেই থাকে। শূন্য ফ্ল্যাটে দিন কাটতে চায় না প্রভাত সোম ও কনকলতা সোমের।

চিঠি লিখলেন বিশুকে—এবার পুজোয় তোমার ওখানে বেড়াতে যাবো। ভাবছি পুজোর দুচারদিন আগেই রওনা হবো।

সেই চিঠির জবাব এসেছিল সেদিন। চিঠিখানা হাতে জানলার পাশে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন কনকলতা।

আর চারদিন বাদেই তাঁদের যাত্রার তারিখ নির্দিষ্ট ছিল। ছেলে-বৌ যা যা খেতে ভালোবাসে এখন থেকেই তা গুছোতে শুরু করেছিলেন কনকলতা। তিলের নাড়ু, নারকেলের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, দু'তিন রকমের আচার। নাতি-নাতনিদের জন্যে নিয়েছেন জামা, নানারকম খেলনা। একে একে দুটো সুটকেস বোঝাই করে তুলেছেন। পাছে কিছু ভুল হয়ে যায়। তার মধ্যে এই চিঠি? বিশু লিখেছে—এবার পুজোর ছুটিতে আমরা হায়দরাবাদ বেড়াতে যাচ্ছি আরতির মামার বাড়িতে। মামা যেতে লিখেছেন আর আরতিও খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যাওয়ার

জন্যে। বাড়ি তালা বন্ধ করে রেখে যাব। তাই লিখি এখন তোমরা এসো না !'

এই একটি কথার মধ্যে কনকলতা বিনু বীরুর মনটাকেই যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন। অবাঞ্ছিতকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা।

স্বপ্নের সেই সৌধটা একেবারেই মুখ থুবড়ে পড়ে গুঁড়িয়ে গেল।

বুকভরা অসীম শূন্যতা নিয়ে চিঠি হাতে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন কনকলতা। জীবনে যেন আর কোনো রঙ নেই। সব বিবর্ণ বিস্বাদ।

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন প্রতিমা গুপ্ত। কনকলতা হাতের চিঠিটা চট্ করে বিছানার নীচে ঢুকিয়ে দিলেন।

প্রতিমা বসে পড়ে বললেন—কাল বড় মেয়ের বাড়ি জামসেদপুর যাচ্ছি দিদি। তাই দেখা করতে এলাম। সেখান থেকে আবার পাটনা, ছোট মেয়ের বাড়ি ফিরতে মাসখানেকের আগে নয়। দুই মেয়ে যেন কম্পিটিশন করে চিঠি লিখছে, চিঠির উপর চিঠি। তোমরা এসো এসো এসো। আমি লিখেছিলাম—তোরা আয় আমার কাছে। তা মেয়েদের অভিমান। তোমরা না এলে আর যাচ্ছি না তোমাদের কাছে। জামাইয়েরা তো আরও বেশি। কেউ লেখে—আমাদের জন্য আপনার টান নেই। কেউ লেখে—আমি তো আপনাকে নিজের মা বলেই মনে করি, আপনি আমাকে ছেলে বলে ভাবতে পারেন না কেন? কি বলবো দিদি চিঠি পড়ে চোখে জল এসে যায়। আপনারও তো দিল্লী যাওয়ার কথা ছিলো, কবে যাচ্ছেন?

ধরাগলা কোনোরকমে পরিষ্কার করে কনকলতা বললেন—হয়তো যাওয়া হবে না। এতক্ষণ নিজের আহ্লাদের কাহিনীই এক কাহন গাইছিলেন প্রতিমা। এবার কনকলতার দিকে তাকিয়ে থমকে গেলেন। থমথমে মুখ।

একটু বসো ভাই, তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি—বলে কনকলতা চট্ করে বেরিয়ে গেলেন। হয়তো বা চোখের জল গোপন করতেও।

গল্প হলেও সত্যি

আমাদের প্রতিবেশী গোকুলদাদু মানুষটি খুব সাদাসিধে, ধর্মপ্রাণ। মুখে হাসিটি লেগেই আছে, বয়স ষাটের উপরে। ফরসা গোলগাল চেহারা, মাথায় টাক ও পাকাচুলের সহাবস্থান। গোকুলদাদু নিঃসন্তান, বোধহয় সেই কারণেই একটু বেশিমাত্রায় পত্নীগতপ্রাণ। অন্ততঃ পাড়ায় সেইরকমই রটনা। অবশ্য রটনার মূলে রয়েছেন গোকুলদাদুর গৃহিণী মংগলা ঠাকরুন স্বয়ং। গল্পচ্ছলে সবার কাছেই মুখ টিপে হেসে তিনি বলতেন—এ বাড়ির বাইরে কি এক পা আমার যাবার জো আছে? যেতে দেয় তোর দাদু? যদি কখনও যাই তো তার সংগে গাঁটছড়া বেঁধে যাই আবার গাঁটছড়া বেঁধে ফিরে আসি। একলা যাবার নাম করলেই তোর দাদু যেন ভিরমি খায় আর কি!

কাজেই পাড়ায় কথাটা চাউর হয়ে গিয়েছিল যে, গোকুলদাদু মংগলাঠাকমাকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারেন না।

এ নিয়ে কেউ গোকুলদাদুকে ঠাট্টা করলে তিনি মোটেই প্রতিবাদ করতেন না বরং বিগলিতহাস্যে বিনয়-বিনয় ভাব করে তা মেনে নিতেন।

মংগলাঠাকমার অম্বলের বেদনা ছিলো। সেই ব্যথায় মাঝে মাঝেই কষ্ট পেতেন। অনেক ওষুধবিষুধ খেয়েও ব্যথাটা কমছিল না। অসুখটা শেষ পর্যন্ত 'আলসার'-এ গড়ালো।

বেশ কাতর হয়ে পড়লেন মংগলাঠাকমা। ঠাকমার ভাইয়েরা থাকেন বরানগর। একদিন ঠাকমাকে দেখতে এসে ঠাকমার ভাই গোকুলদাদুকে বললেন—দিদিকে তো একটি দিনের জন্যেও কোথাও পাঠান না মিত্তিরমশাই। দিদির শরীরটা যা খারাপ দেখছি। দিন না, কয়েক দিন বরানগর থেকে ঘুরে আসুক। অসুখ শরীরে একা বাড়িতে থাকেন। পাঁচজনের সংগে থাকলে মনটাও একটু ভালো লাগবে।

বোধহয় মংগলাঠাকরুনের অসুস্থতার কথা বিবেচনা করে গোকুলদাদু এবার কোনো আপত্তি করলেন না। ঠাকমা ভাইয়ের বাড়ি গেলেন। সেখানে যাবার ক'দিন পর হঠাৎ ঠাকমার ব্যথাটা খুব বেড়ে গেলো।

একদিন কয়েকবার রক্তবমি করে মঙ্গলাঠাকমা পরলোকে পাড়ি দিলেন। গোকুলদাদু শান্তভাবে চেয়ে চেয়ে দেখলেন এবং নিঃশব্দে যথা কর্তব্য করে গেলেন। অর্থাৎ সবাই যা ভেবেছিল—দাদু শোকে একটা তোলপাড় কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন—তেমন কিছুই করলেন না।

দুমাস পরের কথা। সেদিন বরানগরে নেমন্তন্ন ছিলো গোকুলদাদুর। দুপুরে খাওয়ার পর তিনি সেই খাটখানিতে শুয়ে গড়াচ্ছিলেন যেটাতে শুয়ে মঙ্গলাঠাকুরন দুমাস আগে চোখ বুজেছিলেন। বেলা পড়ে এসেছিল। গোকুলদাদুর আবার ডায়েরী লেখার অভ্যেস ছিলো। সেদিনও ডায়েরী লিখলেন। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে বাঁ পায়ের হাঁটুর উপর ডান পাটি তুলে সেদিনকার কাগজ পড়তে লাগলেন।

বাড়ির ছোটো বৌ চা নিয়ে এসে ডাকলো —মিত্তির মশাই, এই যে আপনার চা।

গোকুলদাদু সাড়া দিলেন না। তেমনিভাবে কাগজ পড়তে লাগলেন। মিত্তিরমশাই, চা খেয়ে নিন। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কোনো সাড়া নেই।

মিত্তিরমশাই! ও মিত্তিরমশাই—চেঁচিয়ে উঠলো ছোটো বৌ।

গোকুলদাদু নিস্তব্ধ, নিঃসাড়।

ছোটো বৌ ভয় পেয়ে বাড়ির সবাইকে ডাকলো, লোকজন সবাই ছুটে এসে দেখলো গোকুলদাদুর দেহে প্রাণ নেই। তেমনি বাঁ পায়ের হাঁটুর উপর ডান পাটি তোলা। তেমনি মুখের সামনে দুহাতে কাগজখানি ধরে আছেন। শুয়ে আছেন সেই খাটে যে খাটখানিতে শুয়ে দুমাস আগে মঙ্গলাঠাকমা শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

গোকুলদাদুর বালিশের নীচে থেকে বেরুলো ডায়েরী। সেইদিনের তারিখে মৃত্যুর খানিক আগে গোকুলদাদু লিখেছেন—মঙ্গলা, তুমি তো ভারি মিথ্যেবাদী। তুমি না বলেছিলে তুমি ওখানে যাবার দুমাসের মধ্যে আমাকেও সেখানে নিয়ে যাবে। আজ তো দুমাস পূর্ণ হলো। কই, কথা রাখলে না তো! আমি কি তোমাকে ছেড়ে একদিনও থাকতে পারি?

ভাগের মা

এতোদিন তবু মন্দ চলছিল না। কিন্তু কর্তা মারা যেতে সুনয়নী নিজেকে একেবারে অসহায় বোধ করলেন।

বাইরে থেকে দেখে কেউ কিছু বুঝবে না যাঁর চার-চারটি ছেলে কৃতী, উপার্জনক্ষম, তাঁর সারাজীবনের সংগীর মৃত্যুতে ফাঁকাবোধ হতে পারে, কিন্তু অসহায় বোধ করবার কি আছে! কিন্তু সুনয়নী জানেন আজ তিনি কত অসহায়! সেই সংগে বিধবা মেয়েটাও।

বাণী ভরা যৌবনে সর্বস্বান্ত হয়ে মায়ের কাছেই আশ্রয় নিয়েছিল। স্বামীর সংসারে তাঁর কোনো অবলম্বন ছিলো না। সুনয়নীও কপালপোড়া মেয়েটাকে সান্ত্বনা ও আশ্বাসের বাহু মেলে নিজের স্নেহব্যাকুল বেদনাবিক্ষুব্ধ বুকে টেনে নিয়েছিলেন। আর—কিছুটা জোরও ছিল সুনয়নীর। কর্তা তখনও দেড়শো টাকা করে পেনসন পাচ্ছেন। কাজেই নিজের বা মেয়ের জন্য ছেলেদের মুখাপেক্ষী তাঁকে কখনও হতে হয়নি। তাছাড়া, মনে মনে ছেলেদের উপর অভিমানও ছিল সুনয়নীর।

চারটি ছেলের মধ্যে তিনজনই উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদস্থ চাকুরে। ছোটোটির তেমন বিদ্যের জোর নেই, অর্থের জোরও নেই। বাপের সুপারিশে তাঁরই বিগত কর্মক্ষেত্রে একটা যেন-তেন চাকরীতে ঢুকে কোনোমতে বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে দিন গুজরান করছে। সুনয়নী চিরদিন বড়ো তিন ছেলেকে নিয়ে লোকের কাছে গৌরব করেছেন আর ছোটোটিকে বরাবর ধিক্কার দিয়েছেন—হতভাগা! অপদার্থ! বোকা!

কিন্তু আজ সুনয়নী বুঝতে পারছেন—রত্ন তাঁর কোনো কাজে লাগছে না। কাচ-ই আজ তাঁর অবলম্বন। একই সংসারে সবাই আছে, কিন্তু সব থেকেও নেই। যে যার ঘরে নিজেদের বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে আত্মকেন্দ্রিক। বুড়ো মা বেঁচে আছেন, এ কথাও যেন ওদের স্মরণ নেই। বাপ থাকতেও এমনিই ছিল, দিনান্তেও একবার খবর নেবার সময় হয় না। শুধু ওই বোকা নিরীহ ছেলেটাই কাছে এসে দাঁড়ায়, হাসিমুখে 'মা' বলে ডাকে। আগেও ডেকেছে।

ওই ছেলেটা, মেয়ে আর কর্তা—এই নিয়ে তবু ক্ষোভ আর অভিমানকে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন সুনয়নী, অর্থের প্রয়োজন মিটেছে কর্তার পেনসনে। কিন্তু আজ!

পেটে ধরলেই কি ছেলে হয়! সুনয়নী কি প্রাণ গেলেও পারবেন তাঁর রত্নদের কাছে হাত পাততে! আর যার কাছে পারেন সেই হতভাগাটার যে কানাকড়ারও মুরোদ নেই।

তাই আজ সুনয়নী অসহায়।

বাজারটা ছোটো ছেলেটাই করে বরাবর। অফিসার পুত্রদের বাজারে যেতে প্রেস্টিজে বাধে। প্রতিদিন বাজারে যাবার আগে থলিহাতে সে কাছে এসে দাঁড়ায়—মা, বলো তোমার জন্যে কি আনবো। কি খাবে?

ঐটুকু কথাতেই মার বিক্ষুব্ধ মন একটু শান্ত হয়। অন্ততঃ একটা ছেলে তার মাতৃত্বকে মর্যাদা দেয়। তাঁর তৃষিত চিত্তকে 'মা' ডাকের অমৃত সিঞ্চনে তৃপ্ত করে।

প্রত্যেকের খরচ-খরচা আলাদা হলেও রান্নাঘরটা এক, ডাল ভাত তরকারিটা যৌথ। আর সব যার যার তার তার। মা'র প্রয়োজনটা যে কে মেটাবে সে এক সমস্যা।

বাণী বলে—সেই যে কথায় আছে ভাগের মা গঙ্গা পায় না, এ যে দেখছি সেই দশা! তার উপর আমি তোমার আর এক জ্বালা হয়েছি মা!

কি করবি! যেমন অদৃষ্ট তোর আর আমার।

মাঝে মাঝে ছোটো ছেলে সামান্য সওদায় মায়ের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। হয়ত চার আনায় দুটো কচি শশা বা পঞ্চাশ পয়সায় দু'টো ডাঁসা পেয়ারা। বলে—মা, তুমি খাও। দেখো, আবার নাতি-নাতনিদেব বিলিয়ে দিও না।

মা'র কাছে ওই সামান্য জিনিসটুকুই অমূল্য হয়ে দেখা দেয়। প্রাণের উষ্ণ স্পর্শ লেগে থাকে যেন ঐ তুচ্ছতম সওদায়। এর চাইতে বেশি কিছু করবার সাধ্য কই ছেলেটার!

তবু মাঝে মাঝে বলে—মা, আজ তোমার একাদশী। বলো কি খাবে, মিষ্টি আনবো দু'টো! একটু রাবড়ি!

মা জানেন, ওইটুকু অতিরিক্ত খরচ করে ছেলের হয়তো এক সপ্তাহের

ট্রামবাস ভাড়ায় টান পড়বে, তাই তাড়াতাড়ি বলেন—না বাপু, মিষ্টি আমি মোটেই খেতে পারিনে। গা গুলোয়। তার চেয়ে বরং দু'টো কাঁচ শশা আনিস। একাদশী করে বিকেলে কেমন তেণ্টা পায়। নুন দিয়ে খাবো এখন।

ছেলে যে এ ছলনাটুকু ধরতে পারে না, তা নয়। কিন্তু পকেটের দিকে তাকিয়ে বাড়াবাড়িও করে না। মাত্র তিনশোটি টাকা মাইনে দিয়ে যার বৌ-ছেলেমেয়ে, মা, বিধবা বোনকে পুষতে হয় তাকে সংসারের অনেক ক্ষেত্রে বুঝেও না-বোঝার ভান করতে হয়।

এই ভাগ্যহীন ছেলেটার জন্য মা'র চোখে জল আসে। মনে পড়ে তাঁর রত্নদের কথা, যারা হাজার, দেড় হাজার টাকা মাইনে পায়। মার যে কবে একাদশী সে খবর রাখার সময় কোথায় তাদের!

এ পর্যন্ত তবু যা হোক চলছিল। কিন্তু সুনয়নী অসুস্থ হয়ে শয্যা নেওয়াতে ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হলো। কে ডাকে ডাক্তার, কে জোগায় পথ্য। ছোটো ছেলের তো কোনো ক্ষমতাই নেই। অন্যেরা শুরু করলো ঠেলাঠেলি। প্রত্যেকেরই যার যার ঘরে কত খরচ বেশি—আয়ের চেয়ে প্রত্যেকের খরচ যে দ্বিগুণ—এক পয়সাও যে ঘরে সঞ্চয় নেই—এ কথা প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লেগে গেল।

ছোটো ছেলে পাড়ার ডাক্তার সুধাময় বাবুকে ডেকে আনলো।

জানাশোনা লোক। বলে-কয়ে যদি ধার-বাকিতেও কাজ চলে আপাততঃ। তা ভদ্রলোক ভালো, বললেন—আচ্ছা, সে হবে'খন প্রতুল, তুমি তো আর পাড়া ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছো না।

বড়ো ছেলে নাক সিঁটকে বললো—ঐ হেতুড়ে বদ্যি চিকিৎসা করবে কি!

মেজ ছেলে বললো—ছোটোবাবুর কারবার তো! মাথায় চিরদিনই গোবর।

শুনে ছোটো ছেলে বড়ো দুঃখে একটু হাসলো। মেয়ে বাণী ঠোঁট বাঁকালো। আর মা বললেন—প্রতুল, ওদের চুপ করতে বলু। আমি আর সহ্য করতে পারিনে।

সুনয়নীর অন্য কোনো অসুখ নয়। বার্ধক্য, দুশ্চিন্তা আর অশান্তি, এই হলো তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণ। ওষুধের চেয়ে পথ্যের প্রয়োজন বেশি।

বেশি করে দুধ ফল খাওয়াতে হবে।

সব ছেলেরা যার যার ঘরে আলাদা দুধ রাখে। ছেলে-মেয়েরা খায়। মা'র দুধের দাম দেবে কে ?

মেয়ে বললো – দুধ তো আগে রাখি। দাম যে হোক দেবে'খন। না হয় সবাই মিলে ভাগ করেই দেবে।

দেখা গেল পনের দিনের মধ্যেই সব ছেলেরা দুধ-রোজ বন্ধ করে দিয়েছে। কি ? না, গোয়ালা দুধে বড়ো জল দেয়। এতো টাকা দিয়ে ঐ জল দুধ রাখা পোষায় না। তাছাড়া টাকা পয়সার টানাটানিও আছে বৈকি !

বাচ্চারা কি খাবে ? কেন ? ফুড আছে বাজারে। ঘরে ঘরে ফুডের কৌটোর পাহাড় জমতে লাগলো। দুধের খরচ বাঁচলো বৈকি !

বিপদ হল প্রতুলের। মা তার ঘরেই আছেন। আর রোগীকে বিনা পথ্যে রাখা যায় ! বাধ্য হয়ে সে দুধ-রোজ করলো।

মা তিক্ত চিত্তে বললেন—আমার দুধের দরকার নেই। তুই দুধ ছাড়িয়ে দে।

তুমি ডাক্তার কিনা, তাই জানো দরকার আছে কি নেই। বললো ছেলে।

কিন্তু টাকা দেবে কে শুনি ! পারবি দিতে !

আরে টাকা দিতে না পারি দেনা তো করতে পারবো। তোমাদের ঋষিরাই তো বলে গেছেন গো, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। আমরা না হয় দুগ্ধংই খাবো। দুধ থেকেই তো ঘি হয়। কি বল ? বলে হেসে ওঠে প্রতুল।

কিন্তু মা'র চোখে জল আর বাধা মানে না।

তা মাঝে মাঝে বড় ছেলেরা কি আর লেবুটা বেদানাটা এনে দেয় না ? ফর্মালিটি বলেও তো একটা জিনিস আছে। কিন্তু সুনয়নীর যেন সে সব গলা দিয়ে নামতে চায় না। তাই তার বেশির ভাগই যায় বুবুল টুবলুর পেটে, ছেলে আর বৌ হাঁ-হাঁ করে দশ হাতে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুনয়নী টিকলেন না।

কতটা ওষুধ আর কতটা পথ্য পেটে গেল সে হিসেব পাড়ার লোকে না রাখলেও যার একাধিক সন্তান কৃতী, উচ্চপদস্থ অফিসার তার শ্রাদ্ধ কার্য কতটা জাঁকজমকে সম্পন্ন হলো সে হিসাব পাড়ার লোকে নিশ্চয়ই

রাখে। আর মা'র আত্মার তৃপ্তির জন্য যতোটা না হোক প্রেস্টিজ বলে একটা জিনিস আছে তো! এতদিন ধরে পাড়ায় বাস। সবাই চেনে জানে। মোটা রোজগেরে বলে খাতিরও করে। কাজেই—

কাজেই শ্রাদ্ধ কার্য খুব ঘটা করেই হলো। সবাই যথাসাধ্য টাকা পয়সা দিলো। ছোটো ছেলে দিয়েছিল মাত্র একশোটি টাকা।

এরপর থেকে মেজ ছেলেকে পাড়ার লোকের কাছে প্রায়ই বলতে শোনা যায়—মানুষ হয়ে জন্মালে তার কর্তব্য আছে না? গর্ভধারিণী মা, তাঁর কাজ যেমন-তেমন করে করতে পারি? আমাদের ছোটবাবু —বের করে দিলেন কি না একশোটি টাকা। কি মাতৃভক্তি! আর আমি—একাই হাজার টাকা দিলাম। কর্তব্য দেখলে তো চোখ বুজে থাকতে পারি না।

শুনে ছোটো ছেলে বড় দুঃখে হাসে। মনে মনে বলে এর অর্ধেকও যদি মানুষটা থাকতে করতে তবে দেহে-মনে এমন দেউলে হয়ে তিনি মরতেন না।

বাণী মুখ বাঁকিয়ে মন্তব্য করে—আহা। মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা! মরণ আর কি!

ছোঁয়া

ছেলেটা একেবারে বেপরোয়া। তাছাড়া তার একটা দল আছে। সুবিমল আর তার জনকয়েক বন্ধু নিয়ে যে একটা দল আছে তাকে কলেজের সবাই ভয় করে। যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে।

পড়াশুনোয়ও তেমনি। সুবিমলের তো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফোর্থ ইয়ারে পৌঁছাতে জীবনের পঁচিশটে বছর কেটে গেছে। ওরা না করতে পারে এহেন কাজ নেই। দিনকে রাত করতে পারে, রাতকে দিন। তাই পারত পক্ষে কেউ ওদের ঘাঁটায় না।

কে জানে—কোনো মেয়ের বাড়িতে হঠাৎ কোনো অজ্ঞাতনামা ছেলের প্রেমপত্র চলে যাবে যার ফলে অভিভাবকের কাছে লাঞ্ছনা সইতে হবে। অথবা ওদের কেউ স্বয়ং বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের সামনে এমন অভিনয় করে আসবে যেন সে নিজেই মেয়েটির প্রেমাস্পদ। চুপি চুপি দেখা করতে এসে (এবং এমন মাঝে মাঝেই আসে) হঠাৎ বাড়ির লোকের কাছে ধরা পড়ে গেছে। অথবা পরীক্ষার আগে দেখা যাবে কারও জরুরী নোটের খাতা উধাও। কোনো ছেলের হাতের নকল করে নীচে তারই নাম দিয়ে হয়তো কোনো প্রফেসরের নামে কুৎসা গেয়ে চিঠি লিখলো অন্য কারও কাছে। আবার সেই চিঠি সেই প্রফেসরের নজরে পড়বার ব্যবস্থাও হলো। এ নিয়ে খুব হৈ-চৈ হলো, কোন নির্দোষ ছেলে হয়তো শাস্তিও পেলো। এইসব নানা উৎপাতে সবাই এদের ভয় করতো। যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতো। যে-কোনো একটা শয়তানির মূলে যে ওরাই আছে তা সবাই বুঝতে পারতো কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিলো ওদের কার্যকলাপ, তাই পারত পক্ষে কেউ তাদের ঘাঁটাতো না। ভেতরে যাই থাক বাইরে খাতির করে কথা বলতো।

কিন্তু সুতপা তার অজ্ঞাতসারেই হঠাৎ ফাঁদে পা দিলো।

কলেজের আসন্ন কোনো উৎসব উপলক্ষে খরচপত্রের জন্য কিছু চাঁদা ওঠানো প্রয়োজন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কাজ বিশেষ

অগ্রসর হচ্ছিলো না। তাই সুতপা বান্ধবীদের কাছে বলছিলো 'চাঁদার খাতা খুলে দেখ, ঢু ঢু। সবাই আজ না কাল, কাল না পরশু করছে। যে বলছে কাল দেব, কাল কলেজে তার টিকিটিও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে-না। আমি আর পারছি না ভাই, হাতে সময়ও বেশি নেই, যা হবে তা বুঝতে পারছি।' সুতপা হতাশার ভংগীতে হাত ওলটালো।

'না পার যদি এ কাজের সম্পূর্ণ ভারটাই ছেলেদের ওপরে ছেড়ে দাও, ওরা ভালো পারবে।'

'সুবিমলের হাতে ছেড়ে দাও, ও আরও ভালো পারবে।'

সুতপা বলে উঠলো, 'না. না, ওসব মানুষকে টানাটানি না করাই ভালো, যা গুণ্ডো ছেলে। কিসের থেকে কি করে বসবে।'

শুধু ওইটুকুই. কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ একটু বেফাঁস উক্তি! কিন্তু সুবিমলের কোন চেলাচামুণ্ডা মারফৎ সুবিমলের কানে গিয়ে পৌঁছালো, ধারে কাছেই ছিল হয়তো।

দু-তিনদিন পর। ক্লাসে প্রফেসর অনুপস্থিত, সুতপারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করছিলো, হঠাৎ কাছে এসে দাঁড়ালো সুবিমল। সবাই শঙ্কিত হয়ে তার দিকে তাকালো, কি ব্যাপার! যেখানে সুবিমল সেখানেই যে কেলেঙ্কারি!

সুবিমল সোজা সুতপার মুখোমুখি দাঁড়ালো, গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'সেদিন শুধুশুধু আমাকে গুণ্ডা বলেছিলেন কেন?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সুতপা, সঙ্কোচে আর শঙ্কায় আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, কোনো উত্তর জোগালো না মুখে।

হঠাৎ সুবিমল ঠাস করে সুতপার গালে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বললো, 'শুধু শুধু মানুষকে গালাগাল দেওয়ার শাস্তি।' বলিষ্ঠ হাতের চড় সুতপার ফর্সা নরম গালে পাঁচ আঙ্গুলের রক্তিম ছাপ এঁকে দিলো।

মুহূর্তে সুতপার আড়ষ্ট ভাব কেটে গেল, জ্বলে উঠলো চোখ দুটো। ক্রুদ্ধা ফণিনীর মতো মাথা তুলে মুখে এক টুকরো তীক্ষ্ন ধারালো হাসি ফুটিয়ে সুতপা বললো, 'সেদিন আমি যে মিথ্যে বলিনি, আজ এতোগুলো চোখের সামনে আপনি সেকথা প্রমাণ করে দিলেন।'

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুবিমল, তারপর ঝড়ের বেগে চলে গেল।

এতক্ষণ সবাই রুদ্ধশ্বাসে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছিল, এবার সমস্বরে কলরব করে উঠলো —'কি সাংঘাতিক!' 'কি আস্পর্ধা!'

'আপনি প্রিন্সিপালের কাছে জানান মিস রয়, আমরা সবাই সাক্ষী আছি, এবার ওকে তাড়াতে হবে।'

'হাঁ হাঁ, গুণ্ডাটাকে কলেজ থেকে না তাড়ালে আর স্বস্তি নেই। এ পর্যন্ত ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায়নি, এবার হাতেনাতে প্রমাণ। ওঃ সুতপাদেবীর গালটা কেমন ফুলে উঠেছে দেখ।'

'এবার ওকে সর্ষেফুল দেখিয়ে ছাড়তে হবে। ছুঁচোটা ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি।'

সুতপা একটি কথাও বললো না। নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে গেল।

না, সুতপা কোনো নালিশই আনলো না।

কিছুদিন পর্যন্ত এ-ব্যাপার নিয়ে খুব গরম আলোচনা চললো। সুতপাকে কেউ কেউ এ-নিয়ে একটা সাংঘাতিকরকম প্রতিশোধ নেবার জন্য উস্কালো। সুতপার নির্বিকার ভাব দেখে কেউ বিদ্রূপ করলো, কেউ ধিক্কার দিল—তারপর এক সময় আলোচনার জোয়ার থিতিয়ে এলো।

সুবিমলের দলবলও এ নিয়ে একটা সাংঘাতিকরকম কিছু আশঙ্কা করছিলো এবং সেই পরিস্থিতিতে কি করে আত্মরক্ষা করা যায় তাই নিয়ে নানা শলাপরামর্শ করছিলো। কিন্তু তেমন কিছু ঘটলো না।

আবহাওয়া খানিক উত্তপ্ত হয়েই আবার তা জুড়িয়ে গেল।

কিন্তু সেই থেকে ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেছে সুবিমল। আজীবন অভ্যস্ত কাজগুলিতে যেন তেমন উৎসাহ নেই, বন্ধুরা আমল পায় না। বলে, 'কিরে, মানুষ চড় খেয়ে ঠাণ্ডা হয় আর তুই চড় মেরে ঠাণ্ডা হয়ে গেলি! ব্যাপার কি!'

মাঝে মাঝে সুতপাকে দেখতে পায় সুবিমল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে, এখানে সেখানে। সুতপা ভ্রূক্ষেপ করে না। বান্ধবীদের সংগে কথা বলতে বলতে সহজভাবে চলে যায়। কিন্তু কেন কে জানে, সুবিমলের মাথা নীচু হয়ে আসে, সে তাড়াতাড়ি পাশ কাটায়।

সেদিন যদি সুতপা রাগে অপমানে কেঁদে ফেলতো, চেঁচিয়ে দুটো গালাগালি দিতো, বা পা থেকে সিলপার খুলে হাতে তুলে নিতো (মারুক আর না-ই মারুক) তবে হয়তো সুবিমলের মনটা এমন হতো না। কিন্তু সুতপা শান্ত কঠিন ভাবে যে জবাব দিয়েছে তাতেই যেন তার মনে চিড় ধরে গেছে।

সেদিন খুব মাথা ধরেছিল সুতপার, তাই একটা ক্লাস কামাই করলো সে। ভাবলো, পেছনের বাগানে খোলা হাওয়ায় একটু বসলে হয়ত মাথা ছেড়ে দেবে। সুস্থ হয়ে পরের ক্লাসটা করা যাবে।

নিরিবিলি এবং ছায়া দেখে—একটা পাতাবাহারের ঝোপের আড়ালে চুপ করে বসে রইলো সে। সব ক্লাসে ক্লাসে পড়া হচ্ছে, তাই এদিকে কেউ ছিলো না। চোখ বুজে দুহাতে মাথার রগ টিপে ধরে সুতপা চুপ করে বসেছিল। তার একান্ত কাছে কার উপস্থিতির আভাস পেয়ে ছিটকে সে দু' হাত সরে গেল। মুখ দিয়ে অব্যক্ত বিস্ময়ধ্বনি বেরিয়ে এলো—সুবিমল!

তার একান্ত কাছে হুমড়ি খেয়ে বসে আছে সুবিমল।

'ছি ছি ছি, একি!'

আরও খানিকটা কাছে এগিয়ে গিয়ে হাত জোড় করলো সুবিমল। 'আমায় ক্ষমা করুন।'

আরও খানিকটা সরে গিয়ে একটু রুক্ষকণ্ঠে সুতপা বললো, 'ওকি হচ্ছে! লোকে দেখতে পেলে কি বলবে? যা বলবার স্থির হয়ে বসে মুখে বলা যায় না?'

সুবিমল স্থির হয়ে বসলো। বললো, 'আপনি আমার ওপর খুব রাগ করেছেন না?

শান্তকণ্ঠে সুতপা বললো, নয়তো, খুব খুশি হয়েছি বললে আপনি বিশ্বাস করবেন?'

একটু চুপ করে রইলো সুবিমল। তারপর বললো, 'সেদিন থেকে আপনাকে একা পাবার চেষ্টা করছি। অন্যের সামনে ক্ষমা চাইতে লজ্জা করে তাই, কিন্তু আপনি আমার বিরুদ্ধে নালিশ করলেন না কেন? তাহলে ঠিক আমাকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিতো।'

সুতপা হাসলো—'এক কলেজে না পড়লেও এক শহরে বাস করতে হবে তো ? রাস্তাঘাটে দেখা হলে বা কলেজের গেট থেকে রাস্তায় বেরোলে পরে—আর একটা গাল অক্ষত রেখে যে নির্বিবাদে বাড়ি ফিরতে পারবো এমন ভরসা কই ?'

'ছি ছি ছি, আর লজ্জা দেবেন না। আমায় ক্ষমা করুন।' আবার সুবিমলের হাত দুটো যুক্ত হলো।

ধমক দিয়ে উঠলো সুতপা, 'ওকি ! বার বার গরুড়ের মতো ভংগীতে হাতজোড় করছেন কেন ? কেউ দেখতে পেলে কি ভাববে ? আপনার লজ্জা না থাকতে পারে আমার আছে।'

লজ্জা পেয়ে হাত সরিয়ে নিলো সুবিমল।

সুতপা বললো, 'কলেজে এসে অবধি আপনার বীরত্বের অনেক নমুনা দেখতে পাচ্ছি। কথায় কথায় অনেকের গায়ে হাত তোলেন দেখেছি কিন্তু কথায় কথায় হাতজোড় করে ক্ষমা চাওয়া—'

সুবিমল বললো, 'দেখুন মিস রয়, গোঁয়ারতুমি আমি অনেকই করে থাকি কিন্তু মেয়েদের গায়ে হাত তোলার কল্পনাও কোনোদিন করিনি। সেদিন হঠাৎ কি যে মাথায় রক্ত চড়ে গেল—'

সুতপা হাসলো, 'এখন মাথার রক্তটা পায়ে নেমেছে তো ? তাহলেই হলো ! অন্যায় করে অনুশোচনা এলেই অন্যায়ের ক্ষমা হয়। নিন, উঠুন, ভেবেছিলাম, মাথাটা ধরেছে, একটু চুপ চাপ বসে থেকে মাথাটা সারিয়ে নেবো, তা আর হলো না, খুব বকিয়ে নিলেন যাহোক্—।' সুতপা উঠে দাঁড়ালো।

সুবিমলও উঠে দাঁড়ালো, একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বললো, 'মিস রয় ! অন্যায় করে আমার মনে কোনোদিন অনুশোচনা জাগে না। আপনারা যাকে অন্যায় বলেন আমি তাকে অন্যায় বলে স্বীকারই করিনে, কিন্তু সেদিন কেন জানি না, মনটা যেন একটা ইলেকট্রিক শক্ খেলো, যদিও সেদিন আপনাকে চড় মেরেছিলাম কিন্তু আমার মনে হয় এটুকু স্পর্শই আমার মনটাকে ওলট-পালট করে দিয়েছে। আপনার স্পর্শটুকুই স্পর্শমণির কাজ করেছে।' বলে হনহন করে সুবিমল চলে গেল।

সুতপা আশঙ্কা করছিল এই স্পর্শমণি-প্রশস্তি গাওয়ার পরে

সুবিমল হয়ত অন্যরূপে তার পেছন ধরবে, যা বেপরোয়া ছেলে, কিন্তু দেখে খুশি হল যে সুবিমলের আচরণে তেমন কোনো লক্ষণ নেই। এমন কি সেই স্পর্শমণি-প্রসঙ্গ যে কোনোদিন ঘটেছিল তেমন কোনো আভাসও নেই তার আচরণে।

সুতপা আশ্বস্ত হলো, নইলে বান্ধবীরা এমন একটা ব্যাপারের গন্ধ পেলে আলোচনায় সরস হয়ে উঠতো। তবু আলোচনা চলে। 'হ্যাঁরে স্থতপা, ছেলেটা হঠাৎ এমন ভোল পাল্টালো যে! যেন কিছুই জানে না, ভিজে বেড়াল।'

'ইচ্ছে হয় ও নিয়ে তোরা মাথা ঘামা গিয়ে, আমার দরকার নেই।'

সত্যিই আশ্চর্য পরিবর্তন!

বি. এ. পরীক্ষার পর একদিন স্থতপার সঙ্গে স্থবিমলের রাস্তায় দেখা, সুবিমল প্রশ্ন করলো, 'কেমন পরীক্ষা দিলেন?'

'মোটেই ভালো না। পাশ করতে পারবো এমন ভরসা করি না, তবে করেও যেতেও পারি, বলা যায় না—আপনি?'

হাসিমুখে সুবিমল বললো, 'কি জানি, পরীক্ষা কতটা ভালো হলে পাশ করা যায় সে সম্বন্ধে আমার মোটেই ধারণা নেই। তাই বলতে পারছি না, তবে এবার পরীক্ষার আগে বেশ পড়েছি, জন্মেও কোনোদিন এতো পড়িনি।

হাসিমুখে স্থতপা বললো, 'তাহলে গুডবয় হয়ে গেছেন বলুন!'

গাঢ়কণ্ঠে সুবিমল বললো, 'কি জানি, যদি হয়েই থাকি তবে সেই বাহাদুরি আমার প্রাপ্য নয়, প্রাপ্য আপনার। সেদিনের সেই ঘটনাটা হঠাৎ আমাকে যেন ওলট-পালট করে দিয়েছে।'

সুতপা চুপ করে রইলো। সুবিমল বললো, 'আমি কলকাতার বাইরে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'এক বন্যাত্রাণ সমিতিতে যোগ দিয়েছি, বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে যাচ্ছি সেবা ও সাহায্য নিয়ে।'

অবাক কাণ্ড!

হেসে ফেললো সুতপা, 'বন্যার্তদের কপালে আরও লাঞ্ছনা আছে দেখছি! যে রগচটা মানুষ আপনি! সেবা আর সাহায্যের সঙ্গে

সঙ্গে ফাউ হিসেবে ওরা দুচারটে কিল ঘুষি কি আর না পাবে ?'

গভীর দৃষ্টিতে সুতপার মুখের দিকে তাকিয়ে গাঢ় কণ্ঠে সুবিমল বললো, 'না সুতপা, সে ভয় আর নেই। সে জীবনকে আমি অনেক পেছনে ফেলে এসেছি।' বলেই দ্রুত পারে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল।

মাস খানেক পরে খবর পাওয়া গেল—বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে যে সব দুর্গম স্থানে অন্যরা যেতে সাহস করতো না, সেসব জায়গায় সাহায্য নিয়ে যেতো বেপরোয়া ছেলে সুবিমল, তেমন এক জায়গায় সাহায্যদান করতে গিয়ে বিষাক্ত সাপের কামড়ে সুবিমল মৃত্যুবরণ করেছে।

আশ্চর্য ! যে ছেলেটা গুণ্ডামি ছাড়া কিছু জানতো না সে কিনা আর্তের সেবায় আত্মদান করে বসলো, কি করে এলো এই পরিবর্তন ?

সে রহস্য জানে শুধু এক জন। সে সুতপা। হতভাগ্যকে স্মরণ করে দুফোঁটা তপ্ত অশ্রু মোছে সুতপা।

আরও অবাক কাণ্ড : পরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা গেল সুবিমল ভালোভাবেই পাশ করেছে।

'মরশুমী'

একটি মুহূর্ত

এক স্বর্ণ-সন্ধ্যায় একটি পরম মুহূর্ত।

গোধূলির সোনায় বাঁধানো সেই মুহূর্তটিকে মনের নিভৃত কোণে আজীবন সঞ্চয় করে রাখবে মলয়া।

গলির এপার ওপার মুখোমুখি দু'টো বাড়ি। মলয়া-রা একটা পুরনো দোতলা বাড়ির দোতলায় একটিমাত্র ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। বাড়িতে আরও পাঁচঘর ভাড়াটে আছে। সবাই অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত। আর সামনের হালফ্যাসানের নতুন বাড়িটায় বছর পাঁচেক যাবৎ বাস করেন বাড়ির মালিক কৃষ্ণেন্দু দত্ত, স্ত্রী প্রভাবতী ও পুত্র শুভেন্দুকে নিয়ে। একমাত্র কন্যা শর্বরীর বিয়ে হয়ে গেছে। জামাই বড়ো চাকুরে। মাঝে মাঝে আসে নিজের গাড়ি নিয়ে। গাড়িটা চিনে ফেলেছে মলয়া। দেখলেই বুঝতে পারে শর্বরী এসেছে।

জরিপের হিসেবে দু'টো বাড়ির ব্যবধান আট দশ হাতের বেশি নয়। কিন্তু অন্যান্য দিক দিয়ে বাড়ি ও বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। মলয়ার দৃষ্টিতে ঐ বাড়িটা যেন রাজবাড়ি। আর শুভেন্দু? সে যেন রূপকথার রাজপুত্তুর। এ বাড়ির পর্দা-ঢাকা জানালার আড়াল থেকে কেরানীর মেয়ে সেই রূপকথার স্বপ্নপুরীর দিকে মোহের কাজলমাখা চোখে তাকিয়ে থাকে।

মলয়াদের ঘরের জানালায় দাঁড়ালে ও বাড়ির জানালা দিয়ে বাড়ির অনেকখানি, বিশেষ করে শুভেন্দুর ঘরটা স্পষ্ট দেখা যায়। শুভেন্দু হাঁটে চলে শোয় বসে বই পড়ে সিগারেট খায়—মলয়া মুগ্ধচোখে তার প্রতিটি কার্যকলাপ প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালন লক্ষ্য করে। ফর্সা রঙ, স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল দীর্ঘ দেহ, একমাথা কালো চুল। সুন্দর মুখে আভিজাত্য আর ব্যক্তিত্বের ছাপ। দেখে দেখে মলয়া যেন হারিয়ে ফেলে নিজেকে। মানুষ যৌবনে স্বপ্ন দেখে। মলয়াও স্বপ্ন দেখে। কল্পনার স্বর্গ রচনা করে। হঠাৎ সচেতন হয়ে দেখে সে স্বর্গে তার কল্পনা রাজ্যের

রাজা শুভেন্দু। কোনো সন্ধ্যার শুভলগ্নে আশেপাশের কোনো বাড়িতে যদি শাঁখ বাজে, আলো জ্বলে, সানাইয়ের রাগিণী শোনা যায়—হঠাৎ মলয়ার মনটাও উদাস হয়ে যায়। উধাও হয়ে যায় কল্পনার রাজ্যে। নিজেকে চেলি-চন্দন পরা চেহারায় কল্পনায় করে। কল্পনায় মালাবদল করে যখন শুভদৃষ্টি করতে যায়, তখন যে মানুষটির চোখে চোখ ফেলে, দেখে, সে শুভেন্দু।

এমনি করে এক অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি মেয়ে তার নাগালের অনেক বাইরে উঁচু মহলের একটি ছেলেকে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা তার জীবনের সব স্বপ্নের পাকে পাকে জড়িয়ে ধরতে লাগলো। যদিও সে নিজেও জানতো তার এই স্বপ্ন কোনোদিনও সত্য হবে না। তবু মনের গভীরে এই নিভৃত চিন্তাটুকুই ছিলো মলয়ার জীবনের একমাত্র সোনালী রঙ।

মাঝে মাঝে শর্বরী এলে মলয়া আরও অধ্যবসায় সহকারে জানালার পাশে আস্তানা গাড়তো। সেদিন শুভেন্দুকে আরও উজ্জ্বল আরও উচ্ছল দেখা যেতো। ভাই বোনের খুনসুটির অন্ত ছিল না। তার মধ্যে একটা নাম প্রায়ই শোনা যেতো—'শ্রীলা'।

হাস্যপরিহাসের ভেতর থেকে মলয়া শ্রীলার পরিচয় উদ্ধার করতে পেরেছিল। আর অজান্তেই তার দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। সেদিন শর্বরী এসেছিল। পা টিপে টিপে শুভেন্দুর একেবারে পেছনে এসে দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললো—কিরে দাদা, একেবারে যে বেহুঁস! কার ধ্যান করছিস? শ্রীলার?

শুভেন্দু চমকে পেছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে শর্বরীকে দেখলো। বললো—বটে! ইয়ার্কি হচ্ছে!

দাদা, সামনেই যে ফাল্গুন মাস। আর একটা বসন্ত ব্যর্থ যাবে! মতটা দিয়ে দে: আমি ঘটা করে মাকে জানিয়ে ঘটকালি শুরু করে দি।

খুব কানমলা খেতে ইচ্ছে হয়েছে, না? শুভেন্দু উঠে দাঁড়িয়ে শর্বরীর দিকে হাত বাড়ায়।

আচ্ছা আচ্ছা, আর বলবো না। এবারটি মাপ কর্। ঘাট মানছি। গত রোববারে যা কান মলে দিয়েছিলি, ওঃ, আজও ব্যথা সারে নি।

—ঠিক আছে। খবরদার, আর কখনও যদি বলবি, আয় বোস।

দুজনে পাশাপাশি বসে গল্প শুরু করে।

মলয়া জানালার পর্দা একটু ফাঁক করে তার তৃষ্ণার্ত দু'টো চোখ সামনের বাড়ির ঐ ঘরে ফেলে রাখে। উৎকর্ণ হয়ে ওদের প্রতিটি কথা শোনার চেষ্টা করে।

এক সময় আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মলয়া। এক মাথা ঢেউ ঢেউ চুল এলিয়ে দেয়। নিজের আশ্চর্য সুশ্রী মুখখানার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

আচ্ছা, শ্রীলা কি মলয়ার চেয়ে বেশি সুন্দর!

সেদিন বিকেল বেলা ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিল মলয়া। একটা ঝোপের আড়ালে একটু নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়েছিল। ঝিরঝিরে মিষ্টি হাওয়া। ছায়াছায়া বিকেল ভারী ভালো লাগছিল মলয়ার। মিষ্টি কল্পনাগুলো মনের মধ্যে ভীড় করে এসেছিল। আর মলয়া তাতে ডুব মেরেছিলো।

হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে দুহাতে তার দু'চোখ টিপে ধরলো। হয়তো পরিচিত কোনো বান্ধবী। হঠাৎ দেখতে পেয়ে দুষ্টুমি লাগিয়েছে।

মলয়া তার চোখ-চাপা-দেওয়া হাত দু'টোতে নিজের দু'টো হাত রেখে বললো—কে?

তার মাথার ওপর কার যেন একখানা চিবুক নেমে এলো।

আদরভরা চাপা পুরুষ কণ্ঠ ফিসফিসিয়ে উঠলো—আমি, রানী আমি। তোমার শুভেন্দু। আমার কি বেশি দেরি হয়ে গেছে? রাগ করনি তো রানী?

সমস্ত দেহ-মনে রোমাঞ্চিত হলো মলয়া। চেতনা বুঝি অবশ্য হয়ে যাচ্ছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত শিরা বেয়ে ঠাণ্ডা রক্তস্রোত যেন ছুটোছুটি করছে। মলয়া না নড়তে পারলো, না কথা বলতে পারলো। শুধু তার নিজের হাত দু'টো সেই হাত দু'টো থেকে খসে পড়লো তার কোলের উপর।

মলয়ার মাথাটাকে আরও নিবিড়ভাবে নিজের দিকে আকর্ষণ করে শুভেন্দু বললো—কথা বলছো না যে। রাগ করেছো? বলে চোখ থেকে হাত সরিয়ে দু'হাতে মলয়ার মুখখানি ধরে পেছন দিকে হেলিয়ে

আনলো শুভেন্দু। একেবারে নিজের মুখের কাছে। চোখের সামনে।

এক পলকমাত্র। অস্ফুট একটা আওয়াজ তুলে মলয়াকে ছেড়ে দিয়ে তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়লো শুভেন্দু। মলয়াও যেন স্বপ্ন-ঘোরে উঠে দাঁড়ালো, আনত দৃষ্টিতে।

মাপ করবেন · আমি ঠিক···ছি ছি···আপনাকে···পেছন থেকে দেখতে ঠিক···আমার বান্ধবী শ্রীলা···আজ ঠিক এই জায়গায় আমার জন্য অপেক্ষা করার কথা ছিলো ছি ছি···আমার খুব অন্যায় হয়েছে··· না দেখে ··ছি ছি···ক্ষমা করুন অসংলগ্নভাবে কথাগুলো বলতে বলতে শুভেন্দু সরে পড়লো।

মলয়া তখনও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সেই আদরভরা কণ্ঠ, আদরভরা স্পর্শ। সেই স্পর্শে তার সমস্ত শরীর যেন সেতারের মত রিনঝিন করে বাজছে। হোক না সে ভুল। সেই ভুলটুকুই মলয়ার জীবনে ফুল হয়ে ফুটে থাকুক।

এ কি আশ্চর্য রে! এ কি আশ্চর্য!

সে যখন গভীর স্বপ্নে ডুবেছিল তখনই এসে ধরা দিয়েছিল তার স্বপ্নের রাজপুত্তুর।

এই গোধূলি লগ্নে সন্ধ্যার বাসরে শষ্পশয্যায় মুহূর্তের জন্য মিলন হলো তার রাজপুত্তুরের সঙ্গে।

মলয়া জানে তার বাবার মতো এক সামান্য টাকা বেতনের কোনো কেরানীর সঙ্গেই হয়তো তার বিয়ে হবে একদিন। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামে লাবণ্যহীন, অস্বাস্থ্যের পাণ্ডুরতা নিয়ে নেহাৎ সাদামাঠা একটি পুরুষ। আর সেই স্বল্প আয়ের সংসারে খেটে খেটে মলয়ারও একদিন সব লাবণ্য ঝরে যাবে তার মা'র মতো। ঘরকন্নার কাজ করে অমন সুন্দর নখগুলো ক্ষয়ে যাবে, আঙুলগুলো হবে শ্রীহীন। অমন যে ঢেউ-ঢেউ মেঘ-মেঘ চুল যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে যাবে। চাঁপা রঙ হবে তামাটে।

মলয়া স্বচ্ছন্দে তা আঁচ করতে পারে।

তবু—গোধূলির সোনায় বাঁধানো আজকের স্বর্ণ-সন্ধ্যার এই পরম মুহূর্তটিকে মলয়া মনের নিভৃত কোণে চিরদিন সঞ্চয় করে রাখবে।

'শারদীয়া রূপমঞ্চ'

মেঘমুক্তি

সামনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন মন্দিরার মাথাটা ঘুরে গেল। এ কি ! এও কি সম্ভব !

এতো আলো এতো ফুল এতো লোকজন এতো সমারোহ সব যেন মরীচিকার মত মিলিয়ে গেল মন্দিরার চোখের সামনে থেকে। একটা বিরাট শূন্যতা যেন মুহূর্ত মধ্যে তাঁকে হাঁ করে গিলে ফেললো। পা দুটো টলছে, মাথার ভেতর ঝাঁ-ঝাঁ করছে।

ছি ছি, একি প্রতারণা ! এতো ছোট, এতো নীচ হতে পারে মানুষ !

টলতে টলতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল মন্দিরা। সবাই নীচে গিয়ে ভীড় করেছে, উপরটা ফাঁকা। পেছনের বারান্দার আলোটা নিবিয়ে দিয়ে মন্দিরা অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়ালো।

মাথার ভেতর কিসের একটা টলটলে গরম স্রোত বয়ে যাচ্ছে। চোখ দুটো জ্বালা করছে। মন্দিরা সজোরে দু'চোখ চেপে বন্ধ করে রাখলো !

মিথ্যেবাদী ! ভণ্ড ! প্রবঞ্চক ! ছোটোলোক !

মনের মধ্যে রাশি রাশি গালাগাল পাক খেয়ে উঠতে লাগলো। বিশ্বাসের দৃঢ় ভিতটা যেন আকস্মিক আঘাতের ভূমিকম্পে ধসে ধসে পড়ছে। কাকে কি ভেবেছিল সে ? পলাশকে গোলাপ ? মাকালকে অমৃত ফল ? ছি ছি, একি দৃষ্টি-বিভ্রম তার ?

কিন্তু যে আলোকে মন্দিরা তরুণ সূর্যের আলোকচ্ছটা ভেবেছিল, যে আলো তার চোখকে মুগ্ধ করেছিল, রঙ্গীন করেছিল, স্বপ্নিল করেছিল সেই আলো তবে আলেয়া ? মন্দিরার দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে তার পেছনে মন্দিরাকে ছুটিয়ে মেরে—তারপর হঠাৎ মিলিয়ে গেল।

এও কি সম্ভব !

মন্দিরার এক বন্ধুর বাড়িতে ভাস্করের সংগে তার পরিচয়, বন্ধু নন্দিতার দাদার বন্ধু ভাস্কর, নন্দিতাদের বাড়িতে মন্দিরার যতোটা যাতায়াত ভাস্করেরও ততোটা। সেই থেকেই সূত্রপাত। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা, ইদানীং মন্দিরা ছাত্রী আর ভাস্কর শিক্ষক।

ছাত্রী পড়ানোতে যতোটা একনিষ্ঠ না হোক—হাজিরায় শিক্ষকের নিষ্ঠার ত্রুটি নেই। ঝড়, বৃষ্টি-বাদল তুচ্ছ করেও শিক্ষক নিয়মিত হাজিরা দেয়। তবে শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে যে বিশুদ্ধ বিদ্যাচর্চাই চলে সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে বই কি! যেমন—

কাল আসবেন তো?

না এসে পারি! ঘড়িতে দু'টো বাজলে দুনিয়া ভুলে যাই—শুধু এই তারক প্রামাণিকের গলিটা মনে থাকে। ঠিক যেন চায়ের নেশা। সময় হলো তো দুনিয়ার আর কিছু মনে পড়বে না, মনে পড়বে শুধু চায়ের কাপ।

ফিক্ করে হেসে ফেলে মন্দিরা। তারপরই ঠোঁট ফুলিয়ে বললো—এক পেয়ালা চায়ের সঙ্গে আমার তুলনা করা হলো! আমার দামও বুঝি আপনার কাছে চার আনা ছ'আনা।

রাম রাম! তা হতে যাবে কেন? তুমি আমার কাছে অমূল্য, মানে, আমার কাছে তোমার কাণাকড়াও মূল্য নেই।

বেশ! কাল থেকে আর আসবেন না, আমি পড়বো না।

সর্বনাশ! তাহলে যে মারা পড়বো। দেখ মন্দা, অন্য বিদ্যে যত খুশি চর্চা করো—কিন্তু গুরুমারা বিদ্যের চর্চা করো না।

কোনো দিন হয়তো মন্দিরা বলে—আই. এ. পরীক্ষা দিয়ে তারপর কি করি বলুন তো?

কেন? বি. এ. পড়বে।

সে তো পাশ করলে, তার আগে এই লম্বা ছুটিটায় কি করা যায়!

একটু চিন্তা করে ভাস্কর বলে: কেন? বিয়ে করবে।

আহা! বললেই যেন হয়ে গেল। বিয়ের জন্য কতো আটঘাট বাঁধতে হয় জানেন?

ঠিক আছে, তবে তাই করো।

আহা! আমি করতে যাবো কোন দুঃখে। আপনি করবেন, আমি পেছনে থাকবো।

সেই থেকে দু'জনের পাকা কথা হয়ে আছে।

এর মধ্যে মন্দিরা আই. এ. পাশ করেছে, বি. এ. পড়ছে। দু'জনে আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে, মন্দিরাও 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ধরেছে, ঠিক

হয়েছে মন্দিরার বি. এ. পরীক্ষা অবধি দুজনেই অপেক্ষা করবে। তারপর ভাস্কর আর্জি পেশ করবে। মন্দিরার বিশ্বাস বাড়িতে কারও অমত হবে না। বাড়িতে সবাই ভাস্করকে স্নেহ করে।

একদিন ভাস্কর বললো—ক'দিন আসতে পারবো না।

কেন ?

সে অনেক ব্যাপার ! ফিরে এসে বলবো।

তারপর আজ আট দিন ভাস্করের কোনো পাত্তা নেই। মন্দিরা দুশ্চিন্তায় অস্থির, আর ভাস্কর কিনা আজই এ বাড়িতে টোপর মাথায় দিয়ে তারই মাসতুতো বোন ফুলুদিকে বিয়ে করতে এসেছে !

মানুষ এমন প্রতারকও হতে পারে !

সেখানে যেন আর টিকতে পারে না মন্দিরা। সমবয়সী মেয়েরা দেখতে পেলে এক্ষুণি বিয়ের আসরে টেনে নিয়ে যাবে। ফুলুদি ভাস্করের গলায় মালা দেবে এ দৃশ্য কিছুতেই চোখে দেখতে পারবে না মন্দিরা।

এর দিন পাঁচেক পর ভাস্কর এসে হাজির। হাসিমুখে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে মন্দিরার পাশের চেয়ারটাতে বসে পড়ে বললো—উঃ, কি বিভ্রাটেই না পড়েছিলুম, জানো মন্দা—

কঠিন মুখে কঠিন গলায় মন্দিরা বললো—কোনো কৈফিয়তে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

হাসিমুখে নীচু গলায় ভাস্কর বললো—জানি, মান হবে। ওগো মানিনী ! দেরি হওয়ার কারণটাই আগে শুনে নাও, তারপর যথাবিহিত শাস্তি বিধান করো।

গম্ভীর কণ্ঠে মন্দিরা বললো—এসব বদ ঠাট্টাগুলো এখানে না করে অন্য কথাও করুন গিয়ে।

বদ ঠাট্টা ! করুন গিয়ে ! ব্যাপার কি !

দেখুন, অভিনয়েরও একটা মাত্রা আছে, প্রতারণারও একটা সীমা আছে।

অভিনয় ! প্রতারণা ! এসব কি বলছো মন্দা !

যা বলছি ঠিকই বলছি, এরপর আপনি আর এ-বাড়িতে আমার সামনে এসে দাঁড়াবেন না।

দুই চোখ জ্বলে উঠলো ভাস্করের, কঠিন গলায় বললো—বেশ! তাই হবে! বলে হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে গেল।

মন্দিরা তার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ফিরছিল, হঠাৎ ফুলুদি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো—কিরে মন্দা, তোর যে আর পাত্তাই নেই। ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলি যে! মন্দিরা আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো অদূরে ভাস্কর দণ্ডায়মান, এরপরও কি সে ন্যাকামী করবে। মন্দিরা অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিলে, ভাস্করের দিকে তাকাতেও যেন তার প্রবৃত্তি হয় না।

ফুলু বললো—চল্ আমাদের বাড়ি, একটা আশ্চর্য জিনিস তোকে দেখাবো।

আজ নয় ফুলুদি, কাজ আছে।

রাখ্ তোর কাজ, ভারী দেমাক হয়েছে তো মেয়ের, শুনছো! এ আমার মাসতুতো বোন মন্দিরা।

ফুলু ছাড়লো না, টেনে নিয়ে গেল বাড়ি পর্যন্ত।

বাইরের ঘরে মন্দিরাকে বসিয়ে ফুলু বললো—তুই একটু বোস্ মন্দা, তোর জামাইবাবুর সংগে গল্প কর্, আমি ততক্ষণ শাড়িটা ছেড়ে আসি।

মন্দিরার ইচ্ছে হলো ফুলুকে ঘরে আটকে রাখে বা তার পেছন পেছন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু কোনোটাই পারলো না। সে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে বসে রইলো, চোখের পাতাগুলোও যেন ভারী হয়ে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। ভগ্নিপতিই প্রথমে বললো—বিয়ের সময় তো তোমাকে দেখিনি।

ভাস্করের গলাটা কেমন যেন আড়ষ্ট। বোধ হয় হাতেনাতে ধরা পড়ে ঘাবড়ে গেছে।

তীক্ষ্ন কণ্ঠে মন্দিরা বললো—আমি কিন্তু দেখেছিলাম। তাইতো চালাকি খাটলো না।

চালাকি! ও পক্ষের অবাক্ প্রশ্ন।

এখনও অভিনয়! মানুষ যে এতো নির্লজ্জ হতে পারে জানতাম না।

নির্লজ্জ!

শুধু নির্লজ্জ নয়। ভণ্ড, প্রতারক, বেহায়া, ইতর, একশ্বাসে এতগুলো গালাগাল দিয়ে হাঁফাতে লাগলো মন্দিরা। ভগ্নিপতি তো থ!

এমন সময় পর্দা ঠেলে যে ঘরে ঢুকলো তাকে দেখে আঁৎকে উঠলো মন্দিরা। ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত চেয়ার ছেড়ে ছিটকে উঠেই আবার ধপাস্ করে বসে পড়লো। আগন্তুক ভাস্কর না? তবে ওই মানুষটা কে? গালাগালির শতনাম হয়ত ভাস্করের কানে গিয়েছিল। ব্যাপারটা সে আঁচ করলো। মুচকি হেসে বললো—কি হয়েছে দাদা। এমন সময় ফুলু এলো। বললো—মন্দা, বলেছিলাম তোকে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাবো। দেখতো আশ্চর্য কিনা। এই আমার দেওর ভাস্কর। ভেবেছিস্ ওরা যমজ ভাই, তা নয়, ওরা চার বছরের ছোট বড়। কিন্তু কি আশ্চর্য সাদৃশ্য বলু দিকিনি। প্রথমে তো গলার স্বর শুনে চিনতে হতো।

মন্দিরা বিহ্বল, একবার এর মুখে একবার ওর মুখে দৃষ্টিপাত করছিল। এতক্ষণে একটু সামলে নিয়ে বললো—জামাইবাবু, আমায় ক্ষমা করুন। ফুলুদি, আজ উঠি।

ক্ষণপূর্বে অভিনীত নাটকের কথা ফুলু জানতে পারেনি, ব্যস্ত হয়ে বললো—সে কিরে! বোস, চা খেয়ে যা।

আজ নয় ফুলুদি, আর একদিন। বলে মন্দিরা জোর করে উঠে পড়লো।

ভাস্কর বললো—চলো মন্দা, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

শঙ্কর বললো—তুই ওকে চিনিস নাকি রে!

না হলে আমার পাওনা গালাগালগুলো তোমার কপালে বর্ষিত হলো কেন?

ওরা বেরিয়ে গেল। হো হো করে হেসে উঠলো শঙ্কর—এবার বুঝতে পেরেছি! বোধহয় পূর্বরাগের পালা চলছে। কিছু নিয়ে মান-অভিমান যাচ্ছে। আমাকে ভাস্কর মনে করে কি গালাগালের ধুম। আমি ভাবি এ বুঝি নতুন ধরনের নতুন জামাইবাবু সম্ভাষণ। শ্যালিকার সঙ্গে প্রথম আলাপটি বড় মধুময় হলো।

ফুলু বললে— যাই বলো, ঠাকুরপোর সঙ্গে কিন্তু মন্দাকে মানাবে চমৎকার।

ওদিকে বাসের অপেক্ষায় ওরা দাঁড়িয়েছিল। মন্দিরা বললে—ছি ছি ছি, কি ভুলটাই না করলাম। ভাস্কর হেসে বললো— বাবা! ধড়ে যেন প্রাণ এলো। আমার দিনরাত যে কি করে কাটছিলো সে জানেন একমাত্র ভগবান।

দিদি

রূপুর বয়স যখন চার তখন তার ছোটো বোন টুপুর জন্ম। আর তখন থেকেই রূপু একেবারে মহিমময়ী দিদির ভূমিকায় মর্যাদার আসনটিতে সমাসীনা।

টুপুর জন্মসংবাদ বহন করে নার্সিং হোম থেকে ফিরে এসে সহাস্যে রূপুর রাঙাপিসী বলেছিলো—'রূপু, তোর একটা ছোট্ট বোন হয়েছে রে, দেখিস, তোকে দিদি বলবে।'

রূপু অবাক্ চোখে পিসীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ছোটো হাত দিয়ে নিজের বুকে টোকা মেরে বলেছিলো—'আমাকে? দিদি বলবে?'

—'হ্যাঁ রে। ও যে তোর ছোটো বোন। বলবেই তো।'

রূপু আরও অবাক্ গলায় বলেছিলো—'আমার চিনিমামা, ফুলমাসী মাকে যেমন 'দিদি' বলে সেইরকম?'

—'হ্যাঁরে হ্যাঁ।'

—'ওরা মাকে যেমন নম করে, বোনটা আমাকে তেমনি নম করবে?'

রূপু প্রণাম করাকে বলে 'নম' করা।

—'বারে, করবে না কেন, নিশ্চয় করবে। তুই যে দিদি।'

রূপু বিস্ময়ে থ। চোখ দুটো গোল হয়ে ওঠে। নিজেকে কেউকেটা মনে হয়।

মা টুপুকে নিয়ে বাড়ি ফিরলে অন্য বাচ্চার মত রূপু বোনকে হিংসে করলো না মা'র কোল বেদখল হয়ে গেছে বলে, বরং বিস্ময়ভরা চোখে বোনকে দেখে দেখে যেন তার আশ মেটে না। কেমন ছোট্ট নরম তুলতুলে। বড়ো একটা পুতুলের মতো। জ্যান্ত পুতুল। হাসে কাঁদে, হাত পা নাড়ে, চুকচুক করে খায়।

শুধু একটাই যা দুঃখ রূপুর। পিসী বলেছিল বোনটা তাকে দিদি বলবে। কিন্তু বলে না তো! অবশ্য অন্যের কাছে একথা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইতো না সে। হয়তো তার মর্যাদায়

লাগতো। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করতো—'রূপু, বোনটা তোকে দিদি বলে তো?' অমনি রূপু জবাব দিতো—'হ্যাঁ, আজ বোনটা তিনবার দিদি বলেছে।'

প্রথম যেদিন টুপু 'দিদি' উচ্চারণ করতে শিখলো, সেদিন রূপুর কি আনন্দ। তার যতো খেলনা-পুতুল সব এনে গুঁজে দিতে লাগলো টুপুর হাতে। যেন বিশ্বভুবন দিয়ে দিতে পারে ছোটো বোনটিকে।

এর মধ্যে একদিন রূপুর পরিত্রাহি চীৎকার শুনে সবাই দৌড়ে এলো, রূপুকে কাঁকড়া বিছে কামড়েছে।

যন্ত্রণায় ছটফট করছে রূপু। মা বললেন—'কি করে কামড়ালো? কি করছিলি তুই?

কাঁদতে কাঁদতে রূপু বললো—'আমি ওটাকে হাতে ধরে ফেলতে গেছিলাম।'

—'বলছিস কি ডাকাত মেয়ে! কাঁকড়া বিছেতে হাত দিতে আছে? কামড়ে দেয় জানিস না?'

—'জানবো না কেন? দুগ্‌গা দিদিকে কামড়ে দিয়েছিল দেখেছি। দুগগা দিদি খুব কাঁদছিল।'

—'তবে যে তুই হাত দিলি বড়ো।'

—'নইলে যে ওটা বোনকে কামড়ে দিতো। বোনের দিকে যাচ্ছিল তো।'

—'তুই আমাকে ডাকতে পারলি না? এখন যে তোর কষ্ট হচ্ছে।'

সংগে সংগে কান্না থামিয়ে ফেললো রূপু। বললো—'হোক গে। বোনকে কামড়ালে বোন মরে যেতো না! ও যে ছোটো।'

এই হলো রূপু। চার বছর বয়স থেকেই সে দিদি।

টুপুর পর ওদের ভাই পুপুর জন্ম হয়েছে। কিন্তু রূপুর দাক্ষিণ্য টুপুর প্রতিই বেশি, কারণ সে তাকে প্রথম দিদির মর্যাদা দিয়েছে। বরাবর ভালো জামাটা, শাড়িটা, খাবারের বেশি ভাগটা সে টুপুকেই ছেড়ে দিয়েছে।

রূপু বড় হয়েছে। লেখাপড়া শিখে চাকরি করছে। পুপুর সর্বদা অভিযোগ—'দিদিটা ছোড়দিকে সবকিছু বেশি বেশি দেয়।'

রূপুর মামার বাড়ির গ্রামের ছেলে বিকাশ। কলকাতায় চাকরি করে। মা'র সম্পর্ক ধরে প্রায়ই এ-বাড়িতে আসে। রূপু টুপু দু'জনের

সঙ্গেই খুব গল্প করে, হাসে। টুপু যখন চা আনতে রান্নাঘরে যায়, তখন বিকাশ ও রূপুর সংলাপ আরও একটু নিভৃত হয়।

—'কি এতদিন দেখা নেই কেন?' —চাপা গলায় বলে রূপু।

—'কেন, এই তো সেদিন এসেছিলাম।'

—'তাই বই কি। দশদিন হয়ে গেছে, বুঝেছেন?

—'আমার আসা না আসার দিন গোনা হয় বুঝি?'

—'আহা! দিন গোনা আবার কি! কেউ এলে মনে থাকে না বুঝি, কবে এলো।'

—'ব্যস, শুধু এই? আর কিছু নয়?'

—'জানি না, যান।'

এই ছোট্ট সংলাপটি থেকে বিকাশ তার কাঙ্ক্ষিত উত্তরটি তৃপ্তমনে কুড়িয়ে নেয়।

সেদিন ছুটি। রূপু বিছানায় শুয়ে পা দুলিয়ে গল্পের বই পড়ছিল। পাশের ঘরে মা-বাবার গলায় 'রূপু বিকাশ' এই দুটো নাম শুনে উৎকর্ণ হলো।

মা বলছেন—'তোমার চোখে পড়েনি কিছু? আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পেরেছি। বিকাশ এলে কথাটা পাড়বো।'

বাবা বললেন—'ভালোই তো। যদি হয় আমার আপত্তি নেই। বিকাশ ছেলেটা ভালো। তবে রূপুর মতামতটাও জানা দরকার।'

রূপুর মুখে একটু করে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো।

রূপু জানে ওপাশের বারান্দায় বসে টুপু এখন উল বুনছে। ঘরের কথাবার্তা বারান্দা থেকে শোনা যায়। টুপুও নিশ্চয় শুনতে পেয়েছে। হয়তো এখনি ছুটে আসবে এ ঘরে। রূপুকে ঠাট্টায় ঠাট্টায় অস্থির করে তুলবে।

কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। টুপু এলো না। রূপু ধীরে ধীরে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। দেখলো চেয়ারের উপর টুপুর বোনার সরঞ্জাম পড়ে রয়েছে; আর সে বারান্দার রেলিং ধরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ বিবর্ণ, যেন কোনো আঘাত সামলাবার চেষ্টা করছে।

রূপু ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু টুপু রূপুর দিকে ফিরে

তাকালো না। কথাও কইল না।

রূপু বললো—'কি হয়েছে রে ?'

—'কিছু না'—বলে বোনার সরঞ্জাম তুলে নিয়ে টুপু ভেতরে চলে গেল। মা বাবার কথাগুলো টুপুর কানেও গেছে নিশ্চয়। রূপুর মনে একটা সন্দেহ উঁকি দিলো।

রাত্তিরে দু' বোন দুটো আলাদা খাটে এক ঘরে শোয়। অনেক রাত অবধি চলে তাদের হাসি-গল্প। তার আওয়াজ টুকরো টুকরো হয়ে মা-বাবার ঘরেও গিয়ে ছিটকে পড়ে। এক-একদিন মা ওঘর থেকে তাড়া দেন—'কি রে, তোরা এখনও ঘুমোসনি ? কাল বেলা আটটা বাজিয়ে ঘুম থেকে উঠবি তো ? কি যে এত গল্প তোদের বুঝি না।'

সেদিনও রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে রূপু যথারীতি গল্প জমাতে চাইলো। ডাকলো—'টুপু' ! টুপুর সাড়া নেই।

—'টুপু, এই টুপু।' তবুও কোনও উত্তর এলো না।

—'বা রে এরই মধ্যে ঘুম !' অগত্যা রূপুও সেদিন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লো।

প্রথম দু-একদিন অতোটা খেয়াল করেনি রূপু। তারপরই চোখে পড়লো টুপুর এই ভাবান্তর। আগের মত কথা বলে না। হাসেও না। সে চঞ্চলতা নেই। সব সময় কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে থাকে। এড়িয়ে চলে রূপুকে। অথচ টুপু মানেই প্রাণোচ্ছলতার জোয়ার।

—'তোর কি হয়েছে রে টুপু ? অমন গোমড়া হয়ে থাকিস কেন ?'

—'কি আবার হবে ?'—দায়সারা উত্তর দিয়ে টুপু সরে গেল।

রূপু মাকে বললো—'মা, টুপুকে বকাঝকা করেছো নাকি ?'

—'না তো। কেন, কি হয়েছে ?'

দু-একদিন বাদে রূপু টুপুকে বললো—মা জিজ্ঞাসা করছিলেন বিয়েতে চুড়ি নেবো না বাউটি নেবো। কোনটা নেওয়া যায় বলু তো ?'

টুপু থমথমে গলায় বললো—'সে আমি কি জানি ! তোর যা খুশি নে।'

সন্দেহ আরও দানা বাঁধলো।

রূপ টুপুর খুব কাছে এসে দাঁড়ালো। বললো—'তোর কি হয়েছে বলু তো টুপু ?

টুপু জবাব দিলো—'কি আবার হবে? কিছু না।'

'কিছু না হলে কেউ অমন বদলে যায়? তুই কি চিরদিন এমন ছিলি?'

টুপুর মুখ কালো হয়ে এলো। কোনো উত্তর দিলো না। রূপুর বুকটা যেন ভেঙে গেল। একটু চুপ করে থেকে মৃদুগলায় সে বললো —'আমি জানি তোর কি হয়েছে।'

হকচকিয়ে গিয়ে টুপু বললো—'কি হয়েছে?'

—'বিকাশকে তুই ভালোবাসিস।'

নিমেষে টুপুর মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। সামলাবার প্রাণপণ চেষ্টায় ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগলো। তারপর—দু হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দ কান্নায় সে ভেঙে পড়লো।

রূপু বুঝলো, সে যখন বিকাশকে ঘিরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে অন্যদিকে টুপুও তাকে ঘিরেই পল্লবিত হয়েছে, মুকুলিত হয়েছে। আর এখন মুকুল ঝরে পড়বার আশঙ্কায় সে আকুল।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রূপু। একটা উদ্যত দীর্ঘশ্বাসকে ফের বুকের ভেতর জোর করে পাঠিয়ে দিলো। অনুচ্চকণ্ঠে বললো—'মুখপুড়ি, আগে বলিস নি কেন আমায়?' তারপর একটু থেমে, রূপু নয়, তার ভেতরের দিদি বললো—'বিকাশকে তুই-ই পাবি।'

—'না না দিদি—তুই—'

শান্ত গলায় রূপু আবার বললো—'বললাম তো, বিকাশকে তুই-ই পাবি।'

রূপু মাকে বললো—'মা, বিকাশের সঙ্গে টুপুর বিয়ে দাও।'

—'ওমা সে কি কথা। আমরা যে ভেবেছি তুই—মানে—বিকাশও তোকে—'

—'তোমাদেব চোখে সেই মান্ধাতার আমলের চশমা কি না! কোনো ছেলের সঙ্গে হেসে দুটো কথা বললেই তোমরা ঐ ভেবে বসে থাকো।'

'কিন্তু বড়োকে রেখে ছোটোর বিয়ে'—

—'ও আজকাল আকছার হচ্ছে। বাবাকে বলে-কয়ে তুমি রাজি করাও।'

বিকাশের কাছে কথাটা পাড়তেই সে অবাক হয়ে গেল। বললো—

'এ তুমি কি বলছো রূপু, তবে কি এতোদিন আমি ভুল বুঝেছি? তাছাড়া টুপুকে তো আমি সে চোখে কোনোদিন দেখিনি।'

মুখে হাসি টেনে রূপু বললো—'বিয়ে হয়ে গেলে বৌয়ের মতোই দেখবেন।'

—'তুমি আমার উপর অবিচার করছো রূপু। এ অসম্ভব!'

—'মোটেই অসম্ভব নয়। আর কিছুই অবিচার করছি না। টুপু খুব ভালো মেয়ে। একটি ভালো বৌ পাইয়ে দিচ্ছি আপনাকে। সুবিচারই করছি বলুন।' তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—'রাজি আপনাকে হতেই হবে। জানেন, আপনার রাজি হবার উপর একটা জীবন নির্ভর করছে।'

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সবাইকে রাজি করালো রূপু। বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

পুপু আগে শুনেছিল ব্যাপারটা একরকম। এখন অন্যরকম শুনে বললো—'যা ব্বাবা! দিদি ছোড়দিকে সবকিছু দিয়ে দেয় বলে বরটাও দিয়ে দিলে!'

বিয়ের দিন প্রধান ভূমিকা নিলো রূপু। দৌড়ঝাঁপ করে দশজনের কাজ একাই করলো। সন্ধ্যা হতে সাজাতে বসলো টুপুকে। লাল বেনারসী, গয়না, ফুলের মালা দিয়ে অপরূপ করে সাজালো। কপাল ঘিরে সুন্দর করে কনেচন্দন এঁকে দিলো। তারপর আয়না এনে টুপুর মুখের সামনে ধরে কৌতুক করে বললো—'দ্যাখ তো কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে! দ্যাখ, নিজের মুখ দেখে নিজেই ভুলে যাবি।'

টুপু কাজল-আঁকা ডাগর দু'টি চোখ রূপুর মুখের উপর মেলে ধরলো।

—'হাঁ করে আমার মুখের দিকে কি দেখছিস বোকা মেয়ে? নিজের মুখ দ্যাখ।'

—'দিদি, তুই আমাকে খুউব ভালোবাসিস, নারে?'

—'বাসিই তো।'

—'সেই আমিই তোকে সবচাইতে বেশি আঘাত দিয়ে গেলাম।'

—'এই—এই—বাজে কথা একদম নয়। বিয়ের দিনেও বকুনি না খেলে চলছে না বুঝি তোমার?'

টুপুর চোখ ভরে জল এলো।

—'ওমা! তুই এখন কাঁদতে বসবি নাকি! দ্যাখ্ টুপু, অনেক খেটে এতো সুন্দর করে চন্দন পরিয়েছি। মুছে গেলে ভালো হবে না বলছি।'

রূপুর রকম দেখে মা অব্দি ভুল করলেন। ভাবলেন—'আমরা বোধহয় ভুলই বুঝেছিলাম। তেমন কিছু হলে মেয়ের মুখ দেখে কি আর বুঝতে পারতাম না।'

বাসর-ঘরে মেয়ের দল বরকনেকে নিয়ে কলকল করছে। সবার কান এড়িয়ে রূপু বিকাশকে বললো ফিসফিস করে—'এখন আমি সম্পর্কে বড়ো। আজকে থেকে তোমাকে আমি 'তুমি' বলব।'

বিকাশ চাপাগলায় জবাব দিলো—'এ তো আমি অনেকদিন আগেই চেয়েছিলাম। কিন্তু কি হতে কি হয়ে গেল!'

তিরস্কারের সুরে রূপু বলে উঠলো—'এই—আমি তোমার দিদি গুরুজন, একথা ভুলে যেয়ো না। আমার সামনে ওসব কথা নয়।'

সবকিছু চুকে গেলে রূপু তার ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করলো। সটান শুয়ে পড়লো বিছানায়। আঃ সারাদিন যা ধকল গেছে!

চোখ বুজলো রূপু। চোখের পাতায় তিরতির করে কাঁপছে সান্ধ্য অনুষ্ঠানের ছবিগুলি পরপর। বিকাশকে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল আজকে। টুপুকেও! বহুবার দেখা মানুষটি চিরদিনের চেনা মেয়েটি আজকের মায়াসন্ধ্যার স্পর্শে অপরূপ হয়ে উঠেছিল··

গভীর রাত। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু রূপুর চোখে ঘুম নেই। সে বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ করছে। এক সময় উঠে পা টিপে টিপে ছাতে এসে দাঁড়ালো। তারা ভরা কালো আকাশটার দিকে তাকিয়ে অসীম শূন্যতায় রূপুর বুকটা হু হু করে উঠলো। আচমকা চোখের বাঁধ ভেঙে বন্যা নামলো।

কয়েক মুহূর্ত! সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলো রূপু। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে মনে মনে নিজেকেই বললো—রূপু, তুমি না দিদি। চোখ মোছো। তোমার চোখের জলে ওদের সুখের পথ পিছল করে দিও না।

স্বরূপ

দেখে দেখে সমীরের গা জ্বলে যায়।

সমীর একদম দেখতে পারে না মেয়েটাকে। মোটেই সহ্য করতে পারে না। আর যতোই ও মেয়েটাকে এড়িয়ে চলতে চায় ততোই যেন মেয়েটা গায়ে পড়ে ওর হাড় জ্বালাতে আসে।

রূপ? রূপ ওর আছে বই কি! কিন্তু দ'দণ্ড কেউ তাকিয়ে দেখে সে সাধ্যি কি! চোখ ঝলসে যাবে না! মনে হবে যেন মরুভূমির ওপর প্রচণ্ড তেজে সূর্যের রশ্মি জ্বলছে! নামখানা আবার মন্দালিকা। সমীর দাঁত পিষে স্বগতোক্তি করে—আমি হলে ঠিক চণ্ডালিকা রাখতাম।

চণ্ডালিকা নয়তো কি! একেবারে চামারের বেহদ্দ। আজ তিনটি বছর ধরে সমীর ওর লীলাখেলা দেখছে তো! বিজয় সুভাষ আনন্দ সুকোমল সব ক'টা ছেলের মাথা চিবিয়ে খেলো। সুভাষ ছেলেটা স্কলার ছিলো। ক্লাসের সব ক'টা পরীক্ষায় অদ্ভুত নম্বর রাখতো। আই. এ. পরীক্ষায় ইউনিভারসিটিতে স্ট্যান্ড করলো। তারপর ঐ মেয়েটা তার এমন মাথা ঘুরিয়ে দিলো যে বার দুই বি. এ. ফেল করে শেষটায় কলেজ ছেড়ে দিলো। আনন্দকে কিছুদিন এমন নাচ নাচালে যেন বাঁদর নাচ। আনন্দ ভেবেছিল বুঝি ধন তার হস্তগত হয়েছে, এবার পকেটে পুরলেই হয়। কিন্তু যেদিন আনন্দকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সুকোমলের সঙ্গে লীলাকমল ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করলো আনন্দ তো সেদিন মহা খাপ্পা। খুনির মতো চেহারা নিয়ে ঝড়ের মতো কমনরুমে ঢুকে একদিন এমন জোরে মেয়েটার হাত চেপে ধরলো যে মেয়েটা চীৎকার করে উঠলো ভয়ে যন্ত্রণায়। সবাই ছুটোছুটি করে এসে তবে ছাড়ায়। কয়েক ঘা খেয়েছিলও সেদিন আনন্দ। আর সেই অপরাধে কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। তারপর সুকোমলকে বার কয়েক খাবি খাইয়ে এখন বিজয়ের গলায় বিজয়মাল্য চড়িয়ে তাকে 'শেঠ' করে রেখেছে।

তাই বলে এখানেই শেষ নয়। অনিরুদ্ধর সঙ্গে মাঝে মাঝে 'লেকে'

দেখা যায় মেয়েটাকে। আর অঞ্জনের সংগে প্রায়ই কফি হাউসে। আরও হয়তো কতো আছে।

সমীর বুঝতে পারে না—ঐ মেয়েটার পেছনে সবাই অতো ছোটোছুটি করে কেন? রূপ? ঐ রূপ নিয়ে কে কি করবে! যে-ঘরে যাবে ঘরখানা ঠিক দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠবে। দেখলো তো সমীর! যে কয়টা ছেলের ওপর ওর নেক নজর, ধ্বংস হয়ে গেল ছেলেগুলো। তবু ওর পেছনে ছোটা! সমীর নাক কুঁচকে মনে মনে বলে—এ কি জঘন্য পতঙ্গবৃত্তি! জেনে শুনে রূপের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরা। আর রূপ যে কি তাও সমীর বোঝে না। ঝাঁকড়া ফাঁপা একমাথা রুক্ষ ববড হেয়ারের ইতস্ততঃ আন্দোলন যেন মা কালীর দুপাশে চেড়িদের কথা মনে করিয়ে দেয়। লিপস্টিক-মাখা রক্তবর্ণ ঠোঁট যেন ওর উগ্র চেহারাকে আরও উগ্র করে তুলেছে। ওঃ, সমীর দস্যুর মতো ভয় করে মেয়েটাকে।

সেদিন কলেজের লাইব্রেরি রুমে বসে সমীর তার দরকারী কতগুলি জিনিসের নোট নিচ্ছিল খাতায়। তারপর মৃদু উচ্চারণে পড়ে দেখছিল। এমনি সময়ে বিজয়ের সংগে মুখরিত আলাপে এবং একরাশ কাচ-ভাংগা হাসি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো মন্দালিকা। সমীরের দিকে চোখ পড়তেই তেমনি হাসিতে বললো—ও ভালছেলে সমীরবাবু, বিড়বিড় করে কি বকছেন? মন্ত্র পড়ছেন বুঝি! কিসের মন্ত্র ভাই। মনসা পুজোর না ঘেঁটু পুজোর।

সমীর ব্রাহ্মণ। তায় অতি-আধুনিকতার বিরোধী। তাই এই কথাটা।

রাগে সমীরের পিত্তি জ্বলে যায়। তবু যথাসম্ভব সংযত কণ্ঠে বলে—বেনা বনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ কি বলুন! অতি আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান এই কলেজের লাইব্রেরি রুমে পুজোর মন্ত্রের মূল্য বুঝবে কে?

তীব্রতর হাসিতে খান্‌খান্‌ হলো মন্দালিকা—ওঃ, এই আধুনিক যুগটার উপর আমাদের সমীরবাবুর বড়ো রাগ। তার মতো গুডবয় কেন যে আমার ঠাকুদ্দার আমোলে জন্মালেন না তাই ভাবি। হাসতে হাসতে চলে গেল মন্দালিকা বিজয়কে সংগে নিয়ে। সমীর নিরুপায় রোষে ঠোঁট কামড়াতে থাকে।

সেদিন সমীর তার ক্লাসে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় পেছন থেকে মন্দালিকার ডাক শোনা গেল—ও সমীরবাবু, সমীরবাবু!

যেন শুনতে পায়নি এমনিভাবে সমীর এড়িয়ে চলে যাচ্ছিল, মন্দালিকা দ্রুত পায়ে এসে তাকে ধরলো—ও সমীরবাবু, শুনতে পাচ্ছেন না না কি! না আপনার মতো গুডবয় আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। নামটা মন্দা বলে আমি কি এতোই মন্দ।

অপ্রতিভ সমীর কাষ্ঠহাসি হেসে বললো—বারে, মন্দ হতে যাবেন কেন? শুনতে পাইনি কি না!

থাক সমীরবাবু, প্রাণ খুলে যদি না হাসতে পারেন তবে ওই কপি-সুলভ হাসি হাসবেন না। তার চেয়ে বরং মুখ কালো করে দু'টো গালাগালি দিন।

কি বললেন? কপি-সুলভ মানে!

খিলখিল করে এক দমক হেসে নিলো মন্দালিকা। বললো—বারে, বুঝলেন না? কপি, কপি, গাছের ডালে যারা থাকে। যাদের হাসিটাই মুখ ভেংচির মতো মনে হয়। বলে হাসতে হাসতে চলে গেল।

অসহ্য রাগে একটা আগ্নেয়গিরির মতো দাঁড়িয়ে রইল সমীর। উঃ, কি আস্পর্ধা!

শুধু শুধু গায়ে পড়ে 'বাঁদর' বলে গেল!

তারপর থেকে ঘৃণায় মেয়েটার মুখের পানেও তাকায় না সমীর। একটা বেহেড অসভ্য মেয়ে। বেলেল্লাপনা ছাড়া যদি কিছু জানতো। ওকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেয় না কেন?

সেদিন কলেজ থেকে রাস্তায় বেরিয়েই এক কাণ্ড। একজন মেয়ে-ছেলে—গরীব দুঃখীই হবে—ফুটপাথে মরে পড়ে আছে। পাশে একটা বছর দেড়েকের ছেলে। মা'র নাকে মুখে হাত চাপড়াচ্ছে, চুল টানছে আর ডাকছে, মা-মা—। সাড়া না পেয়ে থেকে থেকে কেঁদে উঠছে। ভারী করুণ দৃশ্য।

সবাই এসে ভীড় করছে। দেখছে। দু' একবার 'আহা উহু' করে সরে পড়ছে।

কে বলতে পারে কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। থানা-পুলিশ হওয়াই বা বিচিত্র কি!

মন্দালিকা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখলো। তারপর বাচ্চাটার কাছে গিয়ে হাত বাড়ালো—আয়! বাচ্চাটা চারপাশে ভীড়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন পরম আশ্বাসে মন্দালিকার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বিজয় বললো—ও কি! ওকে নিয়ে চললে কোথায়?

বাড়ি। দেখি, বাচ্চাটার কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না। নইলে ওটাও মরবে।

ফ্যাসাদে পড়বে। ব্যাপারটা হয়তো পুলিশে যাবে।

বাঁকা হাসিতে মন্দালিকা বললো পুলিশ এলে আমার ঠিকানাটা দিয়ে দিও। তুমি তো জানোই বিজয়। আচ্ছা চলি। এই ট্যাক্সি, ট্যাক্সি—

হাত দেখিয়ে ট্যাক্সি থামিয়ে শিশুসহ মন্দালিকা ট্যাক্সিতে উঠে বসলো।

সমীর একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। মনে মনে বললো—মেয়েটা যাই হোক না কেন, মায়া-মমতাও আছে মনে হচ্ছে। আছে মা হবার মতো একটা প্রাণ।

সেদিন সমীরের মনটা ভালো ছিলো না। সে 'লেকে' একটা বেঞ্চিতে চুপচাপ বসেছিল।

এমন সময় পাশেই পরিচিত তীক্ষ্নকণ্ঠ বেজে উঠলো—সমীরবাবু যে! বকধার্মিক হয়ে বসে বসে কি ভাবছেন! মাছের ভাবনা!

এখানেও মেয়েটা! সমীর কি আর কলকাতা শহরে বাস করতে পারবে না!

মন্দালিকা বললো—আপনার পাশে একটু বসবো সমীরবাবু!

বিরস কণ্ঠে সমীর বললো—বসুন।

খানিকটা ব্যবধান রেখে বসে পড়ে ঠাট্টার সুরে মন্দালিকা বললো—আমি কতটা ব্যবধান রেখে বসলে শাস্ত্রমতে আপনার চরিত্রের সততা, মানে সতীত্ব রক্ষা হয় সমীরবাবু! সততাটা আমার। আপনি যতটা ব্যবধান রেখেই বসুন না কেন তা অক্ষুণ্ণ থাকবে। আমার জিনিস আমি যদি নিজে থেকে ভাঙতে না দিই আপনার সাধ্য নেই তা ভাঙতে পারেন।

একটু চুপ করে থেকে মন্দালিকা আবার বললো—কি ভাবছেন সমীরবাবু! পেত্নীটা বুঝি আমার ঘাড় ভাঙতে এলো। তাই না?

পেত্নি কিনা জানিনে। তবে কয়েকটা ছেলের ঘাড় ভাঙতে দেখেছি সত্যি। কিন্তু আমার ঘাড়টা ঠিক সেজাতের নয়। কিছুটা ইস্পাতের মিশেল আছে। তাই সেদিকেও আমি নিশ্চিন্ত।

কিন্তু আপনার ঘাড়ের ওপরই যে আমার লোভ বেশি সমীরবাবু!

তাহলে একটু সামলে চলবেন। লোভ রেখে লাভ হবে না কিছু। আপনার ঘাড় মটকাবার ফাঁদে যারা ধরা দেয় দিক, আমি কিন্তু তাতে পা দিচ্ছিনে।

ঐ জন্যেই তো আপনাকে এত শ্রদ্ধা করি সমীরবাবু! মন্দালিকা খানিকটা কাছে সরে এলো। কণ্ঠস্বর শোনালো কোমল।

সমীর বিস্মিত হয়ে ওর মুখের পানে চাইলো। মেয়েটা আবার কোন্ ধরনের ছলনা শুরু করলো কে জানে। কিন্তু না, কণ্ঠস্বরের সংগে সামঞ্জস্য রেখে ওর মুখের রেখাগুলোও যেন কোমল হয়ে এসেছে।

মন্দালিকা বললো—অবাক্ হয়ে দেখছো কি! সত্যি বলছি, বাঁদরগুলোকে শুধু নাচানোই চলে। কিন্তু ভালোবাসা যায় একটা মানুষকে, একটা পুরুষকে। মেয়েরা পৌরুষের কাছেই আত্মনিবেদন করতে ভালোবাসে। সারা কলেজে তুমি ছাড়া আর আমি পুরুষ দেখতে পেলাম না সমীর! —মন্দালিকার কণ্ঠস্বর কি এক গভীর আবেগে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে আসে।

সমীর মৃদুকণ্ঠে বললো—এ ও হয়তো তোমার আর একটা ছলনা মন্দালিকা। ঘাড় মটকাবার নতুন ধরনের ফন্দী।

ব্যাকুল মুঠিতে সমীরের একখানি হাত আবদ্ধ করে মন্দালিকা বললো—না না, এ আমার ঘাড় মটকাবার ফন্দী নয় বরং ঘাড়ে চাপবার ফন্দী বলো। আমাকে বইতে পারে এমন ঘাড় তো একটাও দেখলাম না সমীর! সে শুধু পারো তুমি। তোমার ওপর সে বিশ্বাস আমার আছে। তাইতো মনে মনে তোমায় এত ভালোবাসি সমীর। তাইতো বললাম তোমার ঘাড়ের ওপর আমার লোভ সবচেয়ে বেশি।

সমীর আর একবার মন্দালিকার মুখের দিকে তাকালো। মরুভূমির ওপরে সূর্যটা বুঝি ডুবে গেছে। এবার উঠেছে যেন পূর্ণিমার চাঁদ।

নাঃ—সমীর মনে মনে বললো—মেয়েটা যাই হোক প্রিয়া হবার মতো একটা মনও ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে। মন্দালিকার অন্তরেও রয়েছে

মন্দাকিনীর অমৃতধারা। তফাৎ শুধু বাইরেই। ভেতরে বুঝি সব মেয়েই এক।

মৃদুস্বরে সমীর বললো—তুমি তোমার উপযুক্ত আসনে নিজেকে অধিষ্ঠিত করে নাও মন্দা। তাতে আমার আপত্তির কিছু নেই।

ধীরে ধীরে মন্দালিকার মাথাটা সমীরের কাঁধের উপর নেমে এলো। বললো—আঃ, আমায় বাঁচালে সমীর। বাঁদর নাচিয়ে নাচিয়ে আমি বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—।

'চিত্ররূপা'

বিদ্রোহ

সুমতিদির মতো এমন স্বামিভক্তি আমি এ-যুগে দেখিনি।

সুমতিদির একটি মেয়ে, একটি ছেলে। মেয়ের ভালো বিয়ে দিয়েছেন। জামাইটি খুবই সুপাত্র। মেয়ে-জামাই আমেদাবাদে থাকে। ছেলে এম. বি. বি. এস. পাশ করে বিলিতি ডিগ্রী নিতে বিদেশে গেছে। বাড়িতে আছেন শুধু কর্তাগিন্নী—সুমতিদি আর বারীনদা। রান্না করার একজন ঠাকুর, আর বাদবাকি কাজের জন্য একটি মেয়ে, কাঞ্চন। তা লোকজন থাকলে কি হবে, ওদের সঙ্গে সংসারের সব কাজে সুমতিদির হাত লাগানো চাই। পাছে বারীনদার কোনো কিছুতে ত্রুটি হয় তাই সুমতিদি এক পায়ে খাড়া।

কপাল বটে একখানা বারীনদার। এমন সেবা দেবতার কপালেও জোটে কিনা সন্দেহ। ঠাকুর রান্না করে। সুমতিদি আগাগোড়া সেখানে দাঁড়িয়ে তদ্বির করেন। বারীনদা ভালোবাসেন এমন বিশেষ দু'একখানা তরকারি নিজের হাতে রোজ রাঁধা চাই। টিফিনের বাক্সে নিত্যি নতুন খাবার করে দেন। বেশ বড়ো-সড়ো সাইজের বাক্সটি পাউরুটি মাখন ফলমূল গাজরের হালুয়া ক্ষীরের সন্দেশ নারকোলের তক্তি এসব খাদ্যদ্রব্যে এমন বোঝাই হয়ে ওঠে যে একটা পিঁপড়ে ঢোকারও জায়গা থাকে না। টিফিন বাক্সটা হাতে নিয়ে ওজন পরখ করে বারীনদা বলেন—এতো কি দাও বলো তো! একটা মানুষ এতো খেতে পারে?

খুব পারে। —সুমতিদি বলেন—ওইটুকু না খেলে শরীর টেকে! এতো খাটুনির কাজ, না খেলে চলবে কেন?

বারীনদা হেসে বলেন—তুমি দেখছি আমাকে পেটুক করে তুলছো। আমার অফিসের সবাই আমাকে ঠাট্টা ক'রে বলে—গিন্নী যত্ন করে এই বয়সেও তো তোমাকে বেশ শাঁসে-জলে রেখেছে হে?

তা সত্যিই, এই বয়সেও বারীনদার চেহারাখানা দেখবার মতো। একেই তো তাঁর টকটকে ফর্সা রঙ, দারুণ নিটোল চেহারা, চুলে যদিও বা কিছু কিছু পাক ধরেছে কিন্তু কলপ দিয়ে বেশ ম্যানেজ করে রাখেন। তার ওপর সুমতিদির এই যত্ন তাঁর মুখে বয়সের রেখা পড়তে

দেয়নি একটুও। বারীনদা খেতে বসলে সুমতিদি নিজের হাতে সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিবেশন করেন। মাথার ওপর ফুল স্পীডে পাখা ঘুরলেও হাতপাখা নিয়ে কাছে বসেন যেমনটা আজকাল শুধু সিনেমাতেই দেখা যায়। একটু কম খেয়ে ওঠার জো নেই। সুমতিদি আর্তনাদ করে ওঠেন—কিছুই যে খেলে না। অন্ততঃ মাছের পেটিটা খেয়ে নাও। আর এটুকু ছানার ডালনা কিছুতেই ফেলতে পারবে না।

বারীনদা হেসে বলেন—সুমতি ঠাকরুন, বয়স তো হয়েছে। এখন কি আর অতো খেতে পারি?

সুমতিদি বলেন—ওসব কথায় ভুলছি না। ওটুকু খেতেই হবে।

বারীনদা অফিস থেকে ফিরলে বিকেলে চায়ের জল চাপায় কাঞ্চন। কিন্তু চা তৈরি করবেন সুমতিদি নিজের হাতে। বারীনদা হয়তো বলেন—তোমার যাওয়ার কি দরকার। তুমি বসো না। কাঞ্চনই তো চা করতে পারবে।

সুমতিদি বলেন—তুমি হালকা চা খাও। মিষ্টি কম খাও। কাঞ্চন যদি চা কড়া করে ফেলে কি বেশি মিষ্টি দিয়ে দেয়! ও আমি নিজের হাতে না করে শান্তি পাই না।

বারীনদা বলেন—আমার লোকজন রেখে কি লাভ বলতে পারো? সেই তো তুমি খেটে খেটে সারা হও। দুটো লোকের সংসারে দুটো কাজের লোক। তাও তোমার একটু বিশ্রাম নেই। সেবাযত্নে আমাকে তো বেশ নেয়াপাতি করে রেখেছো কিন্তু খেটে খেটে নিজের চেহারা কি হয়েছে দেখেছো? অমন যে রূপ তাতে যে মেঘের ছায়া পড়ছে।

সুমতিদি উজ্জ্বল চোখে মৃদু হাসিতে বলেন—হাতে শাঁখা আর কপালে সিঁদুর যতোদিন আছে ততোদিন আমার রূপ কে কেড়ে নেয় শুনি?

শুধু কি খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর! জামা কাপড় কাচা, ইস্ত্রি করা, অফিসে বেরোবার মুখে হাতের কাছে ধোপ দুরস্ত পোশাক ধরে দেওয়া, হাতে চিরুনী তুলে দেওয়া, কোট পরতে সাহায্য করা, মায জুতো জোড়াটি নিজের হাতে পায়ে পরিয়ে দেওয়া। অফিস থেকে ফেরা মাত্র ফের জুতো খুলে রাখা, কোট খুলে দেওয়া সব—সব সুমতিদি কি আশ্চর্য যত্নে করেন। আর বারীনদার অসুখ-বিসুখ হলে তো কথাই নেই, সেবায় যত্নে রাত জাগায় সুমতিদি যেন সীতা সাবিত্রীব

আধুনিক সংস্করণ।

সত্যি কপাল করে এসেছিলো বটে মানুষটা! এমন স্ত্রী পাওয়া, কপালের জোর চাই। সুমতিদির হার্টের অসুখ হয়েছে। ডাক্তার বিশ্রামে থাকতে বলেছেন, তা শুনছে কে! সুমতিদির স্বামীসেবায় ছেদ নেই। এ নিয়ে বারীনদা এখন চেঁচামেচি করেন। বলেন—আমার কথা না হয় এতোদিন শোনোনি। এবার ডাক্তারের কথাটা শোনো। আমার জন্যে খাটতে গিয়ে যদি মরে যাও তো এ পাপের বোঝা বইবে কে? তুমি বসে থাকো তো! যা যা দরকার কাঞ্চন দেবে।

কাঞ্চন আনাড়ি নয়। সে সব কাজ বেশ ভালো পারে। আমি মাঝে মাঝেই সুমতিদির বাড়ি যাই। তখন যে টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো দেখি বা টুকরো টুকরো কথাবার্তা শুনি তাই জুড়ে-তেড়ে সুমতিদির সংসারের এই ছবি আমি পেয়েছি। কাঞ্চনকেও আমি দেখেছি। কারণ আমি গেলে কাঞ্চনই চা-টা এনে দেয়। সুমতিদি তাকে হাতে ধরে সব কাজ শিখিয়েছেন। মিশকালো গায়ের রঙ কাঞ্চনের। মাথার চুলের রঙের সংগে বিশেষ তফাৎ নেই কিন্তু চেহারাটি বড় সুন্দর। বড়ো বড়ো দু'টো চোখে সরলতা। কালো মুখে যতটা শ্রী থাকা সম্ভব তা কাঞ্চনের আছে। সব সময় হাসিখুশি, আর তার দাঁতগুলি বড়ো সুন্দর। সাদা ঝকঝকে। হাসলে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। মেয়েটি স্বামী-পরিত্যক্তা। বছর পাঁচেক হয় সুমতিদির কাছে আছে। যেমন শিখেছে কাজ তেমনি আদব-কায়দা। সুমতিদি ওকে খুব ভালবাসেন। রান্নার ঠাকুরটিও যেমন পাকা রাঁধুনি তেমনি বিশ্বাসী। সুমতিদি অনায়াসে পায়ের উপর পা তুলে খাটে বসে থাকতে পারেন। কিন্তু স্বভাব! বারীনদার যত্নআত্তিটুকু নিজের হাতে করতে না পেলে যেন ছটফটিয়ে মরে যান। বারীনদাও তেমনি। সুমতিদিকে কি করে সুখে রাখবেন সেই চিন্তায়ই অস্থির। মেয়ের বিয়ে এবং ছেলের বিদেশযাত্রার পর সুমতিদি বড়ো একা হয়ে গেছেন। বারীনদার অফিস। কোনো কোনোদিন ফিরতে রাত হয়ে যায়। এই নিঃসংগতা ঘোচাবার জন্য বারীনদা কত ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ভালো ভালো বই, নানা পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, রেকর্ডপ্লেয়ার,

ভালো রেকর্ড। সুমতিদিকে সুন্দর এবং দামী শাড়ি কিনে দেওয়াও ছিলো বারীনদার শখ। দামী দামী সব বাহারে শাড়ি। বারীনদা চাইতেন সুমতিদি সব সময় ভালো ভালো শাড়ি পরে লক্ষ্মীঠাকরুন সেজে বসে থাকুন। তা সুমতিদির লক্ষ্মী ঠাকরুনের মতো রূপই বটে। রঙটা বারীনদার মতো অতো উজ্জ্বল নয় তবু ফর্সাই বলা চলে। মুখের গড়নটি ভারি সুন্দর। সব চাইতে সুন্দর সুমতিদির বড়ো বড়ো ঘনপক্ষ চোখ দুটো আর পিঠ-ছাপানো ঢেউ-ঢেউ চুল। এক রাশ! তবে সামনের দিকে কয়েকগাছা চুলে পাক ধরেছে।

মাঝে মধ্যে গেলে সুমতিদি কৃত্রিম অনুযোগের ভঙ্গিতে বলেন —দ্যাখ্ দিকিনি তাপস, তোর জামাইবাবুর কাণ্ড। কি বাহারে সব শাড়ি এনেছেন আমার জন্যে।

বেশ ভালোই তো, পরো না সুমতিদি!

শাড়ি তো ভালোই। কিন্তু বয়স হয়েছে না! এই বয়সে কি এসব শাড়ি মানায়? মেয়ে বিয়ে দিয়েছি। জামাই দেখলে কি বলবে। শাশুড়ি ছেলেমানুষ সেজে থাকতে চায়। —সুমতিদি খুশির সঙ্গে একটু লজ্জা ফুটিয়ে হাসেন।

আমি বলি—না না সুমতিদি, তোমাকে দেখে বুঝতেই পারা যায় না তোমার বয়স হয়েছে। আর জামাই এসেছে বলে কি হয়েছে? ও আধুনিক জামাই বরং দেখে খুশিই হবে।

তা সুমতিদি পরতেন। কত রঙ-বেরঙের দামী দামী বাহারি শাড়ি পরে সব সময় লক্ষ্মীঠাকরুনটি সেজে থাকতেন।

আমি ভাবতাম—ঐশ্বর্য প্রাচুর্য অনেক সংসারে থাকে। কিন্তু সুমতিদির সংসারের মতো ভক্তি-ভালোবাসা বিশ্বাস-শ্রদ্ধা সব মিলিয়ে এমন একটি নিটোল সংসার আর কখনও দেখিনি।

কিন্তু সেই সুন্দর সংসারটিতে এক আকস্মিক অভিশাপ নেমে এলো। হঠাৎ হার্ট স্ট্রোক হয়ে তিন দিন যমের সঙ্গে লড়াই করে বারীনদা মারা গেলেন! সুমতিদির মতো স্বামিগতপ্রাণা মহিলার কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। বারীনদা নিজে তো গেলেনই, সেই সঙ্গে সুমতিদিকেও মেরে রেখে গেলেন। অনেক বলে-কয়েও তাঁকে খাওয়া-পরার কৃচ্ছ্রসাধনা থেকে টলানো গেলো না।

সুমতিদি নেহাৎ থান পরতেন না বটে কিন্তু শাড়ির পাড় এক আঙুলের বেশি চওড়া হলেও পরতেন না। মেয়ে এ নিয়ে কতো কাঁদাকাটা—চওড়া-পাড়-শাড়ি পরো মা।

সুমতিদির নির্লিপ্ত উত্তর—কি হবে পরে? কার জন্যে পরবো?

আমাদের জন্যে পরো। নইলে দেখতে কষ্ট হয় আমাদের।

তোদের বাবা চলে গেছেন সেই কষ্ট সহ্য করতে পারছিস আর এটুকু পারবি না?

না, সুমতিদি টলেন নি।

গয়নার মধ্যেও হাতে শুধু দু' গাছা সোনার চুড়ি। আর খাওয়া? দুপুরে ভাতেভাত, রাত্তিরে ফল দুধ। মেয়ে কান্নাকাটি করে বলেছে—এই খাওয়া খেয়ে শরীর টেকে! শরীরটা শেষ করছো কেন মা?

সুমতিদি নির্লিপ্ত হাসিতে জবাব দিতেন—শরীরের কি দাম রে! আমার এই শরীরের থেকেও অনেক দামী শরীর তোরা পুড়িয়ে ছাই করে দিসনি? আজ মরে গেলে আমাকেও তো তাই করবি।

আর বারীনদার ছবি? ঘরে দেয়ালে-দেয়ালে, টেবিলে, তাকে, কোথায় নয়। ঠাকুরের আসনে বড় একখানা ছবি নিত্য পুজো হয়। সকালে সব ছবিতে টাটকা মালা পড়ে। স্নান সেরে এসে নিজের হাতে মালা পরান সুমতিদি।

মাঝখানে প্রায় বছর খানেক কলকাতায় ছিলাম না। কোনো কাজে দিল্লী থাকতে হয়েছিলো। ফিরে এসে ভাবলাম—যাই সুমতিদিকে দেখে আসি।

পরদিন সকালবেলায় গেলাম সুমতিদির বাড়ি। ঘরে ঢুকে আমি তো একেবারে থ! সুমতিদির পরনে সেই আগেকার মতো দামী বাহারে শাড়ি। হাতে গোছাভরা সোনার চুড়ি, গলায় মোটা হার, কানে কর্ণভূষা।

সুমতিদি টেবিলে বসে চা খাচ্ছেন। সামনে চায়ের পট। পাউরুটি টোস্ট আর একটা ডিসে—এ কি! আমি ভুল দেখছি না কি। দু'টো সেদ্ধডিম। আমার দিকে চোখ পড়তে সুমতিদি বললেন—তাপস এলি! আয়, বোস্।

আমি একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম—কেমন আছো সুমতিদি ?

ভালো।

সুমতিদি ঠাকুরকে ডেকে আমার জন্য ডিম পাউরুটি চা অর্ডার দিয়ে নিজে চামচ দিয়ে ডিম ভেঙে মুখে পুরতে লাগলেন।

আমার মাথাটা কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিলো। সারা ঘরে বারীনদার একখানা ছবিও যে নেই! ব্যাপারটা কি—থই পাচ্ছিলাম না। আমার জন্য চা খাবার এলে আমি নিঃশব্দে খেয়ে যেতে লাগলাম।

খাওয়া পর্ব মিটলে সুমতিদি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—খুব অবাক্ হয়ে গেছিস তাপস।

আমি বোকার মতো তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর সুমতিদি যা বললেন তা হলো—বারীনদা মারা যেতে কিছুদিন পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো কিছুতে সুমতিদির নজর ছিলো না। কয়েক মাস পর হঠাৎ একদিন কাঞ্চনের দিকে চোখ পড়তে তিনি চমকে উঠলেন। অভিজ্ঞ মেয়েলি চোখে ধরা পড়লো কাঞ্চনের দেহের পরিবর্তন। তিনি চেপে ধরলেন তাকে—বল্ তোর কি হয়েছে। তোর তো স্বামীর সংগে সম্পর্ক নেই। বল্ তোর এ অবস্থার জন্য দায়ী কে ?

ধরা পড়ে কাঞ্চন কাঁদতে লাগলো কিন্তু কিছু বলে না। সুমতিদি যত জেরা করেন ততো কাঁদে আর বলে—মরে গেলেও বলতে পারবো না মা। আমাকে মেরে ফ্যালো কেটে ফ্যালো—ও নাম আমি মুখে আনতে পারবো না।

সুমতিদি তাকে কিছু টাকা দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

মাস চারেকের ছেলে কোলে নিয়ে ছ'মাস পরে কাঞ্চন আবার এসেছিলো কাজ করবে বলে। আর সে ছেলের দিকে তাকিয়ে সুমতিদি পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। হৃদ্‌পিণ্ড অস্বাভাবিক জোরে লাফাচ্ছিলো। আবার কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে কাঞ্চনকে জন্মের মতো বিদেয় করেছিলেন।

সুমতিদি আমাকে বলেছিলেন—বুঝলি তাপস, ঐ কয়লার মতো কালো মেয়েটার কোলে কাঁচা সোনার মতো রঙের ছেলে! আর বাচ্চাটার মুখ! কি বলবো তোকে, ঠিক যেন তোর জামাইবাবুর চেহারা

কেটে বসানো। আমার শরীরের রক্ত দ্রুত বইতে লাগলো। মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। আমি কড়া চোখে কাঞ্চনের মুখের দিকে তাকালাম। সে অপরাধীর মতো মুখ নীচু করলো। বুঝতে আমার আর বাকি রইলো না। বুঝলাম কেন কাঞ্চন আমার কাছে সেদিন নাম বলতে সাহস পায় নি। মাথায় আগুন জ্বলছিলো। কাঞ্চন বিদেয় হয়ে গেলে প্রথমেই ঘরে ঢুকে ও'র সব কটা ছবি সরিয়ে ফেললাম ঘর থেকে। ভাড়ারে বাক্সবন্দী হয়ে আছে সেগুলো। তারপর বাথরুমে ঢুকে খুব জল ঢেলে চান করলাম। আলমারি থেকে বেশ বাহারে একখানা শাড়ি বের করে পরলাম। ঠাকুরকে বললাম চায়ের সংগে ডবল ডিমের ওমলেট করে আনতে।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলতে বলতে সুমতিদির চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠলো। কপালের রেখাগুলো কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। একটু থেমে আবার তিনি শুরু করলেন—

চা ওমলেট নিয়ে এসে ঠাকুর অবাক্ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। বুঝলাম আমার শাড়ি দেখে অবাক্ হয়ে গেছে। তারপর বললো—ওমলেট কাকে দেবো মা। বললাম—আমাকে।

ও আরও হতবুদ্ধি হয়ে আমার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। সুমতিদি থামলেন।

আমিও বোকার মতো সুমতিদির দিকে তাকিয়েছিলাম। কি বলবো খুঁজে না পেয়ে এবার আরও বোকার মতো একটা কথা বলে বসলাম—যাই বলো সুমতিদি, তোমাকে আবার ঠিক আগের মতো দেখাচ্ছে। শুধু সিঁদুর নেই, এই যা।

সুমতিদির চোখ দু'টো আবার দপ্ করে জ্বলে উঠলো। চাপা কঠিন গলার বললেন—সিঁদুর! এই ঘটনা জানার পর তোর জামাইবাবু বেঁচে থাকলেও আর আমি সিঁদুর পরতাম না। না না, কক্ষণো না।

পল্লবিত

সকালবেলা হঠাৎ হৈ-হৈ পড়ে গেলো পাড়ায়, ডাক-হাঁক চেঁচামেচি ছুটোছুটি।

কি, কি হলো ?—ব্যাপারটা জানতে গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

দু'তিনটি ছেলে আমার সামনে দিয়েই ছুটে যাচ্ছিলো, ছেলে ক'টি আমার চেনা। জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে সুজন ? এত হৈ-হল্লা ছুটোছুটি কিসের ?

দেখলাম ছেলেটির দাঁড়াবার অবকাশ নেই। ছুটতে ছুটতেই বললো—চৌধুরী বাড়ির পলা আগুনে খুব পুড়ে গেছে।

কি করে পুড়লো ?

কি জানি! স্টোভ থেকে আগুন বোধ হয় অসাবধানে শাড়িতে ধরে গেছে।

পলা কে, কোনটা চৌধুরী বাড়ি এসব কিছুই জানা নেই। তবু শিউরে উঠলাম। একটি অদেখা অচেনা মেয়ের দহন-যন্ত্রণা আমার বুকের মধ্যে যেন যন্ত্রণার কাঁটা ফুটিয়ে দিতে লাগলো।

মন থেকে সরাতে পারছিলাম না মেয়েটির কথা, অচেনা মেয়েটিকে কল্পনায় রূপ দিয়ে তার কথাই ভাবছিলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো আগুনের দাউ-দাউ শিখা। একটি মেয়ের দেহকে পেঁচিয়ে ধরে পোড়াচ্ছে।

খানিক পরে পাড়ার জিতু এলো আমার ছেলে শান্তকে ডাকতে। বললো—পলাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে অ্যাম্বুলেন্স এসেছে। পলার বাবা তো একেবারে ভেংগে পড়েছেন, ওর দাদা একা যেতে সাহস পাচ্ছে না, চল আমরা সংগে যাই।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—হ্যাঁ বাবা জিতু, মেয়েটি কি খুব বেশি পুড়েছে ?

হ্যাঁ মাসিমা, খুব বেশি। চোখে দেখা যায় না। মনে হয় না বাঁচবে।

ষাট ষাট ! বাঁচুক : কি করে গায়ে আগুন ধরলো গো। স্টোভ বার্স্ট করেছিলো ? না কি অসাবধানে শাড়িতে লেগে গেছে।

ব্যাপারটা গোলমেলে। মনে হয় সুইসাইড করেছে। শাড়িতে কেরোসিন ঢেলে নিজের গায়ে নিজে আগুন দিয়েছে।

আমি শিউরে উঠে বলি—বলো কি ! কেন ? কেন এমন কাজ করতে গেলো।

কি জানি কি ব্যাপার !—শান্তকে সংগে নিয়ে জিতু বেরিয়ে গেলো।

বিকেলবেলা বেড়াতে এলেন রক্ষিত বাড়ির সুষমাদি। বললেন—খবর শুনেছেন তো ভাই। চৌধুরী বাড়ির মেয়েটি মারা গেছে।

মারা গেছে ! আহা রে !

হ্যাঁ ভাই। আসতে আসতে পাড়ায় শুনে এলাম। আহা, কি মেয়ে ছিলো গো। যেমন রূপ তেমন গুণ। কাঁচা হলুদের মতো রঙ, পান-পাতার মতো মুখ। যেমন নাক তেমনি টানা-টানা দুটো চোখ। আর চুল ? কি বলবো দিদি, কোমর ছাপিয়ে পড়েছে যেন কালো রেশমের গোছা।

আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। বড় কষ্ট হতে লাগলো সেই পানপাতার মতো মুখের মেয়েটার জন্য। সেই টানা-টানা দু'টো চোখ আর কালো রেশমের মতো এক পিট চুলের জন্যও।

সুষমাদি এবার ফিস্ ফিস্ করে বললেন—অনেক ব্যাপার আছে এর মধ্যে।

ব্যাপার ! কি ব্যাপার ?

তবে আর বলছি কি ! একটি ছেলের সংগে ঘনিষ্ঠতা চলছিলো বুঝি মেয়েটির। মেয়েটি বললো—ওকে আমি বিয়ে করবো।

মা-বাবা বললেন—না, এখানে আমরা বিয়ে দেবো না।

মেয়ে বললো—আমি এখানেই বিয়ে করবো।

মা-বাবা বললেন—কিছুতেই এখানে দেবো না।

তারপরই এই কাণ্ড। মেয়েটা গায়ে স্পিরিট ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

স্পিরিট ঢেলে ? তবে যে শুনেছিলাম কেরোসিন ?

না না, স্পিরিট। যখন এই ঘটনা ঘটলো, বাড়িতে চিৎকার চেঁচামেচি

চলছে, আমার বাবুল তো ছুটে গিয়েছিলো সেখানে। এসে বললো—মা, স্পিরিটের গন্ধে বাড়ি ম' ম' করছে। নির্ঘাৎ স্পিরিট ঢেলেছে গায়ে।

সুষমাদি উঠলেন।

তা স্পিরিটই হোক আর কেরোসিনই হোক ক্ষতি যা হবার তো একই হলো! সুন্দর জিনিস নষ্ট হলে আমার বড়ো কষ্ট হয়। সেই পানপাতার মতো মুখের মেয়েটার জন্য, সেই টানা-টানা দুটো চোখ আর রেশম-কালো একঢাল চুলের জন্য আমার বড়ো কষ্ট হতে লাগলো। আবার রাগও হলো—বোকা মেয়ে! রূপে গুণে তিলে তিলে তিলোত্তমা হয়েছিলি তুই। এমনি করে জীবনটা নষ্ট করলি? নষ্ট করলি ঈশ্বরের এমন সৌন্দর্যের আশীর্বাদ। এত জেদ কেন তোর মেয়ে! পৃথিবীতে সবাই কি সবকিছু পায়?

রাগ হলো মেয়ের মা-বাবার ওপরও। এতোটা বেশি মা-বাবা-গিরি কি না ফলালেই চলতো না! একটু রাশ আলগা করলে কি হতো? তাহলে তো ঐ পানপাতা মুখের মেয়েটা এমনি করে হারিয়ে যেতো না এই পৃথিবী থেকে।

বিকেলবেলা বাসন-মাজা ঠিকে-ঝি কলতলায় বসে বাসনে ঝামা ঘসতে ঘসতে বললো—কি কাণ্ড গো মা, কি কাণ্ড! ও পথ দিয়ে আসতেছেনু। দেখি মেয়েটাকে খাটিয়া করে হাসপাতাল থেকে নে এসেছে। সর্বাঙ্গ কাপড়ে মোড়া। এমন পুড়েছে দেখলে না কি ভয় করে। তাকানো যায় না। মা'টা পাগলের মতো চ্যাঁচাচ্ছে। অমন দুগ্‌গো পিতিমের মতো মেয়েটা কি না গায়ে পেট্রল ঢেলে পুড়ে মলো!

পেট্রল ঢেলে? তবে যে শুনেছিলাম স্পিরিট!

না গো মা, না। আমার ভাই ডেরাইভারের কাজ করে। সে পেট্রলের গন্ধ চিনবেনি? ওই তো এসে বললো—এ যে পেট্রলের গন্ধ ছড়াচ্ছে। পেট্রল ঢেলে গায়ে আগুন দিলে তার আর বাঁচোয়া নেই। তাই তো হলো মলো তো!

যে দুগ্‌গো পিতিমের মতো মেয়েটা এতদিন এ পাড়ার রাস্তায় দু'খানি হরতেল রঙের পা ফেলে-ফেলে হাঁটতো, ওর গায়ের কেরোসিন বা স্পিরিট অথবা পেট্রলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার আগে যার রেশম কালো

চুলের সুগন্ধ এ পাড়ার বাতাসে ভাসতো, এক পাড়ায় এতোদিন থেকেও সেই মেয়েটিকে আমি দেখিনি। কিন্তু সেদিন সারা রাত আমি স্বপ্ন দেখলাম সেই হরতেল রঙের, পানপাতা মুখের মেয়েটিকে। শান্ত মুখে টানা-টানা দু'টো চোখ। তাকে ঘিরে আগুনের শিখা জ্বলছে।

পরদিন সকালবেলা পাড়ার বামুনদি এলেন বেড়াতে। বললেন—জানো বাছা, কি কাণ্ড!

কাণ্ড! আবার কি কাণ্ড!

ঐ যে ট্রামরাস্তার ওপারে পশ্চিম দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতি রাস্তা, তার গা ঘেঁষে বড়ো লাল বাড়িটা—

আমার পূবপশ্চিম জ্ঞান বিশেষ নেই। তাই শুধু বললাম—হুঁ।

সেই বাড়িরই নাকি ছেলেটা—কাল রাত্তিরে নাকি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যে করেছে।

আবার আত্মহত্যা!—বললাম—কেন? কেন এমন করলো?

তবে আর বলছি কি! বিয়ের যুগ্যি ছেলে, আর জানো, আজই তার বিয়ে হবার কথা ছিলো।

ইস্!

বিয়েবাড়িতে আত্মীয় কুটুম্ব লোকজন ভর্তি। তোমার গে কেনা-কাটা শেষ। খাবার-দাবার বায়না-পত্তর সব হয়ে গেছে। মা-বাপের পেরথম ছেলে কি না। ঘটাপটার বিয়েই হচ্ছিল। তা কাল রাত্তিরে এই কাণ্ড করে বসলো ছেলেটা।

—কেন? ছেলেটির ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে হচ্ছিল বুঝি!

—তা বলতে পারো। ছেলেটি তো অন্য মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। তা মেয়ের মা-বাবাও দেবে না এই ছেলের কাছে। ছেলের মা-বাবাও করাবে না এখানে। ছেলেকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করিয়ে নিজেরা সম্বন্ধ ঠিক করলো। ছেলেও মেনে নিয়েছিলো। এদিকে ছেলেটি অন্য জায়গায় বিয়ে করছে জানতে পেরে মেয়েটি নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে কাল-ই পুড়ে মরলো। এই খবর শুনে এস্তোক ছেলেটা গুম মেরে গেলো। এ-পাড়া ও-পাড়া তো। খবর যেতে কতক্ষণ লাগে। তারই জন্য মেয়েটা আত্মঘাতী হয়েছে এটা সহ্য করতে পারলো

না। কাল রাত্তিরেই সেও গলায় দাঁড় দিয়ে মলো। আহা আজ তার বিয়ে ছিলো গো। বিয়ে বাড়ি কি না মড়া বাড়ি হয়ে গেলো!

কি বলছেন বামুনদি? কাল পুড়ে মরেছে? কোন্ মেয়ে বলুন তো।

সবাই তো বলছে চৌধুরী বাড়ির মেয়ে পলা-ই নাকি সেই মেয়ে।

—তাই নাকি!—আমি তো চমকিত।

আরও দু'চার কথা বলে বামুনদি উঠলেন। আমি ভাবতে লাগলাম—আচ্ছা, মেয়েটির শাড়িতে অসাবধানে আগুন লেগে গিয়েছিলো না এই অগ্নি-সংযোগ ইচ্ছাকৃত? গায়ে কেরোসিন ঢেলে না কি স্পিরিট ঢেলে না কি পেট্রোল ঢেলে সে নিজেই আগুন লাগিয়ে ছিলো? কেন লাগিয়ে ছিলো?

সে যাকে ভালোবাসে তার সঙ্গে মা-বাবা বিয়ে দেয়নি বলে? সত্যিই কি তার কোনো প্রেমিক ছিলো? না ওটা গালগল্প। ও-পাড়ায় কোনো ছেলে গলায় দড়ি দিয়ে সত্যিই মরেছে কি? সেই ছেলেটিই কি এই মেয়েটির প্রেমিক? অথবা এ দু'টোই বিচ্ছিন্ন ঘটনা! কাছাকাছি জায়গায় একই দিনে ঘটেছে বলে মানুষ এর মধ্যে রহস্যের গন্ধ খুঁজেছে! গুজব রটনাকারীরা দুটো ঘটনাকে এক সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গল্প তৈরি করেছে! কি জানি!

ঘটনার ঘনঘটার এই ডালপালা পত্রপল্লবের মধ্যে একটা কথা কিন্তু ঠিক জেনেছি—একটি মেয়ে গায়ে আগুন দিয়ে নিজের জীবন নিজে শেষ করে দিয়েছে। সেই মেয়েটি যে দিনে দিনে তিলে তিলে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছিলো, যার হরতেলের মতো রঙ, পানপাতার মতো মুখ, টানা-টানা চোখ আর কালো রেশমের মতো চুল। বিধাতার সুন্দর শিল্প। সুন্দর জিনিস নষ্ট হলে আমার বড় কষ্ট হয়। সেই হতভাগ্য মেয়েটির জন্য আমার একটি দীর্ঘশ্বাস আর দু-ফোঁটা চোখের জল রইলো।

সোনার কাঠি

পরপর পাঁচটি ছেলে হবার পর সুবিনয়বাবুর একটি মেয়ে হলো।

একমাত্র মেয়ে, তায় সর্বকনিষ্ঠ। কাজেই অতিরিক্ত আদরে মেয়ে বড়ো হতে লাগলো। মায়ের চেয়ে বাপের আদর যেন আরও বেশি। আর এর অবশ্যম্ভাবী ফল যা হবার তাই হলো। ছোটো বয়স থেকে মেয়ে ভয়ানক জেদী আর একগুঁয়ে হয়ে উঠলো।

দু'বছর ছাড়িয়ে তিনে পা দিয়েই মেয়ে একদিন বললো—এ জামা এ ইজের পরবো না, বিচ্ছিরি।

কোনটা পরবে মণি, বলো।—মা আলমারী খুলে একরাশ জামা, ইজের বের করলেন : সিল্ক, সার্টিন, জরিবুটি—হরেক রকম।

—না, এসব নয়। দাদাদের মতো জামা পরবো। বোতাম লাগানো প্যাণ্ট। এ সব বিচ্ছিরি।

—ওমা! বলে কি! অমন সুন্দর সুন্দর জামা ফেলে কিনা দাদাদের মতো! সে জামা তো বিচ্ছিরি।

এগুলো কেমন সুন্দর দেখো। এই যে কেমন লাল। জরির ফুল। এ জামা পরো, লক্ষ্মী মা-মণি।

কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। সেই এক গোঁ আর কান্না—দাদাদের মতো জামা পরবো, বোতাম লাগানো প্যাণ্ট পরবো। বাবা কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন—আচ্ছা, দাদাদের মতো জামা-ই এনে দেবো। এখন এটা পরো।

—না, এক্ষুণি চাই।

সংগে সংগেই বাবা কিনে আনলেন হাফ ডজন সার্ট আর এক ডজন হাফপ্যাণ্ট। পাঁচ ছেলের সংগে মেয়েও ছেলে সেজে বেড়াতে লাগলো।··· কিছুতেই ফ্রক পরবে না। মা এক এক সময় জোর করে পরিয়ে দিতে চান। কিন্তু মেয়ে অটল। বিস্মিত হয়ে মা বলেন—এ কি ছেলেমার্কা মেয়ে হয়েছে গো! এত রং-বেরংয়ের ফ্রক ছেড়ে কিনা ছেলেদের জামা

ওর পছন্দ। বড়ো হলে না ধুতি পাঞ্জাবী পরতে শুরু করে।

স্বামী হেসে কটাক্ষ করেন—পাগল! তাই কখনও পরে। বাজারে যা রকমারি শাড়ির বাহার! এখন ছেলেমানুষ, হঠাৎ কি ঝোঁক পড়েছে তাই। দাদারা সবাই পরে কিনা। নইলে শাড়ি ছেড়ে ধুতির দিকে মন যায়!

রুপলেখা যতো বড়ো হতে লাগলো ছেলেদের পোশাকের প্রতিই তার আকর্ষণ বাড়তে লাগলো। ছেলেদের সংগে খেলাধুলো করা তার পছন্দ। মেয়েদের সংগে মেয়েলি খেলায় তার মন বসে না। ডলের বদলে বলখেলা, গাছে চড়া, সাঁতার কাটা—এসব খেলা তার প্রিয়।

শুধু কি তাই! বাড়িতে মাসে একদিন পরামাণিক ডেকে ছেলেরা সবাই চুল ছাঁটতো। রুপারও সেদিন দাদাদের মতো চুলছাঁটা চাই। মা চেঁচামেচি করতেন। বাবা হেসে বলতেন—আহা! কদিন আর এমন করবে। ছেলেমানুষের খেয়াল বই তো নয়!

আট বছরের রুপলেখা প্রথম যেদিন স্কুলে ভর্তি হতে গেল সেদিন স্কুলের মেয়েরা তার পোশাক ও চুলের ছাঁট দেখে তার পেছনে লাগলো—এমা, বেটাছেলে নাকি রে!···ও রুপলেখাবাবু!···তুমি আমাদের স্কুলে এসেছো কেন, ছেলেদের স্কুলে যাও না!

চটে গিয়ে রুপলেখা বললো—তাই যাবো। ওরা তোমাদের চেয়ে অনেক ভালো।

কিন্তু ছেলেতে মেয়েতে যে পার্থক্য তা কদিন গোপন রাখা যায়। রুপা কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে পা দিতে মা'র প্রবল আপত্তি শুরু হলো. মা বলে উঠলেন—আর অমন করে চুল ছাঁটা হবে না তোমার। লম্বা রাখতে হবে চুল।

—চুল!—বিস্ময়ে দু'চোখ বড়ো করলো রুপা—এই এতো লম্বা লম্বা একবোঝা জঞ্জাল মাথায় বয়ে বেড়াবো? না, কক্খনো না।

—না, বাংলাদেশের কোন মেয়েটা মাথায় চুল রাখছে না? চুল আবার দশমণ ভার বোঝা হয় নাকি! কি মেয়েই হয়েছেন! আহা! আর এবার থেকে তোমায় বলে রাখছি বাছা, ঐ পোশাক-টোশাকগুলো ছেড়ে শাড়ি-টাড়ি পরো। এখন বড়োটি হয়েছো। এখন আর এসব আদিখ্যেতা ভালো লাগে না।

—শাড়ি! রুপার মুখের অবস্থা সংগীন হয়ে এলো। তুমি বলো কি মা! তুমি চাও শাড়ি পরে আমি রোজ আছাড় খেতে খেতে বাড়ি থেকে স্কুলে যাই আর স্কুল থেকে বাড়ি আসি। কক্ষণো না। কিছুতেই না।

—আহা! কি কথা মেয়ের শোনো। আমরা দেশশুদ্ধ সবাই শাড়ি পরে রাতদিন শুধু আছাড়ই খাচ্ছি, না?

শেষ পর্যন্ত বাবার হস্তক্ষেপে ববড হেয়ার আর সালোয়ার পাঞ্জাবীতে রফা হলো।

এরমধ্যে একদিন স্কুল ফাইনাল পাশ করলো রুপা। কলেজে ভর্তি হলো।

মা বললেন—এবার শাড়ি পর রুপা, এই পোশাকে আর কলেজে যাসনে।

—না, শাড়ি পরে আমি চলতে পারিনে।

—প্রথম প্রথম সবারই অমন অসুবিধে হয়, পরে ঠিক হয়ে যায়। বাঙালীর মেয়ে শাড়ি না পরে তুই সারাজীবন পাঞ্জাবী পোশাক পরবি? লোকে কি বলবে?

—বলুক গে।

অনেক বুঝিয়ে, আদর করে, রাগ করে শেষে মা রুপাকে শাড়ি ধরাতে পারলেন।

—চুলগুলো আর অমন করে কেটে ফেলিসনে রুপা। কি সুন্দর তোর চুল। তোর কি একটু মায়া হয় না? হাতে দু'গাছা বালা পর। কেমন নেড়া নেড়া লাগে দেখতে।

কিন্তু রুপার কাছে চুল রাখা জঞ্জাল আর গহনা পরা ঝঞ্জাট। শেষ পর্যন্ত মাকে একদিন অনশন ধর্মঘট করতে হলো—তুই যদি আর চুলে কাঁচি ঠেকাস, এই বলছি, আমি না খেয়ে মরবো।

নিরুপায় হয়ে রুপা বললো—বেশ! চুল বড়ো হোক। কিন্তু আমি একদিনও চুল বাঁধতে পারবো না। খেলাধুলো নেই আমার! বিকেলে বসে বসে চুল বাঁধবো!

—না, তোকে বাঁধতে হবে না। আমিই বেঁধে দেবো। তুই শুধু দয়া করে আমার কাছে একটু বসিস।

রূপোর হাতে উঠলো দু'গাছা বালা। আর এক বছর না যেতেই চুলগুলো ফুলে-ফেঁপে কোমর ছাড়িয়ে পড়লো। সবই হলো, কিন্তু মেয়েদের মেয়েলিভাব রূপার মধ্যে একবিন্দুও খুঁজে পাওয়া গেল না। ছেলেদের সংগে দৌড়ঝাঁপ করা, টেনিসখেলা ইত্যাদিতে সে অভ্যস্ত। তার সমবয়সী মেয়েদের সংগ তার ভালো লাগে না। তার মনে হয় মেয়েগুলো যেন প্রাণহীন। হাত-পাগুলো নাড়বে কিনা তাও সাতবার চিন্তা করে নাড়ে। তাই দাদাদের বন্ধুরাই রূপার খেলার শ্রেষ্ঠ সংগী; শুধুই কি খেলা! তাদের কাঁধে হাত দিয়ে চলবে। পিঠ চাপড়ে কথা বলবে। কোনো সঙ্কোচ নেই, আড়ষ্টতা নেই। মা এক এক সময় বলেন. ছি ছি রূপা! এ'কি চাল-চলন তোর। অতোবড়ো ছেলেদের গায়ে হাত দিয়ে গলা ধরে কথা বলা।

রূপা হেসে কুটিকুটি—ও মা, তুমি চশমা পরো গো, চশমা পরো। অতোবড়ো ছেলে দেখলে কোথায়? ওরা তো সব আমার বয়সী, বড়োজোর এক দু'বছরের বড়ো।

হায়রে! মা কাকে বোঝাবেন যে ঐ বয়সটাই সবচেয়ে বেশি মারাত্মক। ভগবান কি মেয়েটার ভেতরে মেয়েলি-হৃদয়ের ছিটেফোঁটাও দেননি?

সেদিন রূপা কলেজ থেকে ফিরে দেখলো মা খুব ব্যস্ত। কি? না, তার বড়দা রবির এক বন্ধু বিলেত থেকে অনেকদিন পর দেশে ফিরেছেন এবং সেদিন দয়া করে রূপাদের বাড়ি বন্ধু দর্শনে হাজির হয়েছেন। তাই মা রকমারি জলখাবারের আয়োজন নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। রূপা বিরসমুখে ভাবলো—যাঃ, আজ আর চুল বাঁধা হলো না। ঐ খাবারগুলো খেতে এতো ভালো অথচ করতে যে ছাই কি হাংগামা! আর মা এতোও পারে! বাব্বা! দোকান থেকে দু'টো মিষ্টি এনে ফেলে দিলেই হয়।

মা ডাকলেন—ওরে রূপা। এদিকে আয় দিকিনি। আমার হাত জোড়া। খাবারটা ও-ঘরে দিয়ে আয়।

—আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে মা। তুমিই একটু দিয়ে এসো না।

—বলছি না আমার হাত জোড়া। সব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি, শুধু একটু ধরে দিয়ে আসবি বৈতো নয়। কি এমন রাজকার্য তোমার

ভেসে যাচ্ছে। কাজের মধ্যে কাজ তো খেলা। যা, রবি আছে ও-ঘরে। তুই শুধু দিয়ে চলে যাস্।

সাজানো খাবারের ট্রে তুলে নিয়ে রূপা চলে যাচ্ছে ব্যস্তভাবে, মা চোখ তুলে মেয়ের দিকে তাকিয়ে অবাক্। খোলা চুলগুলোকে পাড়ার মোক্ষদাপিসির মতো তালুতে তুলে জড়িয়ে নিয়েছে। শাড়িটাকে গাছ-কোমর করে এঁটে পরেছে। আবার বগলে চেপে ধরা রয়েছে টেনিস ব্যাট। এই অবস্থায় দুহাতে ধরা ট্রে।

মা চেঁচিয়ে উঠলেন—ও কি ছিরি, এই রণচণ্ডী মূর্তিতে চলেছিস কোথায়? কিন্তু রূপা ততোক্ষণে লম্বা লম্বা পা ফেলে বৈঠকখানায় হাজির, আর সেই মুহূর্তে রবি কি না কি কারণে দু' এক মিনিটের জন্য ঘরে অনুপস্থিত।

তাই বলে রূপা দমে যাবার পাত্রী নয়। বই কাগজপত্রের জন্য টেবিলে স্থানাভাব ছিল, সোজা গিয়ে সুজিতের সামনে ট্রে ধরে বললো—নিন, ধরুন, ধরুন, তাড়াতাড়ি ধরুন।

অপরিচিতা তরুণীর কাছ থেকে এহেন মিলিটারি ধরনের আপ্যায়নে হকচকিয়ে সুজিত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো।

—আহা! কি হাবাগঙ্গারামের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। ধরুন না এটা। আমার বুঝি আর কাজ নেই। এটা হাতে করে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে। বড়দাও যে ছাই কোথায় গেছে। নিন, ধরুন।

কি করবে ঠিক করতে না পেরে সুজিত দু'হাত বাড়িয়ে ট্রেটা ধরলো। আর সেটিকে তার হাতে তুলে দিয়েই ব্যাট ঘুরাতে ঘুরাতে রূপা হাওয়া।

মনে মনে স্বীকার করে নিলো সুজিত, মেয়েটির চোখেমুখে রয়েছে যেন স্ফটিকের মত স্বচ্ছতা, যার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায় ওর মনটিকে। সেখানে যেমন নেই লজ্জা তেমনি নেই আবিলতা। এক নজরেই সুজিত বুঝলো—মেয়েটির এই স্বচ্ছন্দ আচরণ নির্লজ্জ বেহায়াপনা নয়, লজ্জা-অনভিজ্ঞ ছেলেমানুষী।

তারপর থেকে সুজিত প্রায়ই এ বাড়ি আসতে লাগলো। রূপার সঙ্গে দু'এক পলক দেখাও হয়। কিন্তু রূপার সময় কোথায় যে বসে

দুটো কথা বলবে! হৃদয়বৃত্তির যে প্রেরণায় এমনি বয়সের একটি ছেলের দিকে এমনি বয়সের একটি মেয়ে অগ্রসর হয়—সেই হৃদয়বৃত্তির বালাইটাই যে রূপার নেই।

সেদিন এক বান্ধবীর জন্মদিন উপলক্ষে রূপার নিমন্ত্রণ ছিলো। বেরোবার মুখে সুজিতের সঙ্গে দেখা।

সুজিত হাসিমুখে বললো—কোথাও বেরোচ্ছেন না কি, আজ বুঝি আপনার খেলাধুলো বন্ধ।

বিস্ময়ে চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে ভুরু দু'টি কুঁচকে প্রায় জোড়া লাগিয়ে রূপা বললো,—আপনি না বড়দার বয়সী!

হঠাৎ কি অপরাধ হলো বা নিজের বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কি কাজ করে ফেললো তাই ভেবে সুজিত থতমত খেয়ে গেল। ঢোঁক গিলে বললো—কেন তাতে কি হয়েছে?

—তাহলে হিসেব করে দেখুন আপনি আমার চেয়ে ক'বছরের বড়ো। আপনি বড়দাকে বলেন 'তুমি' আর আমাকে 'আপনি'!

—ও, এই ব্যাপার!—হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সুজিত। সহজ হেসে বললো—সে আমার বন্ধু তায় আমার স্বজাতি মানে পুরুষ। আর আপনি একজন মহিলা।

—মেয়ে বলে বুঝি বয়সে হাঁটু সমান হলেও তাকে 'আপনি' বলতে হবে? যতো ন্যাকামি! বিলেতে বুঝি শুধু ন্যাকামি শেখায়?—বলে সুজিতের দিকে তির্যক্‌দৃষ্টিতে তাকিয়ে রূপা বেরিয়ে গেল।

সুজিত হাসিমুখে তার চলার পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। কাকে বোঝাবে সে, যে এ সব বিলেতেব ন্যাকামি নয়, এদেশেই এমন বয়সের একটি মেয়েকে একটি ছেলে 'তুমি' বলতে পারে না। বয়সে ছোটো হলেও না। 'তুমি' বলার ক্ষেত্র আলাদা! কিন্তু তা বোঝবার মন যে এ মেয়েটির নেই। তার মেয়েলি মনটা—যৌবনের মনটা এখনও ঘুমন্ত। আজও সে মনটা কেউ জাগাতে পারেনি। সেই ঘুমন্ত মনটি বড়ো সুন্দর, নিষ্পাপ।

সেদিনও এক সুন্দর বিকেল। রূপা যথারীতি খেলায় মত্ত এবং সুজিত যথারীতি এ বাড়ি এসে বন্ধুবরের অনুপস্থিতিতে একাই বাইরের ঘরে বসে বইপত্র মাড়াচাড়ায় মগ্ন।

খেলা শেষে রূপা ঘরে ঢুকলো। কপালে মুখে শ্রমজনিত স্বেদবিন্দু। মুখ ঈষৎ আরক্ত। নিঃশ্বাস ঘন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল। ঘরে ঢুকেই রূপা আলো আর পাখার সুইচ টিপে দিলো, টেবিলের ওপর দু'হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বললো—একা যে! আপনার বন্ধু কোথায়?

স্মিতহাস্যে সুজিত বললো—ভাগ্যহীনদের সান্নিধ্য সবাই এড়িয়ে চলে।—বলে উঠে পাখার রেগুলেটার বাড়িয়ে দিল।

খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো রূপা। শাড়ির আঁচলে মুখখানা মুছে বললো—বড্ড ঘেমেছি বুঝি!

সুজিত কোনো উত্তর দিলো না। স্মিতহাস্যে রূপার দিকে তাকিয়ে রইল।

রূপা বললো—চুপচাপ যে! কথা বলছেন না কেন?

—ভয় হয় বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কি কথা বলে ফেলি আর দাবড়ানি খেতে হয়।—সে দিনের পর থেকে সুজিত 'তুমি' 'আপনি' দুটোই পরিহার করে চলছিল।

হেসে ফেললো রূপা—ঠাট্টা হচ্ছে, না? কবে আমি আপনাকে দাবড়ানি দিয়েছি বলুন। সেই একদিন 'আপনি' বলেছিলেন বলে—তা 'তুমি' বললেই হয়।

—'তুমি' বলতে গেলে যতোটা ভাব থাকা দরকার, আমাদের মধ্যে কি সে ভাব আছে? আমি খেলতে জানি নে বলে তো আমার সঙ্গে একেবারে আড়ি।

শিশুর সরলতায় প্রবলবেগে মাথা দোলালো রূপা—না, না, কখনো আড়ি নয়। বেশ, ঠিক আছে, আজ একঘণ্টা পরে গা ধোবো আর ততোক্ষণ আপনার সঙ্গে গল্প করবো। কই, বলুন গল্প। বিলেতের গল্প কিন্তু। আমিও দেখবেন একদিন বিলেতে যাবো।

—কিন্তু গল্প শুনতে হলে তো দাঁড়িয়ে থাকা চলে না—পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলো সুজিত।

কিন্তু রূপা একেবারে সুজিতের চেয়ারের হাতলেই বসে পড়লো। চেয়ারের পিঠে একখানা হাত রেখে সুজিতের মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টি তুলে বললো—বলুন। ভ্রূক্ষেপ নেই যে সুজিত একটা আস্ত পুরুষ

মানুষ। রূপার না থাকুক, সুজিতের তো আছে। রূপার দেহ সুজিতের দেহে ঠেকছে। চেয়ারের পিঠে রাখা তার হাতখানা সুজিতের কাঁধ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। পদ্মের পাপড়ির মতো দু'টো চোখ মুখের কাছে ভেসে রয়েছে। বুকের ভেতরে মনটা কি আর স্থির থাকে! থর থর করে কেঁপে ওঠে সুজিতের ছাব্বিশের যৌবন। বুকের ভেতর ভালোবাসার স্বর্ণকমল পাপড়ি মেলতে থাকে। রূপার হাত দুটি দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে সুজিত বিহ্বল ভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে রূপার মনটার ঘুম ভেঙে গেলো। হঠাৎ জেগে ওঠার চমকে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। কি এক অনুভূতিতে দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। সারা দেহমনে শিরশির করে একটা বিদ্যুৎ চমক খেলে গেলো। চির অভ্যস্ত গাছকোমর বাঁধা শাড়িতে আজ যেন দেহটাকে বড়ো অনাবৃত মনে হলো তার। আঁচলে দেহ ঢাকতে গিয়ে আঁচল খুঁজে পেলো না সে। জীবনে এই প্রথম লজ্জার অনুভূতিতে রক্তিম হয়ে উঠলো রূপা। লজ্জায় আরক্ত মুখ নত করে চেয়ারের হাতল থেকে উঠে দাঁড়ালো।

সুজিত উঠে রূপার একান্ত নিকটে দাঁড়ায়। চিবুকে হাত দিয়ে মুখখানা তুলে ধরে বললো—ভগবান তোমাকে এতো রূপ দিয়েছেন, কিন্তু এতোদিন যেন তা অসম্পূর্ণ ছিল। আজ এই লজ্জার ভূষণে সে রূপ কত মধুর হয়েছে দেখো তো!

ততোধিক লজ্জায় সুজিতের কাঁধে মুখ লুকিয়ে অস্ফুটকণ্ঠে রূপা বললো—তুমিই দেখো গে। দস্যু! বিলেতে বুঝি এ-সবই শেখায়!

হিসেবের ভুল

দিন পনেরোর জন্য বেড়াতে বেরিয়েছিলো অমিতা। সহকর্মিণী ঊষা ও সুবর্ণ বেনারস যাবে শুনে অমিতাও তাদের সঙ্গ নিয়েছিলো। বলেছিলো—আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো ঊষাদি। তার ছোট্ট খুপরি ঘরটার মধ্যে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর একা একা নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে অমিতার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। ঘরের শূন্যতা যেন তার গলা টিপে ধরতে চায়। চেপে বসে বুকের ওপর। বুকেব ভেতরটা ছটফটিয়ে ওঠে। তাই বাইরে বেরোবার সম্ভাবনা হতেই তার মনটা কাঙালের মতো বলতে লাগলো—আমি যাবো, আমি যাবো—।

দিনগুলি যে কি চমৎকার কাটছিলো! মনের মধ্যে যেন ঘন চন্দনের মতো শান্তি। একটা মুক্তি-মুক্তি-হাওয়া নরম তুলোর মতো অমিতার দেহকে আচ্ছন্ন করে রাখছে। ওরা তিনজনে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো বারানসী ধাম, গঙ্গায় নিত্য স্নান, অমিতার স্বাদহীন নিস্তরঙ্গ জীবনে একটা স্বাদু ঢেউ উঠলো।

ফিরে আসার আগের দিন সকাল বেলায় ওরা গঙ্গায় স্নান করে আস্তানায় ফিরছিলো, রাস্তার পাশে সারি সারি স্টল, তার মাঝে একটি ছোটো বইয়ের স্টলে নানা ধর্মপুস্তক সাজিয়ে বসেছিলো এক ব্যক্তি। বাংলা বইও রয়েছে। ওরা কিছু বই কিনবে বলে সেই স্টলের কাছে দাঁড়ালো। লোকটি মধ্যবয়স্ক, মাথার চুলে অল্প পাক ধরেছে। পরণে ধুতি আর পাঞ্জাবি, ঊষা যখন 'কেৎনা দাম' বলে দর করতে শুরু করেছে—তখন লোকটি বললো—আমি বাঙালি, বাংলাতেই বলতে পারেন। ওদের কথাবার্তা শুনে সে বুঝতে পেরেছিলো ওরা বাঙালি।

ঊষা আর সুবর্ণ যখন দরাদরি করে বই কিনছিলো অমিতা একপাশে দাঁড়িয়ে একাগ্র দৃষ্টিতে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়েছিলো। তার বুকের ভেতরে চমক। হৃদপিণ্ডটা দুপদাপ করে লাফাচ্ছে।

ওদের কেনা হয়ে গেলে সুবর্ণ বললো—অমিতা, তুমি কিছু নেবে না?

সম্বিত ফিরে পেয়ে অমিতা বললো—না। দোকান ছেড়ে বেশ খানিকটা রাস্তা এগিয়ে যাবার পর অমিতা হঠাৎ বলে উঠলো—এই যা! একটু দাঁড়াও তো ভাই উষাদি, আমি আসছি।

বলে হনহন করে চলে গেলো সেই বইয়ের দোকানের সামনে, সঙ্গিনীদের সামনে যে কথা বলতে পারেনি তাই জিজ্ঞাসা করলো দোকানের মালিককে—আপনি কি কখনও কলকাতায় ছিলেন?

দোকানী স্থিরচোখে অমিতার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো—না।

আচ্ছা, যদি কিছু মনে না করেন—আপনার নামটা কি?

গম্ভীর গলায় সে বললো—আপনাকে আমার নাম বলার কোনো প্রয়োজন আছে বলে তো আমি মনে করি না।

অমিতা মরিয়া, বললো আপনি—আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?

ততোধিক গম্ভীর গলার লোকটি জবাব দিলো—না, আপনাকে আমি চিনি না।

তার কথা বলার ভঙ্গি লক্ষ্য করে অমিতার ধারণা আরও দৃঢ় হচ্ছিলো, তাই সে মৃদু গলায় বললো—সেই হারটা আমার আজও গলায় পরা হয়নি, যে আমাকে হারটা দিয়েছিলো সে পরিয়ে দিলে তবে পরতে পারি।

লোকটি ভ্রূকুঞ্চিত করে বললো—আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না। আপনি কিছু ভুল করেছেন। আচ্ছা, নমস্কার। এবার আসুন।

অমিতা ফিরে এলে ওরা জিজ্ঞাসা করলো—কি হয়েছিলো অমিতা?

অমিতা মৃদু গলায় জবাব দিলো—রুমালটা দোকানে ফেলে এসেছিলাম, সেটা নিয়ে এলাম।

সারা রাস্তা উষা ও সুবর্ণ গল্প করতে করতে যাচ্ছিলো। অমিতা নীরব তার মন ক্রমাগত বলছিলো—আমি ভুল করিনি—।

আবার সেই নিঃসঙ্গ নিরানন্দ খুপরি ঘর। দমচাপা একঘেয়ে জীবনযাত্রা। আবার সেই দৈনন্দিন কাজ। রান্না খাওয়া স্কুল করা। তার মধ্যে সারাক্ষণ মনের মধ্যে বেজে চলে—আমি ভুল করিনি, আমি ভুল করিনি—। সেই জোড়া ভুরু, উপরের পাটির দু'টো দাঁত অসমান,

বাঁ কানের কাছে বড়ো একটা কালো আঁচিল। এতোগুলো লক্ষণ ভুল হয়! অমিতা ঠিক চিনতে পেরেছে তাকে। সেও যে অমিতাকে চিনতে পারেনি একথা অমিতা বিশ্বাস করে না। কিন্তু ধরা দিলো না। একদিন শেকল কেটে পালিয়েছিলো। আজও ধরা দিতে নারাজ।

স্মৃতির স্রোত বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো ভাসিয়ে নিতে চাইলো অমিতাকে। নিয়ে গেলো কুড়ি বছর আগেকার দিনগুলোতে। সেদিন কি ভয়ানক ভুল করেছিলো অমিতা! বয়সটা ছিলো কম। ছেলেমানুষী বুদ্ধিতে যে ভুল সে করেছিলো সেই ভুলের মাশুল গুনেছে সে সারাজীবনের বঞ্চনার মূল্যে।

মাত্র উনিশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল তার সুধাকান্তর সঙ্গে। বিধবা মা'র একমাত্র মেয়ে অমিতা। বাবার অকালমৃত্যুর পর মেয়ে আর মা কাকার আশ্রয় নিয়েছিলো। বাবা যৎসামান্য সঞ্চয় যা রেখে গিয়েছিলেন তা দিয়ে মগডালের কোনো পাত্র জোগাড় করা সম্ভব ছিলো না, আর কাকারও নিজের সংসার সামলে দু'টো বাড়তি পোষ্যকে খাওয়া-পরার বেশি কিছু দেবার ক্ষমতা ছিলো না।

সুধাকান্তর সংসারে সে একা। তার আপনজন বলতে কেউ ছিলো না। বিয়ের পর বছর খানেক বড়ো সুখে আর আনন্দে কেটেছিলো, তারপরই ঘনিয়ে এলো অশান্তির মেঘ। আর সেই মেঘ ডেকে এনেছিলো অমিতা নিজে।

নিজের কপাল নিজে ভেঙেছিলো সে। নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছিলো।

বয়সটা কম ছিলো তাই বুকে অনেক আশা, চোখে অনেক রঙ, চারপাশের দুনিয়ার উপচে পড়া ভোগ-বিলাসিতা দেখে তাক লেগে গিয়েছিলো তার। বুকের মধ্যে থরথর আকাঙ্ক্ষা-আবেগ। কাজেই তার নিত্যনতুন বায়না নিত্যনতুন চাহিদা মেটাতে প্রাণান্ত হতে হচ্ছিলো সুধাকান্তকে।

অসচ্ছল ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলো অমিতা। তার উপর পরাশ্রিত ছিলো। জোর করার, বায়না করার স্থান তার ছিলো না। ছিলো না অধিকার খাটাবার জায়গা, তাই হাতের কাছে—যার উপর অধিকার খাটানো যায় এমন একটা নিজস্ব মানুষ পেয়ে অমিতা বুঝি ভারসাম্য

হারিয়ে ফেলেছিলো।

প্রথম প্রথম মুখ বুজেই মেনে নিতো সুধাকান্ত। বুঝি অমিতার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে, তার ডাগর চোখ দু'টোর দিকে তাকিয়ে নিজের অসুবিধে নিজের অক্ষমতার কথা সব ভুলে যেতো। কিন্তু সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা টানতে মানুষ ক'দিন পারে? সুধাকান্ত ভেতরে ভেতরে ভেঙেচুরে যাচ্ছিলো। যেমন ক্ষমতার দিক থেকে তেমনি মনের দিক থেকে।

সেবার পুজোর মুখে দোকানে শাড়ি কিনতে গিয়ে একটা খুব দামী শাড়ি ধরে বসে রইলো অমিতা, সুধাকান্ত খাবি খেয়ে বললো—বলো কি! এ শাড়ির দাম যে আমার এক মাসের মাইনের থেকেও বেশি। অমিতা আবদারের গলায় বলেছিলো—একবারই তো কিনবো। দাও না এটা কিনে, আমার এ শাড়িটাই পছন্দ। আমি এটাই নেবো।

দোকানদারও সুবিধে পেয়ে বললো—হ্যাঁ হ্যাঁ, এ শাড়ির জুড়ি নেই। আমাদের দোকান ছাড়া আর কোনো দোকানে এতো কম দামে পাবেন না।

ব্যাস্! অমিতা আরও কাত।

বেকায়দায় পড়ে সুধাকান্ত একটু সময় চুপ করে বসেছিলো, শান্ত এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ সে। বলেছিলো—একটু বসো, আমি আসছি। খানিক পরেই সুধাকান্ত ফিরে এসেছিলো। শাড়ির দাম মিটিয়ে দিয়েছিলো। খুশির উচ্ছ্বাসে ডগমগ অমিতা খেয়ালই করেনি সুধাকান্তর হাতে তার হাতঘড়িটা নেই, সুধাকান্ত যে দোকান থেকে বেরিয়ে হাতঘড়ি বেচে টাকা এনে শাড়ির দাম মিটিয়েছিলো সে খবর অমিতা বহুদিন পর্যন্ত জানতেই পারেনি। হয়তো বা জানতে চায়ও নি।

আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নেই। এমনি ধরনের চাহিদা অমিতার মাঝে মাঝেই চাড়া দিয়ে উঠতো, সুধাকান্ত কিভাবে সে চাহিদা মেটাতো অমিতা তার খোঁজ রাখা প্রয়োজনই মনে করেনি। ওসব খেয়ালই ছিলো না তার মাথায়। তাছাড়া, তার বান্ধবীরা তাকে শিখিয়েছিলো সব স্বামীরাই যে কোনো ব্যাপারে প্রথমে অক্ষমতার ভান করে। একটু চাপ না দিলে তাদের কাছ থেকে কিছু আদায় করা যায় না। এই কথাটাই অমিতার মাথায় বাসা বেঁধে ছিলো। স্বামীর সাধ্যে কতোটা কুলোয় তা দেখার মতো চোখ তখন তার ছিলো না।

বয়সটা ছিলো ছেলেমানুষ, বয়সের তুলনায় বুদ্ধিটা ছিলো আরও কম। কিন্তু সেই মানুষটার কি উচিত ছিলো না তাকে বুঝিয়ে দেওয়া, তাকে শাসন করা, তাকে সংশোধন করা! কঠিন অঙ্গুলি নির্দেশে ঠিক পথ দেখিয়ে দেওয়া! তা না করে একি করলো সে! কি কঠিন শাস্তি দিয়ে গেলো অমিতাকে। অপরিণত বুদ্ধির একটা মেয়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে অমিতার সারাটা জীবন ব্যর্থ করে দিয়ে চলে গেলো।

বিয়েতে বাপের বাড়ি থেকে দেওয়া অমিতার গলার চেনটা ছিঁড়ে যেতে সে কিছুদিন ধরেই বলছিলো ওটা বদলে একটা নতুন হার আনতে। হয়তো টাকা-পয়সার অসুবিধের দিক চিন্তা করেই সুধাকান্ত তেমন গা করছিলো না। তাই নিয়ে সেদিন তুলকালাম করলো অমিতা। অগত্যা অমিতাকে নিয়ে গয়নার দোকানে গিয়েছিলো সুধাকান্ত। যাবার সময়ে তাকে বলে রেখেছিলো—খুব অল্পের মধ্যে সেরে নিও। আমার বেশি টাকা-পয়সার ব্যবস্থা নেই।

কিন্তু স্বভাব যাবে কোথায়! অমিতা বেছে বেছে বেশ মোটা-সোটা একখানা হার পছন্দ করে বসলো। তার বক্তব্য পুরনো 'চেন'টা তো সে দিয়েই দিচ্ছে। তার উপরে কতোই বা আর বেশি লাগবে। এই হারটাই সে নেবে।

সেদিন সুধাকান্ত কঠিন হয়েছিলো, বলেছিলো—অসম্ভব! আমি পারবো না। অমিতার মুখ থমথমে হয়ে উঠেছিলো, সুধাকান্ত বলেছিলো—আচ্ছা, আজ থাক, পরে দেখা যাবে'খন—বলে তক্ষুণি দোকান থেকে বেরিয়ে পড়েছিলো। অগত্যা অমিতাকে চলে আসতে হয়েছিলো!

চলে এলো বটে কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিলো অমিতা। সেদিন রাত্তিরে কিছু খেলো না। সুধাকান্ত অনেক সাধ্য-সাধনা করেও খাওয়াতে পারেনি। অবুঝ বায়নায় অনেক রাত অবধি কেঁদেছিলো। এখন মনে হলে লজ্জায় মরে যায় অমিতা।

পরদিন অফিস থেকে ফিরে সুধাকান্ত বলেছিলো—তৈরি হয়ে নাও, বেরোবো। অমিতার মুখের এবং মনের মেঘ তখনও কাটেনি। গম্ভীর গলায় বলেছিলো—কোথায়?

চলোই না, দেখতে পাবে—গলার স্বর কেমন অস্বাভাবিক সুধাকান্তর।

সুধাকান্ত যখন সেই গয়নার দোকানে গিয়ে সেই হারটাই কিনলো অমিতা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলো না। মনে মনে হেসে বলেছিলো —উঁ, দেবে না! মুকুলদি, কিরণদি ওরা মিথ্যে বলে না। বলেছে— একটু রাগ করে থাকলেই সব কিছু আদায় করতে পারবে। সুড়সুড় করে দিতে পথ পাবে না। ওরা এসব জানে তো!

অমিতা সেই রাত্তিরেই সন্ধি করতে চেয়েছিলো স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু সে তরফ থেকে বিশেষ সাড়া না পেয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলো, পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সুধাকান্তকে সে দেখতে পেলো না। ভাবলো কাছাকাছি কোথাও হয়তো গেছে। ক্রমে বেলা চড়তে লাগলো, অমিতার দুশ্চিন্তাও বাড়তে লাগলো। তখন লক্ষ্য করলো টেবিলের উপর কাগজ চাপার নীচে একটা খাম, ব্যগ্রহাতে খুলে দেখলো ভেতরে কিছু টাকা আর চিঠি। সুধাকান্ত লিখেছে—অমিতা, তোমাকে আমার মতো গরীবের কাছে বিয়ে দেওয়া তোমার মা'র উচিত হয়নি, এই ক'দিনেই তোমার চাহিদা মেটাতে আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। সারা জীবন তোমাকে নিয়ে সংসার করবো কি করে? ভাবতেও আমার আতংক হয়। অতি কষ্টে দু'শো টাকা জোগাড় করে রেখে গেলাম, তাই নিয়ে তোমার মা'র কাছে চলে যেয়ো। আমার আর ফিরে আসার ইচ্ছে নেই।—সুধাকান্ত।

চিঠি পড়ে অমিতার দু'চোখ অন্ধকার করে এসেছিলো। পায়ের নীচে মাটি দুলে উঠেছিলো। সেই থেকে আজ পর্যন্ত গোটা পৃথিবীর কাছে অপরাধী হয়ে আছে সে, মাথা নীচু করে আছে।

আসল কথাটা কাউকে বলতে পারেনি। শুধু মা'র কাছে চুপিচুপি বলেছিলো সবকিছু। মা কপালে করাঘাত করে কেঁদে বলেছিলেন— এ কি করলি হতভাগী! তুই এ কি করলি!

লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানতো না অমিতা। কোনোরকমে সেলাইয়ে একটা ডিপ্লোমা নিয়ে এই সেলাইয়ের ইস্কুলে চাকরি নিয়েছে। ভোগ-বিলাসিতা একদম বর্জন করেছে। ভালো খায় না, মোটা শাড়ি ছাড়া পরে না। বান্ধবীরা ঠাট্টা করে কেউ বলে কিপটে, কেউ বলে সন্ন্যাসিনী।

সেই হারটা অমিতা একদিনও গলায় পরেনি। কঠিন শাস্তি হিসেবে

বাক্সে তুলে রেখেছে। আশা ছিলো যদি কোনোদিন সেই নিষ্ঠুর ফিরে আসে, তাকে বলবে গলায় পরিয়ে দিতে। কিন্তু এখন—সেই মানুষটা—সেই জোড়া ভুরু, উপরের পাটির অসমান দু'টো দাঁত আর বাঁ কানের পাশে কালো আঁচিলওয়ালা মানুষটার সংগে দেখা হওয়ার পর অমিতা বুঝতে পেরেছে সুধাকান্ত আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না। আর কোনোদিনই ধরা দেবে না অমিতার কাছে।

অমিতা যে জীবনের হিসেবে বড় বেশি গরমিল করে ফেলেছে!

'শারদীয়া আভা'

রঙিন চশমা

সকালবেলায়ই পাশের বাড়িতে সোরগোল শোনা যাচ্ছিলো। প্রভাতিক কর্মব্যস্ততায় শ্রীপর্ণা অতোটা ঠাওর করতে পারেনি। খেয়াল হতেই উৎকর্ণ হলো।

পাশের বাড়িতে থাকেন বিজয়বাবু। স্ত্রী, একটি মেয়ে ও দু'টি ছেলে নিয়ে তেতলা বাড়ির দোতলাটা নিয়ে বজয়বাবুরা আছেন। তাঁর স্ত্রী অরুণার সঙ্গে শ্রীপর্ণার আলাপ-পরিচয় তো আছেই, মোটামুটি হৃদ্যতাও আছে। শ্রীপর্ণা মাসে অন্ততঃ দু'চার দিন বিজয়বাবুর বাড়ি বেড়াতে যায়। অরুণার সঙ্গে গল্প করে, চা খায়। দেখতে চায় অরুণার সেলাই। নতুন করা কোনো টেবিলক্লথের এমব্রয়ডারি, ক্রুশের লেস বা উলের ডিজাইন খুঁটিয়ে দেখে। কোনো শীতের দুপুরে হয়তো বা উল কাঁটা নিয়ে চলে যায় ওদের বাড়ি। অরুণার কাছ থেকে ডিজাইন তুলে নেয়।

অরুণাও মাঝে মাঝে শ্রীপর্ণাদের বাড়ি আসে। শ্রীপর্ণার নতুন কেনা শাড়ি দেখে, ডিজাইন-পাল্টানো খাট, ড্রেসিং টেবিল দেখে, দাম জিজ্ঞাসা করে, চা খায়, গল্প করে।

কিন্তু শত হোক, প্রতিবেশী ব'লে কথা। আড়ালে কটাক্ষ করতে কেউ কাউকে ছাড়ে না। শ্রীপর্ণা তো যথেষ্টই করে। অরুণার প্রতিটি কাজেই সে শ্রীপর্ণাকে টেক্কা দেওয়ার মনোভাব আবিষ্কার করে। কাজেই পাশের বাড়ির সোরগোল সম্বন্ধে শ্রীপর্ণা কৌতূহলী হলো। বিজয়বাবুর উচ্চকণ্ঠ শোনা যাচ্ছিলো—আর একটু ওঠাও, হ্যাঁ—আর একটু—এবার নানাও—নামাও। এবার উপরের দিকে সোজা ঠেলে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার একটু ঘুরিয়ে—আর না—আর না—ওখানে ঠিক যাবে। খারাপ হয়ে যাবে তাহলে—নষ্ট হয়ে যাবে।

কি ব্যাপার কি! ভ্রূকুঞ্চিত করলো শ্রীপর্ণা। নিশ্চয়ই নতুন স্টিলের আলমারি এসেছে। কারণ শ্রীপর্ণাদের স্টিলের আলমারিটা

কেনার পর থেকেই অরুণাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চৌদ্দ রকম প্রশ্ন করে চলেছে, কত দাম—কোন্ কোম্পানি—দোকানটা কোথায় ? অরুণাদির ঐ এক স্বভাব। শ্রীপর্ণা কিছু কিনলেই তার দাম ধাম ইতিবৃত্তান্ত সব তার জেনে নেওয়া চাই।

ড্রয়িং রুমে বসে অধীর কাগজ পড়ছিলো। শ্রীপর্ণা টেবিলের ওপর ধূমায়িত চায়ের কাপ রেখে বললো—শুনতে পাচ্ছো, পাশের বাড়িতে কিসের সোরগোল।

কাগজ থেকে চোখ তুলে শ্রীপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে অধীর বললো—কেন, কি হয়েছে ?

বোধ হয় স্টিলের আলমারি বা ঐ জাতীয় কোনো ভারি ফার্নিচার কিছু কিনেছে। তাই ওপরে ওঠানো নিয়ে ঝক্কি চলছে। ওদের দোতলায় ওঠার সিঁড়িগুলো তেমন চওড়া নয় কিনা। আর যা ভাঙ্গা ঝরঝরে বাড়ি !

অধীর আবার কাগজে চোখ রেখে নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো—হতে পারে।

হতে পারে কি গো, নিশ্চয় তাই। নইলে সে সাতসকাল থেকে 'ওঠাও' 'ঠেলে দাও' ওইসব চেঁচামেচি চলছে ? কিন্তু এই দু' ঘণ্টা দক্ষযজ্ঞ করেও এখনও কায়দা করতে পারেনি। ওঠাতে পারেনি মনে হচ্ছে। যেমন চাল দেখাতে যাওয়া ! আনুক আরও বিরাট আলমারি ! ও আর ওপরে ওঠাতে হবে না।

অধীর শ্রীপর্ণার মুখের দিকে অবাক্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো—আরে ! তাতে তোমার কি হলো ? তুমি চটছো কেন ?

ব্যাজার গলায় শ্রীপর্ণা বললো—না, চটাচটি কিসের ? একটু চুপ করে থেকে আবার বললো—ঐ পাশের বাড়ির অরুণাদির কথা বলছি। আমাদের সঙ্গে রেষারেষি করাই যেন ওর কাজ।

কিসে বুঝলে ?

কি নয় ? সব সময় নজর দিয়ে বেঁধে রাখছে আমাদের। কি করি না করি সব হিসেব রাখছে। আমরা যা করি তাই ওর করা চাই। আমরা একটা জিনিস কিনলুম কি তক্ষুণি ওরও সেটা কেনা চাই।

তা কিনুক না। ওদের পয়সায় ওরা কিনবে তাতে আমাদের

আপত্তির কি থাকতে পারে ?

থাক্, আর পয়সা দেখিও না !—শ্রীপর্ণা এবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো—ভদ্রলোক করে তো সরকারী অফিসে কেরানিগিরি। তোমার মাইনের অর্ধেকও পায় কি না সন্দেহ। তার ওপর তিনটে বাচ্চাকাচ্চা। পয়সার যেন বান ডেকে যাচ্ছে !

তা যাই হোক, ওদের রোজগারের পয়সায়ই তো ওরা কেনে। আর তুমি বুঝলে কি করে যে আমাদের সঙ্গে রেষারেষি করেই তা কেনে ? সত্যি সত্যি সখ করেও তো কিনতে পারে।

বুঝতে অসুবিধেটা কোথায় ? কিছুদিন আগে সেই শাড়িটা কিনলুম, অমনি অরুণাদির শুরু হলো—কত দাম নিলে শাড়িটার, কোন্ দোকান থেকে কিনলে ? দোকানটার ঠিকানা কি ? ব্যস্—ক'দিন না যেতেই দেখি তেমনি একখানা শাড়ি কেনা হয়ে গেছে। শাড়িটা আমাকে দেখাতে গিয়ে জানিয়ে দিলে ওটার দাম আমার শাড়ির চেয়ে বেশি। বলো, এ সব টেক্কা দেওয়া নয় ?

তোমার শাড়ি দেখে পছন্দ হয়ে থাকলে সখ করে তেমনি একটা শাড়ি কিনতেও পারে। আর মেয়েরা কিছু কিনলে বন্ধুদের দেখাতে খুব ভালবাসে। তাই হয় তো—

তুমি থামো !—শ্রীপর্ণা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো—শুধু কি এই ! টুটুলকে এবার ইস্কুলে ভর্তি করিয়েছি, সেই থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন—কোন্ ইস্কুলে ভর্তি করিয়েছো তোমার ছেলেকে। মাইনে কতো। কোন্ জায়গায় ইস্কুলটা। আমার ছোটো ছেলেটাকে তো ভর্তি করাতে হবে আগামীবার। শোনো কথা ! ঐ ইস্কুলে কি যার-তার ছেলে পড়তে পারে ? তুমি হলে গিয়ে একটা নামকরা কোম্পানির বড়ো অফিসার। আমাদের একটা মাত্র ছেলে আর একটা মেয়ে। আমাদের সঙ্গে সমান তালে ওরা চলতে পারবে ?

তা ওরা যদি পারে পড়াক না। আমাদের অসুবিধে কোথায় ?

আমাদের অসুবিধে হতে যাবে কেন ? কিন্তু বুঝতেও অসুবিধে হয় না এ হলো আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। আচ্ছা বলো, ওদের কি টেক্কা দিয়ে চলার মতো অবস্থা ! বাঙালী জাতটা ঐ করেই গেল, বুঝলে ? ক্ষমতায় কুলোক না কুলোক পাল্লা দিয়ে চলা চাই। শ্রীপর্ণার

উত্তেজিত মুখখানার দিকে তাকিয়ে অধীর আর কিছু বলতে সাহস করলো না।

এমন সময় ও বাড়ির জানালায় অরুণাকে দেখা গেল। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে শ্রীপর্ণাও তার জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো। বললো—আজ তোমাদের বাড়িতে কি এলো গো অরুণাদি ?

তুমি কিসের কথা বলছো শ্রীপর্ণা ?

শ্রীপর্ণা মনে মনে বলে—আহা, ন্যাকা ! বুঝতে ঠিকই পারছো। দর বাড়াচ্ছো। প্রকাশ্যে বললো—মানে স্টিলের আলমারি বা অন্য কোন ভারী ফার্নিচার।

অরুণা বিস্মিত গলায় বললো—কই, না তো, এতো পয়সা কোথায় ভাই যে, ওসব কিনবো।

তাহলে সকাল থেকে এত হৈ-চৈ কিসের ? বিজয়বাবু ক্রমাগত 'ওঠাও' 'নামাও' করছিলেন !

অরুণা হেসে ফেললো। বললো উনি ঐ রকমই ভাই। কোনো কাজ ধীরে সুস্থে করতে পারেন না। সব কিছুতে সোরগোল। পাপুটার এই সবে হাতেখড়ি হয়েছে। তাই উনি সকাল বেলাটা ওকে অক্ষর লিখতে শেখাচ্ছিলেন। শ্লেট পেন্সিলে দাগা বুলোচ্ছিলো কি না।

শ্রীপর্ণা একেবারে চুপসে গিয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়লো।

ড্রয়িংরুমে বসে অধীর দুই বান্ধবীর সংলাপ শুনতে পাচ্ছিলো। শ্রীপর্ণা ঘরে ঢুকতেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সে।

শ্রীপর্ণা অধীরের দিকে চোখ তুলে যেন তাকাতে পারছে না। পাশ কাটিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল। অধীরের হাসিটা বড় কানে বিঁধছে।

মরণোত্তর

চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর জয়গোপালবাবুর হঠাৎ সাহিত্য করার নেশা মাথায় চাপলো। রাতদিন কাগজ-কলম নিয়ে লিখে চলেছেন। পত্রিকা অফিসে অফিসে লেখা পাঠাচ্ছেন। অবশ্য তার প্রায় সব কটাই ফেরৎ আসছে নয়তো বেপাত্তা হচ্ছে। দু' একটা লেখা চুনোপুঁটি মার্কা কোনো-কোনো কাগজে ছাপাও যে না হচ্ছে এমন নয়। তাতে জয়গোপালবাবু নিরাশ হচ্ছেন না। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন চুনোপুঁটি থেকেই আস্তে আস্তে রাঘব বোয়াল হতে হয়। তাই তিনি পুরোদমে নিষ্ঠা সহকারে লিখে চলেছেন এবং লেখা নিয়ে পত্রিকা অফিসে অফিসে ধরনা দিচ্ছেন। আগে তাঁর একজোড়া জুতোয় বছর কেটে যেতো। এখন দু'জোড়া জুতোয় কুলোয় না। তাতেও দুঃখ ছিলো না যদি লেখা ছাপা হতো। কিন্তু কোনো নামকরা কাগজের চক্রব্যূহে নাক গলাতে পারলেন না তিনি। দৌড়-ঝাঁপ করাই সার হলো। কাগজওয়ালারা 'রেখে যান, দেখছি' বলে লেখা রাখেন। তারপর শনিবার মঙ্গলবার এমাস ওমাস করে ছ'মাস ন'মাস ঘুরিয়ে লেখাটি ফেরত দেন। অম্লান বদনে বলে দেন—'চলবে না।' কখনও বা লেখা কাগজের বস্তার তলায় চাপা পড়ে যায়। একদম বেপাত্তা।

ঘেন্না ধরে গেলো জয়গোপালবাবুর, 'ধুত্তোর' বলে পত্রিকা অফিসে লেখা পাঠানো বন্ধ করলেন। কিন্তু লেখা বন্ধ করলেন না। মাথায় নেশা চেপে গেছে। রোগও বলা যায়। না লিখে থাকতেই পারেন না। অতএব বাড়িতে জমা হতে লাগলো পাণ্ডুলিপির স্তূপ। দড়ি দিয়ে প্যাকেটের মতো বেঁধে বেঁধে আলমারি, তাক সব বোঝাই ক'রে রাখতে লাগলেন। মাঝে মাঝে খুলে নিজেই পড়েন। আবার বেঁধে তুলে রাখেন।

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে বলেন, কি যে রাতদিন ছাইপাঁশ লেখো বুঝি না বাপু। পত্রিকাওয়ালারা তো ছাপেও না। কি হবে ওসবে। এর চেয়ে

দুটো ছেলে পড়ালে কাজ হ'তো। দু'পয়সা ঘরে আসতো।

জয়গোপালবাবু তিক্তকণ্ঠে বলেন—ঐ দিয়ে আমাকে দাহ ক'রো মরলে পরে। বুঝলে? দাহ ক'রো।

গৃহিণীর ঝঙ্কার তীব্রতর হয়—আ! তাতেই যেন কাঠের খরচা বাঁচবে! শুধু কাগজ-কালির মোচ্ছব। গীতা-ভাগবত পড়লেও তো পরকালের কাজ হ'তো।

জয়গোপালবাবুর কণ্ঠেও তিক্ততার মাত্রা চড়ে—পরকালের কাজ ক'রে তুমি অক্ষয় স্বর্গ লাভ করো। আমার না হয় নরকবাসই হবে।

এমনিভাবে এক নাগাড়ে সাহিত্যসাধনা ক'রে জয়গোপালবাবু একদিন চোখ বুজলেন।

যে লেখার জন্য গৃহিণী এতোদিন জয়গোপালবাবুকে এত হেনস্থা করেছেন তাঁর মৃত্যুর পর সেই লেখাগুলির জন্যই গৃহিণীর খুব মায়া হ'তো। মানুষটা নেই কিন্তু তার জলজ্যান্ত লেখাগুলো চোখের সামনে আছে। যে মানুষটাকে নিয়ে চল্লিশ বছর ঘর করেছেন তার জীবন্ত চিহ্ন। গৃহিণী তাই লেখাগুলো নষ্ট হতে দিতেন না। মাঝে মাঝে পাণ্ডুলিপির ধুলো ঝেড়ে মুছে তুলে রাখতেন আর বলতেন—কি বাতিকেই না পেয়েছিল মানুষটাকে। কাগজের ডাঁই ক'রে জমানো। ধুলো ঝেড়ে মরি!

অবশ্য যত দিন যায় এটুকু যত্নেও ঢিলে পড়ে।

জয়গোপালবাবুর মৃত্যুর কয়েক বছর পর তাঁর ছোটো ছেলে বিকাশের বিয়ে হয়! বিকাশের শ্বশুর প্রমথবাবু এক নামী পত্রিকার রথী-মহারথীদের একজন। একদিন মেয়ের বাড়ি বেড়াতে এসেছেন, বসে গল্প করছেন এমন সময় কন্যা আরতি তাকের উপর থেকে কি পাড়তে গিয়ে একটা কাগজের বাণ্ডিল ছিটকে পড়লো।

প্রমথবাবু বললেন—এটা কি?

আরতি বললো—জানো বাবা, আমার শ্বশুর নাকি লিখতেন। ও হলো সেই কাগজ।

কৌতূহলী হয়ে প্রমথবাবু সন্তর্পণে ধুলো বাঁচিয়ে দু'এক জায়গায় চোখ ফেললেন।

কৌতূহল বাড়লো। বললেন—ধুলো ঝেড়ে দে তো মা, দেখি।

সবটা পড়ে চমকিত হলেন প্রমথবাবু। এ তো ভোঁতা কলমে হিজিবিজি নয়। এতে যে, প্রতিভার শান রয়েছে।

কাগজের তাড়া পকেটে পুরে বললেন—এটা আমি নিয়ে চললুম।

গৃহিণী হাসলেন—মৃত্যুর দশ বছর পরে বেয়াই দেখছি মানুষটাকে একটু মান দিলেন। আহা! ঐ নিয়ে কি প্রাণপাত না করেছের লোকটা!

বেয়ান, না জানি আমি একটা আবিষ্কারই ক'রে ফেললাম।

মাসখানেক বাদে প্রমথবাবু এলেন একেবারে পত্রিকাটি হাতে নিয়ে। বাংলাদেশের সবচেয়ে নামকরা কাগজ। যে কাগজের সম্পাদক একটু সদয় দৃষ্টিতে তাকালেই একদিন জয়গোপালবাবু ধন্য হয়ে যেতেন, সেই কাগজে কি না তাঁর লেখা ছাপা হয়েছে। তাও সদক্ষিণায়। পত্রিকাটি হাতে নিয়ে গৃহিণী অনেকদিন পর কর্তাকে স্মরণ ক'রে চোখের জল ফেললেন। আহা! মানুষটা থাকলে আজ কতো খুশিই না হ'তো!

প্রমথবাবু বললেন—আর কি কি লেখা আছে বের করতো আবতি!

বেরোলো ঝুড়ি ঝুড়ি বাণ্ডিল। দুটি চারটি ছাপা হতেই পাঠকমহলে আলোড়ন উঠলো। আরও কয়েকটি নামী কাগজ এগিয়ে এলো লেখার উমেদার হয়ে, একের পর এক লেখাগুলি ছাপা হতে লাগলো। অর্থাগমও হতে লাগলো মন্দ নয়। দেখেশুনে বাড়িশুদ্ধ সবারই তাক লেগে গেল।

খোঁজ খোঁজ খোঁজ, বাড়িতে জয়গোপালবাবুর হাতে লেখা একটা চিরকুট পাওয়া গেলেও তা প্রমথবাবুর হাতে জমা পড়তে লাগলো। কি জানি কোন্ সাহিত্যকীর্তি আত্মগোপন ক'রে আছে এর মধ্যে।

ঘরে 'জঞ্জালের' প্রাচুর্য দেখে অসন্তুষ্ট বড় বৌ করুণা এক সময়ে মনে মনে শাশুড়িকে কটাক্ষ করেছে—আদিখ্যেতা! নেহাৎ শাশুড়ির চোখের সামনে পোড়াতে পারেনি, নইলে কত সময় ভেবেছে—এগুলো দিয়ে উনুন ধরালে ঘরও পরিষ্কার হ'তো কেরোসিনের খরচটাও বাঁচতো। অনেক সময় শাশুড়ির চোখ এড়িয়ে ক'রেও ফেলেছে। হয়তো জ্বালিয়ে

খোকাখুকুর দুধ গরম করেছে নয়তো তাদের 'ইয়ে' পরিষ্কার ক'রে ফেলেছে ঐ সব কাগজ দিয়ে। আজ সেজন্য আফশোষে হাত কামড়াতে ইচ্ছে হলো তারও।

জয়গোপালবাবুর জয়জয়কার আর কি !

মৃত্যুর দশ বছর পরে জয়গোপালবাবু বিখ্যাত সাহিত্যিক হয়ে গেলেন।

গৃহিণীর মনে সংশয় তবু কাটে না। তিনি ভাবেন—কৃতিত্বটা কার ? কর্তার না বেয়াই-এর।

অশ্বত্থ চারা

অফিস থেকে ফিরে বাড়ির দরজায় পা দিতেই মনটা অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে স্বাতীর। উনুনে বোধ হয় আঁচ পড়েছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় জমাট বেঁধে আছে প্রবেশদ্বার থেকে পুরো বাড়িটার আনাচ-কানাচ, ওদিকে মা'র তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। তিনি বাড়ির ঠিকে-ঝি যমুনাকে নিয়ে পড়েছেন দেরি করে বাসন মাজতে আসার জন্যে।

এত দেরি করে বাসন মাজতে এলে চলে? সন্ধ্যে হয়ে গেছে, উনুনে আঁচ পড়েছে অথচ বাসনের জন্যে কোনো কাজ সারতে পারছি না। না বাপু, এমন করলে চলবে না আমার।

যমুনাও কিছু কসুর যায় না। সেও সমান তালে গলা চড়িয়ে বলছে—না চললে ছেড়ে দাও বাপু। গতর থাকলে আবার কাজের ভাবনা! একটু দেরি হয়ে গেছে তো কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে তাই বলো। পাঁচ বাড়ি কাজ করি। সব সেরে-সুরে আসতে অমন একটু এদিক-সেদিক হয়েই থাকে। শুধু তোমার দোর ধ'রে পড়ে থাকলে তো আমার চলবোনি। ওই তো ক'টা টাকা মাইনে দাও। তা এখন থেকেই বলে রাখছি বাপু, সামনের মাস থেকে মাইনে না বাড়ালে আর কাজ করতে পারবোনি।

মা আরও জ্বলে উঠে বললেন—যে কাজের ছিরি তোমার। তার উপর মাসে সাতদিন কামাই করছো। আর মাইনে বাড়ায় না।

বিরক্তিতে মন ভরে যায় স্বাতীর। এইসব অপ্রীতিকর কচকচি ভালো লাগে না তার। মা'র মেজাজটা দিনে দিনে কেমন খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। চড়া পর্দায় বাঁধা হয়েই আছেন। অল্পেতে চটে যান। হয়তো দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মা'র কোমল বৃত্তিগুলোর গায়ে কড়া পড়ে গেছে।

স্বাতী ঘরে ঢুকে হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে টেবিলের ওপর রাখলো। তারপর পাখাটা চালিয়ে খাটের ওপর একটু সময় বসলো। ট্রাম-বাসে যা

ভিড়। শাড়ি বিপর্যস্ত, চুল এলোমেলো, গরম ঘাম, এক অস্বস্তিকর অবস্থা!

শাড়ি জামা ছাড়তে ছাড়তে স্বাতী ভাবলো—কড়া কি শুধু একা মা'র মনেই পড়েছে? স্বাতীর পড়েনি? দেয়ালের গায়ে টাঙানো তার উনিশ বছর বয়সের ছবিটার দিকে চোখ পড়লো স্বাতীর। লাবণ্য ঢলঢল হাসিহাসি একটা মুখ। চোখ ফিরিয়ে আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবলো ছবির ঐ মুখটার সঙ্গে আজকের এই সাতাশ বছরের স্বাতীর মুখ কি মেলে? এ মুখে কি আজ রুক্ষতা ছায়া ফেলেনি? কঠিন হয়ে ওঠেনি মুখের রেখাগুলো?

মাকে দোষ দেওয়া যায় না। মা যেন একটা মানুষ নয়, একটা জীবন নয়, যেন একটা হিসেবের খাতা। টিপে-টিপে হিসেব করে প্রতিটি পয়সা খরচ করা।

যেখানে দশ পয়সা খরচের দরকার সেখানে মা প্রাণপণে চেষ্টা করেন পাঁচ পয়সায় সেরে ফেলা যায় কি না। এ ছাড়া করবেনই বা কি! স্বাতী তো পঞ্চাশটি টাকা নিজের হাতে রেখে মাইনের বাকি আড়াইশোটি টাকা মা'র হাতে তুলে দেয়। আর সম্বল বাবার আশিটি টাকা পেনশন। মা নিপুণ হাতে ঐ টাকা কয়টি দিয়ে তাদের ছয় জনের সংসারটাকে চালিয়ে নিয়ে যান। এক পয়সা এদিক-ওদিক হবার জো নেই। তা হলেই পা পড়বে খাদে।

এই তো মাস ছয়েক আগে বাবার একটা অসুখ হয়ে গেলো। তখন বাধ্য হয়ে ডাক্তারের পেছনে খরচ করতে হলো কিছু। যার ফলে দু'মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে। এই ক'মাসের মধ্যে চলতি মাসের ভাড়া ছাড়া বকেয়া ভাড়া মেটানো কিছুতেই সম্ভব হয় নি। বাড়িওয়ালার তাগাদার সুর নীরস। মুখের রেখা অপ্রসন্ন।

একটি মাত্র ভাই স্বাতীর। সুমন। দু'টি বোন সুপ্তি আর স্মৃতি। সুমন কলেজে পড়ছে। বোনেরা এখনও স্কুলে। টিউশনি করেই সুমনকে তার পড়ার খরচ চালিয়ে নিতে হয়। স্বাতীর সাধ্য নেই এই আয় থেকে কলেজে পড়ার খরচ জোগায়। তবে বোনেদের খরচটা বহন করতেই হয়। এর জন্য অনেকটা কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয় এ সংসারকে। স্কুলে পড়া মেয়ে তো আর টিউশনি করতে পারে না।

ঘরে ঢুকলো সুমন সুপ্তি স্মৃতি হাসি-গল্পের কলরব তুলে। ওরা এখনও হৈ-চৈ করে। সংসারের যন্ত্রণার পেষণ এখনও ওদের মনে কড়া ফেলতে পারেনি।

মা এসে চা-খাবার দিয়ে গেলেন সবাইকে।

সুমন আর সুপ্তি পিঠোপিঠি। ওদের মধ্যে খুনসুটি একটু বেশি। সুপ্তির সঙ্গে তাল দিয়ে স্মৃতিও সুমনের পেছনে লাগে। সুপ্তি সুমনের দিকে গলা বাড়িয়ে দেখে বললো—মা, দাদার ডিসে সবার চেয়ে বেশি খাবার দেখছি যে!

স্মৃতি ফোড়ন কাটলো—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, দাদা মা'র একটাই ছেলে কি না। দাদার কথা আলাদা।

সুমন জবাব দিলো—দ্যাখ, আমি পৃথিবীতে এসে নাকি মাত্র একটা বছর শান্তিতে কাটিয়েছিলুম শুনেছি। অমনি সুপ্তিটা দুম্ করে এসে হাজির! আমার ঠিক পেছনেই লাইন দিয়েছিলি বুঝি! ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে আমার দুধের বাটি কেড়ে নিয়েছিস! তবুও হয় নি। সব কিছুতে শুধু আমাকে হিংসে!

স্মৃতিটাও তেমনি হয়েছে। সুপ্তির সঙ্গে জুটেছে।

সবাই হেসে উঠলো।

সুপ্তি বললো—এসেছি, তাতে তোমার কমতিটা হচ্ছে কোথায়? মা তো দেখছি একমাত্র পুত্রের স্নেহে একেবারে গদগদ। বড় মাছখানা কে খাবে?—না, সুমন খাবে। বাড়তি ভাজাখানা কে খাবে?—না সুমু খাবে। দুধের সরটা কে খাবে?—না, সুমু খাবে।

স্মৃতি কথাটা লুফে নিলো। বললো—তবেই দেখো দাদা, আমরা কেউ তোমার দুধের বাটি কেড়ে নিতে পারিনি। মাতৃস্নেহের অমৃত ভাণ্ডার তোমার জন্যে সব সময় টলটল ট-ল-ট-ল করছে।

আবার সবাই হেসে উঠলো। মাও হেসে বললেন—ওর জন্যে বেশি করতে কখন দেখিস বাপু তোরা! খালি পেছনে লাগা!

ভাই-বোনেদের এই খুনসুটি স্বাতী বেশ উপভোগ করে। মনটা একটু হাল্‌কা হয়। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্য। তার পরই আবার সংসারের চিন্তা। দায়দায়িত্বের বোঝা।

সুপ্তি এসে জানায় তার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফি জমা দিতে

হবে এই সপ্তাহের মধ্যে। স্মৃতি জানায় স্কুলের মাইনে বাকি, দু'তিন দিনের মধ্যে না দিলে নাম কাটা যাবে। তার পর মুখ কাচুমাচু করে বলে—স্কুলে যাওয়ার শাড়ি ছিঁড়েছে। অন্ততঃ একটা না কিনলে আর কিছুতেই চলবে না দিদি।

স্বাতী গম্ভীর মুখে শুধু বলে—হুঁ।

তার ওপর মা এসে জানালেন—তোর বাবার মশারিটা বড্ড ছিঁড়ে গেছে রে স্বাতী। সারারাত মানুষটা মশার কামড়ে ছটফট করে। অথচ তোর কষ্ট হবে ভেবে কিছু বলেও না। আমার হাতে তো বাজার খরচের ক'টা টাকা ছাড়া আর কিছু নেই—

হঠাৎ স্বাতী রুক্ষ হয়ে ওঠে—আমি কি করবো বলতে পারো? চুরি না করলে তো বাড়তি টাকা দিতে পারছি না।

মা গজ গজ করে নিজের কপালকে ধিক্কার দেন।

এক এক সময় স্বাতীর অসহ্য মনে হয়। সে কেন সারাজীবন এমনি কলুর বলদের মতো ঘানি টেনে মরবে? কি আছে তার জীবনে? না আছে রঙ, না আছে রস। যেমন-তেমন দু'টি খাওয়া পরা আর উদয়াস্ত খেটে যাওয়া! এর নাম জীবন! এত করেও সংসারকে যদি সুখী করতে পারতো তবুও না হয় কথা ছিলো! সে না পারলো নিজেকে সার্থক করতে, না পারলো সংসারকে সুখী করতে। তার জীবনটা শুধুই ব্যর্থতার ইতিহাস। এক এক সময় গোটা পৃথিবীর ওপর আক্রোশে ফোঁসে স্বাতী। ইচ্ছে হয় চলে যায় এই পৃথিবী ছেড়ে। মা বাবা ভাই বোনেদের কষ্ট হবে? হোক, সে তো আর দেখতে আসবে না।

মাঝে মাঝেই এই ইচ্ছেটা জাগে স্বাতীর নিরন্ধ্র অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে। আত্মহত্যা করে ভাগ্যের ওপর, পৃথিবীর ওপর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয়। বাবার ওষুধের তাকে ঘুমের ওষুধের শিশি আছে। একদিন নির্ঘাৎ কয়েকটা ট্যাবলেট খেয়ে ফেলবে। পালাবে এই যন্ত্রণার কারাগার থেকে।

মনের এই অবস্থায় বাড়িওয়ালা বাকি ভাড়ার তাগিদ দিতে এসে বললো—এ বাড়ির ভাড়া যদি চালাতে না পারেন তবে কম ভাড়ার বাড়ি দেখে চলে যান। তাতে আপনারও সুবিধে আমারও বাঁচোয়া।

মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে স্বাতীর। সে কি এমনি করে তিলে তিলে

দগ্ধে মরবে না পালিয়ে অব্যাহতি নেবে ?

এমন সময় সুমন এসে বলে—দিদি, এ মাসে আমার একটা টিউশনি হাতছাড়া হয়ে গেছে। খুব অসুবিধেয় পড়েছি। তুই যদি—

তা আমি কি করবো ?—তীক্ষ্ন কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে স্বাতী—আমাকে নিয়ে আর কতো ছেঁড়াছেঁড়ি করবি তোরা—আমি আর পারছি না—

সুমন ম্লানমুখে ফিরে গেল।

বুক ঠেলে কান্না আসতে চাইলো স্বাতীর। সুমনের ম্লান মুখটা ক্রমাগত বুকের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। নিজের রুক্ষতা ধীরে ধীরে নিজের হৃদয়কেই রক্তাক্ত করলো। স্বাতী নিঃশব্দে হাহাকার করলো—ভগবান ! ক্ষমতা দাওনি, মমতা দিয়েছো কেন ?

বাবার শিশি থেকে কয়েকটা ঘুমের ট্যাবলেট চুপিচুপি সরিয়ে নেবার সময় টুক-টাক শব্দ শুনে বাবা ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ওখানে কি খুঁজছিস রে স্বাতী ?

কিছু না বাবা। এই তাকটা একটু গুছিয়ে রাখছি।

বাবা বুঝতেই পারেননি কিছু। ট্যাবলেটগুলো নিজের ঘরে বালিশের নীচে লুকিয়েছে স্বাতী। বেঁচে মরে থাকার চাইতে মরে বাঁচা অনেক ভালো।

অনেকদিন পর ছাতে এলো স্বাতী। আকাশে মস্ত একটা চাঁদ। সারা ছাত জুড়ে জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। পৃথিবী এতো সুন্দর ! পৃথিবী এতো যন্ত্রণাময় ! পাঁচিলের কাছে এসে দাঁড়াতেই চোখ পড়লো স্বাতীর—আরে ! পাঁচিলের মাথায় অশ্বত্থ চারাটা কী বড়ো হয়ে গেছে। পাঁচিলটা ফেটে গিয়ে ভেঙে না পড়ে। এতো বড়ো হলো কি করে চারাটা ! অবাক্ চোখে স্বাতী দেখলো—অজস্র কচি কচি পাতায় ভরে গেছে গাছটা। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। আশ্চর্য ! এই শুকনো ইঁট সিমেন্টের মধ্যে কোথায় পেলো এমন প্রাণরস, কোথায় পেলো এমন জীবনীশক্তি ! পায়ের তলায় মাটি নেই, এক ফোঁটা জল কেউ দেয় না গোড়ায়, সার নেই, জীবনধারণের কোনো উপকরণ নেই ! এক টুকরো কাঠিন্যের উপর দাঁড়িয়ে শুধু একটু সূর্যের দাক্ষিণ্য নিয়ে কি সুন্দর বেঁচে আছে এই অশ্বত্থ চারাটা !

তবে স্বাতীই বা বাঁচবে না কেন? হয়তো তার পায়ের তলায় সচ্ছলতার মাটি নেই, জীবনে প্রেমের জল-সিঞ্চন নেই কিন্তু তার তো মা-বাবার স্নেহ আছে, ভাই-বোনের ভালোবাসা আছে। যেমনই হোক, চাকরিও আছে।

না না, স্বাতী বাঁচবে। সে হেরে যাবে না এই জীবন-যুদ্ধে। ঐ অশ্বত্থ চারাটার মতোই শুধু বাঁচার আকাঙ্ক্ষার জোরে বেঁচে থাকবে।

ছাত থেকে নেমে এলো স্বাতী। ঘুমের ট্যাবলেটগুলো আবার চুপিচুপি বাবার শিশির মধ্যে রেখে দিলো।

ঘরে-বাইরে

রত্নমঞ্জরী দেবী প্রখ্যাত সমাজ-সেবিকা। সমাজ-সেবা-সংঘের সভানেত্রী। কোথায় বন্যা হলো কিংবা খরায় দেশ পুড়লো, অমনি সেবা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসেন রত্নমঞ্জরী। চাঁদা তোলা, জামা-কাপড় সংগ্রহ করা, চ্যারিটি শো দিয়ে অর্থসংগ্রহ করা এবং তা দুর্গতদের জন্য দান করা— এসব কাজে রত্নমঞ্জরী শতভুজা।

এছাড়াও কত কাজ রত্নার। বস্তি উন্নয়ন, দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের জন্য বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, বিনামূল্যে বই বিতরণ, বস্তিবাসী নিরক্ষর বয়স্কদের জন্য স্বাক্ষর অভিযান। কিসে নেই রত্না। নাম-করা কতো সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ, সমাজের উঁচুতলার ব্যক্তিদের সঙ্গে দহরম মহরম।

অসাধারণ সুন্দরী রত্নমঞ্জরী। চলনে-বলনে সর্বাঙ্গে আভিজাত্যের ছাপ, কণ্ঠস্বরে মধু, কটাক্ষে বিদ্যুৎ, সাজসজ্জায় চটক। কাজেই রত্নার চারপাশে গুনগুন করার মতো ভোমরারও অভাব নেই।

যেখানেই রত্না গিয়ে দাঁড়ান, সেখানেই বাজিমাৎ। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে পরিচিত মহলে চাঁদার খাতা ধরলে হু হু ক'রে চাঁদা ওঠে। চ্যারিটি শো-এর টিকিট ঝপাঝপ্ বিক্রি হয়। তারপর টাকা সংগ্রহ হলে সেই টাকার তোড়া রাজ্যপালের হাতে তিনি নিজে অর্পণ করেন। খবরের কাগজের রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফারদের আগেভাগে খবর দেওয়া থাকেই। সুন্দর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে মুখে চমৎকার একটু হাসি ফুটিয়ে ক্যামেরার ঝলকানির মধ্যে সেই টাকার তোড়া রাজ্যপালের হাতে তুলে দেন, পরদিন খবরের কাগজে তার মনোহারিণী ছবিসহ বড় বড় হেডিং-এ সেই খবর ছাপা হয়—দুর্গতদের সাহায্যার্থে প্রখ্যাত সমাজ-সেবিকা রত্নমঞ্জরী দেবীর রাজ্যপালের হাতে অর্থ অর্পণ।

রত্নমঞ্জরী অভিজাত পরিবারের অসাধারণ সুন্দরী বধূ। স্বামী অনিরুদ্ধ বসু কেন্দ্রীয় সরকারের আবহাওয়া দপ্তরে উচ্চপদস্থ অফিসার।

তিন পুরুষে ধনী ও বনেদী পরিবার। দক্ষিণ কলকাতায় সুন্দর বাড়ি গাড়ি সুখ-সুবিধের আধুনিক সবকিছু উপকরণসহ বর্ণাঢ্য সংসার। রত্নমঞ্জরীর একটি ছেলে নয়ন। আর রয়েছেন বৃদ্ধা শাশুড়ি, বেশ কয়েক বছর ধরে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় শয্যাশায়ী। বাড়িতে রান্না করার জন্য রয়েছে বংশী। অন্য সব কাজের জন্য কমলমুখী। আর চলৎ-শক্তিরহিত বৃদ্ধা শাশুড়ির পরিচর্যার জন্য সুবালা।

অনিরুদ্ধ সকাল ন'টায় অফিসে বেরোন। গাড়িতেই যান, তাঁকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ফিরে আসে। তারপর দিনের বাকি সময়টা গাড়ি রত্নার হেপাজতে। কতো জায়গায় যেতে হয় তাকে। টালা থেকে টালিগঞ্জ, বালি থেকে বালিগঞ্জ, চিৎপুর থেকে চেতলা, কোথায় নয়? সারা কলকাতা চষে বেড়াতে হয়। কতো দুঃস্থ আছে, কতো বস্তি আছে, আছে কতো নিরক্ষর মানুষ। রত্নমঞ্জরী ছাড়া আর কে হাত বাড়িয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসবে।

কোনো কোনো দিন রত্না সকালের দিকেই বেরিয়ে পড়েন। বিকেল বেলাটা তো বাঁধা আছেই। সভা-সমিতি, আলোচনা, প্রস্তাব গ্রহণ, সেই প্রস্তাবকে কাজে রূপ দেওয়া। কাজ আর কাজ, আর কাজ—

ময়নাডুলি বস্তি এলাকায় একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশ্য পাঠাগার বলতে যা বোঝায় তেমন বড়ো কিছু নয়। ছোটো একটি ঘরে অল্পস্বল্প কিছু বইয়ের সংস্থান রাখা। রত্নমঞ্জরী নিজে উদ্যোগী হয়ে বস্তির মালিককে ধ'রে ক'রে এক টুকরো জমি সংগ্রহ করেছেন। বস্তির মালিক প্রচুর অর্থের অধিকারী কিন্তু মা সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। রত্নমঞ্জরী যখন তাঁর অসামান্য রূপলাবণ্য নিয়ে নম্র ভঙ্গিতে করজোড়ে ঠোঁটে হাসি এঁকে ঐ মানুষটির সামনে দাঁড়ালেন, তাঁর প্রার্থনা নিয়ে তখন মানুষটার বুঝি মাথা ঘুরে গেলো। এমন মহিলার সঙ্গে বাক্যালাপ করার সুযোগও তার জীবনে কখনও আসেনি। কাজেই নিমেষে অভিভূত এবং প্রার্থনা মঞ্জুর।

তারপর চাঁদা তুলে নতুন অ্যাসবেস্টাসের চালা দিয়ে এক ইঁটের গাঁথনির দেয়াল তুলে তাতে চুনকাম ক'রে বেশ দুরস্ত ক'রে তোলা হলো ঘরটাকে। সস্তায় পুরনো গোটা দুই কাঠের আলমারি কেনা হলো। জোগাড় করা হলো প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের কিছু নতুন, কিছু

পুরনো পাঠ্য বই, সহজপাঠ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বই! সবকিছু ঠিকঠাক, গোছগাছ সারা। বাকি শুধু ফিতে কেটে উদ্বোধন করা। উদ্বোধন করবেন প্রখ্যাত সমাজসেবিকা রত্নমঞ্জরী। আর যেদিন সকালবেলা এই উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সেদিনই কিনা কমলমুখী দুম ক'রে কামাই ক'রে বসলো! তার মা'র নাকি 'শ্বাস' উঠেছে, আর একটা দিনও টিকবে না, তাকে যেতেই হবে।

রত্নমঞ্জরীর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠলো, বুড়ি মরার আর দিন পেলো না! বস্তির মধ্যে পাঠাগার। তার এই অভিনব প্রচেষ্টা দেখে সবাই ধন্য ধন্য করছে, কত সাধুবাদ দিচ্ছে। খবরের কাগজের রিপোর্টার ফটোগ্রাফারকে খবর দেওয়া হয়েছে। গণ্যমান্য কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সবাই আসবেন, তার মধ্যে কিনা এই বিপত্তি!

সকাল থেকে বংশী ক্রমাগত গৃহকর্ত্রীর বকুনি খেলো, সুবালাকে রুগীর প্রয়োজন ছাড়া অন্য কাজে যেতে হয় না। বাড়তি ফরমাস খেটে খেটে সেও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো। চান-খাওয়া ইস্কুলে যাবার জন্য তৈরি হওয়া নিয়ে নয়ন অজস্রবার বকুনি খেলো। বার দু' তিন চড়-চাপড় খেলো, বাবার কাছে গিয়ে কাঁদলো।

অনিরুদ্ধ সকাল থেকে স্ত্রীর মেজাজ দেখে একেবারে চুপ মেরে গিয়েছিলেন। কাউকে না ডেকে নিজের কাজগুলো নিজেই সামলে নিচ্ছিলেন, অন্যদিন সকালে বাড়তি এক কাপ চা খান, সেদিন সেটাও বাদ দিলেন। কিন্তু নয়ন যখন কাছে দাঁড়িয়ে হাতের উল্টোপিঠে নিঃশব্দে চোখের জল মুছতে লাগলো তখন আর অতোটা নির্লিপ্ত থাকতে পারলেন না। বললেন—কি হয়েছে রত্না? নয়নকে সেই থেকে বকাঝকা মারধোর করছো কেন?

রত্না ঝঙ্কার দিয়ে বললেন—একেই আজ কমল কাজে আসেনি তার ওপর বাঁদর ছেলে এক কথায় নাইবে না, ক্রমাগত বেয়াড়াপনা করছে। কতো কাজ আমার। আমার কি নষ্ট করার মতো সময় আছে?

তোমার তো এসব কাজ নিত্যি তিরিশ দিনই থাকে রত্না! কিন্তু এই ঘরটা কি তোমার নয়? এর জন্য কি তোমার কর্তব্য নেই? এখানে তুমি এতো অসহিষ্ণু কেন?

রত্না ঠাণ্ডা চোখে অনিরুদ্ধর দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে চাপা

কঠিন গলায় বললো, তোমার মতো সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি হলে তাই ভাবতাম।

দামী সুন্দর শাড়িতে ও নিখুঁত প্রসাধনে অপূর্ব দেখাচ্ছিলো রত্নমঞ্জরীকে। উপস্থিত সকলের সম্ভ্রমমিশ্রিত মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ঠোঁটে সুন্দর একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে কাঁচি ধরে ফটোগ্রাফারদের ছবি নেবার সময় দিয়ে শঙ্খধ্বনির মধ্যে ফিতে কাটলেন রত্না। ঘরে পদার্পণ ক'রে পাঠাগার-ভবনটিকে ধন্য করলেন। তারপর সমবেত জনতার উদ্দেশে সারগর্ভ ভাষণ দিলেন।

এই পর্ব মিটে গেলে সমাজসেবা সংঘের তরফ থেকে বস্তির ঘরে ঘরে গুঁড়ো দুধের প্যাকেট ও পাউরুটি বিতরণ করলেন। ছোটো ছেলেমেয়েদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। অবশ্য সন্তর্পণে—হাত এবং শাড়ি বাঁচিয়ে, যাতে ময়লা না লাগে, সন্তানসম্ভবা মায়েদের ডাক্তার এবং হাসপাতালের হদিশ বাতলে দিলেন। পরিচিত ডাক্তারের কাছে সুপারিশপত্র লিখে দিলেন, বললেন, এই চিঠি নিয়ে অমুক ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করো, সুবিধে হবে।

ভক্তি-গদগদ-চিত্তে কত বধূ তাঁর পায়ের ধুলো নিলো। বয়স্কা মেয়েরা ফিসফিসিয়ে বললো—আহা, কেমন পিত্তিমের মতো রূপ, যেন মা দুগ্গো।

এমনি আরও কিছু কিছু কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে রাত। নয়ন ঘুমিয়ে পড়েছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে শোফায় বসে অনিরুদ্ধ বই পড়ছেন। ঘরে ঢুকেই রত্না ভুরু কুঁচকে বললেন—বিছানা অমন এলোমেলো কেন? নয়নের বইপত্র ছড়ানো? কমল নেই, সুবালা কি একদিনও এটুকু কাজ করতে পারে না?

অনিরুদ্ধ বললেন, সুবালার মেয়ের 'লেবার পেন' উঠেছে, সে মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে গেছে।

চেঁচিয়ে উঠলেন রত্নমঞ্জরী—সুবালাও নেই? কি, ওরা পেয়েছে কি? একই দিনে জোট বেঁধে কামাই করছে!

অনিরুদ্ধ শান্ত কণ্ঠে বললেন, জন্ম এবং মৃত্যুর ওপর ভগবান ছাড়া আর কারও হাত আছে কি?

একই দিনে আমার ওপর ভগবানের এই সুনজর পড়লো কেন?

সেটা ভগবানকেই জিজ্ঞাসা করো।

বংশী এসে জিজ্ঞাসা করলো – মা, খাবার দেবো?

আমি খাবো না, তুমি খেয়ে নাও গে।

বংশী ফের বললো—মা, ঠাকুমা বোধ হয় বিছানা ভিজিয়ে ফেলেছেন। মনে হয়, পাল্টে দেওয়া দরকার। সুবালা তো নেই।

ক্ষিপ্তকণ্ঠে রত্নমঞ্জরী বললেন—আঃ, এরা আমাকে পাগল ক'রে দেবে দেখছি। যাও, আজ রাত্তিরে অমনি শুয়ে থাকতে বলো। কাল সুবালা এসে যা করার করবে। পোশাক পাল্টে খাটে শুয়ে পড়লেন রত্নমঞ্জরী।

অনিরুদ্ধ উঠলেন। বংশীকে নিয়ে মা'র ঘরে গেলেন। অক্ষম বৃদ্ধা অসহায়ের মতো পড়ে আছেন। বংশীর সাহায্যে বিছানা পাল্টালেন অনিরুদ্ধ। তারপর মা'র মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন—ঘুম আসছে না মা?

এইটুকু সহানুভূতির স্পর্শে ছেলের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে হা হা ক'রে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধা। বললেন—তোদের আর কতো কষ্ট দেবো বাবা। যম যে ভুলে আছে। নেয় না।

গভীর মমতায় মা'র মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অনিরুদ্ধ বললেন– ওকথা বলছো কেন মা! আমার জীবনের এক টুকরো পলিমাটি যে এখনও তোমার এই বিছানার পাশেই।

মা ঘুমিয়ে পড়লে নিজের ঘরে ফিরে এলেন অনিরুদ্ধ। রত্নাও ঘুমিয়ে পড়েছেন। আলো নিভিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে অনিরুদ্ধ ভাবতে লাগলেন—আজ কতোদিন তিনি রত্নাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাননি। তার সঙ্গে কোনো সিনেমা, থিয়েটারে যাননি কতো কাল। কতোদিন হলো অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে তিনি রত্নার একটু সাহচর্য পান না। পান না তার হাতের এক কাপ চা। নয়ন কতটুকু সময় পায় তার মাকে? আর অসহায় পঙ্গু যে মানুষটা ও-ঘরে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে? তাকে একবার উঁকি দিয়ে দেখার সময়ও হয় না রত্নমঞ্জরীর কোনোদিন।

নানান চিন্তার মধ্যে একটা প্রশ্ন বড়ো হয়ে দেখা দেয় অনিরুদ্ধর কাছে: সমাজসেবা বস্তুটা কি? মানুষের নিজের ঘরটা কি সমাজের বাইরে? কে জানে?

'শারদীয় সংহতি' । ১৩৮৫

অসম্ভব

দুনিয়ায় কি যে সম্ভব আর কি যে অসম্ভব তা নির্ণয় করা কি মানুষের সাধ্য ?

অতসী যেদিন এসে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হলো সেদিন তাকে দেখে তো আমাদের চোখ ট্যারা। ।

সবাই যখন মন্তব্যটা কোন্ পথ দিয়ে আরম্ভ করবে ভেবে থই পাচ্ছিলো না, তখন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে স্মার্ট আর ব্রিলিয়ান্ট বয় পরেশ বলে উঠলো, "উঃ দুনিয়ার সব মেয়েরাই যদি এমন হতো তবে সব পুরুষেরাও দেবব্রতর মত 'জীবনেও বিবাহ করিব না' প্রতিজ্ঞা করে রাতারাতি ভীষ্মদেব হয়ে উঠতো।'

রাস্তার সন্ধান পেয়ে সেই পথে আর এক পা অগ্রসর হলো রথীন— 'তাহলে রামায়ণ মহাভারতের ইতিহাসও বদলে যেতো ভাই, কোনো মুনিঋষির তপোভঙ্গের বিবরণ তাতে লেখা থাকতো না।'

প্রদোষ বললো, 'ওঃ ! চক্ষুপীড়াদায়ক।'

সত্যি, অতসীর রূপহীনতার মধ্যে যেন রয়েছে একটা তেলতেলে কুশ্রীতা। কালো মাংসল দেহ। এতো মাংস যে, হাতে গলায় ভাঁজ ভাঁজ পড়ে আছে। গোলগাল ভরাট মুখখানায় শ্রী বলে কোনো বস্তু নেই। সবচেয়ে অস্বস্তিকর তার দেহের লোমপ্রাচুর্য। মেয়েদের গায়ে এতো বড়ো বড়ো লোম—ওঃ, গা যেন শিরশির করে ওঠে।

সে ক্লাসে ঢুকলেই সবার মুখে একটু ব্যঙ্গের আভাস জেগে উঠতো। কারো ঠোঁটের কোণ, কারো নাকের ডগা কুঞ্চিত হয়ে উঠতো।

সবচেয়ে বেপরোয়া পরেশ। এক-একদিন তো যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসতো ! হয়ত বলে উঠতো, 'গুবরে পোকা দেখেছিস, প্রজাপতির মেলায় গুবরে পোকা।' কোনো কোনো দিন স্প্রিং-এর মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটা বিরাট মানুষের ছবি এঁকে রাখতো বোর্ডে। নীচে লিখে রাখতো 'তিলে তিলে তিলোত্তমা'। কোনোদিন একটা দশাসই মেয়ের ছবি এঁকে গায়ে অজস্র লোম এঁকে দিতো। নীচে শুধু একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে রাখতো। অর্থাৎ তোমরাই বলো এর কি নাম

দেওয়া যায়। আমি তো ভেবে ভেবে উপযুক্ত বিশেষণ খুঁজে পাচ্ছি না। মেয়েগুলোর পর্যন্ত অতসীর প্রতি একটু সহানুভূতি ছিলো না। তারাও এ বিদ্রূপ উপভোগ করতো আর মুখ টিপে টিপে হাসতো।

কিন্তু আশ্চর্য সহিষ্ণুতা মেয়েটার। চুপচাপ সব সয়ে যেতো। নিয়মমাফিক কলেজে আসতো আর যেতো। প্রফেসারের লেকচার শুনতো আর নোট টুকতো। কারো সংগে একটি কথাও বলতো না ছেলেদের সংগে তো নয়ই—মেয়েদের সংগেও না।

আমি এক এক সময় পরেশের এই বাড়াবাড়ি দেখে ধমক দিতুম, 'আঃ পরেশ, একেবারেই কি চোখের পরদা ছিঁড়েছিস্। লজ্জা সংকোচ সভ্যতা সব বিসর্জন দিয়ে একেবারে বর্বর হয়ে উঠলি যে! ওকি নিজেকে নিজে তৈরি করেছে? এ কি নিষ্ঠুরতা তোর?'

পরেশ একটুও সঙ্কুচিত হয় না। বরং আরও বিদ্রূপে ঝলসে ওঠে। এবং এবার তার ধার আমার উপরেই, 'তাই নাকি! তোর মনে করুণা জেগেছে দেখছি। তাহলে মেয়েটার ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার নয় মনে হচ্ছে। একটু আলোর রশ্মি, ফুলের সৌরভ তার জীবনেও আছে, কি বল্—'

আমি বলি, 'আঃ, চুপ কর্, কি যা-তা বলিস্!'

সেদিন একেবারে চরমে উঠলো। ছুটির পর সব ছেলেমেয়েই বেরিয়ে পড়েছে। শুধু আমরা কয়েকজন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা করছি। এমনি সময় ফের গেট দিয়ে ঢুকলো অতসী। আমাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। বোধ হয় কিছু ফেলে গেছে। ও আমাদের ছাড়িয়ে এক হাত তফাতও যায় নি এমনি সময় পরেশের ধারালো এবং স্পষ্ট মন্তব্য: 'জাস্ট লাইক এ বাফেলো'—এতো রূঢ় আর এতো নগ্ন যে আমরা সব ক'জন ছেলেই চমকে উঠলুম। দু'একজন জিভ কাটলো। কেউ আঃ বলে প্রতিবাদ করে উঠলো। আমি সজোরে পরেশের একখানা হাত চেপে ধরলুম। অতসী একবারও পেছন ফিরে চাইলো না। গন্তব্যপথে সোজা হেঁটে চলে গেল। সবাই নিস্তব্ধ। একটু রুক্ষদৃষ্টিতেই হয়তো পরেশের দিকে তাকিয়েছিলুম, হাতটা তখনও ধরা ছিলো। পরেশ হেসে উঠে নিস্তব্ধতা ভংগ করে বললো, 'কিরে হাতটা ভেংগে দিবি নাকি?'

আমি বললুম, 'শুধু হাতটাই নয়, তোমার মুখখানাও এক ঘুঁষিতে

ভেঙে দেওয়া উচিত। ইতর কোথাকার! তুই একেবারে জাহান্নামে গেছিস পরেশ!'

সবাই বললো, 'সত্যি পরেশ, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।'

পরেশ বললো, 'কি করবো। আমার স্বভাব হচ্ছে যা মনে আসে ফস্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।'

আমি বললুম, 'মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় বললেই হলো? মেয়েটি নিরীহ ভদ্র, তাই না বার করতে পারছো! অন্য মেয়ে হলে তোমার ঐ মুখে দুখানা চড় কসিয়ে দিতো না? তোমার খাচ্ছে না তোমার ঘরের চালের নীচে মাথা গুঁজে আছে? সভ্যযুগের মানুষ। নিজেকে সুশিক্ষিত বলে বড়াই করো, আর ভেতরের বর্বরতাটাকে 'চেক' করতে পারো না?'

পরেশ আমাকে ইঙ্গিত করে সবাইকে বললো, 'শুনলি তো, অনিল কেমন ওকালতী করছে। ও নিশ্চয় অতসীর প্রেমে পড়েছে। নির্ঘাৎ।'

আমি বললুম, 'অতসীর প্রেমে পড়তে না পারি—তাই বলে নিজের অসভ্যতাকে 'চেক' করতে পারবো না, তোমার মতো এমন বনমানুষ আমি নই। আমি সভ্যযুগের মানুষ।'

রথীন বললো, 'নে, ক্ষ্যান্ত দে তোদের কথা কাটাকাটি, কালকের প্রোগ্রামটা ঠিক কর্।'

তার পরই আমরা আমাদের আলোচনায় মগ্ন হয়ে গেলুম। অন্যমনস্কতায় আর কিছুই লক্ষ্য করলুম না।

পরেশ বললো, 'তাহলে কাল চারটেয় সবাই ওখানে গিয়ে 'মিট' করবি।'

আমি বললুম, 'ঠিকানাটা বল্ তো লিখে নিই।' বলে বুক পকেটে হাত দিয়েই তো 'চিত্তির'। কলমখানা ক্লাসে ফেলে এসেছি।

সেদিন যদি কলম না হারাতো আর খুঁজতে না যেতাম তবে ঘটনার ধারাটা হয়তো এভাবে গড়াতো না।

কলমখানা নিয়ে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ দেখি ওদিকের বারান্দায় রেলিং-এ ভর দিয়ে কে দাঁড়িয়ে। একটু এগিয়ে দেখি অতসী। সে কি! ও তখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছে! একটু দাঁড়াতেই বুঝলুম অতসী কাঁদছে। হ্যাঁ, কাঁদছেই। এই অতি সহিষ্ণু মেয়েটিও এতো বড়ো বিদ্রুপের কষাঘাত সইতে পারেনি। তাই ফুলে ফুলে কাঁদছে। ভাবলুম

কাছে গিয়ে পরেশের হয়ে, ক্ষমা চেয়ে আসি। দু'পা এগোতেই আমার পদশব্দে আরক্ত চোখ তুলে তাকালো অতসী। আমাকে দেখতে পেয়েই দ্রুত পদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হয়তো আমার মুখে কোনো ভাবান্তর হয়ে থাকবে, আমি ফিরে এসে দাঁড়াতেই পরেশ বললো, 'কলমটা হারালি বুঝি। দামী কলমটা।'

'না, কলম পেয়েছি। পরেশ, একটা কথা শোন্ ভাই, ও মেয়েটিকে তুই আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে নাজেহাল করিস্নে।'

এবার সবাই বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে চাইলো। পরেশ হেসে উঠলো, তীক্ষ্ন বিদ্রূপের হাসি নয়, সহজ পরিহাসের হাসি। বললো, 'শুনলি তো তোরা। বলু, তখন আমি মিথ্যে বলেছি। যাক্, মেয়েটার একটা হিল্লে হলো।'

'ঠাট্টা নয় ভাই। অতসী এতক্ষণ ওদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। আমায় দেখতে পেয়েই পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে পড়লো।'

এবার সবাই একটু থমকালো। সবার মনেই হয়তো একটু করুণা জেগে উঠেছিল। কেউ যখন কোনো কথা বলছিলো না, তখন হঠাৎ পরেশই বলে উঠলো, 'আচ্ছা কথা দিচ্ছি, কাল তোদের সবার সামনে অতসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো। আর কখনো কিছু বলবো না! দেখিস তোরা, সত্যি বলছি।'

পরদিন অতসী কলেজেই এলো না। তারপর দিনও না। পরেশের ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন ডুব মারলো। হঠাৎ একদিন শোনা গেল অতসী এ কলেজ ছেড়ে অন্য কোনো কলেজে ভর্তি হয়েছে! তারপর ক্রমে ক্রমে অতসীর প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল।

সেবার ফাইনাল হয়ে যাবার পর বড়দির কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে দেওঘর বেড়াতে গিয়েছিলাম। বেশ কিছুদিন পর কলকাতা ফিরে এসে যা শুনলাম তাতে চক্ষু স্থির। পরেশ বিয়ে করেছে। পাত্রী অতসী। সেদিনই ছুটলাম পরেশের বাড়িতে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে মূর্তিমান পরেশ। ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার উপর। গায়ের জোরে পিঠ চাপড়ে বললুম, 'কিরে হতভাগা, কি শুনছি এসব?'

পরেশ কোনো রকমে আমার কবল থেকে আত্মরক্ষা করে আমাকে ঘরে নিয়ে বসালো। বললো, 'বোস, বোস, কথা আছে তোর সঙ্গে।' তারপর ডাকলো, 'অতসী, অতসী। এদিকে এসো। দেখে যাও অনিল এসেছে।'

অতসী নত নেত্রে ঘরে ঢুকলো। নত নেত্রেই নমস্কার করলো। তারপর সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থ বধূর মতোই চা-জলখাবার দিয়ে সযত্ন পরিচর্যা করলো।

অতসী বেরিয়ে গেলে আমি বললুম, 'হঠাৎ কি করে পাশা উল্টালো ভাই! আমি তো ভেবে থই পাচ্ছি নে।'

'তুই-ই তো মূল।'

'মানে।'

পরেশ যা বললো—সেদিন আমার কাছে অতসীর চোখের জলের কাহিনী শুনেই পরেশের মন সজল হয়ে উঠেছিল। অথবা বলা যায় মনের গতি মোড় পরিবর্তন করেছিল। তারপর অতসী কলেজ ছেড়ে দেওয়াতে পরেশের মনে সত্যিই আঘাত লাগলো যে তার অত্যাচারেই এমন হলো। সে কাউকে না জানিয়ে অতসীর বাড়ি গিয়ে ক্ষমা চাইলো। তারপরও প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে প্রায়ই যেতো। অতসী কি মিশতে চায়! রূপহীনতার সঙ্কোচে সে নিজেকে সবার আড়ালেই রাখতে চায়। তার এই সঙ্কোচ ভাঙতে পরেশকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। যেদিন বিয়ের প্রস্তাব করলো পরেশ, অতসী তো কিছুতেই রাজি হয় না। বললো, 'ঝোঁকের মাথায় একটা অসম্ভব কাজ ক'রে পরে আফশোষ করলে আমার অপমান তাতে বাড়বেই। একটা ভুল শোধরাতে এসে ভুলের মাত্রা আর বাড়াবেন না।'

এই পর্যন্ত বলে পরেশ বললো, 'আমি সত্যিই অতসীকে বিয়ে করতে চাই, একথাটা তাকে বোঝাতে কি কম বেগ পেতে হয়েছিল? আর সত্যি ভাই, ও দেখতে ভালো নয়, মনটি কিন্তু ভারী সুন্দর।'

'একটা কিছু সুন্দর হতেই হবে। না হলে তোমার মতো 'চিজ'কে ঘায়েল করলো কি দিয়ে! কিন্তু তোমার মা-বাবার মত হলো কি ক'রে?'

'মা খুবই খুঁত খুঁত করছিলেন। বাবা কিন্তু খুশি। ছেলের

বিষয়বুদ্ধির যথেষ্ট তারিফ করলেন। অতসীর বাবা রজত-কাঞ্চন কোনোটা দিতেই ত্রুটি করেননি কি না।'

আপনারা হয়তো ভাবছেন 'স্রেফ গাঁজা।' লেখক-লেখিকারা কতো আজগুবি কথাই না লিখতে পারে। নয়তো ভাবছেন ঐ পরেশটার মাথা খারাপ হয়েছে। কিন্তু পরেশের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখুন ঘটনাটা নির্জলা সত্যি। সে এখনও অতসীকে নিয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে বহাল তবিয়তেই ঘরকন্না করছে।

হারানো স্বপ্ন

কলেজে পড়বার সময় নীলাঞ্জন স্বপ্ন দেখতো। অনেক অনেক স্বপ্ন। তখন সে বাংলা সাহিত্যের অনেক গল্প-উপন্যাস পড়ে ফেলেছে। ইংরেজী সাহিত্যও কিছু কিছু পড়েছে।

নীলাঞ্জনের চেহারাটা মোটামুটি ভালোই ছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নীলাঞ্জন অনায়াসে গল্প-উপন্যাসের নায়কদের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারতো। সেই এলোমেলো অজস্র স্বপ্নের মধ্যে একজন নায়িকাও যেন আনাগোনা করতো তার মনে। তবে স্পষ্টরূপে নয়। আভাসে, কল্পনায় একটি মুখ হয়তো গড়ে তুলতো কিন্তু বেশিক্ষণ তা ভাবনায় ধরে রাখতে পারতো না। হারিয়ে যেতো। যখন নীলাঞ্জন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেল তখন তার যৌবন আরও দানা বেঁধেছে। ভাসা-ভাসা স্বপ্নগুলো একটি নিটোল রূপ নিয়েছে। তার স্বপ্নের নায়িকা রূপ পেয়েছে কাজরীর মধ্যে, যে তার সহপাঠিনী এবং দেখতে অপূর্ব সুশ্রী। নীলাঞ্জন যখন তার কল্পনার বল্গাহীন ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে তার উপর চেপে বসতো তখন পাশে নায়িকারূপে দেখতে পেতো কাজরীকে। তার স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল কাজরী। নীলাঞ্জন মনে মনে ভবিষ্যতের ছবি আঁকতো—সে ভালো চাকরি পেয়েছে। একটি সুন্দর ফ্ল্যাট বাড়ি, সাজানো-গোছানো। খাটে পরিপাটি ক'রে বিছানা পাতা। ড্রেসিং টেবিলের ওপর টুকিটাকি প্রসাধনসামগ্রী। ফুলদানিতে ফুল। আলনায় সাজানো আধুনিক ডিজাইনের শাড়ি! সে ঘরে মেয়েলি চটি প'রে হালকা পায়ে ঘুরছে কে? কাজরী।

অথচ কাজরীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিলো না মোটেই। শুধু সাধারণ পরিচয় ছিলো। সে দূরে থেকেই কাজরীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতো।

নীলাঞ্জন পাস ক'রে বেরোল। তারপর শুরু হ'ল তার কর্মক্ষেত্র-পরিক্রমা। চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে। দরখাস্ত করে। ছুটোছুটি ক'রে ইনটারভিউ দেয়। তারপর আবার দরখাস্ত করে। এমনি ভাবে

পুরো চারটি বছর আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে আড়াইশো টাকার কেরানীগিরি ছাড়া আর কিছুই জোটাতে পারলো না নীলাঞ্জন। তার একটা স্বপ্ন হারিয়ে গেল।

এই সামান্য উপার্জন সম্বল ক'রে অনেক সাংসারিক কর্তব্য করতে হলো নীলাঞ্জনকে। মা-বাবার দায়িত্ব, ছোট ভাইয়ের পড়ার খরচ, ছোটো বোনের বিয়ে। সব কর্তব্য সারতে সারতে একদিন নীলাঞ্জন দেখলো তার জীবনের ওপর দিয়ে আরও দশটি বছর গড়িয়ে গেছে।

আত্মীয় বন্ধুরা চেপে ধরলো—এবার সংসার পাতো। আর কবে বিয়ে করবে? চুল উঠে যে তালু ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

নীলাঞ্জন হিসেব ক'রে দেখলো তার এই আয়ে ফ্ল্যাট বাড়ি নয়, পাঁচ ভাড়াটের বাড়িতে একখানা ঘর নিয়ে সংসার পাতা ছাড়া আর উপায় নেই। নীলাঞ্জনের আর একটা স্বপ্ন ভাঙলো। ফুলশয্যার রাত্রিতে আবার নতুন ক'রে মনে পড়লো কাজরীকে। ঘরে ঢুকেই আলোটা নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে নববধূর সংগে আলাপ করতে বসলো। বিয়ের আগে সে নিজে পাত্রী দেখে নি। শুভদৃষ্টির সময় ভালো ক'রে তাকায় নি। আগের দিন গেছে কালরাত। জীবনের এই স্বপ্নময় রাত্রিটিতে এক্ষুণি নববধূ অনুভার মুখের দিকে তাকিয়ে তার শেষ স্বপ্নকে চুরমার ক'রে দিতে ইচ্ছে হলো না নীলাঞ্জনের। অন্ততঃ একটা রাত্রি অন্ধকারের মধ্যে নীলাঞ্জন ভাবুক আলিংগনের মধ্যে যাকে ধরে রেখেছে কাজরীর মতো তার রঙ চাঁপাফুলের পাপড়িতে মাজা। চুলে অন্ধকার অরণ্য। প্রতিমার মতো কাটা কাটা মুখ। সর্বাংগ ঘিরে তেইশের লাবণ্য।

নীলাঞ্জন জানে আজকের রাত পোহালেই তার এই স্বপ্ন ভেংগে যাবে। সে শুনেছে অনুভার রঙ কালো না হলেও ফরসা নয়। ত্রিশোত্তর অনুভার গালের হাড় উদ্ধত। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। সামনের দাঁত দুটো সামান্য উঁচু। এর চেয়ে কম বয়স হলে নীলাঞ্জনের সঙ্গে মানাবেই বা কেন? আজকের রাত পোহালে দিনের আলোয় অনুভা তার সবটুকু রূপরেখা নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কাজরী চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে।

অবস্থা ও পরিবেশকে মেনে নেওয়াই মধ্যবিত্ত জীবনের প্রধান শিক্ষা।

নীলাঞ্জন পাঁচ ভাড়াটের বাড়ির একতলায় একখানা স্যাঁৎসেতে ঘরে নতুন খাট বিছিয়ে অনুভাকে নিয়ে সংসার পাতলো।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই চোখের সামনে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা, অফিসে যাবার সময় সযত্ন-পরিবেশিত ভাতের থালা, বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তার দিকে জানালায় পর্দার ফাঁকে প্রতীক্ষারত দুটি চোখ—সব মিলিয়ে মন্দ লাগলো না নীলাঞ্জনের।

মাঝে মাঝে অফিসের কিছু কিছু বাকি কাজ বাড়ি নিয়ে আসে নীলাঞ্জন। ছুটির দিনের দুপুরে বসে বসে কাজগুলো সেরে রাখে।

অনুভা পেছন দিক থেকে এসে গলা জড়িয়ে ধরে। নীলাঞ্জন হাতের কলম রেখে তার হাত দুটো নিজের হাতে নেয়। চেয়ারের পেছনে ঘাড় হেলিয়ে হেসে বলে—কি হলো ?

বাবাঃ ! ছুটির দিনে এতো কি কাজ ! আমি সহ্য করতে পারি না। ওঠো শিগগীর। চলো, বিকেলটা একটু বেড়িয়ে আসি।

আর একটু। এই তো হয়ে গেল !

অনুভা হাত বাড়িয়ে কাগজগুলো গুটিয়ে দেয়—না, আর একটুও নয়। ছুটির দিনটা তুমি শুধু আমার। এখানে আর কারও হাত পড়লে আমার সহ্য হবে না বলে দিচ্ছি।

নীলাঞ্জন হেসে উঠে পড়ে—বেশ, সম্পূর্ণ তোমার হাতেই আত্মসমর্পণ করা গেল। বলো, এবার কি করতে হবে।

অনুভা ভুরু বাঁকিয়ে বলে—চায়ের জল চাপিয়ে এসেছি। এবার চা খেতে হবে। তারপর হাত মুখ ধুয়ে, জামা কাপড় পরে তৈরি হতে হবে। আমাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে হবে। বাড়ি ফিরে আমি স্টোভে ভাত চাপাবো। তখন আমার সঙ্গে গল্প করতে হবে। তারপর খেতে হবে। তারপর—

তোমাকে নিয়ে ঘুমোতে হবে—নীলাঞ্জনের মুখে দুষ্টুমির হাসি।

এই ! যা-তা বলবে না বলছি—অনুভা ছিটকে সরে যায় চায়ের সরঞ্জামের কাছে।

বেশ লাগে নীলাঞ্জনের। বত্রিশের অনুভার মধ্যে যেন একটু একটু ক'রে লাবণ্য ফুটছে। খুশির লাবণ্য। তৃপ্তির লাবণ্য।

আজকাল আর কাজরীকে মনে পড়ে না নীলাঞ্জনের।

সারা সপ্তাহের আলস্য যেন অনুভা রবিবারের সকালের জন্য জমা ক'রে রাখে। শুধু গড়িয়ে গড়িয়ে ঘুমোয়। নীলাঞ্জন উঠে পড়ে, চায়ের তৃষ্ণা অনুভব করে। দুষ্টুমি ক'রে গানের সুরে অনুভাকে ডাকে—রাই জাগো রাই জাগো ওগো শুকসারী বলে—অনুভা চোখ মেলে হেসে ফেলে। বলে—শুকসারীর দায় পড়েছে। ওরা তোমার মতো জ্বালানে নয়। চা'ও খায় না।

বলে পাশ ফিরে আবার ঘুমোয়।

নীলাঞ্জন নাছোড়বান্দা, অনুভার পিঠে হাত রেখে আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দেয়—কত নিদ্রা যাও গো রাধে শ্যামনাগরের কোলে—

অনুভা হেসে ফেলে। বলে—ওমা, শ্যামনাগর তো একঘণ্টা আগে উঠে বসে আছে। মিছে অপবাদ দাও কেন?

অনুভার ঘুমভাঙা ফোলাফোলা চোখ দুটো বেশ সুন্দর দেখায়। সামনের দাঁত দু'টো একটু উঁচু হলেও হাসিটা মিষ্টি। নীলাঞ্জন ধীরে ধীরে নত হয়।

হয়তো নীলাঞ্জনের অনেক স্বপ্ন হারিয়ে গেছে। কিন্তু এই অতি সাধারণ ঘরটিতে সাদামাঠা জীবন-যাত্রায় যে টুকরো-টুকরো সুখ আর তৃপ্তিগুলোকে মাঝে মাঝে খুঁজে পায়, নীলাঞ্জনের কাছে তার মূল্যও কি নেহাৎ কম?

যা হারিয়ে গেছে তার জন্য আক্ষেপ না ক'রে যা হাতের কাছে ধরা দিচ্ছে তাকে কুড়িয়ে নেওয়াই কি ঠিক নয়?

স্বপ্নের কাশ্মীর গালিচাটা নীলাঞ্জন আজকাল তুলে রেখেছে। তার বদলে বিছিয়েছে সাধারণ পাটি। ব্যবহার করতে এও কিন্তু মন্দ নয়। অন্ততঃ নীলাঞ্জন আজকাল মোটেই অসুখী মনে করে না নিজেকে।

বিশ্বাস

তাপস ঘরে ঢুকেই মিলিকে বললো—এই মিলি, এক কাপ চা খাওয়া তো, ঘুরে ঘুরে গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

মিলি বললো—এই তো খানিক আগে চা খেয়ে বেরিয়েছো দাদা, এরই মধ্যে আবার চা চাই? গলা শুকিয়ে থাকে তো জল খাও, জল এনে দিচ্ছি।

—বাজে কথা রেখে এক কাপ চা করে দিবি কিনা তাই বল্।

করে দিতে তো আমার আপত্তি নেই! কিন্তু চা-চিনির ভাঁড়ার যে প্রায় শূন্য। মাসের শেষ না এখন! এখন চা করতে গেলে মা বকুনি লাগাবে।

—তাই বুঝি! দে তবে, এক গ্লাস জলই না হয় দে। হায় রে! এমনই কপাল করে এসেছিলাম যে বরাদ্দের বাইরে এক কাপ চাও জোটে না।

—কি করে জুটবে বলো। জিনিসপত্রের দাম কি হারে বাড়ছে জানো তো। বাবার এই সামান্য আয়ে কি কুলোয়! কি করে যে মাসের শেষ ক'টা দিন মা সংসার চালান সে শুধু জানি আমি।

—সত্যি, একটা চাকরি-বাকরি না হলে আর চলছে না।

মিলি একগ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে এলো। তাপস ঢকঢক করে জলটা খেয়ে খাটের ওপর শুয়ে পা নাচিয়ে নাচিয়ে পত্রিকা পড়তে লাগলো।

—এই দাদা, কিছু হলোটলো?

—কিসের?

—তোমার চাকরির।

—উহুঁ!

—জানো, আমিও চাকরির চেষ্টা করছি।

—তুই! চাকরি করবি? এই পি-ইউ বিদ্যে নিয়ে? হুঁ!

—বারে! আজকাল চাকরির জন্যে আবার বিদ্যে লাগে নাকি!

তাহলে এত শিক্ষিত ছেলে বেকার রয়েছে কেন? ধান্দা জানা চাই বুঝলে? স্রেফ ধান্দা।

তাপস হাতের কাগজ ফেলে উঠে বসলো। বললো—যা বলেছিস মিলি, সোজা রাস্তায় আজকাল আর কোনো কাজ হয় না। যা দেখছি, এবার থেকে ধান্দাই করতে হবে।

মধ্যবিত্ত সংসার বাবার উপার্জন সর্বসাকুল্যে সাড়ে তিনশো টাকা। মা বাবা, ওরা তিন বোন—মিলি, লিলি আর শেলী। দু' ভাই—তাপস আর মানস। এই সাত-জনের সংসার।

মাস ভোর টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি। সংসার চলে না। ধুঁকে ধুঁকে নাভিশ্বাস উঠে যায়।

কড়াক্রান্তির হিসেব করে করে মা'র মেজাজটা হয়ে গেছে রুক্ষ, রসকসহীন। বাবার চেহারাটা কেমন যেন দোমড়ানো। নির্বিকার, নির্জীব অসহায়, মনে হয় ভেতরে যেন কোনো অনুভূতি নেই। চোখের দৃষ্টি মাছের চোখের মতো নিষ্প্রাণ। শীর্ণ দেহটা কুঁজো হয়ে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে। দেখলেই বোঝা যায় জীবন-সংগ্রামে পর্যুদস্ত একটা মানুষ। অফিস যাওয়া আর বাড়ি ফেরা আর মাইনের টাকা ক'টা মা'র হাতে তুলে দেওয়া। এ সংসারে এটুকুই বাবার ভূমিকা। বাদবাকি সব মা।

মা কড়া হাতে সংসারের রাশ টেনে ধরে আছেন। সব দিকেই তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। টিপে টিপে সংসার খরচ চালান। কোথাও এদিক ওদিক হবার জো নেই। বেহিসেবীর ক্ষমা নেই মা'র কাছে। সেদিন মানস দশ টাকার নোট নিয়ে বাজারে গিয়েছিল। নোট ভাঙিয়ে বাজার করবে। হাতে এতগুলো টাকা থাকাতে সে বরাদ্দের বাইরে এক টাকা বেশি খরচ করে ফেলেছিল। সেজন্য মা মানসকে শুধু মারতে বাকি রেখেছিলেন। চার আনা পয়সা বাঁচাবার জন্য মা কতো কৃচ্ছ্রসাধন করে চলেন। বলতে গেলে মা যেন সংসার খরচের টুঁটি টিপে ধরে আছেন। মার নিপুণ পরিচালনায় সংসারের গতি একেবারে থেমে যাচ্ছে না।

রান্নাঘর থেকে মা'র উত্তপ্ত কণ্ঠ ভেসে এলো—ষাট পয়সা দাম নিলো কাচের গেলাসটার। একটা মাসও কাটলো না। ভেঙে চুরমার করলি।

এতো অসাবধান কেন ? একটু সাবধানে কাজ করতে পারিস না ? কাজের সময় মন থাকে কোথায় ?

তাপস বললো—ব্যাপার কি রে মিলি ! পরশুদিন না লিলি একটা কাচের গ্লাস ভেংগেছে ! আজ আবার ভাঙলো কে ?

মিলি একটু তাচ্ছিল্যের ভংগীতে বললো—আজ কেউ ভাংগেনি। পরশু দিনের কথাই তো হচ্ছে।

—সেই অশান্তি পর্বের জের আজও চলেছে ? কবে থামবে বলতে পারিস ?

যতোদিন না আর একটা গ্লাস আসছে। এখন মাসের শেষ। তহবিল একেবারেই শূন্য। এখন ষাট পয়সা কেন, এক পয়সাও বাড়তি খরচ করার মত অবস্থা নয়। বুঝলে ?

—সত্যি, এ অবস্থা আর সহ্য হয় না। কবে যে একটা কিছু হবে।

চেষ্টার চরম করছে তাপস মানস দু'জনেই। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না।

তাপস বি. এ. পাশ। মানস কলেজে পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। খরচ জোগানো সম্ভব হচ্ছিলো না। মা দু'বেলা ঠাকুরের আসনের সামনে বসে বিড়বিড় করে প্রার্থনা জানান। তাপস দু'একদিন কান পেতে শুনেছে, মা বলছেন—ঠাকুর, তাপু মানু ওদের দু'জনের ভালো চাকরি করে দাও। এ কষ্ট আর তো সইতে পারিনে। দোহাই ঠাকুর ! ওদের যেন ভালো চাকরি হয়।

তাপসের ঠোঁট দুটো বিদ্রূপের হাসিতে ঈষৎ বেঁকে যায়। ঠাকুর করে দেবেন চাকরি ! হায়রে !

মা তো জানে না কোম্পানির মস্ত মস্ত চেয়ারম্যানদের ভালো করে তেল দিতে না পারলে আজকাল চাকরি হয় না। মা'র ঠাকুরের চাইতে ওদের ক্ষমতা অনেক বেশি। তাপস এখন তাদেরই একজনকে তৈলাক্ত করবার চেষ্টা করছে ! দেখা যাক্—চাকরিটা যদি হয়।

কিছুদিন ধরে মা'র কান এড়িয়ে বাবার সংগে সলা-পরামর্শ করছিল তাপস। সেদিনও পিতা-পুত্রে কথাবার্তা হচ্ছিলো। বাবা নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাপসের দিকে তাকিয়ে বললেন—এতোগুলো টাকা। টাকাগুলো আমি মিলির বিয়ের জন্য রেখেছিলাম।

—টাকা তো ফিরেই পাচ্ছো বাবা। মাঝখান থেকে আমার একটা হিল্লে হয়ে যাচ্ছে। চাকরি হলে এই টাকা ঘরে ফিরে আসতে ক'দিন লাগবে?

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তোর মাকে একবার জিজ্ঞাসা করলে হতো না?

—না না—মাকে বলা চলবে না। সব ভেস্তে যাবে তাহলে। মা কিছুতেই টাকা হাতছাড়া করতে চাইবে না।

—কিন্তু এতোগুলো টাকা।

তুমি কিছু ভেবো না বাবা। দু'হাজার টাকার বিনিময়ে আমি সংসারের স্থায়ী সচ্ছলতা কিনে আনবো। চাকরি আমার হবেই। তখন মিলির বিয়ের দায়িত্বও আমিই নেব। রাঘব বোয়াল পাকড়েছি। বুঝলে বাবা! আর তুমি তো জানোই রাঘব বোয়ালের হাঁ একটু বড়োই থাকে। তাই টাকাটা একটু বেশি লাগছে। তবে চাকরির ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত। চাকরি হবেই।

তাপস সুখ ও আশ্বাসের হাসি হাসলো।

কিছুদিন পর।

তাপস বাড়ি ফিরে পাংশুমুখে বাবার ঘরে ঢুকলো। কি করে বাবাকে জানাবে সে একথা। এমন মার খাবে কল্পনাও করেনি সে। যাকে আলো ভেবেছিল এখন দেখছে সেটা আলেয়া।

তাপস কাঁদো কাঁদো গলায় বললো—বাবা, বুঝতে না পেরে এক সর্বনাশের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছি। লোকটা আমার টাকাগুলো আত্মসাৎ করে আমাকে প্রতারণা করেছে।

বাবা ভাবলেশহীন দু'চোখ তুলে তাপসের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সেই ঠাণ্ডা দৃষ্টি তাপসকে যেন চাবুক মারতে লাগলো।

এমন সময় মা এসে ঘরে ঢুকলেন। ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে ঘরের থমথমে ভাবটা তিনি অনুভব করলেন। বললেন—কি হলো তোমাদের?

তাপসের বুকের ভেতরটা ঢিপ্-ঢিপ্ করছিল। গলা শুকিয়ে উঠেছিল। মা জানতে পারলে এখন না জানি কি কাণ্ডই হবে।

বাবা তাঁর মৃতদৃষ্টি তাপসের মুখ থেকে সরিয়ে মা'র মুখের উপর

ফেললেন। বললেন, তাপুকে চাকরি করে দেবে বলে একটা লোক দু'হাজার টাকা ঠকিয়ে নিয়েছে।

মা'র চোখ কপালে উঠলো।—দু'হাজার টাকা! অতোটাকা ও পেলো কোথায়?

—আমি দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম যদি চাকরিটা হয়। এখন যে একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। কি করে মিলিকে পার করবো।

বাবার গলা ভেঙে আসতে লাগলো।

তাপস আতঙ্কে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক্ষুণি বুঝি মা রাগে যন্ত্রণায়, দুঃখে ফেটে পড়বেন। যে মা'র কাছে বেহিসেবী একটা টাকা খরচ করা মারাত্মক অপরাধ. মা চার আনা পয়সা বাঁচাবার জন্য নিজে অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করেন, যাট পয়সা ক্ষতির শোক হজম করতে যাঁর কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়! দু'হাজার টাকা, বলতে গেলে তাদের যথাসর্বস্ব খোয়া গেছে, জানতে পারলে শোকে তিনি হয়তো উন্মাদ-ই হয়ে যাবেন।

কিন্তু না, মা খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন—লোভে পড়ে কতো পাকা মাথারও বুদ্ধি নাশ হয় আর ও-তো ছেলেমানুষ।

তাপস চমকে উঠে মা'র দিকে তাকালো।

এই মুহূর্তে মা'র গলায় এমন সুর! মা'র মুখে এমন ভাষা সে কল্পনাও করতে পারেনি। মা বলে চললেন—অতোগুলো টাকা গেলে দুঃখ হয় বৈকি! কিন্তু কি আর করা। এটুকুই মঙ্গল যে তাপু নিজে ঠকেছে। অন্যকে ঠকায়নি। তাহলে সেটা হতো আমাদের মৃত্যুর মতো। যে ঠকে সে কখনও মরে না, যে ঠকায় সেই মরে।

তাপস অবাক বিস্ময়ে মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মা'র কণ্ঠ প্রত্যয়-দৃঢ়। যে শোকের ধাক্কায় তাপস বিদীর্ণ হয়ে যেতে চাইছে মা সেখানে আশ্চর্য স্থির। এত শক্তি মা পেলেন কোথায়?

বাবা তেমনি ভাঙা গলায় বললেন—কিন্তু মিলির বিয়ে! 'লোন' নিয়ে নিয়ে প্রভিডেণ্ট ফান্ডে তো আর কিছুই নেই। ঐ হাজার দুই টাকাই ছিলো।

—ও নিয়ে তুমি ভেবো না। নিয়তি যেদিন পূর্ণ হবে, দেখো, ঠিক টাকা জোগাড় হয়ে যাবে। আমরা তো কারো ক্ষতি করিনি গো।

তাপস পাথর হয়ে দেখছে। মা'র মুখে যেন একটি অখণ্ড বিশ্বাসের আলো ঝলমল করছে। মাকে এমন মহিমময়ীরূপে তো সে কখনও দেখেনি। অথবা দেখবার মতো চোখ তার একদিনও ছিলোনা। এতো বড়ো মার খেয়ে এমন সোজা থাকার শক্তি কোথায় পেলেন মা? ঠাকুরের আসনের সামনে বসে বিড়বিড় করে যে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করেন তার মধ্যে?

ঠাকুরের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতার মধ্যে? কি জানি।

মা বললেন, তোমরা এবার চানে যাও তো! আমার রান্না হয়ে গেছে—ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তাপস বিস্মিত দৃষ্টিতে মা'র গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কাচের স্বর্গ

ছায়া-ছায়া বিকেল আস্তে আস্তে সন্ধ্যার দিকে গড়িয়ে গেল। পশ্চিমের আকাশপ্রান্তে লাগলো গোধূলির রঙ্। একটা স্নিগ্ধ সুন্দর অলস-মন্থর পরিবেশ। কচি ঘাসের কোমলতায় পা ডুবিয়ে বসেছিল ওরা দু'জন।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে বসে ওরা আকাশ দেখলো, মাটি দেখলো। নরম দু'টি চারটি ঘাস ছিঁড়লো, দাঁতে কাটলো। নখ খুঁটলো। শান্তনু ঘড়ি দেখলো। নন্দিনী শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়ালো আর খুললো। তারপর এক সময় নন্দিনী বললো—আমাকে ডেকেছিলে কেন শান্তনু?

হঠাৎ নিজের হস্তরেখার প্রতি অসম্ভব মনোযোগী হয়ে পড়লো শান্তনু। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার দেখতে লাগলো। তারপর বললো—কেন ডেকেছি তা কি বুঝতে পারোনি নন্দিনী?

আমি কি জ্যোতিষী যে না বলতেই সব বুঝতে পারবো!

কিন্তু আমি জানি তোমার মন ঠিক বুঝতে পেরেছে। তুমি তোমার মনকে অস্বীকার করছো। আজ তিন বছর তোমার প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছি। কিন্তু তোমার কাছ থেকে আজও কোনো সাড়া পেলাম না নন্দিনী। আজ একটা কিছু বলো। কথা দাও—আমি তোমাকে নিয়ে যে স্বর্গ রচনার স্বপ্ন দেখছি, তুমি সে স্বপ্নকে সার্থক করবে। তোমার কাছে এটুকুই আমার আর্জি।

নন্দিনী দীর্ঘশ্বাস ফেললো, একটু সময় চুপ করে রইলো, তারপর বড়ো বড়ো দু'টো চোখ মেলে শান্তনুর মুখের দিকে তাকালো।

ততোক্ষণে আকাশে বেশ বড়ো হয়ে চাঁদ উঠেছে। শান্তনু দেখলো নন্দিনীর টলটলে দু'টো চোখে চাঁদের ছায়া পড়েছে। চিক চিক করছে আলো।

নন্দিনী বললো—তা হয় না শান্তনু।

হয় না! শান্তনু বিমর্ষ মুখে বসে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর

সজোরে নন্দিনীর একটি হাত চেপে ধরে বললো—কিন্তু কেন? কেন? কেন হয় না বলতে পারো? না কি আমি তোমার অযোগ্য?

বিশ্বাস করো শান্তনু, আমি পারি না, সত্যিই পারি না।

কেন পারো না? তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো?

শান্তনু, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।

তাহলে বলো বাধাটা কোথায়?

সে যে কি প্রচণ্ড বাধা তোমাকে কি করে বোঝাবো শান্তনু!—নন্দিনীর গলায় আক্ষেপ।

বোঝাতে হবে না। কোনো বাধা আমি মানি না। তুমি যদি আমাকে গ্রহণ করতে রাজি থাকো তবে এই তোমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি সব বাধা আমি জয় করবোই।

থাক্ থাক্, প্রতিজ্ঞা ক'রো না, যদি সে প্রতিজ্ঞা না রাখতে পারো! কেন ছোটো হতে যাবে!

তুমি কি মনে মনে ঠিক জেনে রেখেছ যে আমি প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবো না! কেন আমার উপর তোমার এই অবিশ্বাস নন্দিনী! এক কারণ হতে পারে আমি ব্রাহ্মণ, তুমি কায়স্থ। এজন্য আমার পরিবারে হয়তো প্রবল আপত্তিও হতে পারে। কিন্তু আমি তো বলেছি আমি ওসব সংস্কার মানি না। আমি আমার পরিবারের সব বাধা, সামাজিক সংস্কার তোমার জন্য সব জয় করবো।

নন্দিনী. তুমি রাজি হও। আজকের এই লগ্নটাকে ব্যর্থ হতে দিও না।

পারবে সব সংস্কার জয় করতে?—নন্দিনী অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে শান্তনুর দিকে তাকালো। তারপর—চলো আজ উঠি—বলে উঠে পড়লো।

তিন বছর ওদের পরিচয়, একই অফিসে কাজ করে ওরা। নন্দিনী প্রথম যেদিন কাজে এলো শান্তনুর উপর ভার ছিল তাকে কাজ বুঝিয়ে দেবার। আর—নন্দিনীর দীঘির মত টলটলে দু'টো চোখের দিকে তাকিয়ে শান্তনু ডুবলো। প্রথম দিনই ডুবলো।

তারপর দিন মাস বছর করে এই তিন বছর। এর মধ্যে দু'জনে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। শান্তনু আভাসে ইঙ্গিতে অনেক কিছু জানিয়েছে

কিন্তু নন্দিনীর দিক থেকে এতোটুকু সাড়া মেলেনি। কিন্তু সেদিন শান্তনু মরিয়া, জবাব তার চাই। তাই নন্দিনী উঠে পড়াতে সে দৃঢ়কণ্ঠে বললো—না নন্দিনী, এড়িয়ে গেলে চলবে না, জবাব তোমাকে দিতেই হবে।

সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে শান্তনু চিঠিটা পেলো, খাম খুলে দেখে নন্দিনীর চিঠি। সাগ্রহে পড়তে লাগলো চিঠিখানা। পড়া হয়ে গেলে চিঠিটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল শান্তনু। নন্দিনীর জবাব।

নন্দিনী লিখেছে—শান্তনু, তুমি আমার চোখের সামনে দিনের পর দিন যে স্বপ্নস্বর্গ রচনা করে চলেছো তার প্রলোভন আমার কাছেও বড়ো কম নয়। কিন্তু সেই অমৃত হাত বাড়িয়ে নিতে আমার হাত ওঠে না। কেন, তা তোমাকে জানাবো বলেই এই চিঠির অবতারণা। তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমার জন্য সব বাধা-নিষেধ তুমি জয় করবে। আগে আমার কাহিনী শোনো, তারপর তোমার কর্তব্য স্থির ক'রো। সব জেনেও যদি তুমি আমাকে ডাকো সেই মুহূর্তেই আমি সাড়া দেবো।

জ্ঞান হয়ে দেখেছি সংসারে মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। খুব ছোটো বেলায় সমবয়সীদের বাবাকে দেখে মাকে প্রশ্ন করতাম—মা, আমার বাবা নেই? মা বলতেন—নেই। আর একটু বড়ো হয়ে মা'র পোশাক বা আচরণ দেখে বুঝতেই পারিনি তিনি সধবা কি বিধবা। সাধারণ হিন্দু ঘরের মহিলাকে দেখে যেমন একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে, মাকে দেখে তা হতো না। একদিন মাকে বললাম—মা, বাবা নেই কিন্তু তাঁর একটা নাম তো ছিলো। নামটা জানতে পাবো না কেন?

জানতে চেয়ো না।

পিতৃপরিচয় না জানাটা যে কী বিশ্রী ব্যাপার ততোদিনে আমি জেনে ফেলেছি। আমি জেদ করলাম—তুমি বলো মা, আমি জানতে চাই।

আর সেই দিনই আমি জানতে পারলাম আমি কুমারী মেরীর সন্তান। মা স্পষ্ট গলায় বললেন তোমার পিতা নেই কিন্তু জন্মদাতা আছেন। আর আমার মনে হয় তার নামটা তোমার না জানাই ভালো।

একটা ঘৃণার স্রোত বয়ে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। মা বলে চললেন—

কি করে এক প্রতারক প্রতারণার কুয়াশায় দিগ্‌ভ্রান্ত করে মা'র এক দুর্বল মুহূর্তে আমাকে জন্ম দিয়ে পলাতক হয়। আর সংসার থেকে, সমাজ থেকে তাঁর হয় চির নির্বাসন।

শান্তনু, এই জন্যই—বার বার তুমি আমার মুখের সামনে অমৃতের পেয়ালা তুলে ধরেছো কিন্তু আমি তাতে চুমুক দিতে সাহস করিনি। তৃষ্ণা কি আমার নেই? অমৃতপানের ইচ্ছা কার না থাকে? কিন্তু কাউকে ঠকিয়ে তো সে অমৃত গ্রহণ করা চলে না।

এবার তুমি চিন্তা করো সমাজ সংস্কারের কতটা ঊর্ধ্বে তুমি উঠতে পারবে। এরপরও যদি তুমি আমায় ডাক দাও তবে সে আহ্বান উপেক্ষা করি, তেমন সাধ্য আমার নেই শান্তনু!

কেমন একটা অবসাদ ছেয়ে ফেলেছিল নন্দিনীকে। তাই দু'দিন অফিস যায়নি। দু'দিন পর অফিসে গিয়ে শান্তনুকে দেখতে পেলো না নন্দিনী। শুনলো—হঠাৎ ছুটি নিয়ে কলকাতার বাইরে গেছে।

আরও কিছুদিন পর শুনলো অনেক চেষ্টা-তদ্বির করে শান্তনু অন্যত্র বদলির হুকুম আদায় করেছে।

নন্দিনী বুঝলো সেই চিঠি পাবার পর শান্তনুর সংস্কার নন্দিনীর চোখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছে। তাই সে পালিয়ে বাঁচলো।

কাচের স্বর্গটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

নন্দিনী মৃদু হেসে অফিসের ফাইলপত্রের মধ্যে ডুব দিলো।

রঙ বদলায়

লেটার বক্সে চিঠি আছে কিনা হাতড়ে দেখছিল তাপ্তি। নাঃ, কোনো চিঠিপত্র নেই।

চিঠির বাক্স হাতড়ানো তাপ্তির এক ধরনের স্বপ্ন-বিলাস। যখনই দেখে পিওন লেটার বক্সে চিঠি ফেলে গেছে, সে চিঠি তুলে আনবার সময় ভাবতে ভাবতে যায়—যেন একটা সাংঘাতিক সুখবর আসে। তার নিজের জন্যই হোক বা মা বাবা দাদা পাপু শুভ—বাড়ির যে কোনো কারও জন্য হোক, একটা শাঁসালো সুখবর।

কিন্তু না। তেমন কোনো খবর তাপ্তির এই তেইশ বছরের জীবনে এলো না। যা আসে সেগুলো পিসীমা মাসীমা মামা মামীমার চিঠি। অনন্তকাল ধরে একঘেয়ে ছকে বাঁধা। তুমি কেমন আছো, আমি ভালো আছি। আর নয়তো কার বাতের ব্যথা বেড়েছে কার কন্যার দিকে একটি নাতি জন্মেছে এই সব সংবাদ। কেন যে মানুষ পয়সা খরচ করে আর সময় নষ্ট করে এই সব চিঠি লেখে। তাপ্তির তো এই ধরনের চিঠি পড়তে গেলে ক্লান্তি এসে যায়।

অবশ্য আরও একটা জিনিস আশা করে তাপ্তি। চাকরির জন্য দু' তিন জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়েছে। সেখান থেকে কোনো খবর আসে কিনা তার জন্যও উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করে সে।

বাড়িতে ঢুকলো সৌম্যকান্তি। তাপ্তিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো—কি রে কিছু খবর আছে ?

হ্যাঁ আছে।

কি খবর ?

পিসীমার বাতের ব্যথা বেড়েছে। ছোটো মামার মেয়ে আরতি এবার বি. এ. পাশ করতে পারেনি। মাসীমার মেয়ের দিকে এক নাতি হয়েছে—

আরে ধ্যাৎ ! কি মহাভারত শুরু করলি ! পিসী মাসীর খবর কে জানতে চাইছে ? তোর কোনো খবর আছে কিনা বল্।

আমার খবর ! আজ দুপুরে দারুণ ঘুমিয়েছি। ঘুমোবার আগে শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া পড়ে কেঁদেছি, বিকেলে চা খেয়েছি—

ইয়ার্কি হচ্ছে ? গাঁট্টা খেতে ইচ্ছে হয়েছে বুঝি ?

তাপ্তি নিরীহ মুখভঙ্গি করে বললো—বারে, কি জানতে চাইছিস না জানলে—

না, তুই জানিস না। সেই যে খুব সেজেগুজে ইন্টারভিউ দিলি, দু'দিন দিলি বাড়িতে বসে দুই পাত্র-পক্ষের সামনে, আর তিন জায়গায় দিলি চাকরির জন্য বাইরে।

তাপ্তি ঠোঁটের কোণে হাসি টিপে রেখে বললো—কোনটা আগে বলবো বল্।

আগে পাত্রপক্ষের খবর বল্।

এক পাত্রপক্ষ নীরব। তাই বলে মৌনং সম্মতি লক্ষণং ভাবিসনে। তার মানে কেটে পড়েছে। আর এক পাত্রপক্ষ দাবিদাওয়ার যা একখানা লিস্টি পাঠিয়েছে বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের ঐ ক'টা টাকায় কুলোবে বলে মনে হয় না।

এই আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষেও ?

তাই তো দেখছি।

আর চাকরির খবর ?

এতো সহজে শিকে ছিঁড়বে ভেবেছিস ? তেমন কপাল করে আসিনি রে দাদা। সে-সব জায়গায় এখনও লোক নিতে বাকি আছে নাকি ? দেখগে যা, হয়তো কোনো অফিসারের শ্যালকপুত্র সে-সব চেয়ারে বসে গেছে।

বা ভাইপো-ভাগ্নে—

উঁহু উঁহু! এখন কেউ নিজের ভাইপো-ভাগ্নেকে চাকরি করে দেয় না। দেয় শ্বশুর বাড়ির কুটুমদের।

তাহালে দেখছি তোর ঘরে বাইরে দু'রকমের ইন্টারভিউই মাঠে মারা গেল।

হাসিমুখে তাপ্তি বলে—তা গেল।

আমারও গেল। এবং যাচ্ছে। ওঃ, চাকরির জন্য ঘুরে ঘুরে হন্যে হয়ে গেলাম। কিন্তু একটাও লাগছে না। —বললো সৌম্য।

সত্যি, এদিকে বাবার রিটায়ার করার সময় হয়ে এলো। এর মধ্যে আমাদের দু'জনের কিছু কাজকর্ম না হলে কি করে চলবে! চাকরি আমাদের পেতেই হবে।

সৌম্য তাপ্তির দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসিমুখে বললো—পেতেই হবে।

জীবনের সবরকম ভাগ্যবিড়ম্বনাকে সকৌতুকে গ্রহণ করার আর্ট এদের জানা।

তাপ্তি বললো—তবে দাদা, বাবাকে বলে-কয়ে আমার ঘরে ইন্টারভিউ দেবার ব্যাপারটা আপাততঃ বন্ধ করতে হবে। ওসব এখন ভালো লাগছে না।

তা হয়ে গেলে মন্দটা কি! বাবা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা অন্য খাতে খরচ হবার আগে তোর একটা গতি করে হাল্কা হতে চান। তা পরিকল্পনাটা মন্দ নয়।

দাঁড়া, কিছুদিন চাকরি-বাকরি করি। তারপর গতি করিস।

দ্রুতগতি হলেই তো ভালো হয়।

দু'জনেই হেসে উঠলো।

সেদিন সৌম্যকান্তি বাড়ি ঢুকেই দেখলো বাড়ির হাওয়ায় যেন একটা খুশি খুশি সুর। সবার চোখে মুখে চাপা খুশির ছাপ। ছোটো বোন তৃপ্তিকে সৌম্য জিজ্ঞাসা করলো—কি হয়েছে রে পাপু! বাড়িতে একটা কিছু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তৃপ্তি হাসিমুখে তাপ্তিকে দেখালো—দিদিকে জিজ্ঞাসা করো।

তাপ্তির দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাতেই সে আবার তৃপ্তিকে দেখিয়ে দিলো—পাপুকে জিজ্ঞাসা কর।

সৌম্য ভ্রূকুঞ্চিত করে বললো—খুব আর্ট মারছিস যে। থাক, বলতে হবে না। এমন সময় মা এগিয়ে এলেন। বললেন—জানিস সমু, তাপুর চাকরি হয়েছে। আজই ডাকে চিঠি এলো।

তাই নাকি! কোনটারে? সৌম্যর গলায় বিস্ময় ও উত্তেজনা।

এ. জি.-তে।

ওঃ, এতোদিনে হলো তাহলে।

মুখে হাসি এঁকে খুশিখুশি চোখ দু'টো তুলে তাপ্তি সৌম্যর দিকে

তাকালো। বললো—তুইও তো গোটা কয় ইন্টারভিউ দিয়েছিস। আমাদের সংসারের পাথর-চাপা কপাল থেকে পাথরটা যখন নড়লো। এবার তোরও হয়ে যাবে।

হবে?

নিশ্চয়ই হবে।

সবাই আর একদফা খুশির হাসি হাসলো। কিন্তু দিনের পর দিন কাটতে লাগলো, ঘটনার পর ঘটনা এলো গেলো, সৌম্য এর পরও অনেক ইন্টারভিউ দিলো কিন্তু ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু জমা হলো না তার ঝুলিতে। কোনো জায়গা থেকেই তার ডাক এলো না।

সৌম্যর মনের ভেতরটা কেমন যেন চিড় খায়। চিড় ধরে বুঝি তাপ্তির সংগে সহজ সম্পর্কে, সহজ ব্যবহারেও। তাপ্তি যখন ন'টায় সেজেগুজে অফিসে যায়, সৌম্য ঈর্ষাকাতর চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। একটা তীব্র ঈর্ষা অহরহঃ তাকে পীড়িত করে। তাই তাপ্তির সংগে তার ব্যবহারও হয়ে পড়ে রূঢ়।

ইতিমধ্যে বাবা রিটায়ার করেছেন। এখন সংসারের বেশিটা ভরসা তাপ্তি। কাজেই তার বিয়ের ভাবনা আপাততঃ দূরে সরিয়ে রাখতে হয়েছে। তাপ্তি নিজেও মাকে জানিয়ে দিয়েছে—দাদার কিছু না হওয়া পর্যন্ত এসব ব্যাপার একেবারে ধামাচাপা দিয়ে রাখো দিকি।

সৌম্যকান্তি টিউশনি করে. দু'টো তিনটে চারটে—যখন যেমন জোটে। নিজের হাত-খরচা রেখে কিছু কিছু মা'র হাতে তুলেও দেয়। মাঝে মাঝে যখন টিউশনি ছেড়ে যায় তখন অসুবিধেয় পড়ে। এমনি অসুবিধে চলছিল সে সময়টা। তা সত্ত্বেও মা'র হাতে ক'টা টাকা তুলে দিলে তাপ্তি বললো—তোর তো এখন অসুবিধে যাচ্ছে দাদা, এসময়ে নাই বা দিলি, টাকাটা এখন তোর হাতেই রেখে দে।

তির্যক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সৌম্য বললো—নিজের খোরাকির ব্যবস্থাটাও তো করতে হয়।

তাপ্তি গম্ভীর হয়ে বললো—আমরা দু'মুঠো খেতে পেলে তুইও পাবি। তার জন্য অসুবিধে করেও তোকে টাকা দিতে হবে নাকি?

খাওয়াবে কে? নিজের রোজগারে অন্যকে খাওয়ানোর মধ্যে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ আছে। নারে? অহঙ্কারের গোড়ায় একটু ধোঁয়া

দেওয়া হয়। কিন্তু আমি—এতোদিন না হয় বাবার অন্ন ধ্বংস করেছি—এখন তোর অন্ন ধ্বংস করি কি করে?

তাপ্তি আহত হয়ে বললো—তুই দেখছি আজকাল আমার সব কথাই বড় উল্টো বুঝিস দাদা। আমি কিন্তু অতো ভেবে বলি নি। চাকরি পেয়েছি সেটা কি আমার অপরাধ যে তুই সব সময় আমাকে খোঁচা দিয়ে কথা বলিস!

চোখের জল চাপতে ঠোঁট কামড়ে ধরে তাপ্তি।

সৌম্যর এই রূঢ় পরিবর্তনটা তাপ্তির চোখে বড়ো বেশি করে ধরা পড়ে। সে আরও লক্ষ্য করে সৌম্যর ছোবলের লক্ষ্য যেন সে-ই। কি তার অপরাধ সে বুঝতে পারে না। যে দাদা বাড়িতে তার মনের প্রধান সংগী ছিল, একই সঙ্গে হাসি-কৌতুকে ওরা বাড়ি ভরিয়ে রাখতো, সেই দাদার মনটা চিড় খেলো কেন? কেন ভাটা পড়লো প্রাণের সম্পর্কে! দাদা তার বেকারত্বের হতাশা যন্ত্রণা কেন একা বহন করে? কেন আগেকার মতো তার ভাগ দেয় না তাপ্তিকে। দাদার চাকরি হচ্ছে না তার জন্য তাপ্তির দুঃখ কি কম?

তাপ্তি আগের মতোই ব্যাপারটাকে লঘু করতে চায়। বলে—তুই এতো ভাবছিস কেন দাদা, একটা কিছু হয়ে যাবেই।

সৌম্য গম্ভীর হয়ে থাকে। আগেকার মতো তাপ্তির হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে হাসিতে ঝঙ্কৃত হয়ে বলে না—হয়ে যাবেই।

সেদিন বিকেলে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সৌম্যর ঘরে ঢুকে তাপ্তি দেখলো সে শুয়ে আছে। ডাকলো—এই দাদা, তোর চা এনেছি।

সৌম্য উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল। হাত দু'টো বালিশের দু'পাশে, মুখটা দেয়ালের দিকে কাত করে ফেরানো, মুখ না ফিরিয়েই বললো—টেবিলের উপর রেখে যা।

তাপ্তি চায়ের কাপটা টেবিলের উপর রেখে ঝঙ্কার দিয়ে বললো—এই, অসময়ে শুয়ে আছিস কেন? ওঠ্ ওঠ্—বলে হাসতে হাসতে সৌম্যর চুলের গোছা ধরে টান মারলো।

সৌম্য উঠে বসলো। কোনো কথা বললো না, ঠাণ্ডা চোখে তাপ্তির দিকে চেয়ে রইলো।

তাপ্তি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বললো—তোর কি হয়েছে বলতো দাদা।

কিছু না।

আচ্ছা, তুই এতো ভেঙে পড়ছিস কেন দাদা, চেষ্টা করে যাচ্ছিস, দু'দিন আগে হোক পরে হোক একটা কিছু তো হবেই। তোর যেখানে মাস্টার ডিগ্রী রয়েছে—

ক্রূর দৃষ্টিতে তাপ্তির দিকে তাকিয়ে সৌম্য বললো—মেয়েদের মতো ছেলেদের অতো সহজে চাকরি হয় না। মাস্টার ডিগ্রী থাকলেও না। আমরা তো আর তোদের মত ছলাকলা জানি নে।

দাদা—আর্ত-গলায় চেঁচিয়ে ওঠে তাপ্তি। তুই—তুই এতো ছোটো হয়ে যাচ্ছিস।

তাপ্তি ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সৌম্য তার চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে শক্ত হয়ে বসে রইলো, হাতের কাছে চায়ের কাপ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—সেদিকে খেয়ালও নেই। সে বুঝতে পারে না তাপ্তির প্রতি তার মন কেন কারণে অকারণে বিষিয়ে ওঠে। আগে তো এমন হতো না। তাপ্তির চাকরি হয়েছে, তার হয়নি—এজন্যে কি? বুকের ভেতর ঈর্ষার সাপটা ক্রমাগত হিসহিস করে তাকে যেন জর্জরিত করে তোলে। তবু যদিও তাপ্তি তার বড়ো বোন হতো। সে ছোটো বোন হয়ে যা করছে সৌম্য বড়ো ভাই হয়ে তা পারছে না। এই অক্ষমতার লজ্জা এবং একটা অপমানবোধ তাকে যেন ক্ষিপ্ত করে তোলে, তাপ্তিকে সে সহ্য করতে পারে না, তাই মুখোমুখি হলেই ছোবল দিয়ে বসে। নিজের চুলের গোছা শক্ত মুঠিতে টেনে ধরলো সৌম্য সত্যি—তাপ্তি সত্যি কথাই বলেছে। সে সত্যিই খুব ছোটো হয়ে যাচ্ছে। সারাক্ষণ একটা আক্রোশ টগবগ করে ফুটছে তার বুকের ভেতরে। কিছুতেই মনের রাশ টানতে পারে না সে।

একটা নিশ্চিত প্রত্যাশার জায়গায় ধাক্কা খেয়ে এসে সেদিন সৌম্য একেবারে ভেঙে পড়লো। আগে তাপ্তি কাছে এসে বসতো। সেদিনের ঘটনার পর থেকে সে সৌম্যকে এড়িয়ে চলে। রাত্রিবেলা মা খেতে ডাকলে সৌম্য জবাব দিলো—আমার খিদে নেই। খাবো না।

পরদিন সকালে বেশ বেলা অবধি ঘুম থেকে না ওঠায় মা বললেন—সমু এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। ওকে ডাক তো পাপু।

খানিকক্ষণ পর তৃপ্তি এসে বললো—মা, দাদা যে কিছুতেই উঠছে

না। এতো করে দরজা ধাক্কা দিচ্ছ। অনেক ধাক্কাধাক্কির পরও যখন কেউ দরজা খুললো না, তখন দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকা হলো। দেখা গেল গলায় দড়ি দিয়ে সৌম্য কড়িকাঠে ঝুলছে। না, সৌম্য নয়, সৌম্যর প্রাণহীন দেহ। পুলিশ এসে সৌম্যর দেহ নামালো। সেই দেহ ঘিরে উথালপাথাল শোকের ঢেউ। আর্ত-গলায় পাগলের মতো কাঁদছেন মা। কাঁদছে অন্যরা, শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে আছে তাপ্তু! তার চোখে জল নেই, গলায় আর্তনাদ নেই। ছোটো ভাই শুভ্রকান্তির পিঠে হাত রেখে রুদ্ধকণ্ঠে বললো—কাঁদিসনে শুভ, কাঁদিসনে। দাদাটা কি বোকা রে শুভ। ও কেন জীবনের কাছে এমনভাবে হেরে গেল। এত সহজে কেন হার মানলো! তুই যেন কক্ষণো হেরে যাসনি শুভ। কোনো কিছুতেই হার মানবি না। জীবনকে জয় করে নেওয়াই মানুষের ধর্ম। এ'কথা যেন কক্ষণো ভুলে যাসনে শুভ। কক্ষণো না। বুঝলি?

ও দু'টি চোখ

বাড়িটার একতলায় বাস করতো বীথি আর প্রণব। দোতলায় সপরিবারে থাকতেন বাড়ির মালিক বনবিহারীবাবু, দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বীথিদের ঘরের সামনে টানা লম্বা বারান্দা পেরিয়ে বাইরে আসা-যাওয়ার রাস্তা। তাছাড়া, দুই পরিবারেরই জল কল বাথরুম একতলায়, যদিও আলাদা আলাদা, পুরনো ঢংয়ের বাড়ি, তাই দোতলায় জলের ব্যবস্থা নেই। কাজেই আসতে যেতে বাথরুমে যাবার পথে সবার সঙ্গে সবার মুখোমুখি দেখা হতো।

বীথি ও প্রণবের বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর। কিন্তু এখনও ওদের কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি। প্রণব চাকরি করে একটা পত্রিকা অফিসে আর বীথি একটা মেয়ে স্কুলে। সুখী দম্পতি। দু'জনে দু'জনকে নিয়ে মশগুল। পরস্পরকে নিয়ে পরিপূর্ণ। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা দু'টি জীবন।

দশটার মধ্যে দু'জনেই খেয়েদেয়ে কাজে বেরোয়। সকালবেলায় বীথি রান্না চড়ায়। চা খেয়ে প্রণব বাজারে যায়। ফিরে এসে এক এক দিন রান্নাঘরে হানা দেয়। বলে—দাও, আমি আজ রান্না করি।

বীথির হাত থেকে খুন্তি কেড়ে নিয়ে ঘটাং ঘটাং করে কড়ার মধ্যে খুন্তি চালায় প্রণব। বীথি হাঁ হাঁ করে ওঠে—আরে আরে করছো কি! মাছগুলো ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলছো যে!—কিংবা, তরকারি ঘেঁটে যে একেবারে গোবরের তাল হয়ে গেল।

প্রণব প্রাণপণে খুন্তি নাড়তে নাড়তে বলে—দাঁড়াও না রাঁধি, খেতে বসে দেখো একবার। তোমাকে ঘরের কাজে সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য। আমি যেমন বাইরে চাকরি করি তুমিও করো। তাহলে রান্নাঘরে তুমি একা খেটে মরবে কেন? আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

বীথি হেসে বলে—থাক থাক, সাহায্যের দরকার নেই আমার! আমার আরও কাজ বাড়ানো। ঐ রান্না করা তোমার কর্ম নয় মশাই।

তাহলে, 'আমার কর্ম'—এমন কিছু কাজই আমায় দাও। তোমায় সাহায্য করি। বীথি থালায় করে খানিকটা চাল এনে প্রণবের সামনে ধরে—এতোই যদি কাজ করার সখ তবে এই চালগুলো বাছো বসে বসে রেশনের চাল। কাঁকরে ভর্তি!

মনের আনন্দে চাল বাছে প্রণব। মনের আনন্দে রান্না করে বীথি। তারপর একসঙ্গে পাশাপাশি বসে হাসি গল্পে গুলজার খাওয়া পর্ব। প্রণব অফিসে রওনা হয়ে গেলে ঘরদোর গুছিয়ে দরজায় তালা মেরে বীথি বেরোতো। তারপর সন্ধ্যেয় বাড়ি ফেরা, কোনোদিন চা খেয়ে বাড়িতে বসেই গল্পগুজব, কোনোদিন একটু আধটু ঘুরে আসা। ছুটির দিন বিকেলে সিনেমা-থিয়েটার দেখা কিংবা আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি যাওয়া। বড়ো সুখেই দিন কাটছিল ওদের।

স্কুলের কাজেই এই একটা সুবিধে। বছরে প্রায় ছ'মাসই ছুটি। সে সময়টা বীথি বই পড়ে সেলাই করে কাটায়। আর অধৈর্য হয়ে প্রণবের জন্য অপেক্ষা করে।

বাড়িওয়ালা বনবিহারীবাবুর দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। সবার বড়ো সুবীর। বছর ত্রিশ বয়স হবে! দীর্ঘ গৌর দেহ। স্বাস্থ্যবান। সুদর্শন চেহারা। কিন্তু চোখ দু'টি দৃষ্টিহীন। সুবীর অন্ধ। ছোটোবেলায় অসাবধানতাবশতঃ চোখে আঘাত লেগে তার চোখ দু'টি নষ্ট হয়ে যায়। সুবীর চান করতে বা অন্য কোনো কাজে দিনে দু'চারবার নীচে নামে। বীথি দেখে কেমন নির্ভুল পায়ে হেঁটে সে কাজগুলো সেরে যায়। ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখাপড়াও শিখেছে।

বীথির মনটা কেমন করে ওঠে। এমন সুন্দর একটা বলিষ্ঠ পরিপূর্ণ মানুষ। তার ওপর বিধাতার একি অভিশাপ! অবশ্য বিধাতার এ অভিশাপ খণ্ডন করার উপায় এ যুগে ডাক্তারদের হাতে আছে। কিন্তু আই-ব্যাঙ্কে চোখের একান্ত অভাব। তাই সুবীর দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করে আছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না।

সবার চোখের আড়ালে বসে নিয়তি কোন্ কলকাঠি নাড়ে মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। সেদিন সুস্থ সবল প্রণব অফিস থেকে ফেরার পথে বাড়ির কাছাকাছি এসে অ্যাকসিডেন্টে পড়লো। দু'টো গাড়িতে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে একটা লাফিয়ে এসে পড়লো একেবারে প্রণবের

ওপর। সে তখন ফুটপাথে হাঁটছিলো। সংগে সংগে গুরুতর আহত হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়লো প্রণব। বাড়ির কাছাকাছি ঘটনাটা ঘটাতে অনেকে তাকে চিনতে পেরে একেবারে বাড়িতে এনে তুললো!

প্রণবের অবস্থা দেখে বীথি চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। এই বিপদে আপনজনের মতো পাশে এসে দাঁড়ালেন বনবিহারীবাবু। নিকটতম ডাক্তারকে ডেকে আনলেন প্রাথমিক ব্যবস্থার জন্য। হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সের জন্যও ফোন করে দিলেন।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে দেখে বললেন—ডেড।

বনবিহারীবাবু যখন বীথির কাছে তার আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা চাইছিলেন খবর দেওয়ার জন্য তখন এত শোকের মধ্যেও বীথি বললো—এর সংগে আই-ব্যাঙ্কেও একটু খবর দিয়ে দিন ওঁরা যেন এক্ষুণি চলে আসেন। আমি ওর চোখ দান করবো।

কথাটা শুনে সবাই চমকে উঠলো। বনবিহারীবাবুও ইতস্ততঃ করছিলেন। কিন্তু বীথি দৃঢ়কণ্ঠে আবার বললো—আমি ওর চোখ দান করবো আর তা দেবো আপনার ছেলের চিকিৎসার জন্য। দেরি করবেন না। তাহলে চোখ নষ্ট হয়ে যাবে। বনবিহারীবাবু বেদনায় কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেললেন।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। বীথি এই বাড়িতেই আছে। তার বাবা দাদা বা শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। সে যায়নি। কারণ, এখানে তার স্কুলের চাকরি আছে। বনবিহারীবাবু বলেছেন—তুমি যদি এখানে থাকতে চাও, নিশ্চিন্তমনে আমার মেয়ের মতো থাকতে পারো। তোমার ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না মা!

যেদিন সুবীর চিকিৎসা শেষে নতুন চোখ নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলো আনন্দের বন্যা বেয়ে গেল বাড়িতে। বীথি ঘরের ভেতর থেকে টের পেলো সুবীর এসেছে, কিন্তু দরজায় ভারী পর্দা ঝুলছে তাই দেখতে পেলো না। উঠে এসে দেখার সামর্থ্য তার ছিল না। শরীর অবশ, মন ততোধিক।

কিছুক্ষণ পরে দরজার সামনে সুবীরের বোন স্বপ্নার গলা শোনা গেল—বৌদি, দাদা তোমার সংগে দেখা করতে এসেছে।

পর্দা ঠেলে দু'ভাইবোনে ভেতরে ঢুকলো।

বীথি উঠে দাঁড়ালো। সুবীর দু'হাত জোড় করে বললো—যার সহৃদয়তায় আবার পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছি তাকে দেখতে এলাম আগে। নইলে অকৃতজ্ঞতা হবে।

বীথি কোনো জবাব দিলো না। শুধু মোহগ্রস্তের মত সুবীরের চোখ দু'টোর দিকে তাকিয়ে রইলো! ঐ চোখ যে তার প্রণবের। প্রণবের চোখ বীথিকে দেখছে। তারপর থেকে যেন নেশায় পেয়ে বসেছে বীথিকে। সুবীর হাঁটে চলে, বাইরে যায়, বীথির দু'চোখ নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে। আড়াল থেকে সারাক্ষণ তাকে লক্ষ্য করে বীথি।

সুবীরও মাঝে মাঝেই তার ঘরে আসে, সে যখন কথা বলে বীথি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে। কেমন একটা মোহ তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। সেই মোহ-আঁকা মুখের রেখায়, বিহ্বল চোখ দু'টোতে কি লেখা পড়ে সুবীর কে জানে? আস্তে আস্তে সাহস বাড়ে। আস্তে আস্তে তারও বুঝি মোহ জন্মায়।

সেদিন নিজের ঘরে বসে একমনে একটা বই পড়ছিল সুবীর। সে নিজের চোখে দেখে পড়তে পারছে—একথা ভাবতেই তার আনন্দে রোমাঞ্চ হচ্ছিল। এবং অবধারিতভাবেই বীথিকে মনে পড়ছিল। ঐ মেয়েটি তাকে অন্ধকার থেকে আলোর পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে। এমন সময় দরজার কাছে খুট করে একটা শব্দ হতে চোখ তুলে সুবীর দেখলো পর্দা সামান্য ফাঁক করে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বীথি।

সুবীর ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আসুন। বীথি ঘরে ঢুকলো। গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সুবীরের মুখের দিকে।

সুবীরের বুকের ভেতরটা তখন দুলছে। বীথির ঐ চাউনি তাকে কেমন যেন এলোমেলো করে দেয়। মনটা বল্গা হারিয়ে ফেলতে চায়।

বীথি আবেগঘন গলায় বললো— তোমার চোখ দু'টো বড়ো সুন্দর।

সুবীর আর মনের রাশ টানতে পারলো না। দুহাতে বীথির হাত দুখানা চেপে ধরে গাঢ়কণ্ঠে ফিসফিস করে বললো—এ চোখ তো তোমারই দান। এ চোখ তোমার।

সেইদিন থেকে সুবীরের রক্তে এক অনাস্বাদিত আনন্দের পুলক

জাগলো।

তার যাতায়াত বাড়লো বীথির ঘরে।

সুবীর বলতো আমি এলে তুমি বিরক্ত হও না তো?

বীথি গভীরকণ্ঠে বলতো—তুমি এসো। তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারি না।

সুবীর আবেশে রোমাঞ্চিত হতো।

সেদিন নিজের ঘরে ঘুমিয়েছিল সুবীর। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে পা বাড়িয়েছে। অপরাহ্নের পড়ন্ত রোদ জানালা গলিয়ে মেঝেয় নেমে আলোছায়ার আলপনা আঁকছিল। সুবীরের ঘুম ফিকে হয়ে এসেছে। হঠাৎ সে টের পেলো, কপালের ওপর কার মৃদু নিঃশ্বাসের উষ্ণতা। চোখের উপর নরম আঙুলের ছোঁয়া। কে যেন আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে। সুবীর তাকালো। দেখলো শিয়রে বসে আছে বীথি।

একলাফে সুবীর খাট থেকে নেমে পড়লো। প্রচণ্ড আবেগে দুই বাহুতে বীথিকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো—বীথি, বীথি, আমি তোমাকে ভালবাসি—তোমাকে ভালবাসি। বীথি ছিটকে সরে দাঁড়িয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে বললো—না-না-না—

সুবীর বললো—ধরা দিয়েও কেন আবার দূরে সরে যাও বীথি! কেন তুমি আমায় এত যন্ত্রণা দিচ্ছো। আমি যে সইতে পারছি না। তুমি কি আমায় ভালবাসো না?

ক্রন্দনরুদ্ধকণ্ঠে বীথি বললো—না না সুবীর। আমি শুধু তোমার চোখ দু'টোকে ভালোবাসি। ওই চোখ যে আমার প্রণবের। সুবীর, ও যে আমার প্রণবের চোখ।

'উত্তরভারতী'

সপিণ্ড

সুজাতা সুশ্রী। বেশ ঢলঢল মিষ্টি চেহারা। মায়ামায়া লাবণ্যভরা মুখখানি। একনজরেই চোখ পড়ে যায় তার দিকে। তাই পুষ্পেন্দুর বাবা আর কালক্ষেপ করলেন না। তাড়িঘড়ি কথাটা পেড়ে বসলেন।

পুষ্পেন্দুর বাবা পূর্ণেন্দু বিশ্বাস, সুজাতার বাবা শৈলেশ সরকারের বন্ধু। থাকেন আসানসোল। রেলওয়েতে চাকরি করেন। দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে এসেছেন সুজাতাদের বাড়ি।

শৈলেশ সরকার ও পূর্ণেন্দু বিশ্বাস সেই স্কুল-জীবন থেকেই পরস্পরের বন্ধু। স্কুলে একসঙ্গে পড়েছেন। কলেজে একসঙ্গে পড়েছেন। তারপর কর্মসূত্রে যদিও এক একজন এক একদিকে ছিটকে গেছেন তবু প্রথম দিকে সুযোগ পেলেই পরস্পর পরস্পরের কাছে ছুটে এসেছেন। তারপর কালচক্রে আস্তে আস্তে তা কমেছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শেষ দেখা হয় প্রায় দশ বছর আগে। দীর্ঘকাল বাদে আবার এই দেখা।

পূর্ণেন্দু বললেন—শৈলেশ, আমার পুষ্পর জন্য তোমার সুজাতাকে দাও। আগামী ফাল্গুনেই আমি পুষ্পর বিয়ে দিতে চাই।

শৈলেশ বিস্মিত হয়ে বললেন—বিয়ে! খুকুর! খুকু এই তো সবে আঠারোয় পা দিলো। এবার হায়ার সেকেন্ডারি দেবে। এখুনি বিয়ে কি! আরও পড়াশুনো করুক—।

পূর্ণেন্দু জোর দিয়ে বললেন—করুক না। আমার ঘরে গিয়ে করবে। তোমার কাছ থেকে কিছু অনাদরে থাকবে না আমার কাছে।

সে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু বয়সটা খুব কম কিনা—

পুষ্পর বয়সও তো এই সবে চব্বিশ। তুমি তাকে ভাল করেই জান। তবে তার সম্বন্ধে তোমার মনে যদি কোন সংশয় থাকে—

আরে না, না, সেসব কিছু নয়। পুষ্পর মতো এমন পাত্র বাংলা দেশে ক'টা আছে। এই বয়সে এমন চাকরি, তবে কিনা—

ওই তবে-টবেগুলো ছেড়ে দাও শৈলেশ।

পূর্ণেন্দুর নির্বন্ধাতিশয্যে সত্যিই পুষ্পেন্দুর সঙ্গে সুজাতার বিয়ে হয়ে গেল। বেশ মানিয়েছে দুটিতে, দুই পক্ষই খুশি হলো। এবার সবাই বলতে লাগলো—ভাল পাত্র পাওয়া গেলে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়াই তো ভালো।

পূর্ণেন্দু কথা রাখলেন বটে। সুজাতার পড়া বন্ধ হলো না। আর আদর যত্ন!

সুজাতার কমনীয় মুখে সবসময় যে আলো ঠিকরে পড়তো তাতেই বোঝা যেতো সে আদরে আছে কি অনাদরে আছে।

এমন রূপসী বৌ পেয়ে পুষ্পেন্দুও একেবারে বেসামাল। ঝালাপালা করে মারতো সুজাতাকে।

সুজাতা বলতো—আঃ, ছাড়ো দিকিনি। সব সময় জ্বালাতন। আমার কাজকর্ম নেই বুঝি!

পুষ্পেন্দু চাপা কৌতুকে বলতো—বা রে, বাবা কথা দিয়ে এনেছেন তোমাকে ওখান থেকেও এখানে বেশি আদরে রাখা হবে। শেষকালে আদরে কমতি হলে আমার বাবাকে তোমার বাবার কাছে বকুনি খেয়ে মরতে হবে।

সুজাতা খিলখিল করে হেসে ওঠে—আদর না ছাই! জ্বালাতন জ্বালাতন! একটু কমতি হলে রেহাই পাই।

পুষ্পেন্দু আরও গম্ভীর হয়ে বলে—না, বুড়ো বয়সে বাবার কাছে বকুনি খেতে পারবো না।

সুজাতা হেসে গড়িয়ে পড়তো। খুশির রামধনু উঠতো ওর মনের আকাশে। তার সারামুখে সেই রঙের প্রতিফলন।

বিয়ের বছর দেড়েক পর সুজাতার একটি ছেলে হলো। ছেলেটি যখন এক বছরের তখন ঘটলো সেই চরম সর্বনাশ। ট্রেন অ্যাক্সিডেণ্টে পুষ্পেন্দু মারা গেলো। বজ্রাহত হয়ে গেলো দুটো পরিবার। পূর্ণেন্দু আর্তকণ্ঠে বার-বার বলতে লাগলেন—আমায় ক্ষমা করো শৈলেশ, আমায় ক্ষমা করো।

তোমার কি দোষ।

আমিই সুজাতার এই সর্বনাশের 'নিমিত্ত' শৈলেশ। আমার যা

হবার তা তো হলোই কিন্তু আমি সেদিন এতো জোর না করলে তুমি হয়তো আজও মেয়ের বিয়ে দিতে না।

শৈলেশ শুধু বললেন—নিয়তি, সবই নিয়তি।

পুষ্পেন্দুর মা ছিলো না। সুজাতা নিজের মা বাবার কাছেই রয়ে গেলো।

কিছুদিন যেতেই শৈলেশ বলতে আরম্ভ করলেন—একুশ বছর বয়সে একটা মেয়ের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে! এ হতেই পারে না। আমি খুকুর আবার বিয়ে দেবো।

সবাই বললো—সে তো ভালো কথা। কিন্তু ছেলে রয়েছে যে একটি। এই অবস্থায় কে ওকে বিয়ে করবে।

বাংলাদেশে কি এমন উদার পাত্র একটিও পাওয়া যাবে না?

শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। সুজাতার ছেলে বাচ্চু যখন চার বছরের তখন নির্মল গুহ বাচ্চুর পুরো দায়িত্ব নিয়ে সুজাতাকে বিয়ে করলো।

সুজাতার মন পুষ্পেন্দুর জন্য আবার নতুন করে শোক অনুভব করলো। সুজাতা ভয় পেলো। সঙ্কোচে আড়ষ্ট হলো। কিন্তু প্রতিবাদ করবারও সাহস পেলো না। 'না' বলার মতো মনের জোর নেই। মন ভীরু হয়ে গেছে। নিতেও ভয় ছাড়তেও ভয়। পুষ্পেন্দু সুজাতার জীবন যতখানি ফাঁকা করে দিয়ে গেছে তা কি সম্পূর্ণ ভরলো! তবুও সে যেন একটা অবলম্বন পেলো।

আর অন্যরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। একুশ বছরের একটা জীবনকে তিলে তিলে ব্যর্থ হতে দেখলে কি সহ্য করা যায়!

একটা মস্ত বড়ো সমস্যার সমাধান হলো।

কিন্তু সমাধান কি হলো? গোল বাধালো ঐ একরত্তি ছেলে। সবাই যা স্বীকার করে নিলো ঐ ছেলে তা স্বীকার করলো না।

নির্মল আদর করে বাচ্চুকে বলে—বাচ্চু, আমি তোমাব কে হই বলতো?

জানি না।

আমি তোমার বাপি হই। বুঝলে?

কক্ষণো না। আমি আমার বাপির ছবি দেখেছি।

হ্যা বাচ্চু, আমি তোমার বাপি। কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তবে তুমি বলবে তোমার নাম পুলকেন্দু গুহ আর তোমার বাপির নাম নির্মল গুহ।

এঃ, মিছে কথা। আমার নাম পুলকেন্দু বিশ্বাস আর আমার বাপির নাম পুষ্পেন্দু বিশ্বাস। না মামণি?

অর্থাৎ এক কথায় নিজের নাম বা বাপের নাম ভুলিয়ে দেবার মতো কাঁচা ছেলে ও নয়।

সুজাতা অসহায় চোখে চেয়ে থাকে। কিছু বলতে পারে না। একদিন এই নামগুলো সুজাতাই তো বাচ্চুকে শিখিয়েছিলো। পাখির মতো পড়িয়েছিল। সুজাতার ড্রয়ারে পুষ্পেন্দুর একখানা ছবি ছিলো। একদিন সুজাতা দেখে বাচ্চু কি করে ড্রয়ার খুলে ছবিখানা বের করেছে। সামনে রেখে হাত জোড় করে প্রণাম করছে। সুজাতাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো—এই তো আমার বাপির ছবি। না মামণি?

সুজাতার বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠলো। এক সময়ে সুজাতাই রোজ বাচ্চুকে ছবিখানা দেখিয়ে বলতো—বাচ্চু, এই তোমার বাপির ছবি। প্রণাম কর। বলে দু'টি কচিহাত জোড় করে প্রণাম করা শেখাতো।

সুজাতার মুখে কোনো কথা জোগালো না। শুধু বাচ্চুর হাত থেকে ছবিখানা নিয়ে আলমারিতে তুলে রাখলো।

এমনি করে বাচ্চু সুজাতার নতুন সংসারে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো যেদিকটা সুজাতা আগে কখনও ভাবেনি। সুজাতা কি ভুল করলো? একদিন যা হারিয়েছিলো তা কি সুজাতা আবার ফিরে পেয়েছে? সেই মন, সেই রঙ। কখনো না। কখনো না। উপরন্তু বাচ্চুর প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণ সুজাতার মনকে থেঁতলে দিচ্ছে, রক্তাক্ত করে দিচ্ছে। সুজাতা আজকাল বাচ্চুকে ভয় করে। এই ছেলে যখন আরও বড়ো হবে—আরও বড়ো—তখন? সুজাতা শিউরে ওঠে।

ইতিমধ্যে সুজাতার আরও একটি ছেলে হয়েছে। তারপর একটি মেয়ে, বুলু আর রাণু। তারা নির্মলকে 'বাপি' ডাকতো, বাচ্চু কিন্তু কিছুই ডাকতো না। হয়তো সুজাতা কখনও বলে ফেলেছে—বাচ্চু, বাপিকে ডাকতো, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

অমনি বাচ্চু গম্ভীর মুখে জবাব দিতো—তুমি কি জান না মামণি যে ও আমার বাপি নয়। ও কি দেখতে ছবির বাপির মতো?

স্কুলে ভর্তি হবার সময়ও বাচ্চু নাম নিয়ে তুলকালাম করে ছাড়লো। নির্মল বাধ্য হলো তার নাম পুলকেন্দু বিশ্বাস এবং বাবার নাম স্বর্গীয় পুষ্পেন্দু বিশ্বাস দিতে, শুধু অভিভাবক হিসেবে নির্মল গুহ নামটা রইলো।

ইতিমধ্যে বুলু আর রাণু বড়ো হয়েছে। আজকাল অনেককিছু তাদেরও চোখে পড়ে। তারা বলে—মামণি, আমাদের বাপি দাদার কি হয়? দাদা তাকে 'বাপি' বলে না কেন? বা—মামণি, আমরা নামের পরে গুহ লিখি, দাদা বিশ্বাস লেখে কেন? এই প্রশ্নগুলোর কি জবাব দেবে সুজাতা? তার মনে হয় একটা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে একরাশ সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সে।

'এ দেশের মেয়ে'

আঘাত

এ পাড়ায় নূতন উঠে এসেছে পর্ণশ্রীরা। পর্ণশ্রীর বাবা একটা নামী কোম্পানির অফিসার ছিলেন। রিটায়ার করার পর এ পাড়ায় বাড়ি করে উঠে এসেছেন। পর্ণশ্রীর দাদা পুণ্যব্রত একজন সদ্য পাস করা এবং সদ্য কর্মনিযুক্ত ইঞ্জিনীয়ার। ওরা এক ভাই দু'বোন। বড় বোন শান্ত-শ্রীর বিয়ে হয়ে গেছে তিন বছর আগে, পর্ণশ্রী সদ্য কলেজে ঢুকেছে।

বাড়ি থেকে বড়ো রাস্তায় যেতে গলির মোড়ে যে বড়ো বাড়িটা রয়েছে তার সামনে রকে বসে থাকে পাড়ার একদল ছেলে। পর্ণশ্রীকে কলেজ যাবার পথে ঐ বাড়িটার সামনে দিয়েই যেতে হয়। আর গেলেই টিটকিরির বান ছোটে।

এই যে, নয়া আমদানি।

বেড়ে মাল কিন্তু।

কি ডাটুস দেখেছিস?

হুঁ, অহঙ্কারের ছটায় চোখ ধেঁধে যায় রে ভাই। কেউ হয়তো গান ধরে—আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো গরবিনী—

অন্যজন পাদপূরণ করে—আমি খাবি খাই তব রূপ-সমুদ্রে, ওগো — ওগো—এই ন্যাপলা, বলু না এর পর কি লাগাবো?

সবাই উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে। জিতু বলে—তোর কবিত্বে আর কুলোলো না বুঝি রতন। লাগিয়ে দে কলেজগামিনী।

না না, তরঙ্গিণী।

তার চেয়ে সোনামণি বসিয়ে দে না গুরু, বেশ আদুরে আদুরে হবে।

সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ে।

পরদিন হয়তো নতুন ছড়া শোনা যায়—

সোনামণি সোনামুখ তুইলা চাও না
মিঠামিঠা দুইটা কথা কইয়া যাও না।

রতন ছেলেটা বেশ ছড়া বানাতে পারে।

সবই কানে যায় পর্ণশ্রীর। সবই বুঝতে পারে! রাগে গা চিড়বিড় করে, কিন্তু যেন কিছু হয়নি এমনি ভাব করে আপন মনে চলে যায়। জানে প্রতিবাদ করতে গেলে আরও পেছনে লাগবে।

সেদিন বাড়িতে কোনো ব্যাপার নিয়ে পর্ণশ্রীর মেজাজ আগে থেকেই বিগড়ে ছিলো, তার উপর কলেজ যাবার পথে এই টিটকিরির ফুলঝুরি। আর মেজাজ ধরে রাখতে পারলো না পর্ণশ্রী, ঘুরে রুখে দাঁড়িয়ে বললো —কি, পেয়েছেন কি আপনারা? এতোটুকু ভদ্রতাজ্ঞান নেই আপনাদের?

পর্ণশ্রী রুখে দাঁড়াবে এটা ওরা ভাবতে পারেনি, তাই প্রথমটা কেমন হকচকিয়ে গেলো। তা ছাড়া, ওরাই তো দুনিয়াসুদ্ধু লোককে কথায় কথায় শাসায়। ওদেরও যে কেউ শাসাতে পারে তা ভাবতে পারে নি, তাই কিছুক্ষণ কারও মুখে কথা যোগালো না।

এমন কুরুচি কেন আপনাদের? আপনাদের কি কোনো কাজকর্ম নেই রকে বসে আড্ডা মারা ছাড়া?

এবার ওদের মুখে কথা ফুটলো। নীলমণি বললো—ওঃ, খুব বাতেলা দিচ্ছে! কি কাজ করবো? আমাদের কি কারও চাকরি-বাকরি আছে! আর কাজ অতো সস্তা নয় যে হাত বাড়িয়ে চাইলেই পাওয়া যাবে। আমরা সবাই বেকার। রকে বসে আড্ডা মারবো না তো করবোটা কি?

পর্ণশ্রী দাঁতে দাঁত চেপে বললো, বেকার বলেই বদ ইতরামো করতে হবে নাকি? আর কোনো কাজ না থাকে, ঘরে বসে বই পড়ুন না, তা হলেও অন্ততঃ মনটা এমন ডাস্টবিন হয়ে উঠবে না।

লম্বা ফরসা একমাথা কোঁকড়ানো চুল একটি ছেলে এতক্ষণ চুপ করে রকে বসে ছিলো, এবার লাফ দিয়ে তেড়ে এলো, খপ্ করে পর্ণশ্রীর একটা হাত চেপে ধরে চোখ পাকিয়ে বললো, কথা হিসেব করে বলতে হয়।

দারুণ ভয় পেয়ে গেলো পর্ণশ্রী। বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছে। কিন্তু বাইরে তা বিন্দুমাত্রও প্রকাশ করলো না। স্থির গলায় বললো, কাজও হিসেব করে করতে হয়। কিন্তু হাত ধরেছেন কেন? হাত

ছাড়ুন, যা বলার মুখে বলুন। আমাদের বাড়ির মেয়েদের হাত ধরতে অনেক যোগ্যতার দরকার হয়। রকবাজ হয়ে তা পারা যায় না।

দু'জনেই দু'জনের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো। ছেলেটি আস্তে আস্তে মুঠো শিথিল করে নিঃশব্দে হাতটা ছেড়ে দিলো।

রুখে দাঁড়াবার ফল কিন্তু ভালোই হলো। তারপর থেকে পূর্ণশ্রী লক্ষ্য করতো, রকে মূর্তিমানরা সবাই হাজির, কিন্তু কোনো মন্তব্য-টন্তব্য নেই।

আসলে ওদের সবাই ভয় পায়, কি করতে কি করে বসে, তাই কেউ ওদের শুধরে দেয় না। জীবনের আনন্দ কোথা থেকে কিভাবে আহরণ করতে হবে, সে পথের সন্ধান ওরা জানে না বলেই আঁকাবাঁকা রাস্তায় চলে। পূর্ণশ্রী ঠিক সেই জায়গাতেই ওদের ধাক্কা দিয়েছে।

আর সেই থেকে উৎপাতও বন্ধ হয়েছে। এদিকে রকের আড্ডায় দোস্ত মহলে রীতিমতো গুঞ্জন উঠলো—আরে সতেটার কি হলো বলু তো? সেদিন ঐ মেয়েটার দাবড়ানি খেয়ে একেবারে মিইয়ে গেলো নাকি! রকের আড্ডাটাই মাটি করে দিলে! সতে না থাকলে ঠিক জমে না।

সতুকে কিন্তু আর রকের আড্ডায় দেখা গেলো না। সেদিনের পর থেকে সতু একদম হাওয়া।

পূর্ণশ্রীও আসতে-যেতে আড়চোখে লক্ষ্য করে, তাকে দেখলে ওরা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে না দেখার ভান করে। বাব্বা! একটা যন্ত্রণা থেকে বেঁচেছে সে। কিন্তু ঐ তেড়ে আসা ছেলেটাকে আর দেখা যাচ্ছে না তো, চেহারাখানা তো বেশ কার্তিক-কার্তিক। পড়াশুনোয় নিশ্চয় গাড্ডু। নইলে দিনরাত রকে বসে বাঁদরামো করে? মাগো! একেবারে গুণ্ডা একটা! গুণ্ডা! কি অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো তার চোখের দিকে। পূর্ণশ্রীর বুকের ভেতরটা কেমন সিরসির করে উঠেছিলো। ভয় পেয়েছিলো সে। ছেলেটার ডান চোখের ঠিক নীচে একটা বড় কালো আঁচিল। তা টকটকে ফরসা মুখে ওটা মানিয়েছে ভালোই।

রাঙা মুলো! গুণ্ডা!

ছেলের সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন সতুর মা-বাবা,

পড়াশুনো গোল্লায় গেছে। বি, এস-সি, পার্ট টু পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে কিনা ভরসা কম। বই নিয়ে মোটেই বসে না। রাতদিন রকে বসে আড্ডা দেওয়া, সিনেমা দেখা। আর বন্ধুবান্ধবও জুটেছে তেমনি। যত মায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো ছেলে। শাসন বা সংশোধন করতে গেলে উলটো ফল দাঁড়ায়। তাই মা-বাবা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই ছেলের মধ্যে হঠাৎ তাঁরা কি এক পরিবর্তন দেখতে পেলেন। সব সময় গম্ভীর, প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বেরোয় না। পড়াশুনোর দিকেও বেশ ঝুঁকেছে।

আসলে পূর্ণশ্রীর কথাগুলো ভীষণ ধাক্কা মেরেছিলো সতুকে। অবশ্য সে মনে মনে স্বীকার করে, ঐভাবে তেড়ে গিয়ে মেয়েটার হাত ধরা তার উচিত হয়নি। কিন্তু সে সময় চড়াং করে তার মাথায় রাগ চড়ে গিয়েছিল যে। এমন আঁতে ঘা দিয়ে কথা বললো মেয়েটা, যেন সাংঘাতিক একখানা শক্তিশেল হানলো। এতো অহঙ্কার! ঠিক আছে মেয়ে। আমার চোখ রইলো তোমার দিকে। তোমাকে আমি দেখে নেবো।

একটা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে রাগ আর জেদের তাড়নায় সতু যেন ধ্যানের আসনে বসলো। দেখি মেয়ে, ঐ হাত ধরতে কত নিষ্ঠা আর অধ্যবসায়, কত চেষ্টা আর পরিশ্রমের দরকার হয়। তোমার ঐ অহঙ্কার গুঁড়িয়ে দিতে কতখানি শক্তির প্রয়োজন। হে ঈশ্বর! তুমি আমার সহায় থেকো। আর ভাগ্যদেবতা! তুমি আমাকে সাহায্য করো যেন আমি সে শক্তি অর্জন করতে পারি।

সতুর পরীক্ষা হয়ে যেতেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। বোম্বেতে তার এক পিসীমা থাকেন, চলে গেলো তাঁর কাছে। মা বলেছিলেন—ওখানে গিয়ে কি করবি ?

সতু বললো—এখানে থেকেই বা কি করবো ? বছরের পর বছর তো শুধু চাকরির দরখাস্ত করবো। তার চেয়ে বেরিয়ে পড়ে দেখি না।

সতু ভেবেছিলো, তার চেহারাখানা তো রীতিমতো চোখে পড়ার মতো। বোম্বে গিয়ে একটা ফিল্মস্টার হওয়া যায় কিনা। কিন্তু সেখানে গিয়ে মন ঘুরে গেলো তার! সেই আত্মীয়ের সুপারিশে সুযোগ পেয়ে গেলো একটা উইভিং মিলে অ্যাপ্রেনটিস হিসেবে কাজ

করার। তার পরের পাঁচ বছরের ইতিহাস জানে শুধু সে। সেকি কঠোর পরিশ্রম, নাছোড়বান্দা চেষ্টা, সেকি একাগ্রতা, বড় হবার জন্য জীবন-মরণ পণ। একনিষ্ঠ পরিশ্রমের পুরস্কারও মিললো, পাঁচ বছর পর যখন বাড়ি ফিরে এলো, তখন সত্য একটা নামকরা বড় উইভিং মিলের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। মোটা টাকা মাইনে পায়। কর্তৃপক্ষের সপ্রশংস দৃষ্টি এবং পুরোপুরি বিশ্বাস ও আস্থা তার উপর।

ঈশ্বর দয়া করেছেন। ভাগ্যদেবতাও বুঝি সত্যজিৎকে বিমুখ করবেন না। ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছেন।

পর্ণশ্রীদের বাড়িতে ঘটক গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিতেই লুফে নিলো তার মা-বাবা। লোভনীয় পাত্র। ছেলেটির চেহারাখানা যেমনি রাজপুত্রের মতো, তেমনি যোগ্যতা। কবেকার কি একটা ঘটনা বা দু'এক নজর দেখা একটা মানুষ পর্ণশ্রীর স্মৃতির ধারে-কাছেও কিছু ছিলো না। শুধু পাত্র যখন পাত্রী দেখতে গিয়েছিলো তখন তার মুখখানা যেন একটু চেনাচেনা মনে হয়েছিলো পর্ণশ্রীর। তা হতে পারে, এখন বোম্বে থাকে বটে, আগে নাকি এই কলকাতায়ই থাকতো। তখন হয়তো কোথাও দেখেছে, রাস্তায় ট্রামে-বাসে বা অন্য কোথাও। তা ছাড়া, এক একটা মানুষকে এমন মনে হয়, যেন কতকালের চেনা, যেন জন্মজন্মান্তরের চেনা। পর্ণশ্রীর নিশ্চয় এখানেই বিয়ে হবে।

ফুলশয্যার শুভরাতে ফুলের গন্ধ আর নীলাভ আলোর মায়ায় পুষ্পসজ্জিতা পর্ণশ্রীর পাশে বসে সত্যজিৎ নববধূর একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিলো, মনে মনে একচোট হেসে নিয়ে বললো—তুমি যেমন আশা করেছিলে, আমাকে পেয়ে তোমার সে প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে তো?

পর্ণশ্রী একটু সলজ্জ হাসি হাসলো।

হাসবে না তো কি। এসব কথার জবাব দেওয়া যায় নাকি? দেখতে খুব ভালো কিনা, তাই পর্ণশ্রীর মুখ থেকে একটু শুনে নিতে চায়। চেহারার প্রশংসা শোনার লোভ আর কি!

সত্যজিৎ বললো—কই, জবাব দিলে না তো?

সলজ্জ হাস্যে পর্ণশ্রী বললো—সব কথার বুঝি মুখ ফুটে জবাব দিতে হয়! এমনিতে বোঝা যায় না?

কিন্তু সত্যজিৎ যে পর্ণশ্রীর মুখের কথাই শুনতে চায়।

তাহলে আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে বলো।

ইস্! চেহারার প্রশংসা শোনার কি লোভ!

সত্যজিৎ হাসলো। বললো—আজ এই মুহূর্তে তোমার ভাগ্যটাকে কেমন মনে হচ্ছে পর্ণা?

আমার মা-বাবা দাদা-দিদি সবাই মনে করেন, আমার ভাগ্য খুব ভালো।

আর তুমি নিজে কি মনে করো?

বাব্বা! কি মানুষ! একটু রেখে ঢেকে বলার জো নেই। একেবারে সবটুকু শুনে নেওয়া চাই। লোভী কোথাকার!

হাসিতে লজ্জা ও খুশির ইন্দ্রধনু ফুটিয়ে পর্ণশ্রী বললো—আমিও তাই বলি।

সত্যজিৎ পর্ণশ্রীর হাতে একটু জোরে চাপ দিয়ে হাসিমুখে বললো—তোমাদের বাড়ির মেয়েদের হাত ধরতে যতোখানি যোগ্যতা থাকা দরকার ততোখানি যোগ্যতা আমার আছে তাহলে, কি বলো? অবিশ্যি সে যোগ্যতা অর্জন করার প্রেরণা তোমার কাছ থেকেই আমি পেয়েছি।

হঠাৎ যেন বিস্ময়ে ছিটকে উঠলো পর্ণশ্রী। অনেকদিন আগে দেখা একটা ছবির উপর থেকে বিস্মৃতির আবরণ সরে গেলো। সেই নীলাভ মৃদু আলোতেও সত্যজিতের ডান চোখের ঠিক নীচে কালো আঁচিলটা স্পষ্ট দেখতে পেলো সে।

সেদিনের রূঢ়তা ও প্রগলভতার কথা মনে করে প্রথমে পর্ণশ্রী সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো। তারপরই তার মনে হলো—শিল্পী আঘাত করে করেই সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করে। পর্ণশ্রীর আঘাতেই যদি সত্যজিৎ ধুলোর আসন থেকে উঠে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকে তবে তাতে পর্ণশ্রীরও যে গৌরব।

পলাশ ফুল গোলাপ হয়েছে, তার মধ্যে সুগন্ধটুকু সঞ্চারিত করার কৃতিত্ব পর্ণশ্রীর।

এবার পর্ণশ্রীর বুক গৌরবে ভরে উঠলো। সে সত্যজিতের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো, যেমন করে শিল্পী তার নিজের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে।

অন্য মৃত্যু

মাথার চুল তিন ভাগই পাকা। সিঁথিতে আবছা সিঁদুরের দাগ। একখানা ফর্সা তাঁতের শাড়ি সাধারণভাবে পরা। যদিও চেহারার মধ্যে অনেক পোড় খাওয়ার চিহ্ন ফুটে রয়েছে, তবু বেশ একটা আভিজাত্য এবং ব্যক্তিত্বের ছাপও রয়েছে। প্রথম দর্শনেই মানুষ খুব একটা অবহেলা করতে পারবে না।

মহিলার কাঁধে ঝোলানো একটা বড়ো কাপড়ের ব্যাগ। তার মধ্যে সিঁদুর, তরল আলতা, স্নো, পাউডার ইত্যাদি প্রসাধনী দ্রব্য। কোনো কোম্পানির মহিলা বিক্রয়কারিণী। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে খুব আস্তে কড়া নাড়লো সে আলতো হাতে। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো শ্রীরূপা। কাঁধে ঝোলা দেখেই অনুমান করলো ব্যাপার কি। সকালবেলা হাতে হরেক-রকম কাজ, হরেক-রকম ব্যস্ততা। এখন কিছুতেই ওসব নিয়ে নষ্ট করার মতো সময় তার নেই। তা ছাড়া ভালো দোকান ছাড়া সে কোনো জিনিস কেনে না। বাজে কোম্পানির বাজে জিনিসই বাড়ি বাড়ি ফেরি করা হয়।

না না, এখন কিছু নেবো না।—বলতে গিয়েও থমকে গেল শ্রীরূপা মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে। সে মুখে এমন কিছু আছে, যাতে মুখের উপর প্রত্যাখ্যান ছুঁড়ে দেওয়া যায় না। বরং একটু নরম গলায় বললো—কি চাই ?

—আমি একটা কোম্পানি থেকে এসেছি মা। এই যে দেখুন—সিঁদুর, আলতা, ধূপকাঠি। খুব ভালো জিনিস।

শ্রীরূপা বললো—কিন্তু এখন তো ওসবের দরকার নেই আমার, লাগবে না। তাছাড়া, ভাল কোম্পানির জিনিস ছাড়া আমি ব্যবহার করি না।

—তা কি আর জানি না। তবু বলছি এই সিঁদুরটা খুব ভালো। আর এই ধূপকাঠির গন্ধ ভারী চমৎকার। একটা কিছু নিন না মা !

শেষ পর্যন্ত শ্রীরূপা কিছু কিছু জিনিস নিয়েই নিলো। দাম বুঝে নিয়ে সে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরে থেকে বাড়ি ঢুকছিলেন গৃহস্বামী নীলকান্ত সোম। গেট-এর কাছে দু'জনে একেবারে মুখোমুখি।

নীলকান্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বিস্মিত গলায় বললেন—প্রতিমা! তুমি!

প্রতিমাও তখন বিস্ময়ে পাথর। বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে আছে। মুখে কথা সরছে না। একটু সময়। তারপরই আস্তে আস্তে চোখ নামিয়ে নিলো। নত দৃষ্টিতে মৃদুকণ্ঠে বললো—হ্যাঁ, আমি।

—তুমি এখানে কি করে? তুমি জানতে এটা কার বাড়ি?

—না। আমি এই সব জিনিস বিক্রি করতে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়াই।—বলে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের দিকে ইঙ্গিত করে বললো—তাই ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এসেছি। কার বাড়ি জানা ছিলো না।

এবার ঠাণ্ডা গলায় নীলকান্ত বললেন—এ দুরবস্থা কেন? সরোজ কোথায়?

একবার কেঁপে উঠলো প্রতিমা। তারপর স্থির কণ্ঠে বললো—মারা গেছে।

—তবে যে তোমার মাথায় সিঁদুর!

গম্ভীর গলায় প্রতিমা বললো—সে তো আমায় সিঁদুর দেয়নি! যে আমাকে সিঁদুর দিয়েছে সে বেঁচে আছে।

নীলকান্তকে পাশ কাটিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লো প্রতিমা। নীলকান্ত পিছু ডাকলেন—প্রতিমা, একটু দাঁড়াও। আর একটা কথা।

প্রতিমা ঘুরে দাঁড়ালো। নীলকান্ত বললেন—তুমি আর এখানে কখনও এসো না। আমার একমাত্র ছেলে দেবকান্ত, তার বৌ শ্রীরূপা ওরা জানে তিরিশ বছর আগে তুমি মরে গেছ। কারণ, সেদিন ঘটনাটা আমি সেইভাবেই সাজিয়েছিলাম একটা প্রচণ্ড লজ্জাকে চাপা দেবার জন্য। দেবু রূপা ওরা এখনও তোমার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা পোষণ করে। তাদের এ ধারণা ভেঙে দিও না। আমাকে মিথ্যেবাদী ক'রো না।—একটু থেমে কড়া গলায় বললেন—তুমি যাও। আর কখনও এসো না এখানে।

মাথা নীচু করে চলে গেল প্রতিমা। যতক্ষণ দেখা যায় নীলকান্ত সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর বুকের

ভেতর থেকে।

তিরিশ বছর পর দেখতে পেলেন প্রতিমাকে। সেই প্রতিমা! কেউ জানে না সেদিন কি ঘটেছিল, একমাত্র নীলকান্ত ছাড়া।

সেদিন সারাটা দিন প্রতিমা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। অস্থির অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন তিনি। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে নতুন করে স্মৃতির ভারে ভারাক্রান্ত হলেন। মন চলে গেল তিরিশ বছর আগেকার দিনগুলিতে।

তখনও তাঁর মা বেঁচে। সংসারে আছে বিধবা বোন লীলা, আছে ছোটো ভাই নবকান্ত। বছর চারেক হলো প্রতিমার সংগে তাঁর বিয়ে হয়েছে। প্রতিমার কোলে দু'বছরের ছেলে দেবকান্ত। দেবু। সে সময়ে ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন নীলকান্ত। প্রতিমার কাছে লেখা কে এক সরোজের একটা চিঠি চোখে পড়ে গিয়েছিল তাঁর। চিঠিটা পড়ে তিনি বুঝেছিলেন —এটাই প্রথম নয়, চিঠিপত্রের আদান-প্রদান এদের মধ্যে মাঝে মাঝেই চলে। এবং ঠিক সাধারণ পত্র-বিনিময় নয়। এদের মধ্যে যে আরও একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে চিঠি পড়ে সেটাও বুঝতে বাকী থাকে না নীলকান্তর। তিনি গম্ভীর গলায় প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সরোজ কে?

—আমার বাপের বাড়ির পরিচিত একটি ছেলে।

—সে তোমাকে চিঠিপত্র দেয় কেন?

প্রতিমা নীরব।

—তোমরা কি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট? অন্ততঃ চিঠি পড়ে তো তাই মনে হয়!

প্রতিমা তবুও নীরব।

নীলকান্ত বলেছিলেন—এই যদি তোমার মনের ভাব তবে ঐ সরোজকেই তুমি বিয়ে করলে না কেন?

এবার প্রতিমা বেশ স্পষ্ট গলায় জবাব দিয়েছিল—তুমি কি জান না, বিয়ের ব্যাপারে আমাদের সমাজে মেয়েদের ইচ্ছের কোনো দাম নেই! মা বাপ জোর করে ধরে বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়।

—ওঃ, তাহ'লে—তাহ'লে তুমি আমার উপর এই অবিচার করলে

কেন ?—দুই আঙুলে নিজের কপাল টিপে ধরেছিলেন নীলকান্ত।

—যেদিন থেকে তোমার সংগে আমার বিয়ে হয়েছে আমি তোমার প্রতি অনুগতই থাকতে চেয়েছি।

—অনুগত ? ভান ভণ্ডামি এগুলো আনুগত্যের অভিনয় হতে পারে, তার বেশি কিছু নয়।

—বিশ্বাস করো, আমি অতীতকে চাপা দিয়ে এই জীবনকেই মেনে নিতে চেষ্টা করেছি।

সেদিন নীলকান্ত খুব খানিকটা দাপাদাপি করেছিলেন, পরে গুম হয়ে গিয়েছিলেন। এই চার বছরের বিবাহিত জীবনে তিনি প্রতিমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। কিন্তু তিনি যে চোরাবালির ওপর ঘর বেঁধেছিলেন সেই খবরটা সেদিনই প্রথম জানতে পেরেছিলেন, বিয়ের চার বছর পরে।

নীলকান্ত চিরদিন অত্যন্ত নীতিপরায়ণ। এই আঘাত তিনি চট করে সহ্য করতে পারলেন না। বিশেষ করে প্রতিমার স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কয়েকটা দিন অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে কাটিয়েছেন তিনি। বুকের ভেতর যেন বিছের কামড়। মাথায় আগুন জ্বলছিল। প্রতিমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলেন না। রাত্তিরে ঘুম তো নয়ই, শয়নও নয়। সারা রাত ঘরের সামনের বারান্দায় পায়চারি করে কাটাতেন। মাথাটা যখন অসম্ভব দপদপ করতো বারান্দায় ইজিচেয়ারটাতে গা এলিয়ে একটু চোখ বুজতেন।

তাঁর এই ভাবান্তর মা'র চোখে পড়েছিল। মা বলেছিলেন—তোর কি হয়েছে নীলু ? চোখ মুখের চেহারা এমন হয়েছে কেন ?

লীলা বলেছিল—তোমার দিকে যে আর তাকানো যায় না দাদা। সত্যি করে বল তো কি হয়েছে ?

দুজনকে নীলকান্ত একই জবাব দিয়েছিলেন—কিচ্ছু হয়নি। দু' একদিন ঘুমটা একটু কম হয়েছে তাই হয়তো—।

দিন কতক কেটে যেতে প্রাথমিক উত্তেজনার উপশম হয়েছিল। মনটা একটু নরম হয়ে এসেছিল নীলকান্তর। এবার ভাবতে শুরু করেছিলেন—হয়তো এক সময় প্রতিমা ওদিকে ঝুঁকেছিল। এমন কতো মেয়েই তো করে, কিন্তু এই চার বছরে সে নিশ্চয় তার মন নীলকান্তর দিকে ঘুরিয়ে

নিয়েছে। তাছা, নীলকান্ত মনে মনে স্বীকার করলেন—প্রতিমার সৎসাহস আছে। অন্য কোনো মেয়ে হলে এমন একটা ব্যাপার স্বীকারই করতো না।

মন একটু শান্ত হতে কয়েকদিন অনিদ্রার পর সেদিন গাঢ় ঘুম হয়েছিল, এক সময় ঘুমের মধ্যে ছেলের কান্না তাঁর কানে বেজেছিল। ঘুমটা তরল হতে হতে একসময় ভেঙে গিয়েছিল, তাকিয়ে দেখেন প্রতিমা বিছানায় নেই। ভাবলেন বাথরুমে গেছে। ছেলের গায়ে হাত রেখে শান্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু না হয় ছেলে শান্ত, না ফেরে প্রতিমা। নীলকান্ত উঠলেন। এদিক ওদিক খুঁজে দেখতে দেখতে টেবিলের উপর ভাঁজ করা কাগজটা চোখে পড়েছিল। দ্রুত হাতে কাগজটা টেনে নিয়ে ভাঁজ খুলে পড়েছিলেন। প্রতিমার চিঠি। সে লিখেছে ঃ

আমি অতীতকে ভুলে তোমাকে নিয়েই সংসার করতে চেয়েছিলাম। মনে-প্রাণেই চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি সেটা বুঝলে না। মৃত অতীতকে মন্থন করে শুধু অশান্তির গরল তুলছো। এখন আমাদের মধ্যে সম্পর্ক যেমন তিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, এরপর আর এখানে থাকা চলে না। সরোজ এখনও আমাকে চায়। এখনও সে আমাকে মাথায় করে রাখবে।—প্রতিমা।

চিঠিটা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন নীলকান্ত। ব্যাপার চাপা দেবার জন্য তিনি প্রথমেই একটি চিঠি লিখেছিলেন লীলার নামে। লিখেছিলেন—হঠাৎ খবর পেয়ে একটা বিশেষ জরুরী কাজে আজ বাইরে যাচ্ছি। কাল বেশি রাত্তিরে বাড়ি ফিরেছি বলে তোমাদের খবরটা জানাতে পারিনি। তোমার বৌদিও বায়না ধরেছে আমার সঙ্গে যাবেই। অগত্যা তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলাম। খামখেয়ালী মানুষদের নিয়ে আচ্ছা মুশকিল! বেছে বেছে এমন এক খামখেয়ালী বৌদি এনেছো যে এখন 'ম্যাও' সামলাতে আমার প্রাণান্ত।

প্রতিমার চিঠিটা দেশলাই জেবলে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, নিজের চিঠিটা টেবিলের উপর রেখেছিলেন। তারপর একটা কিটস্ ব্যাগে নিজের কিছু জামা-কাপড়, ছেলের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রাতের অন্ধকারে ছেলে সঙ্গে করে নীলকান্ত বেরিয়ে পড়েছিলেন। যে ট্রেন হাতের কাছে পেলেন টিকিট কেটে তাতেই চড়ে বসলেন।

বেশ কিছুদিন ঘুরে ছেলে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন নীলকান্ত। লীলা দেখেই বলেছিল—কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপি চুপি চলে গেছো যে বড়। বৌদি কোথায় ?

নীলকান্ত খুব গম্ভীর গলায় জানিয়েছিলেন—তোর বৌদি আর কোনোদিনও ফিরবে না লীলা, সে মারা গেছে।

লীলা প্রথমটা বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, তারপরই কেঁদে ফেলেছিল। ক্রমে বাড়িময় রটে গেল খবর। শোরগোল, কান্নাকাটি। প্রাথমিক ঝোঁকটা কেটে গেলে লীলা সংশয়-ভরা চোখে নীলকান্তর দিকে তাকিয়ে বললো—বৌদি সত্যি মারা গেছে দাদা ?

নীলকান্ত ততোধিক গম্ভীর গলায় বলেছিলেন—তোর কি মনে হয় আমি তোর বৌদিকে খুন করে রেখে এসেছি ?

লীলা সন্ত্রস্ত হয়ে বলেছিল—না না না। ও কি কথা বলছো দাদা, অমন কথা উচ্চারণ করতে আছে ?

সেই থেকে প্রতিমা মৃত এ বাড়ির সবার কাছে। এখনও দেবুর ঘরে প্রতিমার সেই বয়সের একখানা এনলার্জ করা ছবি রয়েছে। এখনও বিশেষ বিশেষ দিনে দেবু রূপা সেই ছবিতে মালা দেয়, সামনে ধূপ জ্বালিয়ে দেয়, প্রণাম করে।

নীলকান্ত চান—প্রতিমা ওদের কাছে এমনি শ্রদ্ধার আসনে চিরদিন থাকুক। প্রতিমা কোনোদিন এসে যেন তাদের সেই ধারণাটা ভেঙে না দেয়। এই জন্যই তিনি রূঢ়ভাবে প্রতিমাকে ভবিষ্যতে আর এখানে আসতে মানা করে দিয়েছেন। অগৌরবের চেয়ে যে মানুষের মৃত্যু ভালো। মৃত্যুর চেয়েও সেটা মর্মান্তিক মৃত্যু।

কত ঢেউ ওঠে পড়ে

বাসটাতে ভিড় যেন দরজা ঠেলে উপচে পড়ছে। অনেকক্ষণ বাসরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে চিত্ররথ। দু'টো বাস ছেড়ে দিয়েছে। অনেক ছুটোছুটি করেও উঠতে পারেনি। বাধ্য হয়েই ছেড়ে দিয়েছে। এটাতে না উঠলেই নয়। যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। আর দেরি হলে তার কাজের ক্ষতি হয়ে যাবে।

লোকজনকে ধাক্কা মেরে বেঁকে চুরে অনেক কসরৎ করে কোনোরকমে বাসে উঠলো চিত্ররথ। তারপর ভেতরে ঢুকতে তৎপর হলো। একটু একটু করে এগোচ্ছে চিত্ররথ। হঠাৎ একটা মেয়েলি গলায় আর্ত তীক্ষ্ণ চীৎকার—ওঃ পা'টা একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে রে!

প্রথমটা চিত্ররথ বুঝতেই পারেনি ঐ আর্তনাদের কারণটা তার নিজেরই একটা পায়ের তলায়। পায়ের নীচ থেকে কিছু টেনে নেবার মতো একটা অনুভূতি হতেই বুঝতে পারলো। সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপরের একটা রড আঁকড়ে ধরে পা'টা একটু আলগা করে দিলো সে। পায়ের নীচ থেকে সাঁৎ করে আর একটা পা সরে গেলো। পায়ের অধিকারিণীর মুখের দিকে চোখ পড়লো চিত্ররথের। মেয়েটিও ততোক্ষণে বুঝতে পেরেছে কার পদভরে এতক্ষণ তার পা পিষ্ট হচ্ছিলো। কড়া গলায় বললো—পা'টা তো একেবারে চেপ্টে দিয়েছেন। চোখে দেখতে পান না?

চিত্ররথ লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত গলায় বললো—মাপ করবেন। দেখতে পাইনি।

কেন? চোখে কি হয়েছে?

চিত্ররথ তবুও নরম গলায় বললো—দেখছেন তো কি ভিড় বাসে। নীচের দিকে অতো তাকিয়ে কি পা ফেলা যায়?

বাসে ভিড় বল্লেই লোকের পা মাড়াতে হবে? দেখে চলতে হয়।

দেখতে পেলে কি আমি ইচ্ছে করে আপনার পা মাড়িয়েছি? আমি তো বলছি—আমি দুঃখিত।

'দুঃখিত' বললেই সব মিটে গেলো! আমার পায়ের যন্ত্রণা তাতে সেরে যাবে?

আরে! যতো নরম হয়ে কথা বলা হচ্ছে এ যে দেখি ততো তেড়ে তেড়ে উঠছে। এবার মনে মনে একটু তপ্ত হলো চিত্ররথ। বললো—তাহলে কি আর করা! বাড়ি গিয়ে আয়োডেক্স মালিশ করে নেবেন। আমি বরং দামটা দিয়ে দিতে পারি।

বলে পেছনের ক্রুদ্ধ মন্তব্যের দিকে কান না দিয়ে চিত্ররথ সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। বাসের সব লোক ওদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তর্কাতর্কি করতে সঙ্কোচ হচ্ছিলো তার।

ব্যাপারটা নিয়ে দিন দুই বিশ্রী লাগলো চিত্ররথের। তারপর কর্মব্যস্ততার নীচে চাপা পড়লো। দৈনন্দিন জীবনে এমনি কতো ঘটনাই ঘটে। কে তার হিসেব রাখে!

চিত্ররথ কেন্দ্রীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় দায়িত্বপূর্ণ পদে কর্মরত। কিছুকাল ধরেই তার মা তার বিয়ে দেবার বাসনা জানাচ্ছেন। চিত্ররথ অফিসের পরীক্ষা প্রমোশন ইত্যাদি নানা অজুহাত দেখিয়ে এতোদিন সে বাসনাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। এবার তার প্রমোশন হয়ে যাবার পর আর বাগ মানাতে পারছে না। মা এবার জোর দিয়ে বললেন—তোমার কোনো অজুহাত আর আমি শুনছি নে। একটি ভালো মেয়ের সন্ধান পেয়েছি। এবার আমাদের দায়িত্ব মাথা থেকে নামাতে দাও।

অগত্যা চিত্ররথকে রাজি হতেই হলো। প্রথমে মেয়ে দেখতে গেলেন মা-বাবা তার বোন পুষ্পিতাকে সঙ্গে নিয়ে। এসে তো মহা প্রশংসা। খুব পছন্দ হয়েছে মেয়ে।

পুষ্পিতা বললো—দাদা, যা দেখে এলাম না! এখানে বিয়ে হলে তোর বন্ধুরা তোকে হিংসে করবে।

তাই না কি রে! তাহলে তো এখানেই করতে হয়।

চিত্ররথের মা বললেন—মেয়ে দেখতে তো চমৎকার। এই মেয়েই ঘরে আনবো। তবু খোকা তার বন্ধুদের নিয়ে একবার গিয়ে দেখে আসুক।

তিন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে চিত্ররথ মেয়ে দেখতে গেলো। তার মধ্যে

মনীশ হলো ঘটক। সে-ই এই প্রস্তাব দিয়েছে। মনীশ এদিকে চিত্ররথের বন্ধু ওদিকে মেয়ের পক্ষের দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

ওরা যাবামাত্র যথাযোগ্য সমাদর করে বসানো হলো। প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময় ও আপ্যায়নের পর পাত্রীকে ঘরে নিয়ে আসা হলো। খুবই সুশ্রী পাত্রী। অন্য বন্ধুরা যখন মুগ্ধ চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে চিত্ররথ তখন মনে মনে চমকে উঠেছে। বন্ধুরা নানা প্রশ্ন করতে লাগলো মেয়েটিকে। চিত্ররথ চুপ করে বসে আছে। ওরা বললো—তুই কিছু জিজ্ঞেস কর চিত্র।

চিত্ররথ একটু হেসে বললো—তোরা যা করছিস তাতেই চলবে।

বাড়িতে তার মতামতের জন্য সবাই উন্মুখ হয়েছিলো। ফেরা মাত্রই পুষ্পিতা ছুটে এলো—কিরে দাদা, কেমন দেখলি? খুব ভালো না দেখতে? এক নজরে পছন্দ হয়ে যায়। তাই না রে?

হ্যাঁ, তা হয় বটে।

তবে মাকে বলি তোর পছন্দ হয়েছে, এবার বিয়ের তোড়জোড় করতে।

মাকে বলে দিস আমি ওখানে বিয়ে করবো না।

এমন জবাব কেউ আশা করেনি। বেশ কিছুদিন এ নিয়ে ঝুলোঝুলি হলো কিন্তু চিত্ররথের এক কথা—না, ওখানে বিয়ে হবে না। অন্য যেখানে বলো করবো।

শুনে মনীশ বললো—মেয়ে দেখতে রীতিমতো ভালো, শিক্ষিতা, মেয়ের বাপ দিয়ে-থুয়ে দেবে। তোর আপত্তিটা কোথায় বলতো চিত্রগুপ্ত।

চিত্ররথের পদবী গুপ্ত বলে বন্ধুরা তাকে পরিহাস করে 'চিত্রগুপ্ত' বলতো।

চিত্ররথে হাসে। বলে—এমনি।

কিন্তু মনীশের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললো—দেখতে ভালো হতে পারে কিন্তু ও-মেয়ে একটি কেউটে সাপ।

সে কি রে! তুই এই মেয়েকে জানিস নাকি?

চিত্ররথ এর বেশি আর মুখ খোলে না। কিন্তু মনীশ নাছোড়বান্দা, জেরায় জেরায় পেটের কথা বের করে ছাড়লো। শেষ পর্যন্ত চিত্ররথ

বলেই ফেললো সেদিনকার বাসের সেই ঘটনাটা। এ সেই মেয়ে।

শুনে মনীশ থ।

অমন সম্বন্ধ হাত ছাড়া হলো। মা কিছুদিন চিত্ররথের উপর রেগে রইলেন। আবার নানা সম্বন্ধ আসতে লাগলো। দেখাশোনা কথাবার্তা চললো। কিন্তু ষোলো আনা ঘটঘাট আর হয়ে ওঠে না।

বেশ কয়েকমাস পর। সেদিন চিত্ররথ অফিসের পর আর কোথাও বেরোয়নি। নিজের ঘরে বসেই ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলো। এমন সময় ঝনঝন করে ফোনটা বেজে উঠলো। চিত্ররথ রিসিভার তুলে সাড়া দিলো—হ্যালো—

চিত্ররথ গুপ্ত আছেন?

বলছি।

আমি সুনন্দা সেন বলছি।

সুনন্দা সেন! —চিত্ররথ মনের ভেতর অনেক হাতড়েও নামটা উদ্ধার করতে পারলো না।

মনে করতে পারছেন না? মাস ছয়েক আগে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন?

মাফ করবেন। তবুও মনে করতে পারছি না।

যাকে আপনি কেউটে সাপ বলে মনে করেন।

চিত্ররথ পায়ে মাথায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। ছি ছি মনীশটা একেবারে যাচ্ছেতাই। এই কথা কিনা মেয়েটির কানে তুলেছে!

চিত্ররথ এমন থতমত খেলো যে দু'একটা অর্থহীন আওয়াজ ছাড়া তার মুখ থেকে আর কোনো কথা বেরোলো না।

ওদিক থেকে আবার কথা ভেসে এলো—মনে করবেন না আমি কোনো ব্যাপারে আপনার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছি, শেষের ব্যাপারটাকে আমি মোটেই ধরছি না। কিন্তু প্রথম ঘটনাটা সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। কোনো মানুষের সামান্যতম ভগ্নাংশ থেকে তার সামগ্রিক রূপটা আপনি চিনে ফেলতে পারেন, তাই ভাবেন না কি? খুব অহঙ্কার তো আপনার! আচ্ছা, নমস্কার।

ও তরফ থেকে লাইন কেটে গেলেও চিত্ররথ ফোন কানে নিয়ে

খানিকক্ষণ বোকার মতো বসে রইলো।

কি খারাপ যে লাগছে তার। মনে মনে একশোবার মনীশের মুণ্ডপাত করলো। সেই কবে উত্তেজনার মুহূর্তে কি একটা ব্যাপার ঘটে গেছে—হয়তো সেদিন মেয়েটির মন-মেজাজ খারাপ থাকার মতো কোনো কারণ ঘটেছিলো—তাই নিয়ে এতোদিন পর জল ঘোলা করা? একটি শিক্ষিতা ভদ্রঘরের মেয়ের সম্বন্ধে কি করে যে চিত্ররথ এমন একটা অভদ্র মন্তব্য করলো! আর করলোই যদি তবে মনীশের কাছে করতে গেলো কেন? সে তো জানতোই মনীশ ওদের আত্মীয়। এখন চিত্ররথের মনে হচ্ছে মেয়েটি বাসে তার সংগে যতোটা না অভদ্র ব্যবহার করেছে সে নিজে ওই মন্তব্য করে মেয়েটিকে তার চেয়ে অনেক বেশি অপমান করেছে। আর তখন থেকেই সে ওকে আর অপরাধী ভাবতে পারছে না। নিজের দিকে অপরাধের পাল্লা ভারি মনে হচ্ছে। সুনন্দা সেনের উপর বিরূপ ভাব কেটে যাচ্ছে চিত্ররথের।

নিয়তির খেলা, ঘুরে ফিরে এক বছর বাদে আবার সেই প্রস্তাব। মা বললেন—অনেক তো দেখলাম। ঠিক মনের মতো পাচ্ছি না। ওরা এখনও রাজি আছে। মাঝে মাঝে খবর পাঠাচ্ছে। বাড়ির সবার সবদিকে পছন্দও হয়েছিল ওখানে। তুই যদি বলিস তবে আবার দেখি।

বাঃ, একবার 'না' করে দেওয়া হয়েছে। ওরা দেবে কেন?

মনে মনে বললো—ঐ কথা শোনার পর এই মেয়ে আর এ বাড়িতে আসছে না।

মা বললেন—সে ভাবনা আমার। তুই রাজি কি না তাই বল্।

কি করা! তুমি যখন পুত্রদায়ে ঠেকেছো, আর কোথাও জুটছে না তখন যা হয় কর।

তারপর মা কি করছেন না করছেন, ঘটনা এগিয়েছে কি পিছিয়েছে কিছু খবর রাখেনি চিত্ররথ। হঠাৎ আর এক সন্ধ্যায় ফোন বেজে উঠলো—চিত্ররথ গুপ্ত আছেন? চিত্ররথ উৎকর্ণ হলো। গলাটা চেনা মনে হচ্ছে।

বলছি।

আমি সুনন্দা সেন।

চিত্ররথের বুক ঢিব ঢিব করছে। মা কেন যে আবার ওখানে

গেছেন। আবার কি বলে বসবে ঐ মেয়ে কে জানে।

সুনন্দার গলা ভেসে এলো—দয়া করছেন না কি! আমি কিন্তু দয়াপ্রার্থী নই।

দয়া! না।

তবে কি প্রায়শ্চিত্ত?

না।

তাহলে হঠাৎ মতটা ঘুরে গেলো যে!

মানে—মানে—মা বললেন, তাই ভাবলাম—

মা বললেন তাই! আপনার বুঝি ইচ্ছে নেই। আমি কিন্তু—একটু থেমে বললো—রাজি।

সংগে সংগে লাইন—'কট'।

চিত্ররথ আজও রিসিভার কানে নিয়ে বোকার মতো বসে রইলো।

যাঃ, সেদিনও কোনো কথা বলতে পারেনি। আজও গবেটের মতো তো-তো করেই গেলো।

এরপর একেবারে দেখা শুভ রাত্তিরে। নববধু ঘরে এসে খাটের অন্য প্রান্তে খানিকটা দূরে বসলে চিত্ররথ একটু হেসে বললো—এত দূরে কেন? কাছে এসে বসো।

সুনন্দা মুখ নীচু করে সলজ্জ ভংগিতে মৃদু হাসলো। বললে—ভয় করবে না তো?

ভয় করবে? কেন?

যদি ছোবল দিয়ে দি।

বটে! আজকেও এই কথা!

তবে এই অপ্রিয়বাদিনীর মুখ বন্ধ করার উপায় চিত্ররথ গুপ্তর জানা আছে।

দু'জনে পাশাপাশি বসে কথা বলছিলো। চিত্ররথ বললো—আমি ভেবেছিলাম ঐ কথা শোনার পর তুমি এখানে কিছুতেই রাজি হবে না।

আমি ভেবেছিলাম তুমি রাজি হবে না। এতদিন পর মত হয়েছে জেনে অবাক্ হয়েছিলাম।

আজ ভাবছি কি ভুলই না করতে যাচ্ছিলাম। তোমার অন্য জায়গায়

বিয়ে হয়ে গেলে কি লোকসানটাই না আমার হতো!

উঁহু, আমার অন্য জায়গায় বিয়ে হতোই না। এর মধ্যে কতো সম্বন্ধ এসেছিলো, আমি সব বাতিল করে দিয়েছি।

চিত্ররথ বিস্মিত হয়ে বললো—বাতিল করে দিয়েছো? কেন?

আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম এখানে বিয়ে না হলে আমি বিয়েই করবো না। ঐ কথাটা শোনার পর কেমন একটা জেদ চেপে গিয়েছিলো তোমাকে আমি জয় করবোই।

দুষ্টুমির হাসি হাসতে লাগলো সুনন্দা।

আর আমার যদি অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যেতো?

তাহলে সারাজীবন বিয়েই করতাম না। অবাক্ হচ্ছো? কিন্তু সত্যি বলছি। আমি একটুও মিথ্যে বলছি না।

মানুষের মনের গভীরে কত বিচিত্র ঢেউ ওঠে-পড়ে। চিত্ররথ অবাক্ হয়ে সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'উত্তর ভারতী' ॥

তিল থেকে তাল

পত্রলেখা ফরসা সুশ্রী তন্বী, রীতিমত রূপসী। বিশেষ করে তার বাঁ গালে ঠিক মানানসই জায়গাটিতে একটি মানানসই কালো তিল।

সবাই বলে—সুন্দর, ভারি সুন্দর!

কলেজের বান্ধবীরা বলে—বিউটি স্পট, আর ইন্দ্রনীল বলে—ভগবানের আশ্চর্য শিল্পবোধ। বলে, আমার ইচ্ছে করে ঠিক ঐ জায়গাটিতে—

ইন্দ্রনীল যা অসভ্য না! পত্রলেখা নিজের মনে ফিক্‌ করে হেসে ফেলে, লজ্জায় একটু আরক্ত হয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার নিজেরও মনে হয়—সত্যি সুন্দর। তিলটার জন্যই যেন চেহারার আরও খোলতাই হয়েছে।

ইন্দ্রনীল পত্রলেখার দাদা প্রসেনজিতের বন্ধু। কলেজে একসঙ্গে পড়তো। এখন চাকরি করে। 'মেস'-এ থাকে। বাড়ি বাঁকুড়া জেলায় কোন এক গ্রামে। দাদার বন্ধু হিসেবে প্রথমে দাদার সঙ্গে এ বাড়িতে আসে। কিন্তু এখন বন্ধুর বোনের আকর্ষণ-ই যে বেশি এ কথা পত্রলেখা বেশ বোঝে। একথা ভাবতেও তার ভালো লাগে। ভালো লাগে ইন্দ্রনীলকেও। ইন্দ্রনীলকে নিয়েই তার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখে। এ প্রসঙ্গ নিয়ে মা-বাবাকেও একদিন চুপিচুপি কথা বলতে শুনেছে সে। এই যা ভরসা পত্রলেখার।

পত্রলেখার মাসতুতো দাদা বিশ্বজিৎ বেড়াতে এলো সেবার পত্রলেখাদের বাড়িতে। খুবই মিশুক এবং আমুদে স্বভাব ছেলেটির। এসেই হৈ হৈ করে বাড়িসুদ্ধু সবাইকে জমিয়ে ফেললো। প্রাণশক্তিতে ভরপুর যেন একটা সতেজ ব্যক্তিত্ব। ইন্দ্রনীল এসে আর পাত্তা পায় না। পত্রলেখা সারাক্ষণ বিশুদাকে নিয়েই মশগুল।

এই সময় ছুটিতে বাড়ি গেল ইন্দ্রনীল। যাবার আগে পত্রলেখার সঙ্গে দেখা হতে বললো—বাড়ি যাচ্ছি লেখা, অবশ্য এখানে থেকেও লাভ হচ্ছিলো না কিছু। এসে তো আর পাত্তাই পাই না তোমার। বিশুদার

বিশ্বগ্রাসী দাদাশ্বের কাছে যে একেবারে নস্যাৎ হয়ে গেছি।

পত্রলেখা কৃত্রিম রাগে বললো—হিংসুটে!

এ অবস্থায় কার না হিংসে হয় বল। এসে তোমাকে আর কিছুতেই কায়দা করতে পারি না। তুমি 'পরহস্ত গতং ধনং' হয়ে বসে আছো। আমি অনাথ বালকের মতো ঘুরে বেড়াই। শুধু ঠাকুমা-ই যা একটু পাত্তা দেন।

তাহলে তো তোমার লাভই। ঠাকুমা আমার চেয়ে ঢের ঢের বেশী সুন্দরী।

দাদু অবশ্য তাই বলবেন। আমিও না হয় তাই স্বীকার করে নিলাম। কিন্তু ঠাকুমার চেয়ে কম সুন্দরীর জন্যই যে আমার মনটা খালি ছট্‌ফট্ করতে থাকে।

আ-হা—! এই, জানো—মা বাবা চুপি চুপি কি বলছিলেন—ইন্দ্রনীল ভালো ছেলে। লেখাকে তার হাতেই—। একটু আরক্ত হয় পত্রলেখা—বোধ হয় তোমাদের বাড়িতে চিঠি লিখেছেন।

তাই নাকি! হুররে—আমার মা কোনো অমত করবেন না। আমি জানি আমার মতই তাঁর মত।

এঃ, কত ভালো পাত্র! একদম যাচ্ছেতাই। মা বাবাকে বলবো আমার মত নেই।

মত নেই বলে পার পাবে নাকি! নিয়ে পালাবো না!

তা পালাবে না! ডাকাত তো। ডাকাত!

যা খুশি বলো, আমার দাবি কিছুতেই ছাড়ছি না, আর ছাড়বোই বা কেন? শাস্ত্রে আছে একসঙ্গে সপ্তপদ গমন করলে ইয়ে হয়, সপ্ত প্রদক্ষিণ করে বিয়ে হয়। আমি এই সপ্ত বৎসরে সপ্তলক্ষপদ একসঙ্গে গমন করেছি না! সে কি অমনি না কি! খাটুনি নেই!

ইন্দ্রনীল বাড়ি গেল।

এদিকে বিশ্বজিৎ বাড়ি ফেরার কথা বললেই সবাই একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে ওঠে—আর ক'টা দিন থাকো বিশ্বদা, এতদিন বাদে এলে। প্লিজ, আর ক'টা দিন—এমনি করে তিন দফা বাড়ি যাবার তারিখ পালটাতে বিশ্বজিৎ বললো—তোরা কি আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে দিবি না নাকি! আগামীকাল আমি যাচ্ছি-ই, আর কারও কথা শুনছি না।

পত্রলেখা বায়না ধরলো—মা, আমার তো এখন ছুটি। আমি বিশ্বদার সঙ্গে মাসীমার বাড়ি যাবো।

মা-বাবা প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। শেষে বিশ্বজিতের ওকালতিতেই রাজি হলেন।

ট্রেন চলেছে। একটা জংশন স্টেশনের দু'এক স্টেশন আগে কামরায় দু'জন ভদ্রলোক উঠলেন। ট্রেনে বেজায় ভিড়। গাদাগাদি করে মানুষ বসে, দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোক দু'জন এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। তার পর লোকজন ঠেলেঠুলে এগিয়ে এলেন পত্রলেখাদের কাছে, সেই সময় দু'জন যাত্রী নামবার জন্য উঠে দাঁড়াতে জায়গাও পেয়ে গেলেন বসার।

পত্রলেখা লক্ষ্য করলো ভদ্রলোক দু'জন কেমন আড় চোখে তাকে দেখছে। মনে মনে ভ্রূকুটি করলো পত্রলেখা। বয়সের তো গাছ-পাথর নেই। স্বভাবখানা দেখ না! দু'জনেই এক। যেন মানিকজোড়।

পরক্ষণেই মানিকজোড়ের একজন বিশ্বজিৎকে প্রশ্ন করলো—কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

জবাব না দিতেই আবার প্রশ্ন—একাই, না সঙ্গে কেউ আছেন? সঙ্গে সঙ্গে পত্রলেখার দিকে বক্র কটাক্ষপাত।

পত্রলেখার গা জ্বালা করে উঠলো।

বিশ্বজিৎ বললো—সঙ্গে আমার মাসতুতো বোন আছে।

ভদ্রলোক দু'জন পরস্পর কটাক্ষ বিনিময় করলেন।

মশায়ের নাম?

বিশ্বজিৎ বোধহয় এবার বিরক্ত হলো, একটু দেরি হলো জবাব দিতে, বোধহয় ভদ্রতা বাঁচাতেই বললো—বিশ্বজিৎ রায়।

সঙ্গিনীর নাম?

বিশ্বজিতের মুখে এবার আর কথা জোগালো না। পত্রলেখারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো, রুক্ষ কণ্ঠে বললো—সব ব্যাপারেই একটা মাত্রাজ্ঞান থাকা উচিত।

ইতিমধ্যে ট্রেন সেই জংশন স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভদ্রলোক দু'জন উঠলেন। বললেন—এখানে একবার নামতে হয় যে মা লক্ষ্মী! বিশ্বজিৎ বাবু, উঠুন।

ওরা হতচকিত, বিভ্রান্ত, পরক্ষণেই বিশ্বজিৎ রুখে দাঁড়িয়ে বললো—কি যা তা বলছেন? বলি, ব্যাপারটা কি?

এক ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন—ব্যাপারটা একটু গোলমেলে, নামলেই বুঝতে পারবেন।

অন্যজন বললেন—একেবারেই কি কিছু বুঝতে পারেন নি? সত্যি বলছেন?

যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলো তখন ওরা লজ্জায় মরে যেতে লাগলো। গোয়েন্দা পুলিস ওদের অন্য রকম সন্দেহ করে এনেছে।

রেল-পুলিসের দপ্তরে বসিয়ে তাদের জেরা করা হচ্ছিলো। বিশ্বজিৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—শুধু শুধু মানুষকে এমনি হয়রানি করার কি রাইট আছে আপনাদের?

পত্রলেখা ক্ষোভে দুঃখে আক্রোশে ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—শুধু হয়রানি নয়, জঘন্য অপমান, আমাদের ছেড়ে দিন।

নিশ্চয়ই। আমরাও তো ছেড়ে দিতেই চাই! এখন ঠিক ঠিক নাম-ঠিকানাটা বলুন তো।

ঝাঁঝালো কণ্ঠে পত্রলেখা বললো—এতোক্ষণ কি বেঠিক বলেছি নাকি! বলেছি তো আমার নাম পত্রলেখা চৌধুরী, ইনি আমার মাসতুতো দাদা বিশ্বজিৎ রায়।

ও-গুলো তো ট্রেন যাত্রার পোশাকী নাম, আসল নামটা কবুল করে ফেলুন। অবশ্য আগামীকাল পর্যন্ত আমরাই তা বের করে ফেলতে পারবো।

পত্রলেখা তীব্র আক্রোশে ঠোঁট কামড়ালো। তিক্ত কণ্ঠে বললো—এতদিন পর্যন্ত এই নামগুলোই তো আমাদের বলে জানতাম। এবার আপনিই তা হলে বলুন আমাদের নাম কি?

ঠিকানাটা ঠিক?

পত্রলেখা ব্যঙ্গের স্বরে বললো—দয়া করে কলকাতায় খোঁজ নিয়ে দেখুন না।

সে আমরা লালবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। সেখান থেকে আপনাদের দেওয়া ঠিকানায় 'এনকোয়ারী' করে যদি আপনাদের কথা সত্যি

বলে প্রমাণিত হয় এবং কেউ এসে আপনাদের এই নামে সনাক্ত করে তবে তক্ষুণি ছাড়া পেয়ে যাবেন। যতক্ষণ তা না হচ্ছে এখানে থাকতে হবে।

তার মানে আজকের রাত্রিটা এখানেই কাটাতে হবে!

বিশ্বজিৎ সেখানেই রইলো। আর পত্রলেখাকে নিয়ে যাওয়া হলো সেই অফিসারের কোয়ার্টারসে। অফিসারগিন্নী আন্তরিক ভাবেই পত্রলেখাকে অভ্যর্থনা জানালেন কিন্তু পত্রলেখার মুখে অমাবস্যার অন্ধকার। এক গ্লাস জল ছাড়া সে কিছুই খেলো না রাত্তিরে। রাগে ফুঁসতে লাগলো। সেই সংগে দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ। বাড়িতে যখন খবর যাবে, মা-বাবার তখন কি অবস্থা হবে ভাবতেও তার কান্না পাচ্ছিলো। বাবা হয়তো ছুটে আসবেন। তারপর এই লোকটাকে যা বোঝাবে না পত্রলেখা! গোয়েন্দাগিরি ঘুচিয়ে দেবে।

একখানা ছোট্ট ঘরে পত্রলেখার শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে গৃহকর্ত্রী বললেন—পাশের এই লাগোয়া কামরায় আমরা রইলুম ভাই। কিছু দরকার হলে ডেকো।

দোর জানালা ঠেসে বন্ধ করে আলো জেবলে রেখে বিছানার ওপর বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিলো পত্রলেখা। মা-বাবা অপত্তি করেছিলেন, কেন মরতে সে বিশ্বজিতের সংগে এলো। কে এক কল্পনা দাস গৃহত্যাগ করে এক অরূপ মৈত্রের সংগে পালিয়েছে। সেই ছেলেটি এবং মেয়েটি দু'জনেরই চেহারার বর্ণনার সংগে ওদের দু'জনের চেহারা নাকি অবিকল মিলে গেছে। তাই গোয়েন্দারা তাদের সন্দেহ করছে কল্পনা ও অরূপ। তাদের নাম সম্পর্ক কিছুই পুলিস বিশ্বাস করছে না। তদন্ত সাপেক্ষে আটকে রেখেছে। ছি ছি, কি লজ্জা! এরপর বিশ্বদাকে সে মুখ দেখাবে কি করে! বাবা এলে সে বাবার সংগে বাড়ি চলে যাবে। আর মাসীমার বাড়ি যাবে না, মাথায় থাক বেড়ানো। মাথাটা কেমন গরম হয়ে উঠেছে। কপালের শিরা দপ্ দপ্ করছে, জ্বালা করছে চোখ দু'টো। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে উঠেছে। পত্রলেখা বিছানা থেকে উঠে জল গড়িয়ে খেলো। বন্ধ ঘরে যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে। সে একটা জানালা খুলে তার পাশে দাঁড়ালো। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া চোখে মুখে ঝাপটা মারলো।

ঘরে আলো জ্বলছিল। তারই খানিকটা পত্রলেখার মুখে এসে

পড়েছিল। ওদিকের অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি ছেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখখানা লক্ষ্য করছিল। সে ঘটনাটা শুনেছিল। কিন্তু—

ছেলেটি পায়ে পায়ে আরও এগিয়ে এলো। আরও স্পষ্ট দেখতে পেলো মেয়েটির মুখ। বিস্ময়ে চমকে উঠল—এ কি! কে? দ্রুতপদে গিয়ে দোরে ধাক্কা দিলো। উত্তেজিত কণ্ঠে বললো—দোর খোলো পত্রলেখা, আমি ইন্দ্রনীল।

অসম্ভব চমকে উঠে পত্রলেখা দোর খুলে দিলো। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললো—ইন্দ্রনীল! তুমি! তুমি!

কান্নায় ভেঙে পড়লো পত্রলেখা।

তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ব্যাকুলকণ্ঠে ইন্দ্রনীল বার বার বলতে লাগলো—কি হয়েছে বলো লেখা, কি হয়েছে বলো। কোথায় যাচ্ছিলে তুমি? কার সঙ্গে যাচ্ছিলে? এ সব কি শুনতে পেলাম তোমার নামে?

একটু সামলে নিয়ে পত্রলেখা বললো—বিশ্বদার সঙ্গে মাসীমার বাড়ি যাচ্ছিলুম। পথে ওরা আমাদের—আবার কেঁদে ফেলে পত্রলেখা। তারপর খেয়াল হতে জিজ্ঞাসা করলো—তুমি এখানে কি করে এলে ইন্দ্রনীল?

এ যে আমার দিদির বাড়ি। এরা আমার দিদি জামাইবাবু। দু'দিন হয় এখানে বেড়াতে এসেছি।

ঐ লোকটা তোমার আত্মীয়! এরপরও তোমাকে আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেবো ভেবেছো! পত্রলেখার দু'চোখে এবার স্ফুলিঙ্গ।

বারে, আমার কি দোষ, আমি কিছু জানি, না পুলিসে কাজ করি?

বেশ জোরেই কথাবার্তা হচ্ছিলো। শুনতে পেয়ে গৃহকর্তা উঠে এলেন এ ঘরে। আশ্চর্য হয়ে বললেন—এ কি ইন্দ্র, এত রাত্রে তুমি এ ঘরে!

করেছেন কি দাদাবাবু। এ যে লেখা, পত্রলেখা চৌধুরী, যে মেয়েটির কথা এখানে এসে আপনাদের বলেছিলুম। মানে, এর সঙ্গেই আমার—। সঙ্গে ওর মাসতুতো দাদা বিশ্বজিৎ, আমি ওদের ভালোভাবেই জানি।

থতমত খেলেন ভদ্রলোক। বললেন—তাই না কি! তবে তো বড্ড ভুল হয়ে গেছে।

পত্রলেখা চেঁচিয়ে উঠলো—ভুল হয়ে গেছে বললে পার পাবেন

ভেবেছেন? আমার মামা নামকরা ব্যারিস্টার। আমি সব অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বো।

সত্যি দাদাবাবু, ভালোভাবে খবর না নিয়ে কোনো ভদ্রমহিলাকে এভাবে ইয়ে করা—

ছেলেটির আর মেয়েটির যে চেহারার বর্ণনা পাওয়া গিয়েছিল এদের সঙ্গে যে তা অবিকল মিলে গেল। মায় মেয়েটির ঐ বাঁ গালের তিলটি পর্যন্ত। মেয়েটির চেহারার বর্ণনায় বিশেষ চিহ্ন হিসেবে ছিলো বাঁ গালে কালো তিল। ঐ দেখেই মনে আর কোনো সংশয় ছিলো না। তুমিও তো ভায়া তোমার মানসীর সব কথাই বলেছো শুধু নামটি বলোনি। তাহলে এ ঘটনা বোধহয় এতদূর গড়াতো না। দিদিভাই, এবারটি মাপ করে দাও। আর ঝগড়া নয়। যেখানে অদূরে ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে আমার মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠছে—

কক্ষণো নয়। আপনার মতো বাজে মানুষের সঙ্গে কক্ষেণো আমার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না।

সে কি! পাপ করলুম আমি আর শাস্তি দেবে তুমি ঐ বেচারাকে! একের দোষে অন্যকে দণ্ড দিও না দিদিমণি। ও ছোকরা তাহলে উন্মাদ হয়ে যাবে। ওর কথাবার্তা শুনেই বুঝেছি শ্রীচরণে একেবারে নিবেদন হয়ে বসে আছে। আমার ভুলটাই তো আমার লজ্জা হয়ে রইলো দিদিভাই। আর ঐ তিলটার জন্যই এমন মারাত্মক ভুল হওয়া সম্ভব হলো।

ইন্দ্রনীল বললো—হ্যাঁ, তিল থেকে একেবারে তাল আর কি! ওঃ, কি কাণ্ড!

সে গলা ছেড়ে হেসে উঠলো।

পত্রলেখা চোখ পাকিয়ে ইন্দ্রনীলের দিকে তাকালো।

চিত্রাঙ্গদা ॥ দশম বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা

দলিল

প্রথম বর্ষার মেঘাড়ম্বর নিয়ে যখন আষাঢ় মাস পৃথিবীর মাটিতে সবেমাত্র পা দিয়েছিল—তখনই এক মেঘমেদুর সন্ধ্যায় অনেক আলো জ্বলেছিল রঞ্জনাদের বাড়িতে। অনেক ফুল এসেছিল, সানাই বেজেছিল। বাড়ি গম গম করছিল অতিথি অভ্যাগতের ভীড়ে। আর রঞ্জনা লাল বেনারসী ও কনে-চন্দন পরে কনে সেজেছিল। ঘন ঘন শাঁখের আওয়াজের মধ্যে অসীমের গলায় মালা দিয়েছিল। তারপর অসীমের হাত ধরে বধূ হয়ে প্রবেশ করেছিল এই বাড়িতে। অসীম এমন কিছু আহা মরি সুদর্শন পুরুষ নয়, তবু রঞ্জনার ভাল লেগেছে তাকে। ভদ্র মার্জিত নম্র—শ্রদ্ধা হয়। মোটকথা—অসীম তেমনি স্বামী, যেমন স্বামীর হাতে পড়লে মেয়েরা সুখী হয়। কিন্তু রঞ্জনার মনে তবু সুখ নেই কেন? দু'মাস হতে চললো বিয়ে হয়েছে কিন্তু তার মুখ থেকে বিষণ্ণতার ছায়া একদিনের জন্যও সরেনি। কি যে তার দুশ্চিন্তা, কি যে যন্ত্রণা!

বুদ্ধিমতী, কর্তব্যপরায়ণা, মার্জিত রুচিসম্পন্না স্ত্রী পেয়ে অসীমও খুশি। তবু এক এক সময় তার মনে হয় রঞ্জনা যেন সব সময় বড়ো গম্ভীর হয়ে থাকে, বড়ো মলিন। তবে কি অসীমকে পেয়ে সে সুখী হয়নি?

এক এক সময় কৌতুক করে অসীম বলে—নাঃ, বর্ষাকালে বিয়ে করে দেখছি ভুলই করেছি। গৃহিণীর মুখে সব সময় নবীন আষাঢ়ের মেঘাড়ম্বর।

মেঘের বুকে বিজলীও খেলে। রঞ্জনা এক ঝলক হেসে জবাব দেয় —কি যে বলো।

অসীম বলে—সত্যি বলোতো রঞ্জনা, আমাকে পেয়ে তুমি সুখী কি না।

রঞ্জনা আবেগঘন কণ্ঠে বলে—বিশ্বাস করো, তোমাকে পেয়ে আমি যতটা সুখী হয়েছি, বাংলাদেশের কোনো মেয়ে স্বামী পেয়ে এর চেয়ে বেশি সুখী হয়েছে কি না আমার জানা নেই।

অসীমের মনের দ্বিধা কেটে যায়।

একখানা দু'কামরাওয়ালা ছোট্ট ফ্ল্যাট। বাড়িতে মানুষ বলতে ওরা দু'জন। আর আছে বহুদিনের পুরনো কাজের লোক নবীন। অসীমের মা-বাবা আজীবন দেওঘরে বাস করেন। সেখানে তাদের বাড়ি আছে। অসীম কলকাতায় চাকরি করছে চার বছর। এতোদিন একটা মেসে ছিলো। বিয়ের কথাবার্তা হতে এই ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। রঞ্জনা কলকাতার মেয়ে। বিয়ে ঠিক হতে অসীমের মা-বাবা কলকাতায় এসে ছেলের বিয়ের কাজ সমাধা করে আবার দেওঘরে ফিরে গেছেন। অসীমের কাছে রেখে গেছেন নবীনকে।

মাঝে মাঝে অসীম অফিস থেকে ফিরে রঞ্জনাকে বাড়িতে দেখতে পায় না।

নবীন জানায়—বৌদিমণি তিনটেয় বেরিয়ে গেছেন।

কার সঙ্গে গেলেন রে!

একা একাই গেলেন।

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে রঞ্জনা নিজে থেকেই অসীমকে জানায়—এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম।

যাবে সে কথা আগে তো জানাওনি।

বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি অফিস চলে গেলে হঠাৎ মনে পড়লো। না গেলে আবার সে রাগ করবে। কিন্তু তুমি রাগ করোনি তো?

বলে রঞ্জনা অসীমের পেছনে দাঁড়িয়ে গলা জড়িয়ে ধরে।

অসীম মৃদু হেসে বলে—এতক্ষণ তোমাকে দেখতে না পেয়ে করছিলাম বৈ কি। এখন তেমাকে দেখেই সব রাগ জল হয়ে গেল।

রঞ্জনা হেসে ফেলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার হাসিমুখটা ধীরে ধীরে কালো হয়ে যায়। এই মনস্তত্ত্বের রহস্য অসীম খুঁজে পায় না।

সে রঞ্জনাকে ঢালাও অনুমতি দিয়ে রেখেছে—তোমার যখনই ইচ্ছে হবে বা দরকার হবে কোথাও যাবার, তুমি কোনো দ্বিধা না করে চলে যেও রঞ্জনা, আমি কিছু মনে করবো না।

স্বল্পবর্ষণের পর ভাদ্র মাসের এক আলো-ঝলমল স্নিগ্ধ বিকেল।

পার্কের এককোণে একটা বেঞ্চিতে বসে আছে রঞ্জনা। পাশে এক যুবক।

রঞ্জনা বললো—তুষার, আমি বুঝতে পারছি না, এখনও তুমি আমায় এমন গলায় দড়ি বেঁধে ঘুরিয়ে মারছো কেন?

একটু বাঁকা হাসি হেসে তুষার বললো—কেন, জানো না? আমি যে তোমায় ভালবাসি। তোমায় না দেখে থাকতে পারি না। অবশ্য তুমিও একদিন আমাকে না দেখে থাকতে পারতে না বলেই জানতাম। তোমার নিজের হাতে লেখা প্রমাণ-পত্রগুলো, মানে, প্রেমপত্রগুলো আজও আমার হাতেই আছে রঞ্জনা। একবার দেখে নেবে নাকি?

জানি, আমার দুর্বলতায় ভরা এই চিঠিগুলোর ভয় দেখিয়েই তুমি আমাকে ঘুরিয়ে মারছো। চিঠিগুলো আমার স্বামীকে দেখাবে বলছো। কিন্তু বোঝ না কেন তুষার, আমার এখন বিয়ে হয়েছে। প্রায়ই যদি এভাবে না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি, আমার স্বামী কি মনে করবেন। এটা কি উচিত?

ওঃ, একেবারে পতিব্রতা সতী নারী যে! আগে মা বাপকে ফাঁকি দিয়ে, কলেজ ফাঁকি দিয়ে আসতে না আমার কাছে?

রঞ্জনা কাঁদো কাঁদো গলায় বললো—কিন্তু এখন যে আমার বিয়ে হয়েছে। আমি যে আর একজনের স্ত্রী।

তারও আগে তুমি আমার।—তুষার রঞ্জনাকে জড়িয়ে ধরতে গেল।

রঞ্জনা তড়িৎগতিতে খানিকটা সরে গিয়ে বললো—ছুঁয়ো না আমাকে। আমি তোমায় ঘৃণা করি।

দাঁতে দাঁত পিষে তুষার বললো—কেন, তুমি যাকে বিয়ে করেছ আমি তার চেয়ে ছোটো কিসে?

তিনি তোমার চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক উদার।

সাপের মত হিসহিসে গলায় তুষার বললো—আমি তার এই উদারতা এক মুহূর্তে ভেঙ্গে দিতে পারি।

এতদিনের সঞ্চিত মেঘ যেন ঢল নামিয়েছে। অজস্র অশ্রুবর্ষণে শতধা হয়ে যাচ্ছে রঞ্জনা। অসীম উৎকণ্ঠিত হয়ে বারবার ব্যাকুল প্রশ্ন করছে—কি হলো রঞ্জনা বলো, বলো, আমাকে বলো। আমি তোমাকে সাহায্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। ক্রমে কান্নার দুর্নিবার বেগ কমে এলো।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে চোখ মুছে বসলো রঞ্জনা। বললো—না, আমি আর সইতে পারছি না। আজ তোমাকে সব কথা খুলে বলবো। তারপর যে দণ্ড দাও মাথা পেতে নেবো।

নত মুখে নত দৃষ্টিতে কাঁপা-কাঁপা গলায় রঞ্জনা বলে যাচ্ছিলো একটি কথাও গোপন না করে। অসীম পাশে বসে নীরবে শুনছিল। কাহিনী শেষ করে আবার কেঁদে ফেলে রঞ্জনা। বলে- জানি, সব কিছু শুনে তুমি আমায় ঘৃণা করবে। কিন্তু শপথ করে বলছি আমি তোমার প্রতি একনিষ্ঠ হতে চাই। ওকে আর আমি সহ্য করতে পারছি না। ঐ শয়তানের ফাঁদ থেকে তুমি আমায় উদ্ধার করো।

অসীমের চোখ দু'টো আরক্ত হয়ে উঠেছিল। নাসারন্ধ্র অল্প অল্প স্ফুরিত হচ্ছিল। থমথমে গলায় সে বললো—তুমি আর কখনও যেও না। তাতে যদি কিছু হয়, সে ব্যবস্থার ভার আমার।

সেদিনটা ছিল শুক্রবার। বেলা প্রায় দু'টোয় রঞ্জনাদের ফ্ল্যাটের কড়া নড়ে উঠলো।

রঞ্জনা দোর খুলে দিতেই ঘরে ঢুকলো তুষার। রঞ্জনা বললো—তুমি এখানে কেন?

তুষার বাঁকা হাসিতে বললো—গতকাল তোমার যাবার কথা ছিলো, গেলে না কেন? অগত্যা আমাকেই আসতে হলো।

একি অন্যায় কথা তুষার। আমি আমার স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে ঘুরবো এ তুমি কি করে আশা করো!

তুষার ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো—স্বামীর ঘর! তা ঘরখানা নেহাৎ মন্দ নয় দেখছি। কিন্তু এই ঘর এক নিমেষে ভেঙ্গে দেবার মন্ত্র আমার জানা আছে—তা জানো?

জানি। তোমার যা খুশি করতে পারো। আমি যাবো না।

বটে! সাহস বেড়েছে দেখছি। না, স্বামীর উপর বিশ্বাস বেড়েছে। কোনটা? শোনো, আগামী সোমবার তিনটেয় দেখা করো। আমি ঐখানেই অপেক্ষা করবো।

আমি যাবো না।

না গেলে আমি ফের আসবো।

এরপর এলে আমার চাকর তোমাকে তোমার উপযুক্ত অভ্যর্থনা জানাবে।

দাঁতে দাঁতে পিষলো রঞ্জনা।

তুষারের চোখ দু'টো হিংস্র জন্তুর মত জ্বলে উঠলো। বললো—আচ্ছা!

তুষার বেরিয়ে গেল।

অসীম বাড়ি ফিরলে রঞ্জনা তাকে সব কিছু জানালো।

সেদিন রবিবার। বিকেল চারটা। অসীম ড্রইং রুমে বসে সেদিনের পত্রিকায় সিনেমার পাতাটা বিশেষ করে লক্ষ্য করছিল, ছুটির দিনে রঞ্জনাকে নিয়ে কোন্ বইটা দেখা যায়। এমনি সময় ঘরে ঢুকলো এক যুবক।

কাগজ থেকে চোখ তুলে অসীম বললো—কাকে চাই?

রঞ্জনা আছে?

অসীম সোজা হয়ে বসলো। হাতের কাগজ গুটিয়ে পাশে রাখলো। বললো—আছে। আপনি?

আমি রঞ্জনার বন্ধু। আপনিই মনে হচ্ছে তার স্বামী।

হ্যাঁ, বসুন। রঞ্জনাকে ডেকে দেবো?

না। আপনার কাছেই আমার গোটা কয় কথা আছে।—তুষার বসলো। তুষারের কথা যখন শেষ হল তখন অসীম গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আপনার কথার কোনো প্রমাণ আছে?

নিশ্চয়ই। এই দেখুন প্রমাণ।—তুষার পকেট থেকে এক বাণ্ডিল খামে মোড়া চিঠি বের করে বললো—রঞ্জনার হাতের লেখা নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন।

অসীম হাত বাড়িয়ে বাণ্ডিলটা টেনে নিলো।

দু'চারখানা চিঠি খুলে উল্টে পাল্টে দেখে অসীম বললো—হ্যাঁ, চিঠিগুলো রঞ্জনারই লেখা বটে!

তারপর ডাকলো—রঞ্জনা! রঞ্জনা!

বাড়ির ভেতর থেকে মাঝখানের পর্দা ঠেলে রঞ্জনা ঘরে এসে ঢুকলো।

তুষার ক্রুর কুটিল দৃষ্টিতে রঞ্জনার দিকে তাকালো। তার মুখে কুৎসিত উল্লাসের নৃত্য।

অসীম বললো—তুষারবাবু, রঞ্জনা একদিন এগুলো ভুল করে আপনাকে দিয়েছিল। আসলে কিন্তু এগুলো আমার প্রাপ্য। স্ত্রীর ভুল সংশোধন করে দেবার দায়িত্ব স্বামীর। তাই এই চিঠিগুলো আজ আমি নিয়ে নিচ্ছি। তারপর রঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বললো—রঞ্জনা, একটু আগে না বলছিলে ঘরে স্পিরিট নেই, তাই চায়ের জল গরম করবার জন্যে স্পিরিট ল্যাম্পটা জ্বালাতে পারছো না। এগুলো নাও।—অসীম চিঠির গোছা রঞ্জনার হাতে তুলে দিলো—আশা করি এ দিয়ে তোমার চায়ের জল গরম হয়ে যাবে। আমাদের বন্ধুর জন্যও এক কাপ জল নিয়ো।

অস্ত্র ব্যর্থ হয়েছে তাই ওদিকে তুষারের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। সে আমতা আমতা করে বললো—না না, চা, মানে চা—আমি যাই—

আহা-হা। বসুন, এক কাপ চা খেয়ে যান। আপনি বন্ধু লোক। যাকে বলে সত্যিকারের বন্ধু।

তুষার ততক্ষণে উঠে পড়েছে। অসীমের কথাগুলো যেন চাবুকের মতো পড়ছে তার পিঠে।

সে চোখের আড়ালে চলে যেতেই রঞ্জনা নতজানু হয়ে বসে অসীমের হাঁটুর উপর মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়লো। তার মাথার ওপর নেমে এলো অসীমের সান্ত্বনা-কোমল একখানি হাত।

বিচিত্র মন

নীতা হনহন করে এসে জিতেনবাবুর কাছে দাঁড়ালো। ডাকলো—বাবা!

—কি মা নীতু!

—আচ্ছা বাবা, মিতুর নাকি বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে?

জিতেনবাবু সন্তর্পণে একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেললেন। সংক্ষেপে বললেন—হুঁ।

এমব্রয়ডারির ফ্রেমে আটকানো টেবিলক্লথের কোণে লাল সুতোয় কেয়াফুলের নকশা আঁকতে আঁকতে নীতা বললো—আমার বিয়ে হবে না বাবা! আমি তো মিতুর থেকে বড়ো।

জিতেনবাবুর চোখ দুটোতে বেদনা ঘনিয়ে এলো। বললেন—হ্যাঁ মা, হবে।

—কবে হবে? আমার বিয়েই তো আগে হবার কথা। আমি তো মিতুর থেকে তিন বছরের বড়ো। তাই না বাবা?

—হ্যাঁ মা।

—তবে বুঝি আমাদের দুজনের এক সংগেই বিয়ে হবে?

বেদনার ডেলাটা জিতেনবাবুর গলা বেয়ে উপরের দিকে উঠতে চাইলো। ঢোঁক গিলে তিনি সেটাকে নীচে নামালেন। বললেন—হবে মা, হবে। তুমি এখন বাড়ির ভেতরে যাও তো। বাঃ, তোমার এই সেলাইটা বেশ চমৎকার হচ্ছে কিন্তু। যাও, ওটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলো গিয়ে!

—হ্যাঁ বাবা, বিয়ের আগেই শেষ করে ফেলতে হবে। নইলে আমি চলে গেলে কে আর করবে!

নীতা হাতের সেলাইয়ে সূঁচের ফোঁড় তুলতে তুলতে ভেতরের দিকে পা বাড়ালো। সেদিকে তাকিয়ে জিতেনবাবু বুক ভাংগা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আহা! যেন একখানি লাবণ্যের প্রতিমা! দেহভরা শ্রী, যেখানে যতটুকু সৌন্দর্য প্রয়োজন ভগবান কার্পণ্যহীনভাবে তা দিয়েছেন।

মিতার চেয়েও অনেক সুশ্রী তাঁর নীতা। কিন্তু ভেতরটা পাঁচ বছরের শিশুর মত অপরিণত। খুব ছোটোবেলায় একটা কঠিন অসুখ হয়েছিল। সেই থেকে এই অবস্থা মেয়েটার। অপরিণত বুদ্ধির জন্য পড়াশুনোও কিছুই হয়নি ওর। মনে রাখতে পারে না। কোনো রকম ঘষে ঘষে সিক্স সেভেন অব্দি পড়ে ঐ পর্ব শেষ হয়েছে। তবে ঘরকন্নার কাজে বেশ রপ্ত মেয়েটা। রান্না করতে পারে, ঘরদোর সাজায় ছবির মতো করে। সব কাজে মাকে সাহায্য করে। নিজের বুদ্ধিতে হয়তো সব কিছু পেরে ওঠে না কিন্তু যেভাবে নির্দেশ দেওয়া যায়, খুব নিষ্ঠার সংগে তা করে। আর হাতের সেলাই তো নয়, যেন ছবি। এমন তন্ময় হয়ে সেলাই করতে বসে যেন ধ্যানে বসেছে। বুদ্ধি কম বলে ওর বন্ধু বা খেলার সাথী কেউ ছিলো না। তাই ও নিজেকে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দিয়েছিল ঘরকন্নার কাজ ও সেলাইয়ের মধ্যে। পৃথিবীতে মা-ই ছিলো তার প্রধান সংগী। মিতাও তার সংগে বেশি সময় কাটাতো না, তবে দিদিকে খুব ভালোবাসতো মিতা। ব্লাউসের হাতায় দিদির হাতের এমব্রয়ডারি না হলে তার চলেই না। আর শীতের দিনে চাই দিদির হাতে বোনা কার্ডিগান। মিতা এক এক সময় নীতার গলা জড়িয়ে ধরে বলে—কি চমৎকার সেলাই করিস তুই দিদি। তুই নিজে যেমন সুন্দর তোর হাতের সেলাইও তেমনি সুন্দর। তোকে দেখলে বুঝতে পারি ভগবান কতো বড়ো শিল্পী আর তোর সেলাই দেখলে বুঝতে পারি তুই কত বড় শিল্পী।

মা শুনতে পেয়ে মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে বলেন—হ্যাঁ, ঐ বাইরেই যত বাহার। ভেতরটা তো ছাই।

দুই ছেলে আর দুই মেয়ে জিতেনবাবুর। ছেলেরা উচ্চশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত এবং বড়োটি বিবাহিত। ছেলেদের ছোটো মেয়েরা, এবং মিতা সর্বকনিষ্ঠ। ডিগ্রী কোর্সের থার্ড ইয়ারে পড়ে। তারই বিয়ের তোড়জোড় চলছে। কিন্তু নীতাকে নিয়ে যে কি করবেন জিতেনবাবু ভেবে পান না। মেয়েটা হয়েছে তাঁর বুকের কাঁটা। সব সময় খচখচ করে। বুকের ভেতর রক্তক্ষরণ হয়। বিয়ে দিতেও অনেক চেষ্টা করেছেন জিতেনবাবু। কয়েকটা পাত্রপক্ষ এসে দেখেও গেছে। কিন্তু সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে মেয়েটা নিজেই। দেখে তো কেউ অপছন্দ করে না কিন্তু কথা বললেই মুশকিল। এমন বেফাঁস কথা বলে যে পাত্রপক্ষরা

সরে পড়ে।

প্রথম দফায় যারা এসেছিল, মামুলী প্রশ্নোত্তরের পালা শেষ হতেই ওদের মধ্যে একজন বললো—আচ্ছা, এবার আপনি যেতে পারেন।

নীতা উঠে দাঁড়িয়েই বলে বসলো—আচ্ছা, আমাকে আপনাদের পছন্দ হয়েছে ?

ওরা হকচকিয়ে গেল। পরস্পর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। জিতেনবাবু লজ্জায় ঘেমে উঠলেন।

নীতা আবার বললো—কি, কথা বলছেন না যে? পছন্দ হয়েছে তো ?

পাত্রের মামা বলে পরিচিত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন—হ্যাঁ মা, হয়েছে।

খুশিতে উছলে উঠলো নীতা—আমি জানি, হবেই। আমি খুব সুন্দর কিনা।

জিতেনবাবু ব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলেন—যাও মা, বাড়ির ভেতর যাও।

পরিণামে যা হবার তাই হয়েছিল।

আরও একবার নীতাকে অনেক তালিম দিয়ে দেওয়া হয়েছিল—ওরা যা যা জিজ্ঞাসা করেন শুধু তারই জবাব দিও। বাড়তি কথা একদম নয়।

নীতা কথা রেখেছিল। কিন্তু জিতেনবাবু যেই বললেন—আচ্ছা, এবার তুমি ভেতরে যাও, অমনি নীতা বলে বসলো—হ্যাঁ বাবা, তুমি যেমন যেমন বলে দিয়েছিলে আমি তেমনি কম কথা বলেছি কিনা তাই বলো। ভুল হয়নি তো আমার !

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখন ভেতরে যাও।

কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে কারও বাকী রইলো না।

এমনি আরও কয়েকবার হয়েছে। এর জন্য অনেক অপমান অনেক কটূক্তিও সইতে হয়েছে জিতেনবাবুকে। কেউ কেউ বলেছে—ভাঁওতা দিয়ে পাগল মেয়েকে গছিয়ে দিতে চাইছিলে ? তাই জিতেনবাবু হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এখন মন দিয়েছেন মিতার বিয়ের দিকে।

এতোদিন যখনই মেয়েদের জন্য কোনো জিনিস এসেছে দু' মেয়ে সমানভাবে তা পেয়েছে, শাড়ি জামা জুতো গয়না বা অন্য কোনো উপহার।

এবারই শুধু ব্যতিক্রম। বিয়ের জিনিসপত্র কেনাকাটা হচ্ছে। রোজই গাদা গাদা জিনিস আসছে বাড়িতে। সবই নাকি মিতার। নীতার আশ্চর্য লাগে। এরা সবাই ভেবেছে কি!

এই অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করলো নীতা। বেনারসী শাড়ি আর কসমেটিক্স কেনার দিন তো তুলকালাম কাণ্ড। অগত্যা ওর জন্য ওগুলো কিনতে হলো।

মা বললেন—এখন খরচের সময়। ওর জন্য এতোসব কেনাকাটা কি এখন না করলেই নয়?

—আহা! ওই নিয়ে যদি ভুলে থাকে থাক না। বিয়ের দিন পরলোই বা একটা নতুন শাড়ি।

—কিন্তু জামাই দেখে বায়না করলে তখন কি দিয়ে ভোলাবে, শুনি?

জিতেনবাবু নীরবে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বিয়ের দিন মিতার বন্ধুরা মিলে ওকে চমৎকার করে সাজাচ্ছে। এমন সময় নীতা এসে সেখানে চড়াও হলো—বা রে, তোমরা শুধু মিতুকে সাজাতেই ব্যস্ত। আমাকে সাজিয়ে দাও। আমারও তো আজ বিয়ে।

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। মিতা বললো—যা না ভাই, দিদিটাকে একটু সাজিয়ে দিয়ে আয়। নইলে গণ্ডগোল শুরু করবে।

পাশের ঘরে গিয়ে মেয়েরা সুন্দর করে নতুন কেনা বেনারসীটা পরালো নীতাকে। নীতা ক্রমাগত বলতে লাগলো—চন্দন পরাবে না আমাকে? আমার ফুলের মালা কই? মিতুর হাতে এতগুলো চুড়ি, আমার হাতে শুধু বালা কেন? মা, তোমার চুড়িগুলো আমায় দাও—ইত্যাদি।

মেয়েরাও বেশ মজা পেয়েছে। ঠিক বিয়ের কনের মতোই তারা সাজাতে লাগলো। খুব হাসি-হাসি মুখ করে কনে-চন্দন পরলো নীতা, গলায় ফুলের মালা দোলালো, হাতে-খোঁপায় মালা জড়িয়ে দিলো। মায়ের হাতের চুড়িগুলো পরলো বায়না করে চেয়ে নিয়ে। তারপর

নিজের রূপে নিজেই মুগ্ধ হয়ে বার বার আয়নায় মুখ দেখতে লাগলো। যে কেউ কাছে এলো, তাকেই জিজ্ঞাসা করলো—আমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, না?

দেখেশুনে মা'র বুক শঙ্কায় দুরুদুরু করতে লাগলো। জিতেনবাবুকে বললেন—তোমার বড়ো মেয়ের কাণ্ড দেখছো?

জিতেনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন—দেখেছি। কিন্তু কি করবো বলো। ভুলিয়ে তো রাখতেই হবে। আজকের দিনে যদি ওর চোখের জল পড়ে মিতু কি তাহলে সুখী হবে?

বর এলে সবাই হৈ হৈ করে বর দেখতে ছুটলো। নীতা জানে, কনেদের বর দেখতে ছুটে যেতে নেই। মেয়েরা ঘুরে এলে জিজ্ঞাসা করলো—কেমন বর হয়েছে?

ওরা বললো—না, মিতুর কপাল ভালো। বেশ সুন্দর বর হয়েছে।

—শুধু মিতুর বর! আমার বর আসেনি?

—একজনকেই তো দেখলাম।

—তাহলে বোধ হয় আরও পরে আসবে।

—তাই হবে। মেয়েরা মুখ টিপে হাসে। কি বিয়ে পাগলা মেয়ে রে বাবা।

প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদি সারা হলে বর ছাঁদনাতলায় গিয়ে দাঁড়ালো। এবার কনে আনার পালা। ওদিকে নীতা সবাইকে অস্থির করে তুলেছে তার বর এখনও আসেনি কেন?

একজন বিরক্ত হয়ে বললো তোর বাবা কি তোর জন্য বর ঠিক করেছে যে আসবে!

—তবে কি আজ আমার বিয়ে হবে না?

—বর কোথায় যে বিয়ে হবে।

হঠাৎ নীতা একছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। একেবারে সোজা সুপ্রিয়র কাছে গিয়ে বললো—তুমি আমাকে বিয়ে করবে? মিতু আমার ছোট বোন। আমার আগে তার কেন বিয়ে হবে?

সুপ্রিয় অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো। এটি তবে কনের বড় বোন। কি আশ্চর্য সুন্দর! চোখ ফেরানো যায় না। কনের সাজ কেন? ওরও কি আজ বিয়ে? এমন তো কিছু শোনেনি সে।

মিনতিমাখা ডাগর চোখ দু'টো স্থপ্রিয়র মুখের উপর রেখে তার একখানি হাত ধরে নীতা অনুনয় ভরা গলায় বললো—দেখো, সন্ধ্যে থেকে আমি কতো সেজেছি। এখন ওরা বলছে আজ নাকি আমার বিয়ে হবে না। তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

স্থপ্রিয়র বুকের ভেতরটা দুলে উঠলো। সে অভিভূত, আচ্ছন্ন। মুগ্ধদৃষ্টিতে অপরূপ মুখখানার দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করলো—করবো। কি উচ্চারণ করছে নিজেই যেন বুঝতে পারছে না।

সবাই হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ছুটে এলেন শশব্যস্ত জিতেনবাবু, নীতার হাত ধরে টেনে নেবার চেষ্টা করে বললেন—তুই এখানে কেন মা! চল্ ভেতরে চল্।

নীতা স্থপ্রিয়র হাত দু'টো প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বললো—তোমার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে দিও না। মিনতি মাথা দু'টো গভীর কালো চোখ, চোখের কোলে দু ফোঁটা টলটলে জল। ফুটন্ত পদ্মের মতো একটা মুখ। তার কাছে আত্মনিবেদনে উন্মুখ একটা ফুল। সুপ্রিয়র মনের মধ্যে একটা ধস নামলো। রুদ্ধ কণ্ঠে জিতেনবাবুকে বললো—ওর সঙ্গেই আমার বিয়ে দিন।

—কি বলছো? ভাল করে ভেবে দেখো। ও তোমার উপযুক্ত নয়।

—ভেবেছি, অথবা আমি কিছু ভাবতে পারছি না। ওকে আমি ফেরাতে পারবো না।

—কিন্তু আমার মিতু?

—আমি তার জন্য অন্য পাত্র ঠিক করে দিচ্ছি। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু দেবেশ আমার সঙ্গেই এসেছে। খুব ভালো ছেলে। সুপাত্র। আমার অনুরোধ সে ঠেলতে পারবে না। আপনি নিঃসন্দেহে তার হাতে আপনার ছোটো মেয়েকে দিতে পারেন। আমি জামিন রইলাম। আর—ওকে আমায় দিন।

জিতেনবাবু অভিভূত। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বার বার বলতে লাগলেন -তুমি স্থখী হবে। তুমি স্থখী হবে। মেয়েটার বুদ্ধি একটু কম বটে কিন্তু কাজেকর্মে ওর জুড়ি নেই। বড় ভালো মেয়ে। ভারী সরল—জিতেনবাবুর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হলো।

সব কিছু চুকে গেলেও তখনও যেন বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি সুপ্রিয়র। মানুষের মন কি বিচিত্র। পলকে অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারে। ব্যাপারটা যে কি হয়ে গেল সে যেন বুঝে উঠতে পারছে না।

রাত তখন গভীর। চারপাশের কোলাহল থেমে গেছে। বাসরঘরে এতোক্ষণ যারা হৈ-চৈ করছিল, ক্লান্ত হয়ে চলে গেছে। বিয়েবাড়ি এখন নিস্তব্ধ। ঘরে মৃদু নীল আলোটা জ্বলছিল। খাটের উপর একখানা অপরূপ ছবির মতো নীতা ঘুমিয়ে আছে। ঈষৎ কাত হয়ে রয়েছে সে। বাঁ হাতখানা বিছানার উপর সুন্দর ভংগিতে এলানো। গলার মালাটা বুক বেয়ে এসে হাতখানার উপর নেমে পড়েছে। একটা পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততা। পরিপূর্ণ নির্ভরতা।

এতোক্ষণ অনর্গল কথা বলছিল নীতা। সহজ সরল অভিব্যক্তিতে উচ্ছ্বসিত মুগ্ধ সংলাপ। যার মর্মার্থ হলো—তুমি আমাকে বিয়ে করেছো বলে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসবো। তুমি আমাকে ফেলে কখনও চলে যাবে না তো। আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদের বাড়ি!

সুপ্রিয়র কাছ থেকে সবটুকু আশ্বাস আদায় করে এখন নিশ্চিন্ত ঘুমে ডুবে রয়েছে। আর সুপ্রিয় মনের সংগে বোঝাপড়া করছে। একটার পর একটা সিগারেট টেনে চলেছে। মুহূর্তে কি যে হয়ে গেলো, সেই আকস্মিকতার পরিমাপ করছে। কেন তার মনের এমন পরিবর্তন হলো? মেয়েটি খুব সুশ্রী বলে? সেই সুশ্রী মুখের করুণ আকুতি দেখে?

সুপ্রিয় ভাবছে আজ সন্ধ্যায় তার যার সংগে বিয়ে হবার কথা ছিলো সেই মেয়েটির কথা। সে হয়তো এখন তারই বন্ধু দেবেশের পাশে বসে অনেক মুগ্ধ সংলাপ আওড়াচ্ছে, যে কথাগুলো আজকের এই মায়াঘন রাত্রিতে সুপ্রিয়রই পাওনা ছিলো। আচ্ছা, কি ভাবছে সেই মিতা নামের মেয়েটি? কি বলছে দেবেশের কানে কানে? বলছে—যা হয়েছে ভালোই হয়েছে? তোমাকে পেয়েই আমি খুশি।

এমন সময় বন্ধ দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল। দরজা খুলে চমকে উঠলো সুপ্রিয়। বিস্ময়াহত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মিতা। বিয়ের সাজে আর এক কনে। মিতা ঘরে ঢুকলো।

দরজাটা ভেজিয়ে দিলো। মন্ত্রমুগ্ধের মত সুপ্রিয় তাকে অনুসরণ করলো।

ঘরে এসে সুপ্রিয়র মুখোমুখি দাঁড়ালো মিতা। সুপ্রিয় অবাক্ চোখে তাকিয়ে আছে। মিতাও সুন্দর, তবে তার নীতার মত অপরূপা নয়। কিন্তু এতো রাত্রে বাসরঘর ছেড়ে এখানে কি করতে এসেছে মিতা? দেবেশ কি এখনই ঘুমিয়ে পড়েছে? আজকের রাত কি ঘুমোবার রাত?

সুপ্রিয়র মুখের উপর দৃষ্টি ফেলে মিতা বললো—আমি না এসে পারলাম না!

সুপ্রিয় অসংলগ্নভাবে বললো—কিন্তু—দেবেশ—জেগে আছে না?

—জেগেই আছেন। আমি তাঁকে বলে এসেছি কলঘরে যাচ্ছি।

সুপ্রিয় কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

মিতা বললো—সেই কবে তুমি আমায় কনে দেখে গিয়েছিলে। সেই থেকে বিয়ের কথা যত ধাপে ধাপে এগিয়েছে ততো গভীরভাবে আমি তোমাকে ভেবেছি। আজ সন্ধ্যে পর্যন্তও তাই ভেবেছি, কিন্তু তারপরই তুমি আমার চোখে মহৎ হয়ে উঠেছো। তুমি আমার দিদির বর, আমার আপনজন। কিন্তু আজকের এই রাত্তিরে যতোক্ষণ আমি কনের বেশে সেজে আছি, আমি ভুলতে পারছি না সন্ধ্যে থেকে তোমার জন্যই আমি সুন্দর করে চুল বেঁধেছি, বেনারসী শাড়ি পরেছি, কপালে চন্দন এঁকেছি, এই ফুলের মালা পরেছি, মনে মনে তোমার গলায় পরিয়েও দিয়েছি। আমার জীবনের এই শ্রেষ্ঠ আয়োজন সব তোমার জন্য—তোমার জন্য—তোমার জন্য—

বলতে বলতে মিতার গলাটা আবেগে কেঁপে উঠলো। সে সুপ্রিয়র হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের চোখের উপর চেপে ধরলো।

সুপ্রিয়র বুকের ভেতর একটা আবেগের ঢেউ ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত রাখলো সে। একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রণার কাঁটা বুকের গভীরে খচখচ করে উঠলো। রুদ্ধ গলায় বললো—এখানে তোমার এত দেরি করা বোধহয় উচিত হচ্ছে না। দেবেশ হয়তো ভাবছে।

মিতা সুপ্রিয়র হাতখানা ছেড়ে দিলো। পূর্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো—যাচ্ছি।

তারপর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললো—তোমার মহত্বকে প্রণাম।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মিতা। সুপ্রিয় নিথর দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। নীতা তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

কুণালের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে একটি নিটোল স্বপ্ন বুকে নিয়ে সংসার করতে এসেছিলো মল্লিকা। বড়ো সুখে সংসার করতে শুরু করেছিল। আড়াই কামরার ফ্ল্যাটে দুজন মাত্র প্রাণী। নিজের সবটুকু মনোযোগ স্বামীকে ঘিরে নিয়োজিত করে রেখেছিল সে। লক্ষ্য করেছিল কুণালের সবটুকু মনোযোগও তাকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে।

কাজেই মল্লিকার সুখের পালে হাওয়া লেগেছিল।

কিন্তু মাস তিনেক যেতে মল্লিকার সেই স্বপ্নটা হঠাৎ টোল খেলো।

মল্লিকা জানতো না—অনেকদিন থেকেই কুণালের এই উপসর্গটা ছিলো। বিয়ের পর থেকে কিছুটা সামলে-সুমলে চলছিলো বটে, সেদিন আবার বাঁধ ভাঙলো। একটু বেশি রাত করে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরলো কুণাল।

কি, আজকে ফিরতে এত দেরি যে—অন্যান্য দিনের মতোই হাসিমুখে কাছে এগিয়ে এলো মল্লিকা। যদিও খুব বেচাল হয়নি তবু কুণালের কিছুটা অস্বাভাবিক ভাব চোখে পড়তে এবং ব্যাপারটা বুঝতে মুহূর্তমাত্র দেরি হলো না মল্লিকার।

তুমি—তুমি মদ খেয়েছো? জলে ডোবা মানুষের মতো রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করেছিলো মল্লিকা।

থতমতই ছিলো কুণাল, বলেছিল—বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একটু খেয়েছি, তুমি কিছু মনে করো না মল্লি।

মল্লিকা কোনোরকমে উচ্চারণ করেছিলো—আর কোনো দিন খেয়ো না। আমি সইতে পারবো না।

মল্লিকা এমন এক পরিবেশে বড়ো হয়ে উঠেছিল যেখানে ন্যায়নীতির সূক্ষ্ম মানদণ্ডটা একচুল এদিক ওদিক হবার জো ছিল না, যে পরিবারে একটি পবিত্রতা ও শুদ্ধাচারের ধারা সর্বত্র সর্বক্ষণ প্রবাহিত হতো। তাই মল্লিকা একটা জ্বলে যাওয়া দেয়াশলাইয়ের কাঠির মত নিমেষে নিঃশেষ হয়ে শুধু বলেছিলো—আর কোনোদিন খেয়ো না। কিন্তু মল্লিকার এই আর্জি নিষ্ফল হয়েছিল। কারণ বাঁধ একবার ভেঙে গেলে যেমন বন্যাকে

রোধ করা মুশকিল তেমনি মল্লিকার কাছে যখন ব্যাপারটা একবার প্রকাশ হয়ে পড়লো তখন কুণালকে আর সামলানো গেল না, প্রথমদিকে মাঝে মাঝে তারপর রোজ সে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরতে লাগলো। সংগে সংগে আরও নানা উপসর্গ ভর করলো ওকে। দ্রুত নীচে নামতে লাগলো কুণাল।

প্রথমদিকে নিরুপায় দর্শক হয়ে রইলো মল্লিকা। তারপর প্রতিবাদ শুরু করল। আর এইখানেই যত বিপত্তি। প্রতিবাদ করতে গিয়ে মল্লিকা নির্যাতিত হতে লাগলো। মল্লিকার অনেক স্বপ্নের সংসার যেন আছাড় খেয়ে চুরমার হয়ে গেল। দিনে দিনে তিক্ততা উঠলো চরমে।

আগের রাত্রে মত্ত অবস্থায় কুণাল মল্লিকাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। ফলে টেবিলের কোণ লেগে কপালের বেশ খানিকটা কেটে গিয়েছিল মল্লিকার, তার উপর অতিরিক্ত অশ্রুবর্ষণের ফলে চোখমুখ ছিলো ফোলা ফোলা ও আরক্ত।

কুণাল অফিসে বেরিয়ে যাবার পরে মল্লিকার বাবা মেয়ের খবর নিতে এসে হাজির। মল্লিকার চেহারা দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে রে মল্লি? তোর চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন? কপাল কাটলো কি করে?

মল্লিকা নিজেকে আর সামলাতে না পেরে কান্নায় ভেংগে পড়ে সব কিছু বলে ফেললো। বললো—কপাল শুধু কাটেনি বাবা, কপাল একেবারেই ভেংগেছে।

মল্লিকার বাবা একজন আইনজীবী। তিনি অবরুদ্ধ আগ্নেয়গিরির মতো খানিকক্ষণ বসে থেকে বললেন—এই পশুটার সংগে তো আমি তোকে সারাজীবন বাস করতে দিতে পারি না। আমি এই নরক থেকে তোকে বের করে নিয়ে যাবো।

তীব্র অভিমানে অপমানে পিতার কোলে লুটিয়ে পড়ে মল্লিকা বললো—তাই করো বাবা তাই করো।

তারপর একসময় আদালতের সাহায্যে দু'জনের ডাইভোর্স হয়ে গেল।

বছর তিনেক বাদে মল্লিকার জীবনে আর একজন পুরুষ এসে ছায়া

ফেললো। সে মল্লিকার বাবার বন্ধুপুত্র নিরাপদ। একদিন স্পষ্ট গলায় মল্লিকাকে সে তার জীবনে আহ্বান করলো।

মল্লিকা জানালো এ ব্যাপারে তার বাবার মতামতই চূড়ান্ত। নিরাপদ বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে।

নিরাপদ তার আর্জি পেশ করতে মল্লিকার বাবা বললেন—ভেবেচিন্তে বলছো তো? আমার মেয়ের এর আগে একবার বিয়ে হয়েছিলো সেকথা তুমি জানো নিশ্চয়ই।

জানি। ডাইভোর্স হয়েছে।

এ নিয়ে তার বিন্দুমাত্র অসম্মান হয় এ আমি চাই না। এ ব্যাপারে এগোবার আগে তোমাকে একথা ভেবে দেখতে হবে।

আমি সব বুঝেসুঝেই এগোতে চাইছি।

মেয়েকে আমি আবার বিয়ে দেবো। পাত্র হিসাবে তুমি অযোগ্য নও। তবে তোমাকে আমার সংগে একটা বোঝাপড়ায় আসতে হবে। মেয়ের অমর্যাদা হয়েছে বলে তাকে একজনের কাছ থেকে সরিয়ে এনেছি। তোমারও তাকে অসম্মান করা চলবে না।

আমার কাছে তার কোনো অসম্মান হবে না।

বেশ, তবে আমার কোনো আপত্তি নেই।

তারপর একদিন ম্যারেজ রেজিস্ট্রী অফিসে নিরাপদর সংগে মল্লিকার বিয়ে হয়ে গেলো। আবার আর একজনের ঘরে সংসার পাততে এলো মল্লিকা। কিন্তু না, মনে সে স্বপ্ন নেই, প্রাণে সে রঙ নেই, কাজে সে উৎসাহ নেই। সব ব্যাপারেই কেমন ঝিমিয়েপড়া মনমরা ভাব। থেকে থেকে মনটা উদাস হয়ে যায়। উধাও হয়ে যায় যেখানে, যে ঘরটির মধ্যে, একদিন সেই ঘর থেকে বিতৃষ্ণাভরে মল্লিকা মুখ ফিরিয়ে চলে এসেছিল। সবচেয়ে আশ্চর্য—যে মানুষটার কাছ থেকে বিরূপ মন নিয়ে সে দূরে সরে এসেছিল, এই তিন বছরে যাকে মনে করলেও শরীর আর মনে জ্বালা ধরতো—যার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে জীবন স্বস্তিতে ভরে গেছে বলে মনে হতো তার—সেই মানুষটাকে এখন কেন প্রতি ব্যাপারে মনে পড়ে। নিরাপদ আদর করলে অভিমান করলে পরিহাস করলে অমনি মনে পড়ে যায় ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে কি বলতো কি করতো কুণাল! অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে মল্লিকা। মল্লিকার এই নিস্পৃহতায় নিরাপদর

সব আবেগ যেন জুড়িয়ে শীতল হয়ে যায়।

যতো দিন যেতে লাগলো নিরাপদ ব্যাপারটা বেশি করে লক্ষ্য করলো। একদিন আহত গলায় বললো—কুণাল চৌধুরীকে যদি না-ই ভুলতে পারবে তবে আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন মল্লিকা!

মল্লিকা শান্ত মৃদুকণ্ঠে বললো—আমি তোমাকে প্রতারণা করতে চাইনি। তুমি সব জেনেশুনেই আমাকে বিয়ে করেছো।

না, আমি জানতাম না এখনও তার প্রতি তোমার এতো অনুরাগ। ভেবেছিলাম--বিরাগবশতই তার কাছ থেকে দূরে সরে এসেছো। তুমি আমার ঘর করবে আর মনে মনে কুণাল চৌধুরীর ধ্যান করবে এ কি করে চলতে পারে?

ঠাণ্ডা গলায় মল্লিকা জবাব দিলো—আমার জীবনে যখন এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল তখন এদিকটাও তোমার আগে ভাবা উচিত ছিলো।

উত্তেজিত হয়ে নিরাপদ মল্লিকার দুই কাঁধে জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললো—না না না, এ হতেই পারে না। মল্লি, তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছি, জীবন চেয়েছি, তোমার মধ্যে জীবনের উষ্ণতা চেয়েছি। তুমি আমার স্বপ্নের ঘরে জীবনহীনতার শীতলতা নিয়ে এসো না। আমার এ ঘরে তুমি জীবনের উত্তাপ দাও জীবনের উত্তাপ দাও।

কি বলবে মল্লিকা? নিরাপদর একখানা হাত সজোরে চেপে ধরে সে বোবা হয়ে বসে রইলো।

নিরাপদ নিজেকে একটু সামলে নিলো। আস্তে আস্তে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

সেদিকে তাকিয়ে মল্লিকা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। নিজের মনের গভীরে ডুব দিয়ে দেখলো, তার যা কিছু ঐশ্বর্য ছিলো সব সেই উচ্ছৃংখল অত্যাচারী মাতাল কুণাল চৌধুরীকে দিয়ে দেউলে হয়ে এসেছে। ভালোমানুষ নিরাপদকে দেবার মতো আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

উত্তর ভারতী॥

যে স্রোত হারিয়ে যায়

পথ চলতে চলতে মেয়েটির মুখোমুখি হয়ে যেতেই আমি থমকে দাঁড়ালুম। কে? সুপর্ণা না? ওর সাদা সিঁথিটার দিকে চোখ পড়তেই আমার বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠলো।

প্রায় তিন বছর বাদে দেখা। তখন ওর নতুন বিয়ে হয়েছে। সিঁথিতে ডগ্‌ডগে সিঁদুর। তবে কি—তবে কি সুপর্ণা বিধবা হয়েছে?

একটু সময় লাগলো নিজেকে সামলে নিতে। বললাম—পর্ণা, তুমি! কোথায় চলেছো? খুব দেখা হয়ে গেলো যা হোক।

ও, নিরুপা, খবর কি?

এই চলে যাচ্ছে এক রকম। তুমি কেমন আছো?

সুপর্ণা হাসলো—দেখে কি মনে হচ্ছে? ভাল না মন্দ। তোমার চোখে একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি, তাই তো, পর্ণার সিঁথির সিঁদুর কোথায় গেল। তার জবাব হলো—মুছে ফেলেছি। যদি প্রশ্ন কর কেন মুছেছো, তারও জবাব দিতে পারি। তবে একটু সময় লাগবে, এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো তা সম্ভব নয়। যদি আমার ডেরায়—এই তো কাছেই—পায়ের ধুলো দাও তবে বলতে পারি। এবং তোমার শুনতে ইচ্ছে হলে শুনতে পারো। কি, যাবে?

কলেজ-জীবনে সুপর্ণার সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিলো। প্রথমে আমার বিয়ে হয়, তার দু'বছর বাদে সুপর্ণার, তার বিয়ে না হওয়া পর্যন্তও বন্ধুত্ব টালমাটাল করে বজায় ছিলো। কিন্তু সুপর্ণার বিয়ের পর একেবারে যবনিকাপতন। কারণ দু'জনের বাসস্থানের দূরত্বটা ছিলো একটু বেশি। সেই কারণে যাতায়াত ক্রমেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তিন বছর বাদে এই দেখা! কাজেই জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো সুপর্ণার খবর।

বললুম—চল, দেখা যখন হয়েই গেছে একটু গল্প করেই যাওয়া

যাক্। নইলে মন মানছে না।

পাঁচ ভাড়াটে বাড়ির একখানা ঘর। দরোজার তালা খুলে আমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো সুপর্ণা। চেয়ার টেনে বসতে দিলো। নিজে বসলো খাটের উপর পা দুলিয়ে।

একপাশে রান্নার সরঞ্জাম, স্টোভ, কুঁজো, গেলাস। সিংগল খাটে পরিপাটি বিছানা, আলনায় দু'চারটে শাড়ি জামা। নিতান্তই একার সংসার। আমি সুপর্ণার মুখের দিকে তাকালাম।

সুপর্ণা হেসে বললো—আমি চোখের ভাষা বুঝতে পারি। বলবো—তোমার চোখ কি বলছে? বলছে—তাইতো, তিমিরবাবু কোথায়?

জবাব দিচ্ছি তোমার কথার। তার আগে দাঁড়াও, একটু চা করি। সুপর্ণা স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চাপালো।

দু'জনের চা-বিস্কুট টেবিলের উপর গুছিয়ে নিয়ে সুপর্ণা বসলো। বললো—নাও, চা খাও।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করলাম—এবার বলো তিমিরবাবু কোথায়?

হারিয়ে গেছে। না না, পৃথিবীর বুক থেকে নয়। আমার জীবন থেকে। আজ এক বছর হলো তার সংগে আমার ছাড়াছাড়ি।

সে কি পর্ণা, তোমরা না—

হ্যাঁ, আমরা পরস্পরকে ভালবেসে মন জানাজানি করেই বিয়ে করেছিলাম। তবে—

একটু থেমে সুপর্ণা যা বললো তা হলো—

তিমির ঘোষের সংগে তার জানা-চেনা হয় এক আত্মীয়ার বিয়ের উৎসব-অনুষ্ঠানে। তিমির ঘোষের রূপ, তার কথাবার্তা চলনবলন স্মার্টনেস দেখে চোখ ঝলসে যায়। সুপর্ণার মাসতুতো দাদার কল্যাণে আলাপ হতেও দেরি হয় না। সুপর্ণাকেও বুঝি চোখে লেগে গিয়েছিল তিমির ঘোষের। কাজেই প্রথমে ঘনিষ্ঠতা, পরে গভীর প্রেম।

সুপর্ণা বললো—তিমির, তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না।

তিমির গাঢ় কণ্ঠে জবাব দিলো—আমারও ঐ কথা সুপর্ণা। কিন্তু আমি লুকোচুরি পছন্দ করি না। আমি খুব মদ খাই। জেনেশুনে

যদি তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হও তবে আমি ধন্য হবো।

সুপর্ণা মৃদু কণ্ঠে বললো—তুমি কি ভেবেছো আমি তা আজও টের পাই নি? আমি জানি।

তিমির সজোরে সুপর্ণার একখানা হাত চেপে ধরে বললো তুমি যদি রাজি থাকো তবে আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। দুনিয়ার সব প্রতিকূলতার হাত থেকে আমি তোমাকে ছিনিয়ে নেবো।

বাড়ির সবাই শুনে তো মাথায় হাত দিলেন সর্বনাশ, ওটা যে একটা ডাহা মদ্যপ। বেহেড মাতাল হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি খায়। ওকে বিয়ে করবে কি?

সুপর্ণা দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিলো—বিয়ে করলে ওকেই করবো, নয়তো বিয়েই করবো না।

তর্জন গর্জন শাসন, অনুনয় বিনয় অশ্রুজল—কিছুতেই সুপর্ণা টললো না।

সবাই বললো—এমন মানুষকে বিয়ে করে তুই শান্তি পাবি?

সুপর্ণা বললো—সে আমি বুঝবো।

অন্য জায়গায় বিয়ের প্রস্তাব এলে সুপর্ণা বললো—তোমরা কি আমাকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে বিয়ের আসরে নিয়ে যাবে? জোর করে কিছু করতে যেও না, শুধু অপদস্থই হবে।

মা-বাবা ভাবলেন পাত্রপক্ষকে মেয়ে দেখাতে বাড়িতে ডাকা যাক। বাইরের লোকের সামনে অতোটা বেয়াড়াপনা করতে সাহস পাবে না মেয়ে। কিন্তু পাত্রপক্ষ বাড়ি এলে সুপর্ণা সাজগোজ করা তো দূরের কথা—সেই যে খাটের বাজু আঁকড়ে বসলো, কেউ সেই বজ্রমুষ্টি টেনেও খুলতে পারলো না। আত্মসম্বরণ করতে না পেরে বাবা মেয়ের গালে দুই চড় কষিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোকেরা বিদায় নিলেন। রাগে দুঃখে ক্ষোভে মা কপাল চাপড়ালেন, বাবা মাথার চুল ছিঁড়লেন, কিন্তু সুপর্ণা অটল। অবশেষে মা বললেন—হতভাগী নিজের ভাগ্য নিজে বেছে নিয়েছে, আমরা কি করবো? ওখানেই বিয়ে দিয়ে পাপ বিদেয় করো। ও চক্ষুশূল আর সইতে পারছি না।

কাজেই একদিন এক নিরানন্দ পরিবেশে তিমির ঘোষের সঙ্গে সুপর্ণার বিয়ে হয়ে গেলো।

কনে বিদায়ের সময় মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। বাবা স্পষ্ট বলে দিলেন—কেলেঙ্কারি করছিলে, তাই সমাজে ইজ্জৎ বাঁচানোর জন্য এই বিয়ে দিয়েছি, তাই বলে মনে করো না তোমার স্বেচ্ছাচারিতা ক্ষমা করেছি। এরপর তোমার ভালো মন্দর কোনো দায়দায়িত্ব আর আমাদের রইলো না।

তিমির ঘোষের হাত ধরে যাত্রা শুরু হলো সুপর্ণার। কিন্তু প্রথমদিনেই একটা ধাক্কা খেলো। সুপর্ণা বারবার তিমিরকে বলে দিয়েছিল বৌভাতের রাত্রে যেন 'ওসব' না খায়। লোকজন আসবে তো!

লোকজন এসেছিলো। সুপর্ণাদের বাড়ি থেকে আর কেউ এলো না শুধু তার ছোড়দা ছাড়া, সঙ্গে এক মাসতুতো ভাই। সুপর্ণার বুকটা ফেটে যাচ্ছিলো। কিন্তু বলবে কাকে! এ দুঃখের পশরা তো সে নিজের হাতেই সাজিয়েছে। তবু ভালো, নিয়মরক্ষা করতে একজনও যে এসেছে! তার উপর ছোড়দার সামনে তিমিরের কাণ্ডকারখানা দেখে সে লজ্জায় মরে যাচ্ছিলো। তার কথাবার্তা চালচলন মাদকরসের যে উপচীয়মান উচ্ছ্বাস বহন করছিলো, সুপর্ণা দাঁতে দাঁত চেপে তা সহ্য করলো।

জীবনের যে রাতটা শুধুই স্বপ্ন দেখার সে রাতেই স্বপ্ন ভঙ্গ।

সুপর্ণা তিমিরকে দিয়ে কতগুলো শর্ত করিয়ে নিয়েছিলো, যেমন বাইরে মদ খেয়ে পাড়া জানিয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফেরা চলবে না। বাড়ি বসে খেতে হবে আর দিনে দিনে এটুকু একটু করে মাত্রা কমাতে হবে। সুপর্ণা ভাবে অন্ততঃ এটুকু কৃতিত্ব নিয়ে যেন সে মা-বাবার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

তিমির জবাব দেয়, বেশ তো, ঘরে বসেই খাবো। তুমি আমার সাকী, পেয়ালা ভরে দেবে, কিন্তু কমানো? সে বাক্য তো এখনই দিতে পারছি না রানী।

সেই থেকে তিমির ঘরে বসেই মদ খেতো। সুপর্ণা মনকে পাথর করে সেই দৃশ্য দেখতো। গ্লাসের পর গ্লাস গিলতো তিমির, শেষে মাত্রাজ্ঞান হারাতো। সুপর্ণা জোর করেও তাকে থামাতে পারতো না।

সেদিন অনেকটা খেয়েও যখন আবার নিতে যাচ্ছিলো তিমির, তখন সুপর্ণা কঠিন হলো—না, আর পাবে না।

দাও।

না, কিছুতেই না।

দাও বলছি। গলা চড়লো তিমিরের।

না না না। কিছুতেই না।

দিবিনে? তবে রে—সুপর্ণাকে লক্ষ্য করে গ্লাসটা ছুঁড়ে মারলো তিমির। কপালটা কেটে গেলো, রক্তের ধারা নামলো। আর নেশা এবং উত্তেজনায় তিমির বিছানায় গড়িয়ে পড়লো অবসন্ন হয়ে। সুপর্ণা ভাবলো আমার এই রক্তের ধারা যদি তার জীবনে এতটুকু পরিবর্তন আনতে পারে তবে আমি ধন্য। আমি রোজ রোজ এই রক্ত দিতে রাজি আছি।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সুপর্ণা ব্যথা অনুভব করার বদলে পুলক-কণ্টকিত হলো এই ভেবে যে, কাল তার আঘাত দেখে তিমির দুঃখিত হবে, অনুতপ্ত হবে। আবেগে আপ্লুত হয়ে আদরের বন্যায় তার আঘাতের বেদনা মুছে দেবে। নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করবে। এবং সুপর্ণার শাপে বর হবে।

সুপর্ণা ঘুমুলো। ঘুমিয়ে সুখের স্বপ্ন দেখলো।

পরদিন ঠিক নজরে পড়লো তিমিরের। রাত্তিরে হুঁস ছিল না তো, তাই মনে করতে পারলো না। ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কপালে কি?

সুপর্ণার বুকটা দুলে উঠলো। বললো—কাল রাত্তিরে তুমি গ্লাস ছুঁড়ে মেরেছিলে।

কই, মনে পড়ছে না তো। বুঝেছি, নিশ্চয় মদ চেয়েছিলাম। দাওনি—হুঁ, যেমন ন্যাকামি করতে গিয়েছিলে। বেশ হয়েছে। আমি মদ খাই জেনেই তো আমাকে বিয়ে করেছিলে। এখন আবার ঢং কেন?

সুপর্ণা আবার ধাক্কা খেলো। স্বপ্নভঙ্গ হলো তার।

এর মধ্যে যেদিন সুপর্ণা টের পেলো অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে তিমিরের ঘনিষ্ঠতার পালা চলেছে, সেদিন আর সহ্য করতে পারলো না। দিনের পর দিন পুঞ্জীভূত হতে লাগলো তিক্ততা। একদিন রাত বারোটায়

বেজায় মাতাল হয়ে সেই মেয়েটির সম্বন্ধে সুপর্ণার সংগে কথা কাটাকাটি করতে করতে যেন ক্ষেপে গেল তিমির। সুপর্ণাকে ঘাড় ধরে রাস্তায় বের করে দিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলো। দাঁতে দাঁত চেপে একটা স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির মত সুপর্ণা বন্ধ দরজার সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। মনের ক্ষোভে লাভাস্রোতের মতো গরম গরম অনেকটা চোখের জল গলে পড়লো। দুঃখ নয়। অপমানের জ্বালাটাই তীব্রতর হলো। না, ঐ বন্ধ দরজায় আর ধাক্কা দেবে না সে! কিন্তু যাবে কোথায়? এই মাঝরাতে?

বাপের বাড়ি নয়। স্বামীর ঘরে আসার সময় বাবা যে কথা বলে দিয়েছেন স্বামী-বিতাড়িতা হয়ে সেই বাড়িতে যাওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। সেই মধ্যরাত্রিতে সুপর্ণা তার এক বান্ধবীর বাড়িতে আশ্রয় নিলো।

মাথার সিঁদুর মুছলো। হাতের নোয়া খুললো। বান্ধবী বাধা দিলো—পর্ণা, অতটা বাড়াবাড়ি করিস্ না। দাম্পত্য কলহ। দু' দিনেই মিটে যাবে।

সুপর্ণা দৃঢ়কণ্ঠে বললো—না, তা আর হয় না।

তারপর বন্ধুর আস্তানায় থেকেই গায়ের যে ক'টা গয়নাপত্র ছিলো তা বেচে কিছুদিন চললো। খুঁজলো চাকরি। তারপর পেয়েও গেল একটা মেয়ে ইস্কুলে কাজ—বান্ধবীর বাবার দৌলতে। সেই থেকে ভাড়াটে বাড়ির এই ছোট্ট ঘরে সুপর্ণার একক সংসার।

আমি বললুম - কিন্তু তিমির বাবুর ভুল তো ভাংগতে পারে। আবার ফিরে অসতে পারেন তোমার কাছে। তখন আবার নতুন করে সিঁদুর পরবে তো!

শান্ত মৃদুকণ্ঠে সুপর্ণা বললো--আমি তাকে ভালোবেসেছিলাম। আর সেই ভালবাসায় একনিষ্ঠ হবো বলে সকলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার এতো বড়ো একটা দোষকে মেনে নিয়েছিলাম। শক্ত হাতে তার হাত ধরে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিছুতেই টলিনি। কিন্তু তার যে এই বিশ্বস্ততা-টুকুও নেই। আর যেখানে তা নেই সেখানে সিঁদুর পরা আর সিঁদুর মোছা দুটোই যে সমান ছেলেখেলা। বার বার এই ছেলেখেলা খেলতে আমি রাজি নই নিরু।

এক সময় সুপর্ণার কাছে বিদায় নিয়ে ভারাক্রান্ত মনে আমি চলে এলাম।

মহিলা ॥

বনের পাখি

বন্ধুর কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে অনাদিবাবু সস্ত্রীক বেড়াতে এসেছিলেন এই গ্রামে। অনাদিবাবু আইনজীবী। নাম যশ প্রসার প্রতিপত্তি অর্থ বিত্ত তিনি যথেষ্টই অর্জন করেছেন। দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ি করেছেন। ছেলে-মেয়েরা উচ্চশিক্ষিত। একমাত্র ছেলে শুভ্রজ্যোতি বিলেত ঘুরে এসেছে আইনের ডিগ্রী নিয়ে! বড়ো মেয়ে রঞ্জনা গ্রাজুয়েট। তার বিয়ে হয়ে গেছে। জামাই ডাক্তার। ছোটো মেয়ে অর্চনা এম. এ পড়ছে।

অনাদিবাবু মানুষটিকে বাইরে থেকে সাহেবসুবো মনে হলেও বা তার বাড়ির হালচালে পশ্চিমী সভ্যতার উগ্র গন্ধ থাকলেও ভেতরে তিনি একটু অন্যরকম। নিত্য তিরিশদিন পুজো-আচ্চা করেন। রোজ সকালে মায়ের ছবিতে ধূপধুনো দেখিয়ে প্রণাম করেন। নারকোল কোরা দিয়ে চিঁড়েভাজা খেতে ভালোবাসেন। মায়ালতা এই অজ পাড়া-গাঁয়ে আসতে কিছুটা আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু অনাদিবাবুর যথেষ্ট আগ্রহ ছিলো এ ব্যাপারে। বলেছিলেন—দেখো, ইঁটকাঠের খাঁচায় বাস করে যেন হাঁপিয়ে উঠেছি। চলো না, খোলা হাওয়ায় একটু নিশ্বাস নিয়ে বাঁচি। কয়েকটা দিন বৈ তো নয়!

অগত্যা মায়ালতা রাজি হয়েছিলেন। তারপরই ও'রা এসেছিলেন এই পদ্মমণ্ডিত গ্রামে। দীর্ঘকাল পর বন্ধুদর্শন, তার উপর গ্রামের স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ। অনাদিবাবুর দেহমন জুড়িয়ে গিয়েছিলো। দু'বেলা এলোপাথাড়ি ঘুরতেন সারা গাঁয়ে। যেন ভালো লাগার পাত্রটিকে টইটম্বুর করে তুলতে চান গ্রামের শান্ত সুষমা দিয়ে।

সেদিনও ভোরে অনাদিবাবু বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর চোখে পড়লো সামনের বাড়িটার বাগানে সাজি হাতে ফুল তুলছে একটি মেয়ে। আহা! মূর্তিমতী ঊষা যেন। কি রঙ, কি মুখের গড়ন! ভোরের আলোয় নেয়ে অপরূপ দেখাচ্ছিলো মেয়েটিকে।

অনাদিবাবু মুগ্ধচোখে বার কয়েক মেয়েটির দিকে তাকালেন। সেদিনই বিকেলে মায়ালতাকে নিয়ে সেই বাড়ির দিকেই এগিয়ে গেলেন প্রত্যাশিত চোখ ফেলে ফেলে। বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই দেখাও পেয়ে গেলেন, পেয়ারা গাছের তলায় কয়েকটি মেয়ে পেয়ারা নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে আর কাচভাংগা হাসি ছড়াচ্ছে।

অনাদিবাবু মায়ালতাকে মৃদুকণ্ঠে বললেন—মেয়েটিকে লক্ষ্য করো।

দু'জনে ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন। গ্রামের রাস্তায় এমন দু'জন সংভ্রান্ত ব্যক্তিকে দেখে ওরা কৌতূহলী হয়ে তাকালো।

অনাদিবাবু মেয়েটির নাম ধাম সবকিছু জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন এরা কারা?

আমার বন্ধু।

তোমাদের বাগানে বুঝি আজকে এদের পেয়ারার নেমন্তন্ন।

ওরা আর একরাশ কাচভাংগা হাসি ছড়ালো।

বাড়ি ফিরে অনাদিবাবু মায়ালতাকে বললেন—আমাদের শুভর জন্যে মেয়েটিকে নিলে কেমন হয়? দেখবো কথাটা পেড়ে?

তোমার বিলেত ফেরৎ ছেলে। এই পাড়াগাঁয়ের মেয়ে কি তার মনে ধরবে?

অমন প্রতিমার মতো মুখ, চাঁদের মতো গায়ের রঙ, তোমার ছেলের মনে ধরবে না? সারা কলকাতা শহর চষলেও এমন লাবণ্য খুঁজে পাবে? এ হলো গ্রামের জলহাওয়ার গুণ।

কিন্তু পড়াশুনো যে বড্ড কম। বলছে সবে বি. এ. ফার্স্ট ইয়ার—

তাতে কি আসে যায়?

আর আত্মীয়ও কি আমাদের ঘরের উপযুক্ত হবে?

তাতেও আটকাবে না। বৌটি মনের মতন হলেই তো যথেষ্ট।

হয়তো নিয়তিরই ইচ্ছে। তাই অনেক বৈষম্য সত্বেও সুজয়ার এখানেই বিয়ে হয়ে গেলো। রঞ্জনা অর্চনা খুবই আপত্তি করেছিলো। শুভ্রজ্যোতি প্রথমদিকে আপত্তি করলেও শেষটায় বাবার আগ্রহ দেখে রাজি হয়েছিলো, তবে এক শর্তে, বিয়ে হবে কলকাতায়। ঐ পাড়াগাঁয়ে সে বিয়ে করতে যেতে পারবে না।

সুজয়াদের তরফ থেকে তো আপত্তির কোনো প্রশ্নই উঠলো না।

সুজয়ার বাবা হাতে আকাশ পেলেন। অবশ্য মেয়ের রূপের দিকে তাকিয়ে এমনি একটা স্বপ্নিল প্রত্যাশা তাঁর বুকের তলায় ঘুমিয়ে ছিলো বৈ কি!

সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে সুজয়া এমন সচ্ছল পরিবারে পড়ে প্রথমটা খুশিই হয়েছিলো। এমন সব দামী দামী শাড়ি বিয়ের আগে পরা দূরে থাক চোখেও দেখেনি। আর এমন সব দামী কসমেটিকস্! খুব ভালো লাগতো তার। শুভ্রজ্যোতির মতো এমন সুদর্শন বিদ্বান্ উপযুক্ত স্বামী পেয়ে গৌরব বোধ করেছিলো সে। এমন পরিবারে পড়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলো।

কিন্তু কিছুদিন যেতে কোথায় যেন একটা তার ছিঁড়লো। ভালো লাগার সুরটিও গেলো কেটে। এদের সংগে তাল মিলিয়ে চলতে যতোই অপারগ হয়, ততোই তার মনটা ভেতরে ভেতরে গুটিয়ে আসে।

সেদিন অর্চনা এক ডজন ব্লাউস এনে ফেললো সুজয়ার সামনে। বললো—এখন থেকে তোমার ঐ ফতুয়ামার্কা ব্লাউসগুলো বাতিল করো তো বৌদি। কাল থেকে এগুলো পরবে।

সুজয়া চোখ কপালে তুলে বললো—ওরে বাবা, এ যে চার আংগুল ঝুল আর দু'আংগুল চওড়া হাতা। ও আমি পরতে পারবো না ভাই।

পারবে না মানে? অমন জামাকাপড়ের পুঁটলি হয়ে থাকা চলবে না। এ বাড়িতে কেউ পছন্দ করে না।

সুজয়া চোখ বড়ো করে বললো—কেউ না?

না মশাই। এ কি তোমার পদ্মডিহি গাঁ পেয়েছো?

সুজয়া নিরুপায় গলায় বললো—কিন্তু আমার যে ভীষণ লজ্জা করবে ভাই।

অর্চনা সুজয়ার গলার সুর অনুকরণ করে বললো—তুমি যে অমন জামাকাপড় জড়িয়ে জবুথবু হয়ে থাকো সেও তো আমাদের লজ্জা করে ভাই।

সুজয়া ভেবে পায় না আব্রু বাঁচিয়ে পোশাক পরলে তাতে লজ্জার কি থাকতে পারে। লজ্জা রক্ষার জন্যেই তো পোশাক।

একদিন মায়ালতা জিজ্ঞেস করেছিলেন—কি খেতে ভালোবাসো বলো তো বৌমা!

সুজয়া প্রথমে সঙ্কোচ করে বলতে চায়নি। অনেক পীড়াপীড়িতে পরে বলেছিলো—ডাঁসা পেয়ারা।

অমনি ওরা এমনভাবে হেসে উঠেছিলো যেন পেয়ারা খাওয়ার মতো হাস্যকর কাজ আর পৃথিবীতে নেই। ওটা একটা ভয়ানক লজ্জার ব্যাপার।

অর্চনা হেসে উঠে বলেছিলো—একটা পেয়ারা গাছ বরং এনে বসিয়ে দাও। তোমার বউ গাছের ডালে ঝুলে বাদুড়ের মতো পেয়ারা খাবে।

রঞ্জনা পরিহাসের রঙ আর একটু চড়িয়েছিলো—বাঁদরের মতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

শুধু কি এই! জলখাবারের টেবিলে চপ-কাটলেট ফ্রাই-পুডিং খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেলো সুজয়ার। বাড়িতে দুধ আসে, কলা আপেল ইত্যাদি ফলমূলেরও অভাব নেই। কিন্তু মুড়ি-চিঁড়ের পাট নেই। সুজয়া দুধ কলা দিয়ে মুড়ি মেখে খেতে ভালোবাসে, কিন্তু বলে না। জানে তার এই তুচ্ছ ইচ্ছেগুলো শুধু ওদের উপহাস কুড়োয়।

বাপের বাড়িতে বেশি যেতে দেওয়া হয় না সুজয়াকে। গেলেও দু'তিন দিনের বেশি থাকতে দেয় না। তাহলে নাকি চেহারায় আরও গেঁয়ো ছাপ পড়ে যাবে। সুজয়া মনে মনে বলে—গেঁয়ো ছাপমারা চেহারা দেখেই তো এনেছিলে।

সব চাইতে দুঃখ হতো সুজয়ার, শুভ্রজ্যোতি কখনও শ্বশুরবাড়ি যেতো না। বলতো—ও গাঁয়ে গিয়ে আমি একদিনও কাটাতে পারবো না। বাপের বাড়ি থেকে কেউ এসে নিয়ে যেতো সুজয়াকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যেতো। এ নিয়ে মা-বাবার মনে যে একটা চাপা দুঃখ আছে তা সুজয়াকে বেদনা দিতো। সেই সঙ্গে একটা অপমানের কাঁটাও খচখচ করতো মনে। বিয়ের আগে মাথাভর্তি চুলের যত্ন করতো সুজয়া সুগন্ধি দামী কেশতৈল দিয়ে। মা কতো যত্ন করে তেল দিয়ে দিতেন চুলের গোড়ায় গোড়ায়। আরামে ঘুম পেয়ে যেতো সুজয়ার, মিসমিসে কালো রেশমের মত চুল ছিলো তার। এখন তেল মাখা বন্ধ। শ্যাম্পু ঘষে ঘষে চুল রুক্ষ। শুভ্রজ্যোতি মাথায় তেলমাখা একদম পছন্দ করে না। বিয়ের দু'দিন পরেই সে বলেছিলো—তোমার মাথার তেলের গন্ধে আমার গা গুলোয়। তেল মাখা বন্ধ করো,

নইলে কিন্তু আমাকে আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করতে হবে। তেলচিটে মাথা আমি একদম দেখতে পারি না।

ক্ষোভে দুঃখে চোখে জল এসে গিয়েছিলো সুজয়ার। পরদিন থেকে আর তেল মাখেনি মাথায়। রুক্ষ চুলে প্রথম প্রথম কি অস্বস্তি হতো তার। মাথা জ্বালা করতো। গরম বোধ হতো, এখন গা-সহা হয়ে গেছে। তেল-মাখা-যুগের স্নিগ্ধতা এখন শুধু তার স্মৃতিতে।

এমনিভাবে তার কত টুকরো টুকরো স্নিগ্ধ শান্তি, অভ্যস্ত তৃপ্তি অতি-অভিজাত আধুনিকতার রুক্ষ হাত মুছে দিয়েছে. সুজয়ার মনটা সেই তেলে-জলে ঝোপ-জঙ্গলে সেই জামরুল-পেয়ারার বাগানে সেই গ্রামীণ জীবনটার জন্য নীরবে মাথা কুটে মরে।

আর একটা বড়ো অপছন্দের জিনিস আছে সুজয়ার। সেটা হলো ককটেল পার্টি। শুভ্রজ্যোতি মাঝে মাঝেই এ ধরনের পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়। সঙ্গে যেতে হয় সুজয়াকে। কখনও কখনও অর্চনাও সঙ্গে যায়। প্রথম দিন তো সুজয়া একেবারে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলো। কি সব পোশাকের বাহার! এতগুলি অতি সংক্ষিপ্ত-বাস মহিলাকে একসঙ্গে দেখেনি কখনও সুজয়া। কম বয়সী, বেশি বয়সী রোগা মোটা সবাই কথাবার্তায় চলনে-বলনে-প্রসাধনে একই ঢঙ্। প্রত্যেকের হাতে ফিনফিনে গ্লাসে তরল পানীয়। বেয়ারা ওদের সামনেও ট্রে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলো। সবাই নিচ্ছে দেখে সুজয়াও একটা গ্লাস তুলে নিয়েছিলো। তারপরই অর্চনাকে প্রশ্ন—এটা কি জিনিস ভাই!

অর্চনা মুখ টিপে হেসে ওর কানে কানে ফিসফিস করে কিছু বলতেই সুজয়া এমন জোরে ঠক্ করে গ্লাসটা টেবিলের উপর রাখলো যে গ্লাস ভেঙে গেলো। ধবধবে সাদা টেবিল-ঢাকা পানীয়-কলঙ্কিত। সবাই মুখ ঘুরিয়ে তাকালো সেদিকে। অবশ্য বাঁকা চোখে। বেয়ারা ছুটে এলো। ঢাকনা পাল্টে নতুন ঢাকনা পেতে দিয়ে গেলো।

বাড়ি ফিরে শুভ্র ব্যঙ্গ করে বলেছিলো—এমন হদ্দ গেঁয়োকে নিয়ে কোথাও যায় কেউ! লজ্জার একশেষ।

সুজয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিলো—তাই বলে ভদ্রঘরের মেয়ে হয়ে—

শুভ্রজ্যোতি ভুরু কুঁচকে বলেছিলো—ওখানে কি তুমি সব অভদ্র-ঘরের মেয়ে দেখলে নাকি?

সুজয়া আরো কুঁকড়ে গিয়েছিলো।

যতো অপছন্দ থাক বা অনিচ্ছা হোক, সুজয়াকে এই ধরনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই হতো। ঐ গ্লাসের ব্যাপারটা ছাড়া আর সব কিছুতে সে মোটামুটি রপ্ত হয়ে উঠেছিলো।

অনেকদিন মা-বাবার চিঠি না পেয়ে খুবই মনমরা হয়ে ছিলো সুজয়া। এমন সময় বাবার চিঠিতে জানতে পারলো ছোট ভাই টাটুর খুব অসুখ। ওখান থেকে কেউ এসে সুজয়াকে নিয়ে যেতে পারছে না। সুজয়া যেন শুভ্রজ্যোতিকে সংগে নিয়ে অন্তত: দু'তিনদিনের জন্য এসে টাটুকে দেখে যায়। চিঠি পেয়ে কেঁদেকেটে অস্থির হল সুজয়া। কিন্তু যাবার অনুমতি মিললো না। বাড়িতে একজনের কাছেই সুজয়া আন্তরিক সহানুভূতি পায়। তিনি অনাদিবাবু। অনাদিবাবু সুজয়ার মন বোঝেন। তিনি শুভ্রজ্যোতিকে অনুরোধ করেছিলেন সুজয়াকে নিয়ে দু'তিন দিনের জন্য ঘুরে আসতে। কিন্তু সে রাজি হয়নি। একটা জটিল মামলা জেতার সাফল্যে সে একটা পার্টির ব্যবস্থা করেছে। ডেকেছে কয়েকজন নবীন ও প্রবীণ আইনজীবীকে। সেটা সারা না হলে সুজয়ার কোথাও যাওয়া চলবে না। তারপর যেতে পারে যদি ওখান থেকে কেউ এসে নিয়ে যায়। পার্টি! পার্টি! সুজয়া আর পারে না। ক্লান্ত হয়ে উঠেছে সে, দম বন্ধ হয়ে আসে তার। একটু মুক্তির হাওয়ার জন্য বুকের ভেতরটা ছটফট করে!

সন্ধ্যে থেকেই অভ্যাগতদের ভিড় শুরু হয়! রঞ্জনা অর্চনা সুজয়ার পোশাক বেছে দিয়ে গেছে। সেই হাফ-আবরু হাফ বেআবরু ব্লাউসের ওপর শাড়িটাকে যথাসম্ভব গা ঢেকে জড়িয়ে পরে মাপা হাসি মাপা কথায় অতিথিদের আপ্যায়ন করছিলো সুজয়া রঞ্জনা অর্চনার সংগে। সেই থেকে চলছে খানাপিনা নাচগান মিহি নাকি সুরে আধো আধো বুলিতে কৃত্রিম বাক্যালাপ, অত্যন্ত ভদ্রভাবে অহঙ্কার আর ঐশ্বর্যের মার্জিত প্রতিযোগিতা। সেই রঙ, এক ঢঙ।

অতীন বাসুর মেয়ে মিলি নাচছিলো! বাসুদম্পতি মুগ্ধ চোখে দেখছে। অন্যরাও দেখে খুব তারিফ করছে। সুজয়া জানে বাসু পরিবার এখন চলে গেলে ওরাই নিন্দের ঝড় বইয়ে দেবে। এমন ঘটনা সুজয়া আগেও দেখেছে। সামনে এরা সো-সুইট, হাউ লাভলি—

এসব কথার বান বইয়ে দেয়। আড়ালে টিটকিরি দেয়। সুজয়া যেটাকে কারও আন্তরিকতা বলে ভাবে, ওরা সেটাকে বলে অহঙ্কার, বাহাদুরি দেখানো, টেক্কা দেবার চেষ্টা।

অতি সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে ধুমসো মেয়েটা নাচছিলো। সুজয়ার চোখ যেন কটকট করছে। আস্তে আস্তে সরে পড়ে সে। পায়ে পায়ে একেবারে ছাতে। ক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে ছাতের আলসেয় ভর দিয়ে দাঁড়ালো সুজয়া। তারায় ভরা আকাশটার দিকে তাকিয়ে তার মনটা হু হু করে উঠলো। গ্রামের সেই অবাধ মুক্তি তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কতোদিন হলো মা-বাবাকে দেখে না সে। ছোট ভাইটা কেমন আছে কে জানে! চোখের জল বাধা মানলো না আর। অনর্গল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। রুদ্ধকণ্ঠে সুজয়া উচ্চারণ করলো —ওগো, আমি বনের পাখি, আমাকে তোমরা এমনি করে সোনার খাঁচায় বন্দী করে রেখো না। আমাকে আকাশে ডানা মেলতে দাও।

সেই মুহূর্তে ছাতের একপাশে খাঁচায় অর্চনার আদরের পোষা টিয়াটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে ডেকে উঠলো। কি যে হলো সুজয়ার, ছুটে গিয়ে খাঁচার দরজা খুলে পাখিটাকে উড়িয়ে দিলো।

পরক্ষণেই সুজয়াকে খুঁজতে খুঁজতে অর্চনা এসে হাজির। বললো —তুমি এখানে। নীচে চলো, দাদা ডাকছে।

হঠাৎ খাঁচাটার দিকে চোখ পড়তেই বলে উঠলো—একি। পাখিটা নেই। কে খাঁচা খুলে দিয়েছে?

সুজয়া মৃদুগলায় বললো—জানি না।

সেতু

কুণ্ঠিত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠলো মেয়েটি। রুদ্ধ দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করলো, তারপর হাত বাড়িয়ে কলিং বেল টিপলো।

মিনিট খানেক অপেক্ষা করতেই এক সুদর্শন যুবক এসে দরজা খুলে দিলো। মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে বললো—আরে, বন্দনা যে! এই অসময়ে! খবর কি?

মেয়েটি মুহূর্তকাল যুবকের মুখের দিকে তাকালো। তার পর নতদৃষ্টিতে বললো—ভেতরে চলো নিরুপম, কথা আছে।

নিরুপম রায় সুদর্শন ধনীপুত্র, উচ্চশিক্ষিত, কোনো এক বিরাট কোম্পানির মালিক, অতি আধুনিক, তাই মা-বাপ ভাইবোনের সংগে এক বাড়িতে থাকা পছন্দ করে না। আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে ঠাকুর চাকর নিয়ে বাস করে। এখনও বিয়ে করেনি তবে এ নিয়ে মা-বাবা খুব পীড়াপীড়ি করছেন।

বন্দনা ঘরে ঢুকলো! একটা চেয়ারের দিকে ইংগিত করে নিরুপম বললো—বসো। কি ব্যাপার বলোতো।

বন্দনার এ বাড়িতে আসা এই প্রথম, সে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। তারপর নতদৃষ্টিতে বললো—নিরুপম, আমাদের বিয়ের দিনটা তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেলা দরকার।

একটু থমকে গেল নিরুপম, একটা কিছু যে অনুমান না করলো এমন নয়। কিন্তু মুখে একটু কাষ্ঠ হাসি ফুটিয়ে বললো—এত তাড়াহুড়ো কেন বলোতো? আর বুঝি এক মুহূর্তের বিরহও সইছে না?

বন্দনা নিরুপমের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো—ঠাট্টা নয় নিরুপম, আমাদের বিয়ে যতো শিগ্‌গীর সম্ভব হওয়া উচিত।

—কেন বলোতো?

—বুঝতে পারছো না? ব্যাখ্যা করে বলতে হবে? কুমারীর শুভ্রতা আমি হারিয়ে ফেলেছি নিরুপম, তুমি আমার কুমারীত্ব মুছে দিয়েছো আমার মধ্যে আর একটা প্রাণের ইসারা টের পাচ্ছি আমি।

ব্যাপারটার গুরুত্ব উড়িয়ে দিয়ে হাল্কা করে ফেলতে চাইলো নিরুপম। মুখে হাসির আভা ফুটিয়ে বললো—ও, এই ব্যাপার! তা তুমি এতো ঘাবড়াচ্ছো কেন বন্দনা? এই সমস্যা সমাধানের অতি সহজ উপায় তো আমাদেরই হাতে।

—তা ঠিক। একমাত্র সমাধান বিয়ে। তাইতো বলছি, বিয়ের দিনটা তাড়াতাড়ি ঠিক করো।

—বিয়ে আমাদের হবেই। কিন্তু সেটা তো এক্ষুণি হচ্ছে না। কিছুদিন দেরি করতেই হবে যে!

বন্দনা করুণকণ্ঠে বললো—কিন্তু ততোদিনে আমার অবস্থাটা কল্পনা করতে পারো?

—এতো ভয় পাবার কি আছে? তুমি একেবারে ছেলেমানুষ। নিরুপমের একখানা হাত বন্দনার কাঁধে মমতার স্পর্শ রাখলো। আর একখানা হাত চলে গেলো তার টেবিলের ড্রয়ারে। বেরিয়ে এলো এক গোছা নোট, বন্দনার হাতে টাকাগুলো গুঁজে দিয়ে বললো—এই টাকাটা রাখো। আমার জানাশোনা ভাল ডাক্তারের ঠিকানা দিচ্ছি, চলে যাও তার কাছে। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে মুক্তির নিশ্বাস ফেলবে।

হাতের উপর টাকার এবং কাঁধে নিরুপমের হাতের ছোঁয়া—দুটোই যেন এক সংগে আগুনের ছ্যাঁকা লাগালো। বিদ্যুৎবেগে নিজেকে সরিয়ে নিলো বন্দনা। অনুচ্চ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো—ডাক্তার! ডাক্তার কি করবে! আমি যা হারিয়েছি ডাক্তার তা আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে?

—কেন পারবে না? আজকাল বিজ্ঞান সব কিছু সহজ করে দিয়েছে।

দৃঢ়কণ্ঠে বন্দনা বললো—না নিরুপম, ডাক্তার পারবে না, বিজ্ঞান পারবে না। ওরা আমার দেহটাকেই শুধু ভারমুক্ত করতে পারবে কিন্তু যে সম্পদ আমি হারিয়েছি সে তো আর ফিরে আসবে না। আমার কুমারী জীবনের শুচিতায় যে কালির ছাপ পড়েছে সেই কলঙ্কের কালি

থেকে একমাত্র তুমিই আমা। বাঁচাতে পারো নিরূপম।

—তোমার যতো সব বাজে সেন্টিমেন্ট!

—বাজে সেন্টিমেন্ট! আমার জীবনের এতো বড়ো একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোমার কাছে বাজে সেন্টিমেন্ট?

—তা ছাড়া আর কি! আজকাল ছেলেমেয়েরা অবাধে মেলামেশা করবার সুযোগ পায়। ফলে এমন একটু আধটু হয়েই থাকে। তার জন্য ভাবনা চিন্তা না করে তাড়াহুড়ো করে একটা বিয়ে করে ফেলতে হবে?

—আমাকে বিয়ে করতে তোমার এখনও ভাবনা চিন্তার অবকাশ আছে তাহলে!

—কেন থাকবে না? বিয়ে জিনিসটা তো একদিনের নয়। সারাজীবনের ব্যাপার।

বন্দনার দু' চোখে আগুন জ্বলে উঠলো—তোমার শপথের ভাষা এতো তাড়াতাড়ি মুছে গেলো নিরূপম! এতো তাড়াতাড়ি মুখোস খুলে গেল!

বন্দনা চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো।

নিরূপম বললো টাকাটা নিয়ে গেলেই ভালো করতে। এতে আমারও যখন খানিকটা দায় রয়ে গেছে তখন টাকাটা আমি আমার কর্তব্যবোধেই দিচ্ছিলাম। তোমাকে দয়া দেখাতে নয়।

—তোমার কর্তব্যবোধকে অশেষ ধন্যবাদ।

এবার একটু তপ্তকণ্ঠে নিরূপম বললো—নেওয়া না নেওয়া তোমার ইচ্ছে। তোমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাও তোমারই হাতে। আমি তোমার উপর কোনো জোর করতে চাই না। তবে একটা কথা বন্দনা, এ নিয়ে আর কোনোদিন সিন ক্রিয়েট করতে এসো না। জেনো, আমার একটা ইজ্জৎ আছে।

—ইজ্জৎ! বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে বন্দনা নিরূপমের দিকে তাকালো—তোমার ইজ্জৎ আছে আর আমার নেই? আমার ইজ্জৎ ধুলোয় লুটালো কে? পাঁকের নর্দমায় ছুঁড়ে ফেললো কে? দুই হাতে মুখ চাপা দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো বন্দনা। খানিক পরে বললো—নিরূপম, যেখানে ভালবাসা নেই,

সেখানে বিশ্বাসও নেই, তবু, আমার আজকের একটা শপথকে তুমি বিশ্বাস করতে পার। এই সপ্তাহের মধ্যেই রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে যাক আমাদের। তারপর কথা দিচ্ছি, আমি তোমার জীবন থেকে দূরেই সরে থাকবো কিন্তু ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমি পাপের বোঝা ভারী করতে পারবো না। সমাজের স্বীকৃতি নিয়ে একটা প্রাণ পৃথিবীতে জন্ম নিক। ভগবানের নামে শপথ করছি, তারপর আমি নিজে আদালতে গিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তোমাকে মুক্তি দেবো। যেমনি চুপি চুপি হবে আমাদের বিয়ে তেমনি চুপিচুপি হবে বিবাহ-বিচ্ছেদ। আর কোনোদিন আমি তোমার সামনে আসবো না।

—শুধু জন্ম হলেই তো সব চুকে যায় না। তারপরের পরিচয়টা কি হবে ?

—সে শুধু তোমার নামটাই জানবে, আর জানবে আমি বিধবা। ভয় নেই, তোমার পরিচিত সমাজে আমি নিজেকে ও তাকে সম্পূর্ণ গোপন করেই রাখবো।

এক মার্চেন্ট অফিসের লেডি টাইপিস্ট বন্দনা সান্যাল। অন্য আর এক কোম্পানির মালিক নিরুপম রায়। ব্যবসা সূত্রে দুই কোম্পানির যোগাযোগ। সেই সূত্র ধরেই নিরুপম মাঝে মাঝে আসতো বন্দনাদের অফিসে। ম্যানেজার মিঃ গুহর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতো। মিঃ গুহর চেম্বার তেতলায়। তার পাশেই ছিল বন্দনার বসার জায়গা। কাজেই যেতে আসতে, লিফ্‌টে উঠতে নামতে বন্দনার সঙ্গে নিরুপমের দেখা হতো। সেই থেকে পরিচয়, আলাপ, কখনও কখনও নিরুপমের গাড়িতে করে বন্দনাকে লিফ্‌ট দেওয়া। এমনি করে ঘনিষ্ঠতা, অনুরাগ এবং পরে যা ঘটলো সেখান থেকেই এই গল্পের শুরু।

শেষ পর্যন্ত ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়েটা হলো। এইটুকু অনুগ্রহ নিরুপম বন্দনাকে করলো। বন্দনার আত্মীয়-স্বজন সবাই জানলো তার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু নিরুপমের পরিচিত কেউ জানলো না তার বিয়ের কথা। এ বিয়ের যারা সাক্ষী ছিলো তারাও বন্দনারই পরিচিত এবং আত্মীয়। এ বিয়ের একমাত্র প্রয়োজনীয়তা বন্দনার যে বিয়ে হয়েছে তা প্রমাণ করা, তাই সব ব্যবস্থাপনাও বন্দনারই। নিরুপম শুধু উপস্থিত

থেকে তার পরিকল্পনায় রূপ দিয়েছে। তার পর যে যার বাড়িতে চলে গেছে—এবং কেউ কারও খবর রাখেনি। যে যার মতে পথ চলেছে। বিয়ের পর সময়ের নির্দিষ্ট মেয়াদ পার হতে নিরূপম আদালতের চিঠি পেলো। বন্দনা রায় নিরূপম রায়ের ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে চায়।

এই চিঠিরই অপেক্ষা করছিলো নিরূপম। মা-বাবা বিয়ের জন্য জোর তাগিদ দিচ্ছেন। আর ব্যারিস্টার জে. আর. মিত্রের রূপসী বিদূষী কন্যা সুপর্ণারই বা তাগিদ কম কি! প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় নিরিবিলিতে পেলেই গলা জড়িয়ে ধরে বলছে—নিরু, তোমার লগ্ন কবে হবে বলো তো! আমার যে প্রতিদিনে প্রতিটা মুহূর্তকে লগ্ন করে তুলতে ইচ্ছে করছে।

তা সুপর্ণা বলতে পারে। দু'পক্ষের সানন্দ সম্মতিতে কথাবার্তা পাকা হয়ে আছে। শুধু নিরূপমই যা সময় নিচ্ছে। তার কারণ বন্দনা। ব্যাপারটা একেবারে চুকিয়েই তবে মধুময় নূতন জীবনে প্রবেশ করতে চায় নিরূপম।

হায়রে! কোথায় সুপর্ণা আর কোথায় সেই লেডি টাইপিস্ট বন্দনা! তারিখ অনুযায়ী কোর্টে গেল নিরূপম। একটু কৌতূহলী দৃষ্টিতে সে বন্দনাকে খুঁজছিল। বিয়ের পর আর একদিনও দেখা হয়নি বন্দনার সঙ্গে। নিরূপমই এড়িয়ে গেছে। বন্দনাদের অফিসে তার যে কাজ তা অন্যলোক মারফৎ করিয়ে নিয়েছে, নিজে যায়নি। যাতে বিয়ের কথাটা জানাজানি না হয়ে যায় তার জন্যই এই সতর্কতা।

মামলা উঠতে তখনও অনেক দেরি। বাইরে এক পাশে একটা বেঞ্চিতে বসে অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানছিলো নিরূপম। এমন সময় চোখে পড়লো বন্দনা আসছে। তার হাতে ধরা একটা বছর আড়াই বয়সের ছেলে। নিরূপমের চোখ দুটো যেন সেই শিশুর মুখের উপর বসে গেল। মোটা সোটা নাদুস নুদুস ছেলেটা। ফর্সা ফোলা ফোলা দুটো গাল রোদের আঁচে আপেলের মতো লাল টকটক করছে। কাজলটানা ড্যাবাড্যাবা মিশ কালো চোখ। একমাথা ঝাঁকড়া কালো চুল, সিঁথি কেটে পরিপাটি করে আঁচড়ানো। বন্দনা কাছে এসে পড়তেই নিরূপম উঠে দাঁড়িয়ে বললো—এই যে বন্দনা, কেমন আছো?

বন্দনা চমকে উঠে থমকে দাঁড়ালো। নিরূপম বেঞ্চিটার দিকে অঙ্গুলি

নির্দেশ করে বললো—এখানেই বসে অপেক্ষা করা যাক—কি বলো ?

বন্দনা নিরুপমের মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে বেঞ্চিটার অন্য প্রান্তে গিয়ে বসলো। ছেলেটা মা'র গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিরুপমের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে বন্দনার শাড়ির আঁচল পাকাতে লাগলো।

নিরুপম বললো—তোমার ছেলে ?

বন্দনা সোজা হয়ে বসে গলায় জোর দিয়ে কঠিন-ভঙ্গীতে বললো—হ্যাঁ, আমার ছেলে।

নিরুপম ছেলেটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো। সিগারেটে টান দিতেও ভুলে গেল যেন।

নিরুপম বললো - ছেলের নাম রেখেছো কি বন্দনা ?

বন্দনা সঙ্গে সঙ্গেই চট করে জবাব দিতে পারলো না। কিন্তু ছেলেটা ঠোঁট ফুলিয়ে বলে উঠলো—আমার নাম অনুপম রায়। আমার বাবুজীর নাম ছিযুক্ত নিরুপম রায়।

নিরুপমের বুকের ভেতরটা যেন চলকে উঠলো। হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা খসে পড়ে গেল। কোটের উপর একবার হাত বোলালো নিরুপম। যেন বুক থেকে প্রবলবেগে রক্তক্ষরণ হচ্ছে এমনি একটা অনুভূতি। বন্দনা মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো। এবার নিরুপম হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে নিজের কোলের কাছে টেনে নিলো। দিব্বি সপ্রতিভ ভঙ্গীতে এগিয়ে এলো ছেলেটা। নিরুপম কতকটা আত্মগতভাবে বললো—হ্যাঁ, তুমি নিরুপম রায়ের ছেলে, নিরুপম রায়ের ছেলে—

বন্দনা সোজা হয়ে বসে বলে উঠলো—না। ও শুধু আমার ছেলে। তুমি তাকে খুন করতে ডাক্তারের কাছে পাঠাচ্ছিলে, আশা করি সেকথা ভুলে যাওনি নিরুপম।

'খুন' কথাটা শুনেই নিরুপম আর একদফা বাচ্চাটাকে চকিতে কোলে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলো। ওই নরম দেহটা তার সর্বাঙ্গে কেমন একটা পুলকের অনুভূতি আনলো। ছেলেটাও পাকা। অপরিচিত ব্যক্তির কাছে গিয়ে তার কোনো বিকার নেই। যেন ন্যায্য পাওনা সে নিচ্ছে। ওর নরম গালে নিজের গালটা চেপে ধরে নিরুপম বললো—আজ তোমাকে তোমারই একটা কথা ফিরিয়ে বলতে

ইচ্ছে করছে বন্দনা !

—কি কথা ?

—যেখানে ভালোবাসা নেই সেখানে বিশ্বাসও নেই। তবু আমার আজকের একটা শপথকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো বন্দনা।

বন্দনা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিরুপমের দিকে তাকালো।

—খোকনকে না দেখলে কি হতো জানি না, তবে আজ খোকনকে দেখে আমার ভেতর বিলাসী পুরুষ নয়, পিতৃত্ব জেগে উঠেছে বন্দনা। এই পিতৃত্বকে, এই বাৎসল্যকে আমি তো অস্বীকার করতে পারছি না। আমি খোকনকে নিয়ে, তার মাকে নিয়ে এবার ঘর বাঁধবো—এই আমার আজকের শপথ, তুমি অনুমতি দাও।

মৃদু কণ্ঠে বন্দনা বললো—তা কি করে হয় !

চকিতে বন্দনার অনেকটা কাছে সরে এলো নিরুপম—হয় বন্দনা, যদি তুমি হতে দাও। মামলাটা তুলে নিলেই হয়। তবেই আমরা ঘর বাঁধতে পারি। তারপর তুমি আর আমি এই দুই তীরকে বেঁধে দেবে এই সেতু আমাদের খোকন। আমাদের সে বাঁধা ঘর আর কখনও ভাংগবে না।

আদালতে মামলা উঠেই ডিসমিস হয়ে গেল।

দু'পাশে দু'জন—নিরুপম আর বন্দনা। মাঝখানে খোকন—দু'জনের দু'হাতে বাঁধা। নিরুপমের গাড়ি দাঁড়ানোই ছিলো। ড্রাইভারের সিটে বসলো নিরুপম। মাঝে খোকন, এপাশে বন্দনা। গাড়ি চললো নিরুপমের ফ্ল্যাটের দিকে।

একজন অপরিচিত লোকের সংগে কোথায় যাচ্ছে এই কৌতূহল মনে জাগতেই বোধ হয় খোকন নিরুপমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো—তুমি কে ?

হাসিমুখে নিরুপম জবাব দিলো—আমি নিরুপম রায়। ছিযুক্ত অনুপম রায়ের বাবুজী।

হেসে উঠলো বন্দনা। একবার বন্দনার আর একবার নিরুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে খোকনও হেসে উঠলো খিলখিল করে।

গহিলা ॥

বীরভোগ্যা

রূপ? হ্যাঁ, রূপ আছে বৈ কি! তার মুখখানার দিকে তাকালে স্বভাবতঃই মনে হয় ভগবান নিপুণ শিল্পী। গুণ? তাও নেহাৎ কম কি! কলেজে বি. এ. পড়ছে, গান-বাজনা জানে। সেলাই-ফোঁড়াইও নেহাৎ মন্দ জানে না। ঘরকন্নার কাজকর্ম? সেদিকেও একেবারে আনাড়ি নয়।

একটি পাত্রী মনোনীত করতে মানুষ একটি মেয়ের মধ্যে যে যে গুণের সমন্বয় আশা করে শর্মিলার মধ্যে তার একটিরও অভাব নেই।

অভাব শুধু একটা জিনিসের। সে হলো পিতার অর্থ।

তবু—দু'টো নয়, পাঁচটা নয়—একটমাত্র সন্তান। তাই মা-বাপ এই অর্থাভাবের আভাসটুকুও মেয়েকে বুঝতে দেন না। যথাসাধ্য স্বচ্ছলতায়ই তাকে বড়ো করে তোলেন। তার সব আব্দার যথাসাধ্য সামর্থ্যে আর আদরে পূর্ণ করেন।

কিন্তু কাল হলো শর্মিলার পিসতুতো দাদা বিনয়। কি কুক্ষণেই না তার বন্ধু শিশিরকে নিয়ে বাড়ি ঢুকেছিলো, তারপর প্রকৃতির যা নিয়ম, শিশির বন্ধু বিনয়কে ছাড়াও এবাড়ি ঘন ঘন আসতে লাগলো আর সবার সংগে একটু দায়সারা গোছের কথাবার্তা সেরেই শর্মিলার পায়ে পায়ে ঘুরতে লাগলো পোষা বেড়ালের মতো। তারপর—একটা উনিশ বছরের মেয়ের বাঁধ ভাংগতে ক'দিন লাগে?

বাড়ি ঢুকেই শর্মিলার মা উর্মিলাকে 'মাসীমা' বলে ডাক দিয়ে প্রণাম করে হাসিমুখে কাছে দাঁড়ায়, অমনি উর্মিলার মাতৃহৃদয় মমতায় আর্দ্র হয়ে ওঠে। এই মমতার দুর্বলতায়—শর্মিলার সংগে শিশিরের এতটা মেলামেশা ঠিক নয় জেনেও তিনি কঠিন হতে পারেন না। বরং একটু প্রশ্রয়ই দেন। মনকে বোঝান—এমন ভালো ছেলে বিশেষ করে বিনয়ের বন্ধু—তার দ্বারা কি কোনো ক্ষতি হতে পারে।

ফলে যা হবার তাই হলো, দুজনেই দুজনকে জানালো একজনকে ছাড়া আর একজনের চলবে না।

উপায় ? উপায় বিনয়। শিশির বিনয়কে ধরলো ঘটকালি করবার জন্য।

পাত্রীপক্ষ থেকে আপত্তি হলো না। শিশির শিক্ষিত সুন্দর বড়লোকের ছেলে। ভালো চাকরি করে। এমন পাত্রে কন্যাদান করা শর্মিলার সৌভাগ্য বলেই মনে করলেন।

কিন্তু মুশকিল হলো ছেলের পক্ষের দেনা-পাওনা নিয়ে। শিশিরের বাবা মোটা দর হাঁকলেন। হ্যাঁ, মেয়েটি যখন সুশ্রী আর অন্যান্য সবদিকেই ভালো বলছো, তখন সম্বন্ধ করতে আমার আপত্তি নেই। তবে বাপু, শুধু হাতে চিঁড়ে ভিজবে না। নগদ দু'হাজার—আর আমার ঘরের যাতে মান থাকে তেমনি যৌতুক আভরণ দিতে হবে। বিশ ভরি সোনা, ছেলেকে ঘড়ি বোতাম আংটি রেডিও ফার্নিচার—এসব যদি দিতে পারো সম্বন্ধ করতে এগোও। নয়তো এখনই কেটে পড়ো। আমার সাফ কথা।

বিনয় সবিনয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বললো, 'কিন্তু শিশিরের যে এখানেই পছন্দ—'

'ও অমন সব ছেলেরাই সুন্দরী মেয়ে দেখলে পছন্দ করে বসে থাকে। আবার তার চাইতেও একটি সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে দিলে তখন তাকেই পছন্দ করে। সেজন্য আটকাবে না বাবাজী।'

বিনয় মরিয়া হয়ে বলেই ফেললো, 'কিন্তু শিশির যে শর্মিলাকে ভালোবাসে—'

হেঁ হেঁ করে চিবিয়ে চিবিয়ে খানিকক্ষণ হাসলেন শিশিরের বাবা। বললেন, 'যেখানেই হোক একবার বিয়ে হয়ে গেলেই তোমার গিয়ে ঐ ভালোবাসারও পছন্দের মতই দশা হয়। বুঝলে বাবাজি ?'

অগত্যা মাথা নীচু করে বিনয়ের ফিরে যাওয়া ভিন্ন গতি কি ?

সব শুনে শর্মিলার মুখে আঁধার নামলো—মা বাবা দেখতে পেলেন। গোপনে গোপনে যে চোখের জল ফেললো তাও টের পেলেন। মা-বাপের বুকে যেন শেলের আঘাত লাগলো। অর্থের জন্য। শুধু অর্থাভাবের জন্যই তাদের একটিমাত্র সন্তানকে তারা সুখী করতে পারছেন না।

শিশির বিনয়কে বললো, 'মুখে মুখে রাজি হয়ে যাও না কেন ? তারপর বিয়ে হয়ে গেলে কম বেশি দেনা-পাওনায় কি এসে যায়। না হয়

একটু রাগারাগি মন-কষাকষি হবে। কিন্তু বিয়েটা তো ফিরবে না। বরং বিয়ের পরে পারো তো আস্তে আস্তে বাকিটা দিয়ে দিও। সব মিটমাট হয়ে যাবে আর তোমাদেরও সুবিধে হবে।'

'কিন্তু বলবো একরকম দেবো আর একরকম, এ যে প্রতারণা করা।'

'আরে তোমরা তো নিজে করতে যাচ্ছো না। আমি বলছি বিনয়, যেভাবেই হোক কাজটা হাসিল করে দাও।'

বিনয় কথাটা মামা-মামীকে জানালো, শিশির স্বয়ং ভরসা দিয়েছে, পরামর্শ দিয়েছে।

ভরসা পেয়ে কন্যাপক্ষ জানালো, 'আমরা রাজি।'

পিতার যৎসামান্য সঞ্চয়, মায়ের গায়ের সবগুলো গহনা, দেশের বাড়ির কিছুটা জমি বিক্রির টাকা, বিনয়ের সাহায্য, সব মিলিয়ে দানসামগ্রী যৌতুক আভরণ জোগাড় হলো, কিন্তু নগদ টাকাটা? সেই দু'হাজার টাকা?

বিনয় বললো, 'শিশির তো বলেছে—এখন কিছু বাকি থাকে থাক্, পরে দিয়ে দিলেই হবে।'

'কিন্তু যদি গণ্ডগোল হয়।'

'আরে গণ্ডগোল হয়তো বিয়ের পরে হবে। টাকাটা তো বিয়ের আগেই চাইবে না। চাইবে বর-কনে বিদায়ের সময়। তখন আমি সব ম্যানেজ করে নেবো 'খন। শিশির হাতে আছে, ভয় কি?'

বিনয় শিশিরকেও কথাটা জানালো। শিশির সমর্থন করলো, 'ঠিক আছে, কোনোরকমে সাতপাক ঘোরা হয়ে গেলেই হয়!'

শর্মিলা এত কথার বিন্দুবিসর্গও জানলো না।

বিয়ের রাত। ফুলে আলোয় ঝলমল করছে বাড়ি, বর এসে গেছে, সেখানে শর্মিলার যত বান্ধবী ও পাড়ার মেয়েদের ভীড়। ভেতরের একটা ঘরে কয়েকজনা মিলে শর্মিলাকে সাজিয়ে দিচ্ছে। লাল বেনারসীর ওপর গোলাপী রঙ-এর ওড়না। খোঁপা ঘিরে বেলফুলের গোড়ে মালা। কপাল ঘিরে কুমকুম আর কনেচন্দন। নিশভোর সোনার কারুশিল্প আর বর্ণ ঔজ্জ্বল্যে শর্মিলার সর্বাঙ্গ ঝলমল করছিলো। একটা চিত্তিরকরা পিঁড়িতে দেবীপ্রতিমার মতো বসেছিলো শর্মিলা।

লগ্ন প্রায় উপস্থিত, এমন সময় বাইরের দিকে একটা সোরগোল উঠলো। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো শর্মিলা। কারা সব উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে তার মধ্যে বিনয়দার গলাটা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু কি ব্যাপার! মেয়েরা যারা ঘরে ছিলো কি হয়েছে জানবার জন্য ছুটোছুটি করে বেরিয়ে গেল। শর্মিলা একা ঘরে কাঠ হয়ে বসে রইলো।

খানিকক্ষণ পরে মাসতুতো বোন হাসি এসে ঘরে ঢুকলো। তার চোখে মুখে উত্তেজনার চিহ্ন।

শর্মিলা শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি হয়েছে রে?'

হাসি ইতস্ততঃ করে বললো, 'কি যেন টাকা পয়সার ব্যাপার। ছেলের বাপ বলছে এক্ষুণি টাকা দাও, বিনয়দা বলছে দেবো দেবো, আগে বিয়েটা হয়ে যাক, লগ্ন হয়ে গেছে।

'না, আগে টাকা দাও, পরে বিয়ে। ফাঁকি দিয়ে কাজ হাসিল করবার মতলব। জোচ্চুরির আর জায়গা পাওনি।'

মেসোমশাই হাতজোড় করে কাকুতি মিনতি করছেন কিন্তু ছেলের বাপ যা-তা গালাগালি দিচ্ছে আর ছেলেকে বলছে 'উঠে আয়, চলে আয় এখান থেকে। এ বিয়ে হতে দেবোনা আমি—'

কম্পিতকণ্ঠে শর্মিলা জিজ্ঞেস করলো, 'আর উনি কি বলছেন?'

'তিনি তাঁর বাবাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছেন। বলছেন, 'বাবা, এখন থামুন, পরে যা হয় হবে। ছি, ছি, ছি, এত লোকের মাঝখানে কেলেঙ্কারী করবেন না।'

শর্মিলা একটু আশ্বস্ত হলো। 'না, তিনি কিছুতেই এতে সায় দিতে পারবেন না। সামান্য কয়টা টাকার জন্য ভালোবাসার অপমান করতে পারবেন না। নিজের ভালবাসার। শর্মিলার ভালবাসার।

কিছুক্ষণ হৈচৈ শোনা যাবার পর গোটা বাড়িটা হঠাৎ যেন নিঃঝুম হয়ে গেল। শর্মিলার বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

একে একে মেয়েরা ফিরে এলো। সবাই চুপচাপ। সবার মুখ অন্ধকার, ঘরের কোণে বসে মা অস্ফুট কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

শর্মিলার বুকের ভেতর একটা দাবানল জ্বলে উঠলো। বুঝিবা মুহূর্তের জন্য চোখ দুটোতে ইস্পাত ঝিকিয়ে উঠলো। বড়লোকের আদুরে দুলাল! এই তার ওজন! এই দাম! এই পৌরুষ! এই

ভা-লো-বা-সা !

পিঁড়ি থেকে উঠে পড়লো শর্মিলা। টেনে টেনে খুললো বেনারসী শাড়ি আর ওড়না। আটপৌরে শাড়িখানি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সহজকণ্ঠে বললো, 'হাসি, সাবানটা দে তো রে! মুখটা ধুয়ে আসি। সং সেজে আর বসে থাকতে পারিনে। তারপর মা'র দিকে তাকিয়ে বললো, মা কাঁদছো কেন? এইতো বেশ হলো। কাল সকালবেলা জন্মের মতো এবাড়ি ছেড়ে যেতে হবে ভেবে এমন কান্না পাচ্ছিল। এই বেশ হলো। আর তোমাদের ছেড়ে যেতে হবে না।'

সে বছরেই শর্মিলা বি. এ. পাশ করলো, তারপর এম. এ., কি একটা বিষয় নিয়ে থিসিস লিখে ডক্টরেট পেলো, তারপর একটা নাম করা কলেজে অধ্যাপনার কাজে লাগলো, তাছাড়া, টিউশনি করতো শর্মিলা, বড়লোকের মেয়েরা বাড়িতে শর্মিলাদির কাছে পড়বার জন্য পাগল।

শর্মিলার এখন অনেক নাম, অনেক চাহিদা। দেদার পয়সা।

মা-বাবা বিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শর্মিলা হেসেই উড়িয়ে দেয়। 'একবার ভুল করেছি বলে কি বার বার ভুল করবো? তোমাদের আর আছে কে বলো, আমি চলে গেলে কে দেখবে তোমাদের। তাছাড়া, বিয়ে জিনিসটা কি সাংঘাতিক ব্যাপার ভাবো তো, একটা রাত্তিরের মধ্যে তোমাদের সবেধন নীলমণি একটা মাত্র মেয়ে, যতো টাকা পয়সা সোনাদানা সব বেহাত হয়ে পরের ঘরে চলে যাবে। একরাত্তিরে সর্বস্বান্ত। একেবারে ডাকাত পড়ার অবস্থা আর কি!' শর্মিলা হেসে কুটিকুটি।

মা বলেন, 'তাই বলে কি তুই আমাদের জন্য সারাজীবন যোগিনী হয়ে থাকবি।'

উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে শর্মিলা, 'যোগিনী! একে তুমি যোগিনী হয়ে থাকা বলো! দেখো তো কতো ভালো ভালো শাড়ি পরি। আর বিশ ভরি সোনার গয়না রয়েছে না! সেই যে গড়িয়ে দিয়েছিলে। যোগিনীরা বুঝি অতো শাড়ি গয়না পরে, ভালো খায়, প্রতি সপ্তাহে সিনেমা বায়োস্কোপ দেখে, এটা ওটা নিয়ে দিনরাত হৈ চৈ করে বেড়ায়!'

কিন্তু শর্মিলা কতো বড় হয়েছে, কতো চালাক হয়েছে যে কথার ফুলঝুরিতে মায়ের মন ভোলাবে!

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

এমনি করে সুখে দুঃখে সাতটা বছর কেটে গেল।

সেদিন শর্মিলা সকালবেলা চা পানের পর বাড়ির বাইরের দিকে তার ছোট্ট পড়ার ঘরখানির মধ্যে বসেছিলো, বসে পড়াশুনো করছিলো। ঘরে তার কেউ ছিলো না। এমন সময় কে একজন ঘরে ঢুকলো। মাথা তুলে তাকে দেখে শর্মিলা চমকে উঠলো। শিশির। হঠাৎ এতদিন পরে!

শিশির ঘরে ঢুকলো, বললো, 'চিনতে পার শর্মি! অনেকদিন পর এলাম।'

সেই পুরোনো ডাক! শর্মিলার চোখদুটো একবার জ্বলে উঠলো বুঝি বা! কিন্তু পর মুহূর্তেই সহজভাবে তাকিয়ে সে বললো, 'বসুন।'

কথাটা খট্ করে শিশিরের কানে বাজলো। একদিন তাদের মধ্যে 'আপনি' 'আজ্ঞে'র পালা শেষ হয়ে গিয়েছিল। অপ্রতিভ হাস্যে শিশির বললো, 'আমাকে মনে আছে না ভুলে গেছো শর্মি?'

'আজ্ঞে না, ভুলিনি, আপনাকে ভুলে যাওয়া আমার সাধ্য নয়।'

কথাটার মধ্যে যে তীক্ষ্ন ব্যংগ ছিলো তাতে শিশির আহত হলো। বললো, 'শর্মি, আমায় ভুল বুঝো না, আমি সেদিন অপারগ ছিলাম, কিন্তু আমি আজও বিয়ে করিনি।'

'কেন? বাংলাদেশে সবাই কি আমার বাবার মত গরীব। দু'হাজার টাকা পণ দেনেওয়ালা মানুষ খুঁজে পেলেন না?'

কিন্তু আমি তো টাকা চাইনি, টাকা চেয়েছিলেন আমার বাবা, আমি যে তোমাকেই চেয়েছিলাম শর্মি! তাই আমি আজও বিয়ে করতে পারিনি। বিয়ের সম্বন্ধ এলেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি!'

ভীরু! কাপুরুষ! তাই তোমার এই ভীরুতার খেসারত দিলো একটি মেয়ে মান ইজ্জত খুইয়ে, জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিয়ে।

মুখ বেঁকিয়ে একটু হাসলো শর্মিলা, 'তাই নাকি! সুখী হলেম, কিন্তু শ্রদ্ধা বাড়লো কি না সে প্রশ্ন যেন করবেন না।'

'রাগ তুমি করতে পারো শর্মি। কিন্তু সত্যিই তাই, তোমাকে আমি

আজও ভুলতে পারিনি, এতোদিন বাবার জন্য পারিনি, কিছুদিন হয় বাবা মারা গেছেন। তাই আবার তোমার খোঁজে বেরিয়েছি।'

তেমনি হাসিমুখে শর্মিলা বললো, 'কিন্তু খুঁজে পাবেন না। কুড়ি বছরের সেই শমিটা কবে মরে গেছে। এই প্রায় তিরিশের শর্মিলা সেনের মধ্যে তার ভূতটাকেও খুঁজে পাবেন না। পাবেন একজন পুরোদস্তুর অধ্যাপিকাকে। খুব ভালো পড়াতে পারি কিন্তু, আপনার কোনো ভাইঝি ভাগ্নি কলেজে পড়লে আর দরকার হলে খবর দেবেন। গিয়ে পড়িয়ে আসবো, সপ্তাহে দু'দিন, মাসে একশো টাকা টিউশন ফি, বুঝলেন! হেসে উঠলো শর্মিলা।

শিশিরের মুখে ক্রমেই যেন এক এক পোঁচ কালি পড়ছিলো। বললো, 'আমার আর্জি কি মঞ্জুর হবে না তাহলে?'

'এটা তো আর্জি পেশ করবার সিজন নয়, আপনার অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'ঠাট্টা বিদ্রূপ অনেক করেছো শমি। ভালোই করেছো, কারণ এটুকু আমার প্রাপ্য। কিন্তু এবার ক্ষান্ত দাও, আজ আর আমাকে ফিরিয়ে দিও না।'

কঠিন কণ্ঠে শর্মিলা বললো, 'কিন্তু সেদিন তো আপনিই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, আমি দিইনি। আর কোন্ জায়গা অবধি টেনে নিয়ে তারপর ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মনে করে দেখুন। একবারও ভেবেছিলেন আমার মান ইজ্জত, আমার ভবিষ্যতের কথা?'

'জানি, জানি, সেদিন আমি অন্যায় করেছিলাম। আমায় ক্ষমা করো শমি! কিন্তু বিশ্বাস করো আমি আজও তোমাকে ভালবাসি।'

শর্মিলার মুখের রেখা কঠিন হলো, ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'এতোদিন পর আপনি কি এখানে প্রলাপ বকতে এলেন?'

উত্তেজিত কণ্ঠে শিশির বললো, 'প্রলাপ নয়, আমি বড়ো একা, আজ তোমাকে আমার বড়ো প্রয়োজন।'

'কিন্তু আজ আপনাকে আমার একটুও প্রয়োজন নেই।'

শিশিরের মুখে কে বুঝি এক দোয়াত কালি ঢেলে দিলো। মুখে ভাষা জোগালো না কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আচ্ছা, চলি তাহলে।'

'বসুন, এক কাপ চা আনাই।'

'ধন্যবাদ, প্রয়োজন নেই।' শিশির আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

শর্মিলা স্তব্ধ হয়ে বসে সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

কিন্তু বুকটা দুলে ওঠে কেন? চোখ ফেটে জল আসতে চায় কেন?

প্রাণপণে ঠোঁট কামড়ে ধরলো শর্মিলা। না কিছুতেই দুর্বল হবে না সে।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, বীরভোগ্যা নারীও, নারী পৌরুষের কাছেই আত্মসমর্পণ করতে ভালবাসে।

শর্মিলার সারা অন্তর জুড়ে যে আজও শিশিরই বাসা বেঁধে বসে আছে। তাই বলে কি সে ঐ কাপুরুষের পায়ে জীবনের নৈবেদ্য সাজিয়ে দিতে পারে?

না। তার চেয়ে এই ভালো। বেশ আছে শর্মিলা। খুব ভালো আছে।

শেষ পরিচয়

শেষ পর্যন্ত অমিতাভ—

থাক, শেষ পর্যন্ত অমিতাভ কি করলো, সেই পরের কাহিনী না হয় পরেই বলবো। আপাততঃ অমিতাভর নজির দেখে আমার একটা অভিজ্ঞতা হলো। আজকাল প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় একালের ছেলেরা বিয়ে করলেই নাকি কর্তব্যজ্ঞান ভুলে যায়, তা সে যত ভালো ছেলেই হোক। মা বাপ ভাই বোন ইত্যাদি পাঁচজনের ব্যাপারে একেবারে নির্লজ্জ ভাবে চোখ উলটে ফেলে।

অমিতাভ ভালো ছেলে। সে তার মা বাবাকে ভালোবাসে, ভাই বোনকে ভালোবাসে, তাদের জন্য কর্তব্য করে তার আনন্দ, তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তার সুখ। সেই অমিতাভ বিয়ের পরেও ঠিক এমনি থাকতে চেয়েছিলো। এমনি কর্তব্যপরায়ণ, পরিবারের সবার সঙ্গে স্নেহ মমতার দড়িদড়ায় তেমনি আবদ্ধ, সহযোগিতায় সহমর্মিতায় একাত্ম। তার ফলে তাকে কি পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিলো এবং তার পরিণতি কি হয়েছিলো, তাই নিয়েই এই কাহিনী।

অমিতাভ নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলো সুতপাকে। তার মা বাবার সায় এ ব্যাপারে যদিও তেমন ছিলো না, তবু ছেলে যদি সুখী হয় এই ভেবে তা মেনেও নিয়েছিলেন। কিন্তু সুতপাই পারলো না আপোস করে চলতে। সংসারের আর পাঁচজনের সঙ্গে তো নয়ই, এমন কি অমিতাভর সঙ্গেও নয়। তার চলাফেরায়, কথাবার্তায়, আচার-আচরণে প্রকাশ পেতো অবাধ্যতা, উগ্রতা ও স্বেচ্ছাচারিতা।

শৈলবাবু ও বিভাবতী অশান্তি এড়াবার জন্য ওর আচরণ চুপচাপ সহ্য করে যেতেন। অরুণাভ, অজন্তা এবং অলকাও বিরূপ ছিলো ভ্রাতৃবধূর উপর। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বিশেষ কথাবার্তাই বলতো না তার সঙ্গে। কাজেই ঠোকাঠুকি যা কিছু হতো

অমিতাভর সংগে। অমিতাভ মা বাবাকে ভালোবাসতো। ছোটো ভাই বোনদের স্নেহ করতো। বিশেষ করে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সৌন্দর্যহীনতা পছন্দ করতো না সে। সুতপার অসৌজন্যমূলক দৃষ্টিকটু ব্যবহার তাকে খুব পীড়া দিতো। সে প্রতিবাদ করতো এবং তাই নিয়ে এক এক দিন তুলকালাম কাণ্ড বেধে যেতো। তারপরই সুতপার রাগ করে গৃহত্যাগ—বাপের বাড়ি, দিদির বাড়ি, মাসীর বাড়ি, পিসীর বাড়ি যেখানে হোক গিয়ে দু'চারদিন থেকে মাথা ঠাণ্ডা করে ফের বাড়ি আসতো।

অমিতাভ বলতো—দ্যাখো, আমাদের মা বাবা আমাদের বিয়ে দেয়নি। আমরা নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করেছি। এখন আমাদের মধ্যে বনিবনা না হওয়া তোমার আমার দু'জনেরই খুব লজ্জার ব্যাপার। অন্ততঃ এদিকটা ভেবেও আমাদের মানিয়ে চলা উচিত।

সুতপা ভুরু বাঁকিয়ে জবাব দিতো—মানিয়ে চলার দায়িত্বটা এক তরফা আমার নাকি!

এর মধ্যে সুতপার কোলে এলো একটি মেয়ে—ঝুমু। সকালবেলা অজন্তা ও অলকার কলেজ। ওরা ছ'টায় বেরিয়ে যায়। বিভাবতী একা রান্নাঘর নিয়ে হিমশিম খান। এতগুলি মানুষের ভাত বাড়া, তার উপর রয়েছে অফিসের তাড়া। এক হাতে কুটনো বাটনা রান্না। চারদিকে ছড়ানো তরিতরকারির স্তূপ, মাছ, শিল নোড়া। তার মাঝখানে বসে দুহাতে কাজ গোছাতে গোছাতে হাঁপিয়ে ওঠেন বিভাবতী। সারা মুখে ঘাম ফুটে ওঠে। কপালের সিঁদুরের টিপটা আস্তে আস্তে অর্ধেকটা কপালে ছড়িয়ে যায়। মা'র সেই ঘাম ঘাম তেল তেল সিঁদুর ধ্যাবড়ানো মুখের দিকে তাকিয়ে অমিতাভর খুব মায়া হয়।

সেদিন সকালবেলা অমিতাভ সুতপাকে বললো—রান্নাঘরে একা একা মা'র কষ্ট হয়। তুমি কি তাকে একটু সাহায্য করতে পারো না?

সুতপা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো—মেয়ে নিয়ে আমি হেঁসেল ঠেলতে পারবো না বাপু।

—সে তুমি কোনোকালেই পারবে না আমি জানি। মেয়ে নিয়েও নয়, না নিয়েও নয়। আমি শুধু মাকে একটু সাহায্য করতে বলেছি।

সুতপা মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে দুম করে মাটিতে বসিয়ে দিলো।

আচমকা এই রূঢ়তায় বাচ্চাটা কেঁদে উঠলো।

অমিতাভ বললো—আহা! ওকে কাঁদাচ্ছো কেন?

—কেন, তুমিই তো বললে, তোমার মাতৃদেবীকে সাহায্য করতে।—সুতপার গলায় ঝাঁঝ।

অমিতাভ পরম মমতায় মেয়েকে কোলে তুলে নিলো। বললো—তোমার একটা আচরণও কি সহজ স্বাভাবিক হতে পারে না সুতপা। তুমি কি এমনি করেই আমায় সারাজীবন যন্ত্রণা দেবে।

—কেন, তোমার হুকুমই তো তামিল করতে যাচ্ছি। তাতেও যদি তুমি জ্বলে মর, আমি কি করতে পারি?

দু'জনেরই গলা উত্তরোত্তর চড়ছিলো! শুনতে পাচ্ছিলেন বিভাবতী। অফিস যাওয়ার মুখে পাছে ছেলের মেজাজ বিগড়ে যায় এবং খাওয়া না হয়, তাই ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য তিনি ডাকলেন—অমু, রান্না হয়ে গেছে। খেতে আয়। তোর যে অফিসের বেলা হয়ে গেল।

খেতে বসে অমিতাভ গম্ভীর মুখে বললো—মা, তোমার বড়ো কষ্ট হচ্ছে। তোমাকে সাহায্য করার জন্য একটি লোক রেখে নাও বরং।

বিভাবতী বললেন—এখনও তো পারছি বাবা। যখন পারবো না তখন তো রাখতেই হবে। ও নিয়ে তুই ভাবিস নে। আর শোন্, এসব নিয়ে বৌমাকে কিছু বলিস নে। আজকালকার মেয়েরা এসব কাজ পারে না। না পারলে কি করা যায় বল্!—ছেলের দরদে বিভাবতীর বুক ভরে যায়।

অমিতাভ অফিসে চলে যেতেই সুতপা মেয়ে নিয়ে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হলো। মেজাজ বিগড়ে গেছে তার। এই অবস্থায় এ বাড়ির লোকজনকে সহ্য করতে পারে না সে। ততোক্ষণে অজন্তা ও অলকা কলেজ থেকে ফিরে এসেছে।

অজন্তা বললো—মা, এই ভর দুপুরে তোমার বৌমা চললো কোথায়?

—কি জানি বাপু! অমুর সংগে তর্কবিতর্ক হচ্ছিলো শুনতে পাচ্ছিলাম একটু আগে। এই এক ঢঙ। মতের বিরুদ্ধে কিছু হলো তো অমনি মেয়ে ট্যাঁকে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। অজু, ডাক্

তো দেখি, শুনি কি ব্যাপার।

—কি আবার! এ তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ও তোমাকে দেখতে শুনতে কিচ্ছু করতে হবে না। আমিও ডাকাডাকি করতে পারবো না। তোমার বৌয়ের নাটকীয়ভাবে বাড়িতে কখন প্রবেশ কখন প্রস্থান কে অতো হিসেব রাখে বলো? দেখলেই তো আমার গা জ্বলে যায়।

অগত্যা বিভাবতীই এগিয়ে যান। জিজ্ঞাসা করেন—এই ভর দুপুরে কোথায় যাচ্ছো বৌমা?

—মা'র ওখানে।

—এটা কি একটা বেরোবার সময়! প্রত্যেক ব্যাপারেই শোভন অশোভন বলে একটা কথা আছে। তুমি তো ঘরের বৌ।

কোনো জবাব না দিয়ে অনমনীয় ভঙ্গিতে চলে গেলো সুতপা। অলকা অজন্তাকে বলে,—আচ্ছা দিদি, দাদা বৌদি তো নিজেরা পছন্দ করেই বিয়ে করেছিলো, তাহলে রাতদিন এত ঠোকাঠুকি কেন?

অজন্তা জবাব দেয়—বুঝলি না, দাদা যে মাকে ভালোবাসে, আমাদের ভালোবাসে, এটাই বৌদির পছন্দ নয়। এটাই তার গাত্রদাহের আসল কারণ। দাদা আমাদের সংগে খারাপ ব্যবহার করুক, মা'র পক্ষে কথা না বলে বৌদির পক্ষে কথা বলুক, মাকে একটু হেনস্থা করুক, দেখবি বৌদির মেজাজ জল হয়ে গেছে।

কিছুদিন যাবৎ সুতপা বায়না ধরেছিলো তাকে সামনের পুজোয় কাশ্মীর বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে। আগের বছর তার দিদি জামাইবাবু কাশ্মীর গিয়েছিল, সেই থেকে তার বায়না।

অমিতাভ বলে,—পাগল নাকি! শখ করে হাজার টাকা ওড়াবার মতো টাকা আমার নেই। জানো তো, দু' দুটো বোনের বিয়ের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে। এখন কি টাকা-পয়সা নষ্ট করা উচিত? দায়-দায়িত্ব কমুক, তখন দেখা যাবে।

—কেন, মেয়েদের বাবা থাকতে দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে কেন?

অমিতাভ গম্ভীর গলায় বললো—কারণ বাবা বুড়ো হয়েছেন, আর আমি বড়ো ভাই। সুতপা, তুমি আমাকে কর্তব্য করতে সাহায্য করো, সব কর্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়ো না।

—তোমার সব কর্তব্যজ্ঞানই টনটনে দেখছি, শুধু আমার বেলায় তোমার হাতের মুঠি খোলে না। সেদিন মা বলছিলেন, বড় জামাই তোর দিদিকে নিয়ে প্রত্যেক বছর এখানে ওখানে বেড়াতে যায়, কই, তোকে নিয়ে তো জামাই কোথাও যায় না ?

অমিতাভ জবাব দিলো—তা ঠিকই, তবে তোমার মা একদিনও কি জিজ্ঞাসা করেছেন, তুই জামাইকে একবেলাও অফিসের ভাত রেঁধে খাইয়েছিস কিনা ? বলে দিয়েছেন কি বাড়ির সবার প্রতি যথাযথ কর্তব্য করতে। স্বামীর উপার্জনের পয়সায় শুধু জোলুশ করাই মেয়েদের একমাত্র ধর্ম নয়। আমার বুড়ো মা শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস ভোর রাত্রে উঠে দু'টো রেঁধে দেন বলে খেয়ে অফিস যেতে পারি। তোমার মা এসবের হিসেব নেন কখনও ? না, বড় জামাইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁর মেয়েকে কাশ্মীর সিমলায় হাওয়া খাওয়াতে পারি নে আমি—শুধু সেই হিসেবটাই নেন ?

সুতপার চোখ মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছিলো। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল তার। দাঁতে দাঁত পিষে বললো—আমার মাকে অপমান করছো ! বেশ, থাকো তুমি তোমার মা নিয়ে, আমি সরে যাচ্ছি তোমার সামনে থেকে।

সেই যে রাগের মাথায় সেদিন চলে গেল সুতপা, মাস ছয়েক কাটলো, সে আর ফিরে এলো না। অমিতাভ বার তিনেক গিয়েছিলো ওকে বুঝিয়ে আনতে। কিন্তু সুতপার পণ—ঐ বাড়িতে সে আর কখনও ফিরবে না। যদি আলাদা বাসা করে অমিতাভ, তখন দেখা যাবে।

অমিতাভ বলে—তা হবার নয়, মা বাবাকে ছেড়ে আমি তোমাকে নিয়ে কিছুতেই আলাদা থাকতে পারবো না।

এই দ্বন্দ্বের মধ্যে বেশ কিছুকাল কেটে যাবার পর অমিতাভ নিরস্ত হলো। তার মনও তখন বিরূপ হয়ে উঠেছে। আরও কিছুদিন পর সে জানতে পারলো, সুতপা নাকি অন্য একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে যে বিয়ের আগেই তার পরিচিত ছিলো। তীব্র বিতৃষ্ণায় অমিতাভ এবার সব যোগাযোগ ছিন্ন করলো। শুধু বিবাহবিচ্ছেদের দাবি উঠলো না কোনো পক্ষ থেকেই।

এরপর দীর্ঘ দশ বছর কেটে গেছে। প্রথম দিকে মেয়ের জন্য অমিতাভর মন কেমন করতো, তারপর আস্তে আস্তে সহ্য হয়ে গেছে। সুতপার দাদারা পুরনো বাড়ি ছেড়ে অন্য অঞ্চলে নূতন বাড়িতে উঠে গেছে। অমিতাভ সেই ঠিকানা খোঁজ করেনি। শুধু বিভাবতী মাঝে মাঝে বলতেন—মেয়ে তো তোর। তুই দাবি করে মেয়ে নিয়ে আয়।

অমিতাভ বিষণ্ণ হাসি হেসে বলতো—লাভ কি মা? মেয়ে হয় বাবাকে পাবে, নয় মাকে পাবে, দু'জনকে একসঙ্গে তো পাচ্ছে না। তার চাইতে যার কাছে আছে তার কাছেই থাক।

একদিন অমিতাভ আর তার বন্ধু সুকুমার একসঙ্গে পথে হাঁটছিলো। একটা মেয়ে-ইস্কুলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সুকুমার বললো—জানিস, এই স্কুলে তোর মেয়ে পড়ে।

অমিতাভ চকিত হলো, বললো—তুই আমার মেয়েকে চিনিস?

—হ্যাঁরে, চিনি। তোর শ্বশুরবাড়ির পাড়ায় আমার আত্মীয় থাকে। মাঝে মাঝে সেখানে যাই। তোর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ওদের বিশেষ পরিচয় আছে, সেখানেই দেখেছি তোর মেয়েকে।

—আমাকে দেখিয়ে দিতে পারবি?

—তুই দেখলে চিনতে পারবি না?

অমিতাভ চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললো—বোধ হয় না। সেই তিন বছর বয়সে দেখেছিলাম। আজ দশ বছর দেখি না। তোর কাছেই নিজের মেয়েকে চিনতে হবে।

পরদিন স্কুল ছুটির সময় দুই বন্ধু গেটের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলো। দলে দলে মেয়েরা বেরিয়ে আসছে, ওরা দাঁড়িয়ে সাগ্রহে লক্ষ্য করছিলো। হঠাৎ বন্ধু বললো—ঐ তো তোর মেয়ে!

পাঁচ ছ'টি মেয়ে দল বেঁধে গল্প করতে করতে আসছিল, বারো তেরো চোদ্দর মতো বয়স। তার মধ্যে একটি মেয়েকে নির্দেশ করলো সুকুমার। অমিতাভর চোখ দু'টো যেন মেয়েটির মুখের ওপর বসে গেল। ফিসফিস করে বললো—ঠিক চিনিস তো?

—হ্যাঁরে। অবশ্য আগে আমিই কি জানতাম ও তোর মেয়ে। একদিন বাবার নাম জিজ্ঞাসা করতে তোর নাম বললো। জানি তো তোর ব্যাপারটা।

অমিতাভ অপলক চোখে দেখতে লাগলো মেয়েটিকে। ফর্সা ছিপছিপে, মাথায় বেশ লম্বা, কচি মুখখানাতে স্নিগ্ধ লাবণ্য। পরনে স্কুলের ইউনিফর্ম—সাদা ব্লাউস আর নীল স্কার্ট। উচ্ছ্বসিতভাবে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে, হাসছে। সেদিন সারারাত ভালো ঘুম হলো না অমিতাভর। থেকে থেকে মেয়েটির চেহারা ভেসে উঠতে লাগলো তার মনে। কি এক দুর্নিবার আকর্ষণে পর পর ক'দিন ঐ একই জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো অমিতাভ, মেয়েকে দেখবার জন্য। একদিন ডাকলো—খুকু শোনো, তোমার নামটা কি মা ?

মেয়েটি অবাক গলায় বললো—আমাকে বলছেন ?

—হ্যাঁ।

—আমার নাম অঞ্জনা দত্ত।

—ডাক নাম কি ?

মেয়েটি আরও অবাক হয়ে বললো—ঝুমু। কেন বলুন তো ?

ওদিকে বন্ধুরা অধৈর্য হয়ে ডাকলো—এই অঞ্জনা, দেরি হয়ে যাচ্ছে রে !

অঞ্জনা আসতেই জিজ্ঞাসা করলো—লোকটা কে রে ?

—কি জানি ভাই ! আমি তো চিনি না ! আমার নাম জিজ্ঞাসা করছিলো।

—এই, খবরদার ! অচেনা লোক ডাকলেও তার কাছে যাবি না। কোনো কথা বলবি না। ছেলেধরা নাকি কে জানে !

—ছেলেধরা নয় রে। এ লোকটা বোধ হয় মেয়ে ধরা। ওরা হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়লো।

• •

কয়েকটা দিন ছটফট করে কাটালো অমিতাভ। মুহূর্তের জন্যও মেয়েকে বুক থেকে সরাতে পারছে না। রাতে ঘুম নেই। মন স্থির করে ফেললো অমিতাভ। মান টান ভুলে দশ বছর পর আবার সুতপার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। কাঙালের মতো বললো—আমার মেয়েকে ছেড়ে আমি আর থাকতে পারছি না। মেয়ে নিয়ে তুমি আবার আমার ঘরে চলো সুতপা।

সুতপা কঠিন গলায় বললো—দশ বছর যদি মেয়েকে না দেখে চলতে

পারে, এখন চলবে না কেন?

অমিতাভ কাতর গলায় বললো—তুমি আমাকে দয়া করো সুতপা, আমার মেয়েকে আমার কাছে থাকতে দাও। ডাকো না একটু ওকে, একবার দেখবো।

সুতপা তেমনি অনমনীয় ভঙ্গিতে বললো—না, ও এখন বাড়ি নেই। আর আমি চাই না, তোমার মতো বাপের সঙ্গে ওর পরিচয় হোক।

সুতপার নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে ঝঞ্ঝা-বিধ্বস্ত একটা গাছের মতো ভেঙে চুরে দুমড়ে গেল অমিতাভ। নীরব হাহাকারে অসংলগ্ন পা ফেলে ফেলে বাড়ি ফিরলো সে। যেন সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে ও।

শেষ পর্যন্ত অমিতাভ—

হ্যাঁ, সেদিনই রাত্তিরে গলায় দাড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলো অমিতাভ।

সকলের নির্দেশে অরুণাভ গিয়েছিলো শেষ দেখা দেখবার জন্য সুতপা ও ঝুমুকে আনতে। সুতপা কিছুতেই আসতে রাজী হলো না। কিন্তু বাগ মানাতে পারলো না ঝুমুকে। ঝুমু ব্যাপারটা জানতে পেরে অরুণাভর হাত আঁকড়ে ধরলো—কাকু, আমি যাবো, আমি আমার বাবাকে দেখতে যাবো।

অগত্যা ঝুমুকে পাঠাতেই হলো।

ঝুমুকে দেখে সবার শোক দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। ঝুমু অমিতাভর শবের দিকে তাকিয়েই বলে উঠলো—এই-তো সেদিন রাস্তায় আমাকে নাম জিজ্ঞাসা করেছিলো। আমি তো জানতাম না এই আমার বাবা। অমিতাভর বুকের উপর কান্নায় ভেঙে পড়ে বললো—ওগো তোমরা কেউ আমাকে আগে বলে দিলে না কেন ও আমার বাবা হয়। আমার সব বন্ধুদের বাবা আছে, আমার বাবা নেই বলে কত দুঃখ হতো। মনে মনে বাবা বাবা বলে ডাকতাম। বাবা গো, সেদিন তুমি আমায় জানালে না কেন যে তুমি আমার বাবা।

তীর বেঁধা পাখির আর্তনাদের মত ঝুমুরের কচি-কণ্ঠের আকুল কান্না সবার শোকোচ্ছ্বাসকে ছাপিয়ে সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

অমিতাভ জানলো না, যে মেয়েকে বুকে নেবার জন্য তার বুকের

ভেতরটা আকুলিবিকুলি করতো, সেই মেয়ে তার বুকের উপর লুটোপুটি খাচ্ছে। যার মুখের একটি 'বাবা' ডাক শোনার জন্য তাঁর হৃদয়টা কাঙাল হয়ে ছিলো, অমিতাভ শুনলো না, সেই মেয়ে তাকে ক্রমাগত ডেকে চলেছে—বাবা—বাবা—বাবা—

মৌনমুখর

হেমন্ত চৌধুরী একটা কারখানার মালিক। কারখানাটি নেহাৎ ছোট নয়। জনা তিরিশ কর্মচারী এখানে কাজ করে। ওদের ইউনিয়ন আছে। কয়েক মাস আগে বেতন বাড়ানো ইত্যাদি চৌদ্দদফা দাবিতে ওরা স্ট্রাইক করেছিলো। দফায় দফায় মালিক শ্রমিক অনেক বৈঠক করেও যখন কোনো ফয়সালা হলো না, তখন মালিক পক্ষ কোম্পানি লক আউট ঘোষণা করলো।

দীর্ঘ পাঁচমাস একটানা লক আউট চললো। শ্রমিকদের মেরুদণ্ড একেবারে ঘুণে খাওয়া বাঁশের মতো ফোঁপরা হয়ে গেল। পেটে পড়লো মোক্ষম টান। পাঁচ মাস মাইনে নেই। ছেলেপিলে নিয়ে খাবে কি? তাই আংশিক দাবি পূরণ হতেই সুড়সুড় করে কাজে লেগে গেলো। মনের জোর অনেকখানি গেল হারিয়ে।

এই ধর্মঘটে এবং দাবিদাওয়ার আন্দোলনে যারা পাণ্ডা ছিলো সেই চাঁইদের ছাঁটাই করা হলো। ছাঁটাই করা সহকর্মীদের ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে মৃদু গুঞ্জন তুলেই অন্যান্যরা চুপ করে গেল। কারণ তখন বাঘের গর্জন বেড়ালের 'মিউ মিউ'তে পরিণত হয়েছে। সে স্বর এতো মৃদু যে কারখানার দেয়ালের একটা ইঁটও তাতে কাঁপেনি, ভিত টলা তো দূরের কথা। পাঁচ মাস চরম অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের এতোটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিলো না।

ছাঁটাই করা কর্মীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। সহকর্মীদের উপরও তাদের ক্ষোভ কম নয়।

সুদাম ঘোষ বললো—যা করেছি সবার স্বার্থ ভেবেই করেছি অথচ দেখো, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল আর ওরা কি না মালিকের কাছে মাথা বিকিয়ে বসে আছে!

রতীশ সামন্ত বিতৃষ্ণাভরে বললো—দাবিদাওয়া সব চুলোয় গেল। মালিক দয়া করে ক্ষুদকুঁড়ো যা ছুঁড়ে দিয়েছে তাতেই ডগমগ হয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে সব কাজে লেগে গেল।

পাঁচকড়ি হালদার ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে বললো—যতো সব ভেড়ুয়ার দল। মেরুদণ্ড বলতে কিছু নেই, ওদের নিয়ে নাকি লড়াই করা চলে!

পরাণ কর্মকার বললো দাঁতে দাঁত পিষে—বেইমান। বেইমান! সব ক'টা বেইমান!

জীবন মণ্ডল হাত মুঠো পাকিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে বললো—আমাদের রুটি মারবার শোধ আমরা নেবোই।

ওদের মধ্যে একমাত্র সুদামই অবিবাহিত। অন্যদের ঘর সংসার বৌ ছেলে আছে। বয়সে সবার ছোটো হলেও সুদামই ওদের পাণ্ডা।

হেমন্ত চৌধুরী রাশভারি লোক। তার দু'টি ছেলে। বড়োটি বিলেতের ডিগ্রীধারী ইঞ্জিনিয়ার। ভিলাইয়ে কাজ করে। ছোটোটি পশ্চিম জার্মানি থেকে কারিগরিবিদ্যা বিশারদ হয়ে এসে পিতার প্রতিষ্ঠানেই বসে। এই কোম্পানি পরিচালনায় তার অবদান অনেক। কর্মচারীদের কাছে পিতাপুত্র বড়ো সাহেব ও ছোটো সাহেব নামে পরিচিত।

সেদিন বিভাস গাড়ি নিয়ে একটু বাইরে গিয়েছিলো। তার অপেক্ষায় হেমন্তবাবু ছুটির পরেও অফিসঘরে বসে ফাইলপত্র নাড়াচাড়া করছিলেন। বিভাস গাড়ি নিয়ে ফিরলে দু'জনে একসংগে বাড়ি যাবেন। এমন সময় একটা গণ্ডগোল শোনা গেল। সেই ছাঁটাই করা পাঁচজন কর্মচারী কারখানার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বলছিলো—বড়ো সাহেবের সংগে দেখা করতে চাই।

দারোয়ান বলছিলো—দেখা হবে না। এখন কারও ভেতরে যাবার অনুমতি নেই।

ওরা জোর করে ভেতরে ঢুকতে চাইছিলো এবং দারোয়ান বাধা দিচ্ছিলো। তাই এই সোরগোল। এঁটে উঠতে না পেরে ওরা ফিরে গেল। যাবার সময় শাসিয়ে গেল, আচ্ছা, দেখে নেবো।

হেমন্ত চৌধুরী জানালা পথে সবই দেখলেন এবং শুনলেন। তিনি জানেন বাগে পেলে ওরা তাকে ছাড়বে না। ঘা খাওয়া নেকড়ের মতো ক্ষেপে আছে ওরা। এখন কিছুদিন তাকে একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

মাত্র মাস ছয়েক হয় হেমন্ত চৌধুরীর একমাত্র কন্যা সুজাতার বিয়ে হয়েছে। জামাই ব্যাংগালোরে থাকে। দু'তিনদিন হয় মেয়ে জামাই বেড়াতে

এসেছে। এমনি সময় এক রাত্রে বাড়িতে ডাকাত পড়লো। রাত দুপুরে হৈচৈ। সংখ্যায় ওরা পাঁচজন। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র। প্রথমেই ফোনের লাইন কেটে দিলো। তারপর গোটা বাড়িটা তছনছ করে ফেললো ওরা। কেবলই বলছিলো—কই, শয়তান 'দুটো' কই। ওদের ভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো ওরা হেমন্তবাবু ও বিভাসকে খুঁজছে। ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে পিতাপুত্র দু'জনেই বাথরুমের পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলো।

রাত দুপুরে হঠাৎ এতো গণ্ডগোল কিসের! ঘুমের ঘোরে কিছু বুঝতে না পেরে সুজাতা তার ঘরের কপাটটা খুলতেই হুড়মুড় করে পাঁচজন লোক ঘরে ঢুকে পড়লো। জামাই ইন্দ্রজিৎ ধড়মড় করে উঠে বিছানায় বসলো। হতচকিত, সুজাতা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো।

সুজাতার বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলো ওরা, তাই ইন্দ্রজিৎকে দেখে চিনতে পারলো। একজন বললে—ও দু'টো যখন পালিয়েছে তখন দে, জামাইটাকেই খতম করে দে।

অমনি দু'তিন জন ছোরা তুললো। লোহার রড ওঠালো। ইন্দ্রজিৎ কিছু বুঝে উঠবার আগেই আঘাতের পর আঘাত পড়তে লাগলো তার গায়ে।

সুজাতার বুঝতে বাকি ছিলো না ওদের আক্রোশটা কিসের। কারখানার ব্যাপারটা সে জানতো। সুজাতা আর্তনাদ করে দু'হাতে ইন্দ্রজিৎকে জড়িয়ে ধরে বললো—তোমরা ওকে মেরো না, ও তো কিছু করেনি। আমাকে দয়া করো। আমার যে মোটে ছ'মাস হলো বিয়ে হয়েছে!

একজন সুজাতার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে সরিয়ে দিলো। হিস্ হিস্ করে বললো - দয়া! আমাদের কে দয়া করে!

ইন্দ্রজিতের সারা গা বেয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। তা সত্বেও আবার ছোরা ওঠালো ওরা। সুজাতা পাংশু মুখে জলে ডোবা প্রাণীর মত রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলো—আর মেরো না, আর মেরো না, মরে যাবে।

ওর ভয়ার্ত অসহায় চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে এই সময় একজন বললো—এই, ছেড়ে দাও। আর মেরো না।

অন্য একজন ধমকে উঠলো—তুই থাম সুদাম। এই, তোমরা কেউ

ওর কথা শুনো না। শেষ করে দাও ওটাকে। যে আমাদের সর্বনাশ করেছে, মেয়েটাকে বিধবা করে দিয়ে তার উপর শোধ নাও।

ফের ছোরা তুলতেই সুদাম ছোরা সুদ্ধ সেই লোকটির হাত চেপে ধরে বললো—থামো, ও আমাদের আসল শত্রু নয়। ওকে মেরে লাভ কি ?

সুজাতা আবার ছুটে এসে ইন্দ্রজিৎকে আড়াল করতে চাইলে একজন ধাক্কা মেরে তাকে ফেলে দিলো।

সুদাম আবার ধমক দিলো—খবরদার! মেয়েদের গায়ে হাত দিও না।

অন্য একজন বললো—তোর যে বড্ড দরদ দেখছি সুদাম। কাজে ব্যাগড়া দিসনে। উদ্দেশ্য হাসিল করে যাবো। শ্বশুরের বদলে জামাইটাকেই খতম করবো আজ।

—তাহলে আমি তোমাদের সংগে নেই।

বলে সুদাম ঘরের বাইরে পা বাড়ালো। সুদামকে গালাগাল দিতে দিতে ওরাও ঘরের বাইরে গেল।

হেমন্তবাবু ও বিভাসকে খুঁজতে গিয়ে ওরা আরও কিছুক্ষণ সারা বাড়ি তছনছ করলো। অনেক কিছু লুঠপাট করে নিয়ে চলে গেলো।

সবাই এতক্ষণ যার যার ঘরের কোণে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে ছিলো, এবার বেরিয়ে এলো। গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে এলেন হেমন্ত চৌধুরী বিভাসকে সংগে নিয়ে। ততোক্ষণে রক্তক্ষরণে অবসন্ন হয়ে পড়েছে ইন্দ্রজিৎ। উদ্‌ভ্রান্ত সুজাতা ব্যাকুল কণ্ঠে কেঁদে উঠলো—ওগো, আমার একি সর্বনাশ হ'লো।

সবাই ছুটে সুজাতার ঘরে এসে ঢুকলো! ইন্দ্রজিতের অবস্থা দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন সুজাতার মা। ভেংগে পড়লো বাড়ির সবাই। তক্ষুণি তাকে নার্সিং হোমে পাঠানো হলো। এবং নেহাৎ কপালগুণে প্রাণে বেঁচে গেল ইন্দ্রজিৎ।

সুজাতার মুখে আক্রমণকারীদের কথাবার্তার বিবরণ শুনে হেমন্ত চৌধুরী স্পষ্টই বুঝতে পারলেন কারা একাজ করেছে। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন—আমি ওদের এমন শিক্ষা দেবো যেন বিষ দাঁত একেবারে ভেংগে যায়।

তিনি পুলিশে খবর দিলেন এবং পুলিশ ঐ পাঁচজন ছাঁটাই করা কর্মীকে গ্রেপ্তার করলো।

সুজাতা সবই বলেছিলো কিন্তু একটুখানি চেপে গিয়েছিলো। সে দেখেছিল পাঁচজন লোক তার ঘরে ঢুকেছে কিন্তু বললো চারজন। আর সুদাম নামটা যে একাধিকবার শুনেছে তার উল্লেখই করলো না।

ওদের আদালতে অভিযুক্ত করা হলে সনাক্ত করার জন্য সুজাতাকে ডাকা হলো। ইন্দ্রজিৎকেও ডাকা হয়েছিলো। কিন্তু সে অসুস্থ। তাছাড়া সে বললো, ঘুমের ঘোর না কাটতেই আচমকা আঘাত পেয়ে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে গিয়েছিলো, তাই ঠিক করে কিছু বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

সুজাতাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো—এই পাঁচজন লোক আপনার ঘরে ঢুকেছিলো?

চারজন ঢুকেছিলো।—সুদামকে দেখিয়ে বললো—এই লোকটি সেদিন ছিলো না। ওকে দেখিনি।

এই সুদাম ঘোষ-ই তো দলের চাঁই। আপনি ঠিক করে মনে করে দেখুন।

সুদাম ঘোষ! আমার স্পষ্ট মনে আছে—এই লোকটি ছিলো না।

সুদাম স্থির দৃষ্টিতে সুজাতার দিকে তাকিয়েছিলো। সে ভালভাবেই জানতো সেদিন তার নামটা দু'বার উচ্চারিত হয়েছিলো। কাজেই ভুল হবার কথা নয়। এ অস্বীকার ইচ্ছাকৃত তা বুঝতে সুদামের বাকি রইলো না। এই সময়ে সুজাতা গভীর দৃষ্টিতে সুদামের দিকে তাকালো। সুদাম দেখলো সে চোখে দু'বিন্দু কৃতজ্ঞতা টলটল করছে। সুদাম সে দিনই ছাড়া পেয়ে গেলো।

বাড়ি ফিরবার সময় সুজাতা গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো সুদাম। দু'জনেই মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে দু'জনের দিকে তাকালো। দু'য়েরই চোখে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি।

কয়েক মুহূর্ত। দু'জনেই বুঝি পরস্পরের হৃদয়ের নীরব উচ্চারণ শুনলো। চোখের কৃতজ্ঞতার ভাষা পড়লো, পরক্ষণেই সুজাতা উঠে বসলো গাড়িতে। সুদাম মাথা নীচু করে হেঁটে রাস্তার জনারণ্যে মিশে গেল।

গাড়িতে বসে হেমন্তবাবু বললেন—তুই নিশ্চয় ভুল করেছিস মা, ঐ সুদাম ঘোষ ঐদিন নিশ্চয়ই ছিলো। ওটাকে গাঁথতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো।

সুজাতা দৃঢ়কণ্ঠে বললো—না বাবা, আমি ভুল করিনি। সুদাম ঘোষ সেদিন ছিলো না।

তারপর মনে মনে বললো—সুদাম ঘোষ! আমি যতদিন সিঁথিতে সিঁদুর পরবো ততদিন তোমার দয়ার কথা স্মরণ করবো। তোমাকে আমি কোনোদিনই ভুলবো না সুদাম ঘোষ।

উত্তর ভারতী।

ঊষর পথের যাত্রী

অবিভক্ত ভারত তথা বাংলাদেশের কাহিনী।

পূর্ববঙ্গের সম্পন্ন জমিদার পরিবারের বধূ হয়ে এসেছিলো অমিয়া বাড়ির বড়ো ছেলে সুজিতের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে। তখনও সুজিত কলেজের ছাত্র। কলকাতায় হস্টেলে থেকে পড়ে। অমিয়ার বয়স সবে বছর ষোলো।

সে সময়ে ছাত্রাবস্থায় বিয়ে করতে কোনো বাধা ছিলো না। কারণ সম্পন্ন পরিবারের ছেলেদের পরিবার প্রতিপালনের কোনো দায় ছিলো না। ক্ষেতের ফসল, পুকুরের মাছ, ঘরের দুধ ঘি এবং জমিদারীর স্বত্ব থেকেই স্বচ্ছন্দে চলে যেতো। কাজেই মা বাবা-রা অল্প বয়সেই ছেলের বিয়ে দিতেন। বিশেষ করে ঘরে যদি দাদু ঠাকুমা থাকতেন তবে তো আর কথাই নেই। টুকটুকে নাত-বৌ না দেখে পাছে হঠাৎ মরে যান সেই ভয়ে চোখে ঘুম আসতে চাইতো না। জমিদার সুবল চৌধুরীর বড়ো ছেলে সুজিত চৌধুরীর বিয়ের ইতিহাসটাও ঐ একই রকমের।

বিয়ে করে বৌকে মা বাবার জিম্মায় রেখে সুজিত আবার যথারীতি হস্টেলে ফিরে গেল পড়তে। বি. এ., এম. এ. অবধি। সেই সময়েই প্রফেসর শৈলেন গুহর নেক নজরে পড়ে যায় সুজিত চৌধুরী। তাঁর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। এবং প্রফেসরের বি. এ. পড়া কন্যা মাধুরীর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই মেয়ের জৌলুষ দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায় সুজিত চৌধুরীর। এর কাছে মাইনর পাশ উজ্জ্বল-শ্যাম অমিয়া? যেন দু'শো পাওয়ারের ইলেকট্রিক লাইটের কাছে একটা দু'পয়সার মোমবাতি।

কাজেই ক্রমেই সুজিতের বাড়িতে চিঠি লেখার সংখ্যা কমে এলো। কমে এলো বাড়ি যাওয়ার তাগিদ। প্রায় ছুটিতেই 'পড়ার চাপে' বাড়ি যাওয়ার বিঘ্ন হতে লাগলো। সুবলবাবু পুত্রের এহেন পাঠস্পৃহা দেখে চমৎকৃত হলেন। এবং অমিয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় কাল গুণে গুণে শূন্য শয্যায় শুয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলো।

এমন সময় সুবলবাবু মারা গেলেন। সুজিত চিঠি লিখে জানালো যে সে গংগাতীরেই পিতৃদেবের শেষ কার্য সমাধা করবে। বাড়ি যাওয়ার সময় নেই, কারণ একটা খুব ভাল চাকরির সম্ভাবনা আছে। এখন কোথাও গেলে ফস্কে যেতে পারে। অতএব মিনমিনে গলায় কেউ কিছু বললেও জোর দিয়ে দোষারোপ কেউ করতে পারলো না।

অমিয়া পাঁচখানা চিঠি লিখে একখানারও উত্তর পায় না। মা প্রমাদ গণেন। স্থির করেন ছোট ছেলে বিজিতকে সুজিতের খবর আনতে কলকাতা পাঠাবেন। যাওয়ার তারিখ অবধি ঠিক, এমনি সময় সুজিতের চিঠি এলো। তার একটা ভাল কোম্পানিতে চাকরি হয়েছে একথা সে আগেই জানিয়েছিলো। এবার জানালো—কোম্পানি খরচ দিয়ে তাকে একটা ট্রেনিং-এর জন্য বিলেত পাঠাচ্ছে দু'বছরের মেয়াদে। বাড়ি গিয়ে দেখা করারও সময় হলো না বলে সে খুব দুঃখিত, দু'দিনের মধ্যেই তাকে রওনা হতে হবে।

মা কেঁদে কেঁদে পুত্রকে ধিক্কার দিলেন। স্বর্গতঃ স্বামীর কাছে নালিশ জানালেন। নিজের ভাগ্যকে গালমন্দ করলেন। আর অমিয়া পুরো তিনদিন অন্নগ্রহণ করলো না। শয্যা ছেড়ে উঠলো না। অবিরল অশ্রু বর্ষণে দিন কাটাতে লাগলো।

বিলেত গিয়ে প্রথম প্রথম দুই চারখানা চিঠি লিখেছিলো বৈকি সুজিত। তারপর একদিন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

সংসারের চাকা ক্রমাগতই ঘুরে চলেছে, হঠাৎ একদিন পাকিস্তান হয়ে গেল। হাজার হাজার উদ্বাস্তুর সংগে অমিয়ারাও উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় চলে এলো। একটা উদ্বাস্তু কলোনীতে আশ্রয় নিল ওরা। বিজিত তৈরি জামা প্যান্ট নিয়ে ফুটপাতে হকার্সদের সারিতে বসলো। শুধু নিজের জন্যই নয়—মা আর বৌদির মুখে দু'টো ভাত দিতে হবে তো!

বিলেত যাবার আগে কলকাতায় যে ঠিকানায় সুজিতকে চিঠি লেখা হতো একদিন বিজিত সেখানে গিয়ে ঢুঁ মারলো। কিন্তু যা শুনলো তাতে আঁৎকে উঠলো। সুজিত নাকি কোনো এক প্রফেসর গুহ-র মাধুরী নাম্নী শিক্ষিতা ও সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করে সস্ত্রীক বিলেত গেছে। প্রফেসর গুহ-ই সুজিতের চাকরি ও বিলেত যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

বিজিত বাড়ি ফিরে খবরটা জানালো। মা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অমিয়া শুষ্ক চোখে কঠিন মুখে বললো—যে চলে যেতে চায় তাকে চলে যেতে দাও ঠাকুরপো। আমার জন্য কিছু ভেবো না।

সেই থেকে অমিয়া এক টয়লেট কোম্পানির এজেণ্ট। এক মহিলা কল্যাণ সমিতির স্নো-পাউডার সাবান আলতা নিয়ে দোরে দোরে ঘোরে।

এমনিভাবে অনেকগুলো বছর কেটে যায়। গঙ্গায় বয়ে যায় অনেক জল। অমিয়া আজ প্রৌঢ়া। শাশুড়ি মারা গেছেন। বিজিত বিয়ে করে বৌ নিয়ে দূরে সরে গেছে। টয়লেট ফেরি করাই আজ অমিয়ার জীবিকা।

বালিগঞ্জের এক প্রাসাদোপম বাড়ির মধ্যে ঢুকলো অমিয়া তার সওদা নিয়ে। মেয়েমহলে গিয়ে আর্জি জানালো—ভালো জিনিস আছে। কিছু নিন মা।

গৃহিণী ও তার দু'টি তরুণী কন্যা উৎসুকভাবে জিনিসগুলো দেখতে লাগলো। অমিয়া দেখলো—মহিলা প্রায় তার সমবয়সী হবে। কিন্তু এখনও তার সর্বাঙ্গে কি কোমল লাবণ্য। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাক্ষর। দু'টি মেয়েই দেখতে খুব সুশ্রী। একটি দেখতে প্রায় মায়ের মতোই। আর একটির মুখের আদল—কি আশ্চর্য! অনেকটা যেন—

দূর ছাই! কি যে ভাবছে সে!

মেয়েরা জিনিস বাছাই করেছিলো। মহিলা দাম জিজ্ঞাসা করছিলেন। এমন সময় পাশের ঘর থেকে পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক।

নিঃসন্দেহে গৃহকর্তা। ডাকলেন—মাধুরী, একবার শুনে যাও তো।

অমিয়া বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো ফিরে তাকালো! না, চিনতে একটুও ভুল হলো না অমিয়ার। তারপর কি যে হয়ে গেল। মাথাটা কেমন করে উঠলো।

মেয়েরা হৈ হৈ করে উঠলো—এ কি! কি হলো আপনার। শরীর খারাপ হয়েছে?

মিনিট দুইয়ের আপ্রাণ চেষ্টায় অমিয়া টাল সামলালো। ক্লান্ত কণ্ঠে বললো—ও কিছু না, অনেকক্ষণ রোদে রোদে ঘুরেছি কিনা, তাই মাথাটা হঠাৎ—

অমিয়া তার ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে কোনোরকমে উঠলো—

একটা গলি পেরিয়ে বড় রাস্তা। বাঁদিকে খানিক এগিয়ে গেলে বাস স্টপেজ। এখন আর কোথাও নয়। একেবারে সোজা বাড়ি।

ওঃ, এমন চমকও ছিলো অমিয়ার জন্য !

অমিয়া বাস-স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এমন সময় একটা বিরাট গাড়ি আস্তে আস্তে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো অমিয়া। গাড়ির দরজা খুলে ধরলো সেই প্রাসাদোপম বাড়ির মালিক। বললো—অমিয়া, আমি যেমন তোমাকে এক নজর দেখেই চিনতে পেরেছি, তুমিও যে আমায় চিনেছো সেটাও বুঝতে পেরেছি। গাড়িতে উঠে এসো। কথা আছে।

অমিয়ার গলায় যেন স্বর ফুটতে চায় না। কোনোরকমে বললো—আমি আপনার গাড়িতে উঠবো কেন? আর আপনার সংগে আমার কি কথাই বা থাকতে পারে ?

—অমিয়া, রাগ তুমি করতে পার। কিন্তু আমার সংগে যে তোমার একটা সম্পর্ক আছে তা তো অস্বীকার করতে পারো না।

—সম্পর্ক! যে সম্পর্ক আপনি নিজের হাতে অনেকদিন আগেই মুছে দিয়েছেন তাকে নতুন করে স্বীকার করবারই বা কি প্রয়োজন থাকতে পারে! যে আপনার জীবন থেকে অনেকদিন আগেই হারিয়ে গেছে তাকে আর নতুন করে খুঁজে লাভ কি ?

—মানুষ কি সব সময় লাভ লোকসান খতিয়ে কাজ করে অমিয়া ? অন্ততঃ তোমার ঠিকানাটা দাও। একদিন তোমার প্রতি যে অবিচার করেছিলাম আজ তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

ততোক্ষণে অমিয়া মনের সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। কঠিন কণ্ঠে বললো—অসম্ভব, তা আপনি পারবেন না। আপনি আমার যে ক্ষতি করেছেন কোনোকিছু দিয়েই তা পূরণ হয় না। আমিও আজ আপনার কাছে কিছু প্রত্যাশা করি না। আর একটা কথা মনে রাখবেন। আপনার একটা সাজানো সংসার আছে। সেখানকার জল ঘোলা হয়ে উঠতে পারে।

সুজিত চৌধুরী অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিলো—শিক্ষিতা সুন্দরী এবং ধনী কন্যা মাধুরীও তাকে যতখানি সমীহ করে চলে—এই স্বল্প-শিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়েটি যেন তাকে ততোখানিই পাত্তা দিচ্ছে না। তার মতো সম্ভ্রান্ত

ধনী ব্যক্তি যেখানে উপযাচক হয়ে এসেছে সেখানে এই মেয়েটির তো ধন্য হয়ে যাবার কথা। সেই শান্ত স্বল্পভাষিণী মেয়েটির এ কি রূপান্তর!

এমন সময় বাস এসে দাঁড়াতেই অমিয়া বললো—আমার বাস এসে গেছে। আমি চলি।

—তোমার ঠিকানাটা?

—তার কোনো প্রয়োজন হবে না। অমিয়া দ্রুতপায়ে বাসে উঠতেই বাস ছেড়ে দিলো। এতোক্ষণ যে উত্তেজনাকে অমিয়া আপ্রাণ চাপা দিয়ে সুজিতের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলো—বাসে বসতেই সেই উত্তেজনার স্রোত তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাত পা মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। বুকের ভেতর তোলপাড় ঢেউ।

ওঃ, অমিয়া যে নিজেকে সামলে পালিয়ে আসতে পেরেছে এই ঢের।

কেন এগিয়ে এসেছে সুজিত চৌধুরী? অমিয়ার কাছে কি চায় সে? পরিচয় যতো সত্যিই হোক তবু স্ত্রী পুত্র কন্যার কাছে কি পরিচয় দেবে সে অমিয়ার?

এমন একটা আকস্মিক ধাক্কার পর ক্লান্তিতে ছেয়ে যায় দেহ-মন। তাই দু'দিন কাজেই বেরোল না অমিয়া। কিন্তু আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিলো তার জন্যে। সেদিন সে তার ছোট্ট ঘরটির মধ্যে ক্লান্তভাবে শুয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলো। মাথার মধ্যে ঐ চমক-খাওয়া ঘটনাটাই ঘুরপাক খাচ্ছিলো। এমন সময়ে খুট্‌খুট্ করে কড়া নাড়ার শব্দ। অমিয়া উঠে দরজা খুলে দিয়ে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেলো। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সুজিত।

—আপনি! আপনি এখানে কি করে?

—সেদিন বাসের পিছু নিয়েছিলাম, তোমার আস্তানা অবধি দেখে গিয়েছিলাম।

—ভালো করেন নি। আমি এখানে একা থাকি। আপনার আসা লোকের চোখে ভালো নাও ঠেকতে পারে।

—তাতেই বা ভয় কি অমিয়া! আমাদের মধ্যে যে সত্যের সম্পর্ক রয়েছে!

—যে সত্যটা অনেকদিন আগেই গভীর জলের নীচে তলিয়ে গেছে

তাকে আজকে হঠাৎ তুলে আনতে গেলে লোকে বিশ্বাস করবে কেন ?

—যাতে লোকে বিশ্বাস করে তাই করবো। তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে যাবো।

—কেন ? রাজবাড়িতে ঝিয়ের অভাব হলো নাকি ?

—ছিঃ ! অমিয়া, ভুল তো মানুষেই করে। কিন্তু পরে যদি সে অনুতপ্ত হয়ে ছুটে আসে তাকে কি এমনি করে ফিরিয়ে দিতে হয় ? আচ্ছা, এই দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়েই বিদেয় দেবে, না ভেতরে একটু বসতে দেবে ?

অমিয়া তাড়াতাড়ি এক পাশে সরে গিয়ে আহ্বান জানালো—আসুন, বসুন।

—অমিয়া, তোমার মুখে এই 'আসুন' 'বসুন' কথাগুলো কেমন যেন সহ্য করতে পারি না। কয়েকটা বছর তো ঘর করেছিলে আমাকে নিয়ে। সে সময়কার কথা কি একেবারে ভুলে গেলে অমি ?

এতক্ষণ পর্যন্ত অমিয়া যেন একটা চ্যালেঞ্জ। কিন্তু আর বুঝি পারছে না। একটা আবেগের বন্যা বুক ঠেলে উঠছে। হে ভগবান ! আর একটু ধৈর্য দাও।

সুজিত বললো—বিলেত থেকে ফিরে তোমাদের অনেক খোঁজ করেছি। কিন্তু পাই নি। আজও যে তোমার কথা ভাবি না এমন মনে করো না অমিয়া।

—কিন্তু আজ এ সব কথা বলার সার্থকতা কি ?

—অমি, মরা গাঙে যে বান ডাকে এ কথা কখনও শোনো নি ?

অমিয়া ঠোঁট কামড়ে ধরে দমন করলো হৃৎপিণ্ডের এলোপাথাড়ি স্পন্দন। চোখের উচ্ছ্বসিত অশ্রু। জীবনসংগ্রামের সৈনিক অনেক দুঃখের আগুনে পোড় খেয়ে খেয়ে হৃদয়ের বিলাসকে লাগাম টানতে শিখেছে।

অমিয়া বললো—কিন্তু আজ এই ডাকে সাড়া দেবার মতো আমার কি আছে বলুন। বয়স গেছে, স্বাস্থ্য গেছে। দুঃখের সঙ্গে যুঝে আমার জীবনের সব লাবণ্য, সব নমনীয়তা ঝরে গেছে। একটা পোড়া কাঠের মতো বেঁচে আছি শুধু। এখন আপনি আমার এই দৈন্যভরা জীবনটাকে নিয়ে কি করবেন ?

এবার সুজিত আস্তে একখানা হাত অমিয়ার হাতের উপর রাখলো। কোমল অথচ গভীর গলায় বললো—তুমি আমার স্ত্রী। সহধর্মিণী। আমার জীবনের প্রথম নারী। যৌবনের প্রথম ভালোবাসার উৎস-ধারায় আমি তোমারই অভিষেক করেছিলাম। তারপর হঠাৎ কি হয়ে গেল। মাধুরীর রূপ, তার শিক্ষার জৌলুষ, মাধুরীর বাবার দেওয়া ভাল চাকরির প্রলোভন, বিলেত যাবার স্বপ্ন—সব মিলিয়ে একটা বিরাট মোহ সেই ভালোবাসার উৎসমুখকে চাপা দিয়ে দিলো। কিন্তু আজ এতোদিন পর তোমাকে দেখতে পেয়ে সেই পাথরটা ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ সরে গেছে। তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, এই চল্লিশোর্ধ্বেও আজ আমার বুকে বান ডেকেছে। হাত দিয়ে দেখো অমিয়া, তুমিও বুঝতে পারবে। বলে অমিয়ার হাতখানা টেনে এনে বুকে ছোঁয়ালো সে!

সৈনিক ক্লান্ত, আর বুঝি লড়তে পারছে না। অমিয়ার চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়লো।

তিনদিন বাদে অমিয়াকে বাড়ি নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুজিত উঠলো। বলে গেল অমিয়া যেন প্রস্তুত হয়ে থাকে।

পরদিন রাত প্রায় দশটায় একটা টিনের সুটকেস ও বিছানার বান্ডিল নিয়ে অমিয়া একটা রিক্সায় উঠলো। তারাভরা আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে বললো—পারলাম না, পারবো না, পারবো না। তোমার সাজানো বাগান ভেঙে দিতে আমি কিছুতেই পারবো না। এমন সুন্দর নিটোল সংসারে চিড় ধরাতে পারবো না। তাই চলে গেলাম। তুমি আমায় ক্ষমা করো—ক্ষমা করো।

নামার সিঁড়ি

যখন চারতলায় উঠেছিলাম তখন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিলো। হাঁপ ধরছিলো। মাঝে মাঝে থেমে থেমে বার কয়েক দম নিয়ে তবে উঠেছিলাম। অনেকটা সময় লেগেছিলো। এখন নামছি। বেশ তরতর করে নেমে যাচ্ছি। কোনো কষ্ট হচ্ছে না। উপরে ওঠার চাইতে নীচে নামা অনেক সোজা।

তিল তিল করে একদিন উপরে ওঠার সাধনা করেছিলাম আমি। সেই শৈশব থেকেই করেছিলাম। কে. জি. ওয়ান থেকে স্কুলের সবগুলো ধাপ পেরিয়ে কলেজের সিঁড়িতে পা রাখতে জীবনের ষোলোটা বছর কেটে গিয়েছিলো। কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে পড়েছিলাম বি. এস-সি.। কলেজ আর ইউনিভারসিটি মিলিয়ে আরও ক'টা বছর। সে কি নিষ্ঠা আর পরিশ্রম, সে কি আগ্রহ আর অধ্যবসায় নিয়ে সেই সিঁড়িগুলি ভেঙেছিলাম। বলতে গেলে তপস্যা করেছিলাম। এক-একটা পরীক্ষার সে কি রেজাল্ট। মার্কশিটের উপর বার বার চোখ বুলোতাম। চোখ যেন জুড়িয়ে যেতো।

আমাকে নিয়ে আমার মা-বাবা গর্ববোধ করতেন। সবাই বলতো —এ ছেলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কৃতিত্বের সঙ্গে একটার পর একটা সিঁড়ি ভেঙ্গে কেমন তরতর করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। দেখো, ও জীবনে কতো বড়ো হয়, কতো উঁচুতে ওঠে।

আমি শ্রীসুরজিৎ সেন, এর প্রত্যেকটা কথা বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করতাম। আমার দুই চোখে স্বপ্ন ঘন হতো।

কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে গিয়ে প্রথমে ধাক্কা খেলাম। যে আত্ম-বিশ্বাস নিয়ে পরীক্ষার হলে বসে খাতায় লিখেছি এবং পরে আশানুরূপ ফল পেয়েছি, এখানেও সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে লিখিত পরীক্ষা দিয়েছি। তাতে উৎরেও গেছি ভালোভাবে কিন্তু ইন্টারভিউর পর আর ডাক পাইনি। এমনি এক জায়গায় নয়। বহু জায়গায়। প্রথম দিকটায় একটু জড়তা ছিলো; ছিলো আড়ষ্ট ভাব। ভেবেছি—এই কারণেই হয়তো অযোগ্য সাব্যস্ত হচ্ছি। কিন্তু বেশ কয়েকবার ইন্টারভিউ দিয়ে

শেষদিকে বেশ ঝরঝরে হয়ে গিয়েছিলাম। রীতিমতো ভালো ইন্টারভিউ দিচ্ছিলাম। তবু ডাক আসে না। পরে খবর নিয়ে জেনেছি সব পেছনের দরজা আর তৈলদানের ব্যাপার। ভেতরে যার বাবা মামা শ্বশুরমশাই আছে সে-ই যোগ্যতম ব্যক্তি।

এতো নিষ্ঠা, এতো একাগ্রতা, এতো পরিশ্রম, এতো অধ্যবসায়! এই কি তার দাম!

বন্ধুদের সঙ্গে একদিনও প্রাণ ভরে আড্ডা দিইনি। ছোটো ছোটো শখকে পাশ কাটিয়ে চলেছি। কখনও আমল দিইনি। চলেছি এক আকাঙ্ক্ষায়, এক লক্ষ্যে। আমাকে বড়ো হতে হবে। ওপরে উঠতে হবে।

বাস্তবের রাজপথে আছড়ে পড়ে আমার স্বপ্ন চুরমার হলো।

শুধু আমার নয়। মা-বাবার স্বপ্ন-রঙিন চোখেও তখন ধূসর ছায়া। আত্মীয়-প্রতিবেশীরা আমার দিকে অন্য দৃষ্টিতে তাকায়। তাদের বিশ্বাসের ভিতটাতে ঘুণ ধরেছে। হয়তো ভাবছে—তাইতো, ছেলেটাকে যা ভাবতাম তা নয় দেখছি। নইলে এতোদিনের মধ্যে একটা কাজকর্ম জোগাড় করতে পারে না!

তখন আর একটু নীচে নামলাম। যেমন-তেমন কাজ করতে প্রস্তুত। বিদ্যের অভিমান পকেটে থাকুক। এক বিজ্ঞাপন দেখে তাতেই দরখাস্ত করলাম। যদি লেগে যায় এটাই করবো। নিজের উপর আস্থা রাখতে পারছি না।

ভদ্রলোক বড়ো বিজনেসম্যান। কিসের কিসের নাকি অনেক বিজনেস আছে। আমার ডিগ্রীর বহর দেখে বললো—বাবুজী, আপনি এতো লেখাপড়া শিখিয়ে এহি কাম কোরতে কেনো আসিয়েছেন?

—অন্য কাজ পাইনি বলে।

—আপনি একটা ভালো কাম কোরবেন?

—পেলে করবো।

—তা হোলে কাল আমার চৌরঙ্গী টেরাসের অফিসে আসুন। ভালো কাম হোয়ে যাবে।

ভকতরাম আগরওয়ালের কথামতো পরদিন গিয়েছিলাম তার চৌরঙ্গী টেরাসের অফিস বাড়িতে।

আগরওয়াল খুব ঘটা করে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো—রাম

রাম বাবুজী, আসুন !

বিরাট টেবিলের সামনে বসে আছে আগরওয়াল। ধপ্‌ধপে, ফর্সা রঙ্‌। দেহে অত্যধিক মেদের প্রাবল্য। ছোটো ছোটো দু'টো চোখে ধূর্ততার ছায়া।

আগরওয়াল তার আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলো—ঘি'উর বেওসা আছে। ঘি'উ খুব খাঁটি লেকিন আজকের দুনিয়ার মানুষ আসলি জিনিসের কদর বোঝে না। তাই একটু বাইরের 'শো' দিতে হয় ওদের চোখে চমক লাগাবার জন্য। এই আর কি ! তুমি তো কেমিস্ট আছে বাবুজী, একদম খাঁটি ঘি'উর গন্ধ তৈরি করিয়ে দাও। আমার আরও অনেক কিসিমের বেওসা আছে। তুমি সব ব্যাপারেই আমাকে সাহায্য কোরবে। হাজার রুপেয়া মাইনে পাবে।

আমার তো চোখ ছানাবড়া। দু'টো প্রস্তাবই আমাকে ইলেকট্রিক শকের মতো ধাক্কা মারলো। এক—কাজের জাত। দুই - মাইনের অঙ্ক। বুঝলাম, ভেজাল ঘিয়ে খাঁটি গন্ধ লাগাতে হবে। কিন্তু ঘিটা কতোখানি ভেজাল। ঋষিবাক্য স্মরণ করে কেউ যদি ঋণং কৃত্বা আগরওয়ালজীর ঘৃতং সেবন করে তার পরিণামে জল কতখানি গড়াবে ?

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম— বলছো কি আগরওয়ালজী ! তারপর তোমার ঐ ঘি খেয়ে যদি লোক পটল তোলে ?

পানে ছোপানো সব ক'টা দাঁত বের করে হাসলো আগরওয়াল। বললো—আরে রাম রাম। মোরবে কেনো বাবুজী। মানুষ মোরলে তো হামিও মোরলাম। এই একটু ইয়ে করে দেওয়া আর কি। খাঁটি ভয়সা ঘি'উ-এ যদি বুদ্ধু লোকগুলো গাওয়া ঘি'উ-এর গন্ধ চায় হামি কি করতে পারি।

—কিন্তু আগরওয়ালজী—

হামি আপনাকে অফার দিলাম। তিনদিন টাইম দিলাম। আপনি ভাবিয়ে দেখুন বাবুজী !

আমি ঠিক করেছিলাম এই কাজ আমি নেবো না। ইতিমধ্যে অর্চনার সংগে আমার দেখা হয়েছিলো। অর্চনা উদ্বেগাকুল দুই চোখ আমার চোখে রেখে বলেছিলো— সুরজিৎ, একটা কিছু বলো, একটা কিছু করো। বাড়ি থেকে যে আমাকে বড্ড চাপ দিচ্ছে।

অর্চনার সঙ্গে আমার তিন-চার বছরের পরিচয়। পরিচয় থেকেও কিছু বেশি। আমি জানি বাড়ি থেকে তাকে বিয়ের জন্যে খুব চাপ দিচ্ছে। আমি বলেছিলাম—কিন্তু আমার যে পায়ের তলায় এখনও মাটি নেই। এই শূন্যলোকে তোমাকে কোথায় আনবো অর্চনা!

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলাম—তার চেয়ে তুমি বাড়ির লোকের কথায় রাজি হয়ে যাও।

অর্চনার সেই ঢলোঢলো অসম্ভব সুন্দর চোখ দু'টো হঠাৎ কেমন হয়ে উঠেছিলো। মুখের রেখায় কাঠিন্য ফুটেছিলো। চাপা গলায় সে শুধু উচ্চারণ করেছিলো—ইতর!

তিনদিন পর আমি আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করেছিলাম—তোমার এ কাজ আমি নিতে পারবো না। তুমি আমাকে হিসেব রাখার কাজটাই দাও।

আগরওয়াল ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিয়েছিলো—সে কাজে তো দোসরা লোক নেওয়া হোয়ে গেছে।

অন্য লোক নেওয়া হয়ে গেছে!—সেই মুহূর্তে আমার ইচ্ছে করছিলো লোকটার গলাটা দু'হাতে চেপে ধরি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে। তার বদলে চেয়ারের হাতল দু'টোই চেপে ধরেছিলাম। আমি চলে আসবো বলে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো অর্চনার দু'টো প্রশ্নব্যাকুল চোখ। তার সেই ধিক্কার। মনে পড়লো মা-বাবার চোখের ধূসর ছায়া। আত্মীয়-স্বজনের চোখে অবিশ্বাস আর অবজ্ঞার নিস্পৃহ দৃষ্টি। আর তখনই আমি বলে উঠলাম—আগরওয়ালজী, তোমার যা ব্যবসা, ধরা পড়ে গেলে, তোমার সঙ্গে আমাকেও জেল খাটতে হবে। আমি এই কাজ করবো, তবে টাকার অঙ্কটা আরও বাড়িয়ে দিতে হবে।

আগরওয়াল একগাল হেসে বললো—ঠিক আছে বাবুজী, বসুন। বাতচিৎ করে রফা করুন।

কষামাজা করে রফা হয়েছিলো দেড় হাজারে। দেড় হাজার টাকার চাকরি পাওয়াতে মা-বাবার চোখের পুরনো স্বপ্নগুলো আবার নড়েচড়ে উঠলো। অন্যদের চোখ প্রশংসায় ঝকঝক করলো। অর্চনা আমার ঘরে এলো।

পরে আমি জেনেছিলাম আগরওয়ালের ঘিয়ের উপকরণ হিসেবে সাপের চর্বিও বাদ যেতো না। এছাড়াও অনেক কিছু করতো সে। তেল, বেবীফুড ইত্যাদির ফলাও কারবার। আমি নিখুঁত রঙ আর চমৎকার চমৎকার গন্ধ তৈরি করে দি'। আগরওয়ালের মালের চাহিদা বাজারে চড়চড় করে বাড়ে। লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা লোটে। আমার কাজে আগরওয়াল খুব খুশি! তাই সেই মুনাফার কিঞ্চিৎ অংশ আমিও পাই। সেটাও বড় কম নয়। এই দশ বছরে আমার বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে। অর্চনার শরীরে প্রচুর জড়োয়া গয়না উঠেছে। বাঁ হাতের কৌশলে ইনকামট্যাক্স অফিসারদের কব্জা করে রেখেছি।

এখন আমার মা-বাবা বলেন—এ ছেলে আমাদের গৌরব।

আত্মীয়রা বলে—সুরজিতের মতো ছেলে পাওয়া ভাগ্যের কথা।

শ্বশুরবাড়িতে বলে—হীরের টুকরো জামাই।

সবাই বলে—আমরা জানতুম। সকাল-ই দিনের আভাস দেয়। ছেলেটা কেমন চড়চড় করে উপরে উঠে গেলো।

আমি শ্রীসুরজিৎ সেন—আমি উঠছি না নামছি। নামছি। এখন আমি নামছি!

এইমাত্র একটা ফরমুলা আগরওয়ালকে দিয়ে এসেছি। একটা নামকরা কোম্পানির হুবহু অনুকরণে বেবীফুড তৈরি হবে। সেই স্বাদ, সেই রঙ, সেই গন্ধ। ট্রেড মার্কটিও সযত্নে নেওয়া হয়েছে। আসল নকল বোঝে কার সাধ্যি। নামমাত্র খরচে কৌটো তৈরি হবে। তারপর সেই কৌটো বাজারে বিক্রি হবে চার গুণ বেশি দামে। লক্ষ লক্ষ কৌটো। কতো মুনাফা হবে? তার মধ্যে আমার কতো অংশ থাকবে?

এই ফরমুলাটাই আগরওয়ালকে দিয়ে চারতলা থেকে এখন আমি নামছি। নামছি, নামছি। উপরে ওঠার চেয়ে নীচে নামা অনেক সহজ।

নামের আড়ালে

দরজার কড়াটা নড়ে উঠলো। বার বার তিনবার, খট্‌খট্‌ শব্দ করে।

বালিশের উপর চুল এলিয়ে খাটে শুয়েছিলো মাধবী—আধো ঘুম আধো জাগরণে।

শরীরের আঁচল শিথিল। মাথার উপর ফুল স্পিডে পাখা ঘুরছে। গ্রীষ্মের এক অলস দুপুর।

কড়ানাড়ার শব্দে মাধবী উঠলো। চুলটা খোঁপায় জড়িয়ে নিলো। শাড়িটা গুছিয়ে পরে নিয়ে দরজা খুললো। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সমীর। সংগে একজন আগন্তুক।

সমীর বললো—মাধবী, দেখো, কাকে ধরে নিয়ে এসেছি।

মাধমী স্থির দৃষ্টিতে আগন্তুককে দেখলো। সেও তাকিয়ে আছে মাধবীর দিকে।

মাধবী দৃষ্টি সরিয়ে সমীরের মুখের দিকে তাকালো।

আমার অন্তরংগ বন্ধু পরিতোষ দাশ। এর কথা আমার মুখে তুমি হয়তো শুনেছো। আজ বছর তিনেক হয় কোনো সম্পর্কই ছিলো না ওর সংগে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ কোথায় যে নিপাত্তা হয়ে গিয়েছিলো উল্লুকটা। এখন শুনলাম—ও আসাম চলে গিয়েছিলো এবং এখন নাকি সেখানেই ওর কর্মক্ষেত্র। আজ আমাদের অফিসের একজন অফিসার মারা যাওয়াতে অসময়ে অফিস ছুটি হয়ে গেল। এ সময়ে ছুটি হয়েছিলো বলেই ঘটনাচক্রে রাস্তায় নেমে দেখি মূর্তিমান হনহন করে চলেছেন। তবু ডাকতে সাহস হয় না পাছে ভুল লোককে ডেকে বসি।

পরিতোষ মৃদু হাসলো।

কথা বলতে বলতে ওরা ঘরের ভেতর এসে বসেছিলো। সমীর বললো—এই আমার মাধবী, ওর সংগে তো তোর পরিচয় নেই। বিয়ের পর তোকে আর পেলাম কোথায়? তখন থেকেই তো তুই বেপাত্তা।

মাধবী ও পরিতোষ দু'জনেই পরস্পরের প্রতি নমস্কার এবং প্রতি নমস্কারের ভংগি করলো।

সমীর বললো—মাধবী, একটু চায়ের ব্যবস্থা করো। তোমার ভাঁড়ারে কি আছে টাছে বের করে আনো। অতিথির আপ্যায়ন করো।

পরিতোষ বললো—আহা, তোকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমার এক কাপ চা পেলেই চলবে। অসময়ে অন্য কিছু খাবো না।

মাধবী সমীরের দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললো—তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না। ঘরে সব আছে। আমি ব্যবস্থা করছি।

খানিকক্ষণ বাদেই মাধবী ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে এলো দু'জনের মতো চা আর খাবার। হালুয়া, পাঁপর ভাজা, শুকনো আলুভাজা।

ডিসগুলো ওদের সামনে টি-টেবিলের উপর নামিয়ে দিতেই পরিতোষ মৃদুকণ্ঠে বললো—প্রচুর আয়োজন।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তৃপ্তকণ্ঠে সমীর বললো—তা মাধবী নিজেকে সুগৃহিণী বলে দাবি করতে পারে। আমার সংসার বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে রেখেছে।

মাধবীর ঠোঁটের কোণে লাজুক হাসি জাগে।

নির্লিপ্ত গলায় পরিতোষ বলে—আনন্দের কথা।

সমীর ওর দিকে ভ্রূ কুঁচকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে বললো—তুই একদম ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিস।

পরিতোষের মুখের রেখায় একটু হাল্কা হাসি ফুটে ওঠে। সে নীরবে চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

সমীর বললো—বিয়ে-থা তো করিসনি বললি। এবার করবি তো? মেঘে মেঘে কিন্তু অনেকটা বেলা হয়ে গেছে।

—তা হয়েছে। কিন্তু এখনও ঠিক করে কিছু বলতে পারছি না। খুব একটা প্রয়োজন আছে বলেও মনে করি না।

—ওহো, তোর তো আবার কি একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছিলো। তার জের-ই এখনও চালাচ্ছিস নাকি! মাধবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে সমীর বলে—বুঝলে মাধবী, একটা মেয়ে পরিতোষকে প্রায় তিন বছর খেলিয়ে শেষে অন্য ছেলের গলায় লটকে পড়লো। মেয়েটার নামটা যেন কি ছিলো রে? স্বাতী, তাই না? স্বাতী-ই তো?

মাধবীর মুখটা লাল হয়ে উঠলো। সমীরের বলার ভঙ্গিতেই হয়তো।

পরিতোষ আড়চোখে তার মুখের দিকে এক পলক তাকালো। বললো—হ্যাঁ।

—সেই থেকে বন্ধু আমার নিপাত্তা। মনের দুঃখে বনে গেলেন আর কি! আরে, মেয়েটা অন্য ছেলের গলায় ঝুলে পড়েছে, তুইও আর একটা মেয়েকে বিয়ে করে সুখে ঘরসংসার কর, তা নয়, উনি বিবাগী হয়েছেন। কার জন্যে বিবাগী হয়েছিস? একটা বিশ্বাসঘাতক মেয়ের জন্যে?

মাধবীর মুখটা যেন ধীরে ধীরে কেমন হয়ে যাচ্ছে। আরও লাল, আরও অপ্রস্তুত। মেয়ে হয়ে কোনো মেয়ের সম্বন্ধে এমন বিশ্রী মন্তব্য শুনতে খারাপ লাগছে নিশ্চয়।

পরিতোষ চোরা চাউনিতে সেদিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে বললো—ওসব কথা থাক না সমীর।

—তুই কি এখনও সেই মেয়েটাকে মনে রেখে বসে আছিস নাকি! তাকে ভেবে তোর এখনও যন্ত্রণা হয়?

পরিতোষ জবাব দিলো না। নত দৃষ্টিতে নখের আঁচড়ে টেবিলের উপর আঁকিবুকি কাটতে লাগলো।

বন্ধুর হৃদয়ের গোপন বেদনা অনুভব করতে অসুবিধে হলো না সমীরের।

সমীর তো সবই জানে। পরিতোষ মেয়েটি সম্বন্ধে সব কথাই বলতো প্রাণের বন্ধু সমীরকে।

সমীর বললো—জানো মাধবী, পরিতোষ মেয়েটিকে হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসতো। মেয়েটিও নাকি তাকে খুব ভালোবাসতো। অন্ততঃ পরিতোষ তো তাই বলতো। স্বাতী, মানে সেই মেয়েটি নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো সে পরিতোষকেই বিয়ে করবে। শেষ পর্যন্ত নাকি—পরিতোষের কথায়—কি একটা ভুল বোঝাবুঝির ফলে মেয়েটি সরে দাঁড়ায় অন্য ছেলেকে বিয়ে করে।

সে সময়টা ভীষণ ভেঙে পড়েছিলো পরিতোষ। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, চোখ দুটো করমচার মতো লাল। রুক্ষ উস্কোখুস্কো চুল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরিতোষ বলতো স্বাতীকে নাকি বাড়ির লোকেরা জোর করে অন্যত্র বিয়ে দিয়েছে। আমি অবশ্য এ কথা বিশ্বাস করতাম না।

তার পরই পরিতোষ একদিন হাওয়া হয়ে যায়। আমাদের বিয়ের অল্প ক'দিন পরেই।

বন্ধুর প্রতি সহানুভূতিতে সেই অদেখা মেয়েটির উপর রাগ হয় সমীরের। অসহিষ্ণু কণ্ঠে পরিতোষকে বলে—তুইও যেমন। তোকে এতখানি আঘাত দিয়ে গেল, আর তুই এখনও বসে তার নামে মালা জপ করছিস? একদিন গিয়ে দিতে পারিস না ওর সুখের ঘর ভেঙে? আমি হলে এতো সহজে ছাড়তাম না। বাড়ি চড়াও হয়ে দুটো চড় কষিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম—এই খেলার কি প্রয়োজন ছিলো?

পরিতোষ মাধবীর মুখের দিকে এক পলক তাকালো। মুখটা কেমন লাল আর থমথমে। ওর সামনে এই ধরনের আলোচনায় হয়তো সে বিব্রত হচ্ছে।

পরিতোষ বললো—ওসব কথা এখন থাক না সমীর, তোর খবর বল্।

কি আর খবর। আগেও যা এখনও তাই। নতুন খবর শুধু মাধবী। তিন বছর হয় শ্রীমতীর পাণিগ্রহণ করেছি। এবং বেশ সুখে শান্তিতেই ঘর করছি। একটু আগেই পরিচয় পেয়েছিস মাধবী সংগৃহিণী। আর—মাধবী, তুমি শুনো না—বুঝলি পরিতোষ, মাধবী সত্যি বড়ো ভালো মেয়ে। সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমাকে ভালোবাসে, ওর ভালোবাসার আশ্রয়ে আমি জীবনের একটা মহৎ মূল্য খুঁজে পেয়েছি।

মাধবী লজ্জায় বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

সমীর মনে মনে ভাবলো—বাইরের লোকের সামনে মাধবীর মতো সপ্রতিভ মেয়েও কেমন লাজুক হয়ে পড়ে।

সমীর বললো—পরিতোষ, কই রে, তুই মাধবীর সংগে একটা কথাও তো বলছিস না?

—তুই অন্যকে কথা বলতে দিচ্ছিস কোথায়?

—তা ঠিক, আমি সেই থেকে একাই বকে যাচ্ছি। মানে তোর পুরোনো প্রেমের পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটছি।—তারপর বল, মাধবীকে তোর কেমন লাগলো।

—তুই সুখী হয়েছিস জেনে আমি খুশি। আচ্ছা সমীর, এবার আমাকে উঠতে হচ্ছে। একটা দরকারী কাজ রয়েছে। এখনই না উঠলে দেরি হয়ে যাবে।

—আচ্ছা, আয়। তবে কথা দে, একদিন ছুটির বারে আসবি ?

—কথা দিতে পারছি না, তবে চেষ্টা করবো। আচ্ছা, চলি—

মাধবীর দিকে ঈষৎ ফিরে কথাটা বলেই দরজার দিকে পা বাড়ালো পরিতোষ। সমীরও উঠে দাঁড়িয়ে বললো—চল্, আমি তোকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ তুলে ওরা দু'জন নীচে নামতে লাগলো। খোলা দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো মাধবী।

সমীর পরিতোষের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। সে তার প্রাণের কথা সব খুলে বলতো সমীরকে। কিন্তু একটি কথা হয়তো গোপন রেখেছে। কারণ, সমীর পরিতোষের অতীত প্রেমের যে বর্ণনা এইমাত্র দিলো তাতে সেই কথাটি উহ্য থেকে গেছে। সমীর জানে না কিন্তু মাধবী জানে—সেদিন পরিতোষ তার নিজের দেওয়া নামে যে মেয়েটির কানের কাছে 'স্বাতী স্বাতী' বলে মুগ্ধ হৃদয়ে গুনগুন করতো তার নাম আসলে স্বাতী নয়। সেই মেয়েটির প্রকৃত নাম ছিলো মাধবী।

পঙ্কজিনী

পথ চলতে চলতে হঠাৎ গলিটার মোড়ে এসে পড়েছিলো সত্যরঞ্জন, চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়েছিলো। অনেকদিন পর এসেছে এ পথে। এই গলিটার সংগে তার দীর্ঘকাল পরিচয় ছিলো। তার অতীত জীবনের অনেক ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে এই গলিটার সংগে। যাবে নাকি একবার ভেতরে! খোঁজ নিয়ে যাবে এই গলির জগৎ আর জীবন একই রকম রয়েছে নাকি পরিবর্তন ঘটেছে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে পায়ে পায়ে গলির ভেতরে ঢুকে পড়লো সত্যরঞ্জন। পেছন থেকে টিটকিরিও কানে গেল—দ্যাখ্ দ্যাখ্, সন্ধ্যে রাতেই ওখানে ঢুকছে। বয়সের তো গাছ পাথর নেই। তবু চরিত্রটা একবার দ্যাখ্।

বলিহারি প্রবৃত্তি রে বাবা।

এসব কথা ওরা বলতে পারে। বলাই স্বাভাবিক। এই গলিতে তো কেউ ভালো উদ্দেশ্যে ঢোকে না। সত্যরঞ্জনের লক্ষ্য এই গলির শেষ মাথার ঘরটি। যে ঘরে এককালে সুবালা মাসী থাকতো। সত্যরঞ্জন তাকে ঐ বলেই ডাকতো। কি জানি এখন সে এই ঘরে আছে কিনা। কিম্বা পৃথিবীতেই আছে কিনা।

দু'দিকে সারি সারি খোলার ঘর। প্রতিটি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এনামেল-করা-মুখ মেয়ের দল। খদ্দেরের আশায়। সত্যরঞ্জনকে দেখে একটা চঞ্চলতার ঢেউ উঠলো ওদের মধ্যে। তাকে নিশ্চয়ই রাতের অতিথি ভাবলো ওরা।

মাথা নীচু করে পথ হাঁটছিলো সত্যরঞ্জন। সেই আগেকার মতই রয়েছে সব কিছু। সেই খোলার ঘর। তেলে ভাজার দোকান, জংলা প'ড়ো জায়গাটা, ছোট্ট একটা ডোবা। শহরের চারদিকে এতো পরিবর্তন, বস্তি উন্নয়ন—তার এক ঝলক হাওয়াও ভুল করে ঢুকে পড়েনি এই কানা গলিতে।

খুব সামান্য মাইনেতে কাজ করতেন সত্যরঞ্জনের বাবা। এই গলিটা যেখানে ডানদিকে মোড় নিয়েছে সেখানে দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন।

সাধারণতঃ কোনো ভদ্র পরিবার ঐ অঞ্চলে বাস করতো না। কারণটা কি বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। তাই খুব কম ভাড়ায় পাওয়া গিয়েছিলো ঘর দু'খানা। সত্যরঞ্জন তখন স্কুলের উপরের শ্রেণীর ছাত্র। তারপর কলেজের। সে দু'বেলা ঐ রাস্তা দিয়ে দু'সারি ঘরের সমাজ পরিত্যক্ত অবহেলিত বাসিন্দাদের চোখের সামনে দিয়ে বই খাতা হাতে নিয়ে স্কুল কলেজে যেতো। ঐ রাস্তায় আর যারা হাঁটাচলা করতো তাদের থেকে সত্যরঞ্জন স্বতন্ত্র। তার দিকে ঐ গৃহবাসিনীরা কখনও লাস্যের দৃষ্টিতে তাকায় নি। বরং শ্রদ্ধার চোখে তাকাতো। তাদের তল্লাটে কলেজে পড়া ভদ্দর লোকের ছেলে তো ঐ একজনই।

সুবালা মাসীর তখন মধ্য বয়স। আয় কমে গিয়েছিলো বলেই বোধ হয় সাইড বিজনেস হিসেবে মুড়ি ভাজার কাজটা নিয়েছিলো। সত্যরঞ্জন আসতে যেতে দেখতে পেতো এই গলির সবাই সুবালা মাসীর থেকে মুড়ি কেনে।

সেদিন মা মুড়ি কিনতে পাঠিয়েছিলেন সত্যরঞ্জনকে। গলি পেরিয়ে সামনের বড় রাস্তায় মুড়ির দোকান। দূরে যেতে ইচ্ছে হলো না তার। সে সুবালার ঘরে গিয়ে বললো—মাসী আধসের মুড়ি দাও।

প্রথমটায় কেমন হকচকিয়ে গেল সুবালা। তারপর সাদর অভ্যর্থনায় মুখর হলো—এসো বাবা খোকন, এসো বাবা গোপাল। এই যে দিচ্ছি।

ওজনের চাইতে আরও খানিকটা বেশি দিয়ে দিলো। তাকে মুড়ি বেচে সুবালা যেন কৃতার্থ। সেই থেকে সুবালার মুড়িই কিনতো সত্যরঞ্জন। অবশ্য মা যদি জানতে পারতেন সে মুড়ি ঘরে ঢোকাতেন কিনা সন্দেহ।

ক্রমেই সুবালা মাসীর সংগে সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠলো সত্যরঞ্জনের।

একদিন ওপথে যাবার সময় সুবালা ডাকলো—একটু ঘরে এসে বসো না গোপাল!

সত্যরঞ্জন ঘরে ঢুকলো। সুবালা যত্ন করে একটা মোড়ায় বসতে দিলো তাকে। একটু ইতস্ততঃ করে বললো—দ্যাখো বাবা, আমি রোজ গংগা চান করে গোপালের পুজো দিই। আজও ভোগ দিয়েছি। তুমি যদি ঐ ভোগের প্রসাদ একটু খাও আমার মনে হবে গোপাল নিজে গ্রহণ করেছেন। খাবে বাবা একটু?

বেশ তো মাসী দাও না, খাবো।

সুবালা এক থালা প্রসাদ ধরে দিলো সত্যরঞ্জনের সামনে। কিছু কমিয়ে দিতে বললে, কিছুতেই শুনলো না। জোর দিয়ে বললো—এটুকু খেতেই হবে।

সত্যরঞ্জন খেতে লাগলো আর সুবালা চুপ করে মাটিতে বসে রইলো। তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিলো। সুবালা অন্য মেয়েদের বলতো—এই ছেলেটিকে যেন তোরা কখনও পাঁকে টেনে নামাস না। ওরা বলতো—তাই কি হয় মাসী। ও যে এ-পাড়ার একমাত্র আলো। এ আলো কি নিভিয়ে দিতে পারি?

তারপর এক সময় সত্যরঞ্জন চলে গিয়েছিলো শহরের অন্য প্রান্তে। সেই থেকে দেখা-শোনা বন্ধ। এর মধ্যে পনেরো বছর কেটে গেছে।

ভাবতে ভাবতে সেই নির্দিষ্ট ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো সত্যরঞ্জন। ভেজানো দরজায় টোকা দিলো। দরজা খুলে দাঁড়ালো এক বৃদ্ধা। হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয়—এতোদিন পর দেখেও সত্যরঞ্জন চিনলো—সেই সুবালা মাসী।

কে বাবা তুমি?

মাসী, আমি সত্যরঞ্জন।

আমার গোপাল এসেছো—আবেগে কেঁপে উঠলো সুবালার গলা—এসো বাবা, ঘরে এসো। মনে আছে তাহলে মাসীকে?

সত্যরঞ্জনকে কোথায় বসাবে কি করবে যেন ভেবে পাচ্ছে না। আকুল হয়ে অজস্র প্রশ্ন করছে—বিয়ে করেছো বাবা? ছেলেপুলে হয়েছে? ক'টি?

এখন মুড়ি ভাজাই সুবালা মাসীর একমাত্র পেশা। বললো—আমাদের খবর তো কেউ নেয় না গোপাল। তুমি যে এসেছো এ আমার কতো ভাগ্য।

কান্নায় চোখ ভেসে যাচ্ছিলো সুবালার। বললো—সমাজ আমাদের রক্ষা করতে পারে না, কিন্তু শাস্তি দিতে পারে। এই যে ঘরে ঘরে মেয়েরা রয়েছে খোঁজ নিয়ে দেখো অনেকেরই প্রায় একই কাহিনী। খুব কম মেয়েই নিজের ইচ্ছেয় এ পথে আসে বাবা। আসে অসহায় অবস্থায়

পড়ে, নিরুপায় হয়ে। এই আমার কথাই ধরো না। গেরস্থ ঘরের বৌ ছিলাম আমি। রূপ ছিলো। জমিদারের নায়েব জোর করে ঘরের বার করে আনলো। কেউ বাধা দিতে পারলো না। তারপর এই পাঁকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। তখন ফেরার পথ বন্ধ। আমারও তোমার মতো একটি ছেলে ছিলো—থাক্—ওসব কথা আর ভাবি না—

সুবালা মাসী চুপ করলো। কিন্তু সত্যরঞ্জন দেখতে পেলো তার অশ্রু ভেজা নিষ্প্রভ দুই চোখে সেই ভাবনারই ছায়া দুলছে।

পাঁকে বাস করেও সুবালা মাসী যেন পঙ্কজিনী। বাৎসল্যের মধু তার হৃদয়টিকে এখনও পদ্ম করে রেখেছে।

নির্মোক

শিশির বহুদিন যাবৎ পশ্চিমে কাজ করে। দীর্ঘকাল পরে সেবার দু' মাসের ছুটি নিয়ে বাংলা দেশে ফিরে এলো। এসেই খুড়তুতো দাদা অনিলকে বললো—অনিলদা, এবার একটু জোগাড়-যন্ত্র করে সাত পাকটি ঘুরিয়ে দাও দি'নি। বয়স তো চৌত্রিশ হয়ে গেল। বাংলাদেশে যখন একবার এসে পড়েছি তখন ও কাজটি সেরেই যাই। এরপর পাঁচ বচ্ছরেও ছুটি মিলবে না।

অনিল শিশিরের চেয়ে বয়সে মাত্র মাস পাঁচেকের বড়ো। ছেলেবেলা থেকেই দু'জনের গলায় গলায় ভাব। দাদাও বটে, বন্ধুও বটে। দু'জনের মধ্যে সব রকম কথাবার্তাই চলে।

অনিল বললো—ঠিক আছে। আমার ছোটো শ্যালিকাটি তৈরি হয়েই আছেন, দেবো লাগিয়ে। কোনো চিন্তা করিসনে শিশির, যাবার বেলায় বোঝা গলায় ঝুলিয়েই যেতে পারবি।

সেই কথায়ই কথা। মেয়ের মা-বাবা তো শিশিরের মতো পাত্রের সন্ধান পেয়ে হাতে আসমান পেলেন, অনিল সর্বক্ষণ শিশিরের কানের কাছে পাত্রীর গুণ বর্ণনা করতে লাগলো।

একদিন কথায় কথায় পাত্রীর সার্টিফিকেট হিসেবেই অনিল বললো—মেয়ের বয়স কতো অল্প। এই তো সতেরো বছরে সবেমাত্র পড়েছে।

শুনে শিশির আঁতকে উঠলো—বলো কি অনিলদা, মেয়ের বয়স সবে সতেরো? তা'হলে কি করে হয়? আমার বয়স যে এর দ্বিগুণ।

তাতে কি হয়েছে! মেয়েরা সতেরোতেই যথেষ্ট বড়ো হয়ে যায়। কথায় বলে— কুড়িতে বুড়ি—

না না অনিলদা, সে আমার ভারী লজ্জা করে। ছি ছি, বাচ্চা একটা মেয়ে, তুমি অন্ততঃ পঁচিশ ছাব্বিশের মধ্যে মেয়ে দেখ। নইলে আমার সংগে বয়সে মানায় না।

কি যে বলিস শিশির! বরের চেয়ে কনে বয়সে ছোটোই থাকে। এতে ছি ছি'র কি হলো, আর লজ্জারই বা কি হলো। আমি যখন বিয়ে করি তোর বৌদির বয়স তখন পনেরো বছর। কই, প্রেম করতে তো

মোটেই আটকায় নি। জানিস না, বাংলাদেশের মেয়েরা পনেরো বছর বয়সেই তৈরি হয়ে যায়।

শিশিরের বহু ওজর-আপত্তি সত্ত্বেও কোনো ফল হলো না। অনিল তার সতেরো বছরের শ্যালিকাটিকে শিশিরের গলায় ঝুলিয়ে তবে ছাড়লো।

শিশির দু'জনের বয়সের ব্যবধানটা কিছুতেই ভুলতে পারলো না। সব সময় মনে একটু সঙ্কোচ লেগে রইলো। কিন্তু সে লক্ষ্য করলো—সুপ্তি বয়সে যতোটা ছেলেমানুষ, মনে ততোটা ছেলেমানুষ নয়। শিশিরের সংগে তার ব্যবহার লজ্জা বা কুণ্ঠার অপেক্ষা রাখে না। বরং আগ্রহ অথবা বলা যায় আগ্রহের আতিশয্যটাই চোখে পড়ে। শিশির মনে মনে ভাবে—সত্যি দেখছি বাংলা দেশের মেয়েরা বয়সের তুলনায় অনেক এগিয়ে যায়। এক এক সময় একটু বিরক্তিও বোধ করে সুপ্তির পাকামিতে। কি কথাবার্তার ঢং। কি হাবভাব! যেন একটা বাজে উপন্যাসের নায়িকা। বাজে উপন্যাস পড়েও বটে মেয়েটা, শিশির লক্ষ্য করে যেখানে যে বই পায় তাই এনে গোগ্রাসে গেলে। খাদ্যাখাদ্য বিচার নেই। মায় বটতলার উপন্যাস অবধি।

রুচির বিকার শিশির সহ্য করতে পারে না। একদিন বললো—কি সব বাজে বই পড়ো বসে বসে। পড়বে ভালো ভালো বই যাতে মনের ঊর্ধ্বগতি হয়। তা নয়, যতো নিম্নরুচির কদর্য বই।

শিশিরের কণ্ঠের এই তিরস্কারটুকু মোটেই গায়ে মাখলো না সুপ্তি। তির্যক্ কটাক্ষ হেনে বঙ্কিম গ্রীবায় থিয়েটারী ঢংয়ে সুর করে বললো—কেন? তাতে কি হয়েছে প্রিয়তম!

শিশির ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। দু'চোখে বিরক্তি। বললো—ছিঃ, রাতদিন ওই রাবিশ গিলে তুমি একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছো।

বারে! কি হয়েছে! বিয়েটিয়ে হয়ে গেছে। আমি কি এখনও ছেলেমানুষ আছি নাকি?

অকাট্য যুক্তি! শিশির জবাব দিতে পারে না। চুপ করে যায়।

নববিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি মানুষের মন যতোটা ধাবমান হওয়া স্বাভাবিক শিশিরের মনের গতিও সেরূপই ছিলো। সুপ্তি যদি একটু সহজ স্বাভাবিক

ব্যবহার করতো তবে হয়তো শিশিরের পক্ষে তাকে গ্রহণ করা সহজ হতো। কিন্তু স্বপ্তির দিক থেকে প্রেমের আতিশয্য বিশেষ করে প্রেম প্রকাশের স্থূলতা শিশিরের রুচিবান মনটাকে যেন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। তার মনটা এক এক সময় স্বপ্তির প্রতি বিরূপ হয়ে যায়। ভাবে এঁচোড়ে পাকা।

শিশির শান্ত সংযত মার্জিত। স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা কম ছিলো না বটে কিন্তু সে ভালোবাসার উচ্ছ্বসিত প্রকাশ ছিলো না। তাছাড়া নিজের বয়স বেশি বলে তার মনে একটু সঙ্কোচও ছিলো। কি জানি বেশি উচ্ছ্বাস দেখে স্বপ্তি যদি এটাকে বুড়ো বয়সে বিয়ে করার আদেখলেপনা বা আদিখ্যেতা বলে ভাবে! তাই নিজেকে সে একটা সীমানার মধ্যে গুটিয়ে রাখতো। আবার স্বপ্তি হয়তো শিশিরের এই ভাবটাকে তার প্রতি নিস্পৃহতা ভেবে নিজেকে এতোখানি অগ্রসর করে দিতো।

সেদিনটা ছিল ছুটির বার। দুপুরে খাটের উপর কাত হয়ে শুয়ে শিশির একটা বই পড়ছিলো। স্বপ্তি পাশের ঘরে কি সব টুকিটাকি ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত ছিলো। কাজ সারা হলে সে শোবার ঘরে ঢুকলো। শিশির একমনে বই পড়ছিলো। চোখ তুলে তাকালো না। স্বপ্তি ওর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করে বেড়ালো। আঁচলের চাবিটা বার দুই টেনে এনে আবার ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে পিঠে ফেললো। চুড়িগুলো হাতের নাড়াচাড়ায় রিনরিন করে বাজিয়ে দিলো! অনাবশ্যক শব্দ করে টেবিলের ড্রয়ারটাকে টেনে খুললো, আবার বন্ধ করলো। বইয়ের গোছা টেবিলের উপর ঠুকে ঠুকে সমান করে আবার সাজিয়ে রাখলো। ছোটোগলায় বার দুই কাশলো। কিন্তু শিশির অনড়। এই বিচিত্র শব্দলহরী যে তার কানে প্রবেশ করছে তার ভাবভঙ্গী দেখে তা বোঝা গেলো না। অগত্যা স্বপ্তি শিশিরের পিঠের দিক ঘেঁষে খাটের উপর বসে পড়লো। তবু সাড়াশব্দ নেই। স্বপ্তি ধীরে ধীরে একখানা হাত তার কাঁধের উপর রাখলো।

প্রত্যুত্তরে শিশির সেই হাতের উপর নিজের একখানা হাত রাখলো। নিঃশব্দে হাতে হাত রেখে বসে থাকার একটি স্নিগ্ধ মাধুর্যে তার অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠলো। শিশিরের ভালোবাসার প্রকাশ এমনি শান্ত। কিন্তু স্বপ্তি চঞ্চল। সে শিশিরের পিঠের উপর দিয়ে ঝুঁকে তার হাতের বইটা

কেড়ে নিতে চেষ্টা করলো, বললো—বাবা ! বাবা ! যতো দরদ বইয়ের উপর। পাশে যে একটা জলজ্যান্ত বৌ বসে আছে সেদিকে যদি এতোটুকু খেয়াল থাকতো ! বইগুলো যেন আমার সতীন।

শিশিরের মনের সুরটুকু কেটে গেল। একটু কঠিন গলায়ই বললো —আঃ, কি হচ্ছে !

বিচিত্র ভংগীতে দেহলতা হেলিয়ে সুর করে সুপ্তি বললো—কেন ? কি হয়েছে নাথ ? তুমি তো পরপুরুষ নও।

যেন বটতলার উপন্যাস থেকে মুখস্থ করা উক্তি। বিতৃষ্ণায় জ্বলে উঠলো শিশির। বললো—ছি ছি, একেবারে যাচ্ছেতাই। এমন জানলে আমি বাংলাদেশের মেয়েই বিয়ে করতাম না। অন্যদেশের মেয়েরা এর চেয়ে ঢের বেশি সহজ সরল ও মার্জিত হয়।

ধমক খেয়ে মুখ কালো হয়ে গেল সুপ্তির। খাট ছেড়ে উঠে জানালার পাশে দাঁড়ালো। তার দু'চোখ ছাপিয়ে নামলো অশ্রুধারা।

সুপ্তির চোখে জল দেখেই শিশিরের মনে অনুশোচনা এসেছিলো। সুরটা বড় কড়া হয়ে গেছে। ভাষাটা আরও।

সুপ্তি হাপুসনয়নে কাঁদছিলো। ছেলেমানুষের মতো ভংগীতে দু'হাতের উল্টো পিঠে চোখের জল মুছছিলো। চোখের জলে ধুয়ে যেন ওর রূপটাই পালটে গেছিলো। ওর দাঁড়ানোর ভংগীটি, ওর কান্না, হাতের উল্টো পিঠে চোখের জল মোছা সব মিলিয়ে কি যে ছেলেমানুষ মনে হচ্ছিলো সুপ্তিকে। দেখে ভারি মায়া হলো শিশিরের। উঠে গিয়ে আস্তে আস্তে সুপ্তিকে নিজের একান্ত কাছটিতে টেনে আনলো। বললো—সুপ্তি, তুমি এমন ঢংয়ে কথা বলো কেন ?

কাঁদতে কাঁদতে সুপ্তি বললো—জামাইবাবু বলে দিয়েছেন যে !

কোন্ জামাইবাবু !

অনিল জামাইবাবু।

কি বলে দিয়েছেন ?

বলেছেন—তোর মতো মেয়েকে শিশির বিয়েই করতে চায়নি। আমি অনেক বলে কয়ে তবে রাজি করিয়েছি। তুই ন্যাকা সেজে থাকলে কিন্তু চলবে না। তুই যদি ওর সংগে একটু বেশি করে রসিয়ে না কথা বলিস্ তবে সেও তোকে পছন্দ করবে না। তাইতো আমি বই

থেকে ওসব মুখস্থ করে করে· ·নইলে যদি তুমি আমাকে পছন্দ না করো।

বিগলিতস্নেহে কৌতুকহাস্যরঞ্জিত মুখে শিশির সুপ্তিকে বুকের কাছে টেনে নিলো। ওর মাথায় মমতা-কোমল স্পর্শ রাখলো। অনুপস্থিত অনিলের প্রতি মন্তব্য ছুঁড়লো, অনিলদাটা একটা বুদ্ধু। না সুপ্তি, তুমি ওরকম করে আমার সংগে কথা ব'লো না। তার চেয়ে যদি বলো বাঁদর খেলা দেখাও বা সামনের ঐ পেয়ারা গাছটা থেকে দুটো পেয়ারা পেড়ে দাও তাতে আমি বেশি খুশি হবো।

সুপ্তির অশ্রুধৌত মুখখানা হঠাৎ উৎসাহে দীপ্ত হয়ে উঠলো। আগ্রহব্যাকুল অনুনয়ে বললো—দেবে? সত্যি দেবে? ঐ দেখো পেয়ারাগুলো কেমন পেকে রয়েছে। তুমি আবার কী ভাবো সেই ভয়ে কিছু বলি না। দাও না দু'টো পেড়ে।

প্রাণখোলা কৌতুকহাস্যে ঘর ভরিয়ে দিলো শিশির। সুপ্তির হাত ধরে টেনে বললো—চলো তো বাগানে। দেখি একটা আঁকশি জোগাড় করা যায় কি না!

মা

সে ভালো থাকতে চেয়েছিলো, কিন্তু পারেনি। তার ক্রূর কুটিল সমাজ, এই কুটিল সংসার তাকে ভালো থাকতে দেয়নি। হিংস্র শ্বাপদের মতো ফণা তুলে তাকে ছোবলে ছোবলে জর্জরিত করে দিয়েছিলো, তার দু'চোখ থেকে পৃথিবীর আলো কেড়ে নিয়েছিলো।

আমি আমার ঠিকে ঝি কুসুমমালার কথা বলছি।

গায়ের রঙটা ফর্সা, আঁটোসাঁটো শরীরের বাঁধুনি, দেহে ভরা যৌবন, কিন্তু মুখের চেহারা বীভৎস কদাকার, সারামুখে ক্ষতচিহ্ন। নাকটা বাঁকা, এবড়ো খেবড়ো দু'টো ঠোঁট, আর চোখ দু'টো নিশ্চিহ্ন। কপালের উপরে মাথার তালু পর্যন্ত টাকের মত পোড়া দাগ। সেখানে চুলের চিহ্নমাত্র নেই।

কুসুমমালা দু'তিন বাড়িতে বাসনমাজা ঠিকে ঝি-এর কাজ করে। চোখে দেখে না তাই কুসুমমালার একমাত্র সন্তান পুষ্পমালা তাকে হাতে ধরে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যায়। কলতলায় এঁটো বাসনের ডাঁই-এর কাছে বসিয়ে দেয়। হাতে ধরিয়ে দেয় শালপাতা আর ছাই, দৃষ্টিহীন চোখেই কুসুম নিপুণহাতে বাসন মাজে, আর পুষ্প ধুয়ে ধুয়ে সে বাসন ঘরে তোলে।

কুসুমমালার কাহিনী বড় নিষ্ঠুর, বড় করুণ কাহিনী। এমনও একদিন ছিলো যেদিন কুসুম দেখতে রূপসী ছিলো। তার টিকোলো একটি নাক ছিলো। পানের রসে রাঙা পাতলা দু'টি ঠোঁট ছিলো। চুলের অরণ্য ছিলো। আর ছিলো আজকের দৃষ্টিহীন দু'টো চোখের গর্তে ঢলোঢলো মায়ামায়া দু'টি চোখ। সেই কুসুম কি করে আজকের কুসুমে রূপান্তরিত হলো তাই নিয়েই তো এই কাহিনী।

বস্তির মধ্যে একটি খুপরির ঘর নিয়ে বাস করতো সকন্যা কুসুমমালা। বাড়ি বাড়ি ঠিকে ঝি-এর কাজ করে দিন কাটতো। স্বামী একটা কারখানায় মিস্ত্রী ছিলো। অ্যাকসিডেন্ট হয়ে মারা যায়। সেই থেকে কুসুম এই বস্তির বাসিন্দা। যখন এলো মেয়েটার বয়স তখন বছর পাঁচ। আর কুসুমের সর্বাঙ্গে সাতাশ বছরের ভরা যৌবন।

এই রূপযৌবনই হয়ে দাঁড়ালো কুসুমের শত্রু। পাশের ঘরের ভাড়াটে নবীনকৃষ্ণ লোভের দৃষ্টি ফেললো কুসুমের দিকে। বত্রিশ বছরের তাগড়া জোয়ান নিঃসন্তান বিপত্নীক নবীনকৃষ্ণ। যখন-তখন কুসুমের সুখ-সুবিধে দেখতে আসে, সব ব্যাপারে দরদ সহানুভূতি দেখায়।

কুসুম যে কিছু বোঝে না তা নয়। কিন্তু সৌজন্য হারায় না। নবীনকৃষ্ণ দাওয়ায় বসে বসে বিড়ি টানে। কুসুম হয়তো কলাইকরা মগে করে চা-ও এনে দেয়।

বস্তির মধ্যে সরস্বতীর সংগে কুসুমের সবচেয়ে বেশি ভাব। সরস্বতী কুসুমেরই সমবয়সী। মুখ টিপে হেসে বলে—কি রে কুসুমি, আবার যানো বিয়ের ফুল ফোটবো ফোটবো কত্তিছে।

তোর মরণ!—কুসুম ঝঙ্কার দেয়।

তা আমি মরি ক্ষেতি নেই। কিন্তু কথাটা তো মিছে নয়। আর দোষেরই বা কি বল্। তুইও বেধবা সেও বেধবা। মিলবে ভালো।—সরস্বতী খিক্খিক্ করে হাসে।

পোড়ারমুখে হাসি দেখো না!—কুসুম দ্বিগুণ ঝঙ্কার দেয়।

আহা! তোমরা পীরিতের সরবৎ খেতে পারো আর বললেই আমার পোড়ারমুখ হলো, না?

কুসুম এবার গম্ভীর হয়ে বললো—ওসব কথা বলতে নেই সরি, আমি মেয়ের মা।

সরস্বতী থমকে গেলো। পরিহাস ছেড়ে স্বাভাবিক গলায় বললো—তুই কি নবীনকেষ্টর ভাবসাব কিছু বুঝতে পারছিস না?

খুব বুঝি।

তাহলে।

দাঁড়া না, বেবস্থা করছি।

সরস্বতী শঙ্কিতকণ্ঠে বললো—কি বেবস্থা করবি। ওকে বেশি ঘাঁটাস না বাপু। একটু গুণ্ডো মতন মানুষ। কি কত্তে কি করে বসে।

না না, ভয় করিসনে। তবে এমন দাওয়াই দেবো না। দেখিস চেয়ে, আর ট্যাঁ ফোঁ করবার ক্ষ্যামতাটি থাকবে না। হ্যাঁ, আমার নাম হলোগে কুসুমমালা।

সেদিন নবীনকৃষ্ণ ঘরের দোরে তালা দিয়ে কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছে, কুসুম হেঁকে বললো—অ কেষ্টদা, আজ একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরোগো, সন্জেবেলা আমার ঘরে একটু এসো—

নবীনকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে পড়লো—কেন গো কুসুম। কিসের তলব।

এসোই না।

সেদিন ছিলো ভাইফোঁটা। সন্ধ্যেবেলা কুসুমের ঘরে শাঁখের আওয়াজ শুনে সরস্বতী গলা বাড়িয়ে দেখলো পিদিমের সামনে একটা আসনের উপর হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছে নবীনকৃষ্ণ। কুসুম তার কপালে ফোঁটা দিয়ে প্রণামী একখানা ধুতি পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলো। বললো, গড় হইগো কেষ্টদাদা, সারাজনম যেন তোমার বুন হয়ে থাকতে পাই। বেপদে আপদে এই দুঃখী বুনটারে একটু দেখো গো।

ব্যাপারটার আকস্মিকতায় নবীনকৃষ্ণ কেমন হকচকিয়ে গিয়েছিলো। আবেগের সঙ্গে উচ্চারিত কুসুমের কথাগুলি বুঝি তার মনকে স্পর্শ করলো, সে কুসুমের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলো।

পরদিন সরস্বতীর সে কি হাসি! বলে—বাবা! রগড় জানিস বটে তুই! মিনসেকে ধরে একেবারে ভাই ফোঁটার আসনে বসিয়ে দিলি।

কুসুমের মুখেও চাপা হাসি।

সেই থেকে সত্যি বুঝি পরিবর্তন হলো নবীনের। আরও দুইবার ভাইফোঁটার আসনে বসলো। উপদ্রব নেই। শুধু নির্দোষ আন্তরিকতা। কুসুমও প্রতিদান দেয়। ভালোমন্দ এটাওটা, রান্না করে তরকারিটা আশটা ধরে দিয়ে আসে। বলে—আর কতকাল এমনি হাত পুড়ে ভাত খাবে কেষ্টদা। ঘরে একটা ভাজ আনো।

নবীনকৃষ্ণও বলে—তুমার মতো বুন থাকতে চিন্তা কি!

দেখেশুনে হাসতে হাসতে সরস্বতী বলে—তোর মাথা বটে একখানা কুসুমি। ফিকির একখানা বার করলি বটে। মাংসখেকো বাঘকে একেবারে ঘাসখেকো পাঁটা বানিয়ে ছাড়লি। তুই বেটাছেলে হলে নেকাপড়া শিখলে জজ ম্যাজিস্টর হতে পারতিস।

কুসুম গৌরব-উদ্ভাসিত চাপা হাসিতে এই প্রশংসাটুকু উপভোগ করে।

মাঝরাত্তিরে কড়ানাড়ার শব্দ শুনে কুসুম দরজা খুলে দেখে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নবীনকৃষ্ণ।

তুমি এত রাত্তিরে কেষ্টদা।

কুসুম, আমি আর পারছিনে। দিনরাত্তির বুকের ভেতরটা কুরে খাচ্ছে। তুমি কি তা কোনোদিন বোঝবে না কুসুম?

বুঝেছি, আমার কপালে ফের শনি নেগেছে। কিন্তু তুমি এখন যাও কেষ্টদা। ঘরে আমার মেয়ে রয়েছে।

কুসুম শক্ত হাতে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

পরদিন কুসুমের ঘরে এসে নবীনকৃষ্ণ জোর গলায় দাবি জানালো—কুসুম, আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

কুসুম শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলো—আর আমার পুষ্প?

সেও আমার ঘরে আমার মেয়ের মতো থাকবে।

তোমার সঙ্গে তার সম্পর্কোটা কি হবে? সে তোমাকে কি বলবে?

একটু থতমত খেয়ে গেল নবীনকৃষ্ণ। তারপর সব দ্বিধা ঝেড়ে জোর গলায় বললো—বাবা বলবে।

একবার আগল ভেঙে গেলে তারপর আমি তো চোদ্দটা নিকেও করতে পারি। পুষ্প কি তাহলে চোদ্দজনাকেই বাপ বলবে না কি?

নিকে বলছো কেন কুসুম। বিধবার কি বিয়ে হয় না?

হয়। কিন্তু যার ছেলে আছে মেয়ে আছে তার হয় না। হওয়া উচিত নয়। মেয়েছেলে 'ভষ্ট' হলে কতো সোয়ামীই হতে পারে, কিন্তু জন্মদাতা বাপ একজনই হয়। না না আমি পারবো না কেষ্টদা। আমার পুষ্পিকে এমন অপমান আমি করতে পারি না। তার মাথা হেঁট করে দিতে পারি না। আমি যে মা।

কুসুমের কাহিনী আমি কুসুমের মুখেই শুনেছিলাম। যখন নবীনকৃষ্ণর সঙ্গে তার এই কথাগুলি হচ্ছিলো তখন সে কি করছিলো, কোন্ ভাষায় কথা বলছিলো তা আমি জানি না! হয়তো তখন সে মাটি চটকে উনুন নিকোচ্ছিলো বা গোবরের তাল হাতে নিয়ে বেড়ার গায়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘুঁটে দিচ্ছিলো। কিন্তু আমার মনে ভেসে ওঠে এক মহীয়সী মাতৃমূর্তি। খাটের একপ্রান্তে পা ঝুলিয়ে বসেছে। হাত দু'টি কোলের উপর জড়ো করা। সংসারের সব কিছু প্রলোভনের ঊর্ধ্বে

পৃথিবীর নীচতা দীনতা ছাড়িয়ে অন্য লোকে যেন চলে গেছে সে। মাতৃত্বের গৌরবে মুখখানা উদ্ভাসিত। মাথা উঁচু করে সে যেন বলছে—আমি কি নীচে নামতে পারি! আমি যে মা।

কুসুম নবীনকৃষ্ণকে বলেছিলো—বুঝেছি কেষ্টদা, তুমি আর এ বাড়িতে আমারে বাস করতে দেবা না।

অন্য বাড়ি ঠিক করলো কুসুম। এ বাড়ি ছেড়ে উঠে যাবে। ঠেলাগাড়িতে মোটঘাট উঠানো হয়েছে। নিজেও ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। এবার রওয়ানা হবে। এমন সময় নবীনকৃষ্ণ বাইরে থেকে একটা বোতল হাতে করে বাড়িতে ঢুকলো। কুসুমের দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখে নিজের ঘরে গেলো।

কুসুম সরস্বতীকে শেষ বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেছে, হঠাৎ দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো নবীনকৃষ্ণ। তার হাতে একটা কাপ। কুসুমের কাছাকাছি এসে কাপের তরল পদার্থটা ছুঁড়ে মারলো কুসুমের মুখে।

—মারে বাবারে জ্বলে গেল রে।—চীৎকার করে উঠলো কুসুম।

চীৎকার করো উঠলো সরস্বতীও। ছুটোছুটি করে বেরিয়ে এলো সবাই। দেখলো নবীনকৃষ্ণ দৌড়ে পালাচ্ছে! কুসুমের মুখ কালীবর্ণ। মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মাটিতে গড়াচ্ছে কুসুম। কাপটা গড়াচ্ছে কাছেই। একজন জলের ঘটি হাতে নিয়েই ছুটে এসেছিলো। সে এসে ঘটির জলটা ঢেলে দিলো কুসুমের মুখে, ঝাপটা দিতে লাগলো।

ছ'মাস ভুগে বেঁচে উঠলো কুসুম। বেঁচে উঠলো আজকের এই মূর্তি নিয়ে। আর সাত বছরের জন্য জেলে গেল নবীনকৃষ্ণ। সরস্বতী গাঢ়কণ্ঠে বললো—পুষ্পিপ যেন তোর এই মহত্ত্বের মর্যোদা দিতে পারে কুসুম।

সবাই কুসুমকে দেখে আঁৎকে ওঠে। বলে—বাপ্‌! কি কদাকার চেহারা! আমি কিন্তু ওকে ততোটা কুৎসিত দেখি না, মনে হয়—সেই বিকৃত মুখখানাতে তার শুচিশুভ্র স্বর্গীয় মাতৃমনটি যেন ফুটে উঠেছে।

ব্যর্থ বসন্ত

স্কুলের মাস্টারি আর ফুলের বাগান, এই নিয়েই শ্যামলীর জীবন।

স্কুলের সময়টা ছাড়া বাকি সময় ওর কাটে বাগানের পরিচর্যায়, গাছ লাগানো, জল দেওয়া, মাটি খুঁড়ে দেওয়া সবটুকু ওর নিজের হাতে করা চাই। সবরকম পুষ্পসম্ভারেই তার বাগান পূর্ণ থাকে। প্রতি ঋতুতেই তার বাগানে ফুলের মরশুম। বৌদিরা পরিহাস করেন, 'ঠাকুরঝি, ফুলের বাগান তো অনেক সাজালে, এবার জীবনের বাগান সাজাও।' শ্যামলী মৃদুহাস্যে জবাব দেয়, 'তেমন মালী পাচ্ছি কই বৌদি।'

বৌদিরা অবাক্‌বিস্ময়ে গালে হাত দেন, 'বলো কি ঠাকুরঝি! অমন বাগান সাজাতে মালীর অভাব হয় কখনও। কর্মখালির বিজ্ঞাপন দাও। দেখবে লাখো লাখো মালী দরখাস্ত পাঠাবে।'

'সে কি আর জানিনে, কিন্তু ঐ লাখোর ভীড়ে তেমনটিকে খুঁজে বের করাই যে মুশকিল।'

বৌদিরা সাধে বলেন না। জীবনের বাগান সাজাবার সময় যে শ্যামলীর প্রায় পার হয়ে গেলো। তিরিশকে ধরিছুঁই করছে, আর কতো!

শ্যামলীর কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। গরজ তো নেই-ই। একই রুটিনে চলছে সে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। একঘেয়েমির ক্লান্তি কিংবা নিঃসঙ্গজীবনের বেদনা কোনোটাই তাকে কাবু করতে পারেনি।

ভোরে উঠে চান করে। তারপর ভিজে কালো চুলগুলোকে পিঠময় ছড়িয়ে দিয়ে, মৃদু প্রসাধনের ছিটেয় সুরভিত হয়ে বাগানে ঢোকে, নিজের হাতে লাগানো গাছ থেকে নিজের যত্নে ফোটানো এক অঞ্জলি ফুল নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। বড়ো রাস্তাটা পেরিয়ে ডাইনে যে গলিটা গিয়েছে তার শেষ মাথায় রয়েছে স্বামী দেবানন্দের আশ্রম। আশ্রমে আছে রাধামাধবের মন্দির, আর আছে স্বামীজীর কয়েকজন শিষ্য। ফুলের অঞ্জলি নিয়ে শ্যামলী ঐ আশ্রমে প্রবেশ করে, দেবতার পায়ে তা

নিবেদন করে বাড়ি ফিরে আসে। বারান্দায় টেবিলে বসে চা খায়। বাগানের তদারক করে। খেয়ে স্কুলে যায়, ফিরে এসে আবার বাগান। সন্ধ্যায় পড়াশুনা, রাতে ঘুম, এই করেই শ্যামলীর জীবন তিরিশ ছুঁইছুঁই।

বাদলা হোক আর ঝড় হোক, ফুলের অঞ্জলি নিয়ে শ্যামলী মন্দিরে যাবেই। বান্ধবীরা ঠাট্টা করে—

'মলি, রোজ রোজ তুই মন্দিরে গিয়ে কি করিস?'

'দেবতা দর্শন করতে। দেবতার পায়ে ফুলের অঞ্জলি দিতে।'

'আর বরলাভের বরপ্রার্থনা করতে—কি বলিস?'

'না ভাই, বর লাভের আশা নেই। যার কাছে বর প্রার্থনা করবো মনটা যে তাকেই বর করতে চায়। কাজেই সে গুড়ে বালি। বর আর আমার জুটবে না।'

'ওবে বাবা, এযে মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর। স্বয়ং শ্রীমতীর প্রেম, জগৎস্বামী আর জীবনস্বামী একাকার।'

'হ্যা ভাই, দেবতার পায়ে নিজেকে নিবেদন করে বসে আছি, যাঁকে ইহজীবনে পাবার আশা নেই।'

বান্ধবীরা আড়ালে বলাবলি করে, 'মলিটা বদ্ধ পাগল। আজকালকার মেয়েদের অমন ঠাকুর দেবতা বাই থাকে!'

বান্ধবীদের মধ্যে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সুজাতা। সুজাতার বিয়ে হয়েছে। একটি ছেলেও হয়েছে, চরিত্রবান স্বামী আর স্বাস্থ্যবান সন্তান নিয়ে পরিতৃপ্তির সংসার। শ্যামলীর এই নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা তাকে বড় বেশি খোঁচা দেয়। বলে 'আচ্ছা মলি, তুই কি এমনি ছন্নছাড়া হয়েই চিরটা দিন কাটাবি?'

'ছন্নছাড়া কিসে হলো, বেশতো ভদ্রভাবেই আছি।'

'সে কথা বলছিনে। এই যেমন আর পাঁচটা মেয়ের মতো ঘরসংসার করা। মেয়েরা সে আনন্দটাও তো চায়।'

'সে দিকেই বা আমি তোদের চেয়ে কম কিসে! তোরাও যেমন আত্মসমর্পণ করে সুখী হয়েছিস তেমনি—সে আনন্দ থেকে আমিও বঞ্চিত নই সু।'

'নাও ঠ্যালা, সেটা আর এটা এক হলো!'

'বিশ্বাস কর ভাই, আমি যখন তাঁর পায়ে ফুলের অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করি তখন যে আনন্দ পাই, তা তোদের বরের সোহাগের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।'—শ্যামলী মৃদু হাসলো।

সুজাতা কোপ কটাক্ষ করলো, 'তার মর্ম তুই কতো বুঝিস কি না।'

শ্যামলী বললো, 'তৃপ্তি শান্তি এগুলো যদি সুখের উপকরণ হয়, তবে সত্যি বলছি সু, ঐ দুটোতেই তখন আমার বুক ভরে যায়।'

'বুঝতে পারিনে ভাই, পাথরের দেবতা নিয়ে কি করে মানুষের বুক ভরে।'

'দেবতা কি পাথর হয় রে! পাথরের হয় মূর্তি। দেবতা যে অনন্ত জগতের প্রাণপ্রবাহ।'

'থাক বাবা, তোর ঐ ভট্‌চায্যি মার্কা তর্ক রাখ। আর কোনোদিন যদি তোকে এ নিয়ে কিছু বলি।'

শ্যামলী হাসে।

বাবা অনেক চেষ্টাচরিত্র করে একদিন শেষনিঃশ্বাস ফেলেছেন। মা অনেক সাধ্যসাধনা করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। দাদা বৌদিরাও কিছু কম করেন নি। এমন কি কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপর তার কোনো দুর্বলতা আছে কি না, সে খবর জানবার জন্যও কম কারসাজি করা হয়নি। অর্থাৎ শ্যামলীকে সুখী করবার জন্য চেষ্টার কসুর কেউ করেনি। কিন্তু শ্যামলীর গোঁ তাতে ফেরেনি। এমনি করে কথাটা একদিন চাপা পড়ে গেছে।

না পড়বেই বা কেন? তিরিশের পর কি আর ওসব চলে?

শ্যামলীদের সংসারের এবং তার জীবনের চাকাটা একই আবর্তে ঘুরে চললো দীর্ঘকাল, এর মাঝে সামান্য যা একটু বৈচিত্র্যের রং ধরালো—দাদাদের ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ গোটাকয় পাশ করলো, কারও কারও বিয়ে হলো। মা আরও থুত্থুড়ে বুড়ি হলেন। বৌদিদের চুলে রুপালী আভা জাগলো। শ্যামলীরও।

হ্যাঁ, চল্লিশ পেরিয়ে গেছে শ্যামলীর।

এমনি সময়ে ওদের সংসারে জোর ধাক্কা লাগলো। শ্যামলী শয্যা নিলো, রোগটাও যে-সে নয়—টি. বি.। হাসপাতালে যেতে শ্যামলীর বড়ো ভয়, মাও ছাড়তে চান না তাই বাড়িতেই রইলো শ্যামলী। খবর পেয়ে

সুজাতা দেখতে এলো। সুজাতার এখন পরিপূর্ণ সংসার। গিন্নীবান্নি হয়ে গেছে, তবু ছোটো বয়সের বন্ধুত্ব এতোটুকু শিথিল হয়নি।

সুজাতাকে একদিন শ্যামলী বললো, 'সু, মরে যদি যাই আমায় পোড়াসনে, সমাধি দিস।'

সুজাতা অবাক্, 'সে কিরে! সমাধি দেবো কি!'

শ্যামলী মৃদু হাসলো।

'ব্যাপার কি রে। 'আমি মরলে না পোড়াইও'—প্রেমাগুনে পোড়া দেহ নাকি। কোনো মুসলমানকে বুঝি ভালোবেসেছিলি। বলু না ভাই।'

'ভালো একজনকে বেসেছিলাম। তিনি হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীস্টানী—সবার ঊর্ধ্বে। তিনি দেবতা।'

'আমার মতো ক্ষুদ্র জীব তোর ঐ বিরাট প্রেমের মহিমা উপলব্ধি করতে পারবে না মলি। কিন্তু আচ্ছা রগড় জানিস তুই, ওঃ, বলে কি না সমাধি দিস।'

সুজাতা হেসে আকুল, শ্যামলীও।

অসুখের মধ্যেও শ্যামলীর আশ্রমে যাতায়াত বন্ধ হয়নি, দাদা বৌদিরা আপত্তি তুলেছেন। মা বাধা দিলেন, 'আহা থাক্ থাক্ বাধা দিসনে, একটা কিছু নিয়ে তো ওকে দিন কাটাতে হবে।'

সেদিন শ্যামলীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়ালো। খবর পেয়ে সুজাতা দেখতে এলো। শ্যামলী বললো, 'আজ ক'দিন আশ্রমে গিয়ে ফুল দিতে পারিনে রে!'

'বাদ দে ওসব। এতো যে ফুল দিলি, পুজো করলি, তোর হালটা কি হলো শেষ পর্যন্ত? সংসার হলো কিছু?'

সেদিনই রাত্রিবেলা শ্যামলীর মৃত্যু হলো।

শ্যামলীর টেবিলের ড্রয়ারে যে খাতাখানা পাওয়া গেল শ্যামলীর শেষ নির্দেশ অনুযায়ী সেখানা সুজাতা বাড়ি নিয়ে এলো।

সুন্দর অক্ষরে লিখেছে শ্যামলী—একদিন খেয়ালখুশির বশেই স্বামী দেবানন্দের আশ্রমে বেড়াতে গিয়েছিলাম, মন্দিরে গিয়ে দেবতার চাইতে দেবতার পূজারীই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো বেশি, একি দীপ্ত বহ্নির মত উজ্জ্বল রূপ! গেরুয়ামণ্ডিত শুচিস্মিত দেহ-লাবণ্য,

প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো সুন্দর পবিত্র মুখকান্তি। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। প্রাণের উদ্যত প্রণাম দেবতার পায়ে না দিয়ে পূজারীর পায়েই ঢেলে দিলাম। ধ্যাননিমীলিত চক্ষু উন্মীলন হলো, শান্ত সুন্দর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি মৃদু হাসলেন, মনটা আমার সেদিনই বিকিয়ে গেল। যেন একটা নেশা, কিন্তু শুধু শুধু তো যাওয়া যায় না। তাই পরদিন থেকে শুরু হলো আমার ফুল নিয়ে আশ্রমে যাওয়া। বাগান করার নেশা বরাবরই ছিলো। তখন থেকে আরও বাড়লো। নিজের যত্নে ফোটানো ফুলে দেবতার পায়ে অর্ঘ্য দিতে যে কি আনন্দ! তবে আমার দেবতা পাথরের বিগ্রহ ছিলো না। দেবতার পূজারীই আমার দেবতাব স্থান অধিকার করেছিলো। ভালোবাসাকে প্রথমে ঊর্ধ্বস্তরে ভক্তির সংজ্ঞাতেই রাখতে চেয়েছিলাম। একদিন দেখলাম মিছেই মনকে চোখঠারা, একটি সলজ্জ কোমল-মধুর ভালোবাসা আমার বুকের কানায় কানায় টলটল করছে। কিন্তু কারও কাছে প্রকাশ করার উপায় নেই। এমন কি যাঁকে ভালোবাসি তাঁর কাছেও না। ভালোবাসার চোরা বালিতে আমি ক্রমশঃ তলিয়ে যেতে লাগলাম। গভীর থেকে আরও গভীরে।

প্রতিদিন নিবেদিত পুষ্পাঞ্জলির অর্থ তিনি কি করেছিলেন জানি না, তবে দুটি ক্ষমাসুন্দর চোখের দৃষ্টিতে প্রসন্ন হাস্যে তিনি আমায় যে অভিনন্দন জানাতেন, তাতেই আমি ধন্য হয়ে যেতাম। তাই আমি শুধু ফুলের বাগানই সাজালাম, জীবনের বাগান সাজানো আর আমার হলো না। সবাই জানলো, আমি দেবতার পায়ে আত্মসমর্পণ করেছি। কেউ জানলো না, অত ঊর্ধ্বে ওঠার যোগ্যতা আমার নেই। আমি দেবতার এক পূজারীর পায়ে আত্মনিবেদন করে বসে আছি। আমার এ অসুখটা কি জানিস সু? দু' বছর আগে স্বামী দেবানন্দ দেহরক্ষা করলেন। চাপা শোকের কীট আমার হৃৎপিণ্ডটাকে কুরে কুরে খেতে লাগলো। এই যে আমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে এ তো অন্য কোনো অসুখ নয়, এ যে রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে রক্তক্ষরণ!

প্রতিদিন আশ্রমে গিয়ে তাঁর সমাধির উপর ফুল ছড়িয়ে দিয়ে আসতাম। সঙ্গে দু' ফোঁটা অশ্রুর অর্ঘ্য। শুধু আজ ক'দিন হলো তা বাদ পড়েছে, আর পেরে উঠি না। একদিন তোকে বলেছিলাম, 'আমায়

সমাধি দিস'। শুনে তুই হেসেছিলি, কথাটা কিন্তু নিছক ঠাট্টা নয়। মনের কোনো গোপন ইচ্ছার এক-আধটা স্ফুলিঙ্গ কোনো আবেগের মুহূর্তে হঠাৎ বেরিয়ে যায়। তবে একটা অনুরোধ তোকে সু, আমার ফুলগাছগুলোতে যে কয়দিন ফুল ফোটে তুই তাঁর সমাধির ওপর ছড়িয়ে দিস ভাই। ফুলগুলো যে আমি সেজন্যেই ফুটিয়ে তুলেছি।

পড়া শেষ হলে সুজাতার দু চোখ বেয়ে দু ফোঁটা জল ঝরে পড়লো। একটা দীর্ঘশ্বাস বুক কাঁপিয়ে উঠে বাতাসে মিলিয়ে গেলো।

সুজাতা শ্যামলীর কথা রেখেছে। রোজই শ্যামলীর বাগানের ফুল নিয়ে স্বামী দেবানন্দর সমাধির ওপর ছড়িয়ে দিয়ে আসে, তবে আর খুব বেশিদিন বোধহয় দিতে হবে না। কারণ বাগানের ফুল প্রায় শেষ। গাছগুলোও শুকিয়ে এসেছে। তেমন যত্ন তো আর করে না কেউ।

নববাণী।

নকল মুক্তোর মালা

আমাদের বাড়ির গায়েই চক্রবর্তীদের নতুন বাড়িটা উঠেছে। চক্রবর্তী দম্পতি আগে শ্যামবাজারের ওদিকে কোথায় যেন থাকতেন। বছর পাঁচেক হয় নতুন বাড়িতে চলে এসেছেন। সম্পন্ন অভিজাত ঘষামাজা। রূপে গুণে উচ্চশিক্ষায় ওঁরা একেবারে রাজজোটক। চেয়ে দেখার মতো দম্পতি।

ওঁরা নিঃসন্তান। শহরের যাবতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যুক্ত। পাড়ার ছোটো বড়ো সবার সঙ্গেই এতো সুন্দর মার্জিত আর সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার যে, সবাই তাতে মুগ্ধ। তাঁদের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলেও যেন শান্তি। তাঁদের চারিদিকে এমন একটা মাধুর্যের হাওয়া বইতে থাকে যে কিছুক্ষণ কাছে বসলে মন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। এজন্য পাড়ার সবাই চক্রবর্তী দম্পতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

বিশেষ করে মিসেস চক্রবর্তী। নারী—এই দু'টি অক্ষর মানে যে লাবণ্যের ঢেউ, অপরূপ কমনীয়তা, সৌন্দর্য আর মাধুর্যের, নম্রতা আর অন্তরৈশ্বর্যের মিশ্রণ—তিনি যেন তার মূর্ত প্রতীক। এমন নরম গলায় কথা বলেন, এমন ধীর পায়ে চলেন—দেখলেই মানুষের মন আপনা থেকেই পুজোর অঞ্জলি হয়ে যায়, শ্রদ্ধায় টলমল করে ওঠে।

আসতে যেতে স্মিত হাসিতে অন্তরের ঐশ্বর্য ছড়িয়ে চলেন ওঁরা। দেখা হলেই দু'টি চারটি কথা, দু'বিন্দু প্রীতির মুক্তো উপহার দেন সবাইকে।

আমি অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত এক ভদ্র সন্তান। স্ত্রী, পাঁচ ছ'টি পুত্র কন্যা নিয়ে কষে সংসার করছি। বলতে বাধা নেই, সংসারের ঘানি ঠেলে ঠেলে মেজাজটা আর আমার তেমন মোলায়েম নেই। গৃহিণী ততোধিক। আমি যদি পঞ্চমে সুর তুলি তিনি তোলেন সপ্তমে। সংসারে সর্বক্ষণ একখানা ভাঙ্গা কাঁসার বাসন কর্কশ শব্দে বেজেই চলেছে।

আমি গৃহিণীকে বলি—জানো তো সারাক্ষণ শুধু চেল্লাতে। চোখের সামনে মিসেস চক্রবর্তীকে দেখেও কি শিখতে পারো না? আদর্শ

মহিলা, মূর্তিমতী ভাগ্যলক্ষ্মী। তাই আজ মিঃ চক্রবর্তীর সংসারে লক্ষ্মীর প্রসন্ন আশীর্বাদ উপচে পড়ছে। আমার সংসারে লক্ষ্মীর কৃপা হবে কি করে? যে সংসারে মেয়েছেলের গলার দাপটে বাড়িতে কাক চিল বসতে পারে না, সেখানে লক্ষ্মী তো পালাই পালাই করবেনই।

গৃহিণী সরোষে এবং সর্বাঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে বলেন—শুধু এক দিকটাই দেখছো কেন? অন্য দিকটাও দেখো। চক্রবর্তীবাবুর গলার পর্দার সঙ্গে তোমার গলার পর্দাও পাল্লা বাটখারায় চাপাও না। দেখি, পাল্লা ঠিক আছে কি না?

আমি রেগে গিয়ে জবাব দিই। উত্তরে গৃহিণী আরও রেগে জবাব দেন।

আবহাওয়া ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

দু' একদিন আমি তাঁদের বাড়িতেও বেড়াতে গেছি। দেখেছি—স্বামী স্ত্রী পরস্পরের প্রতি কি গভীরভাবে অনুরক্ত আর শ্রদ্ধাশীল। আমি যেতেই মিঃ চক্রবর্তী আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। মিসেসের উদ্দেশে বলেছেন—বিজনবাবুকে চা দাও মালিনী। সেইসঙ্গে আমাকেও এক কাপ দিও।

মিসেস চক্রবর্তী স্মিত আননে নরম গলায় বলেছেন—তুমি না এক্ষুণি এক কাপ খেলে। তোমার বেশি চা খাওয়া ডাক্তারের বারণ।

একটু হেসে মিঃ চক্রবর্তী বলেছেন—তবে না হয় হাফ কাপই দাও—প্লিজ—

মিসেস হেসে বলেছেন—এক ঝিনুকও নয়। তোমাকে বরং ঝোর্নভিটা দিয়ে এক কাপ দুধ দিই। কিছু হলে তো আবার ভুগতে হবে।

মিঃ চক্রবর্তী গাঢ়কণ্ঠে বলেছেন—আচ্ছা দাও, তাই দাও। আমার কিছু হলে আমার চেয়েও দুর্ভোগ অবশ্য তোমাকেই বেশি পোহাতে হয়। সেকথা আমি জানি মালিনী। তাই তো তোমার কথা যথাসম্ভব মেনে চলতে চেষ্টা করি।

মিসেস বাধা দিয়ে বলেছেন—থাক থাক ওসব কথা। আচ্ছা, তোমরা বসো। আমি ভেতরে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে আসছি।

বলে নম্র পদক্ষেপে যেন লক্ষ্মীর পায়ের আলপনা এঁকে এঁকে মিসেস বেরিয়ে গেলেন। স্বামী স্ত্রীর সংলাপের মধ্যে দিয়ে ঘরের

হাওয়ায় কেমন একটা মাধুর্য ছড়িয়ে পড়ছিলো। আমি নিঃশব্দে তা অনুভব করছিলাম। কি সুন্দর এঁদের দাম্পত্য জীবন! আর আমাদের! হুঃ—

সেদিন রাত্রিবেলা একটা তুচ্ছ কারণ নিয়ে গৃহিণীর সঙ্গে খুব একচোট হয়ে গেল। সারাদিন খেটেখুটে রাত্রিবেলা একটু ঘুমোবো—তা নয়—তখন যতো অভাব-অভিযোগের ফিরিস্তি। এতো মুখস্থও থাকে! বলেছিলাম—এখন একটু থামো তো। ঘুমোতে দাও। রাত দুপুরে ঘ্যানোর ঘ্যানোর ভালো লাগে না।

গৃহিণী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—তাহলে কখন সময় হবে?

কেন, আমি কি শেষ ঘুম ঘুমোচ্ছি যে কাল সকালে আর উঠবো না?

আমার যে তখন মরণেরও সময় থাকে না। ক'টা ঝি-চাকর রেখে দিয়েছো যে সকালবেলা পাটি বিছিয়ে তোমার সঙ্গে গপ্পো করতে বসবো।

নাঃ, ঘরে ঘুম হবে না। পাটি বালিশ নিয়ে চললাম ছাদে। খোলা হাওয়ায় একটু শুয়ে থাকিগে। এমন মানুষ নিয়ে ঘর করছি যে এতোটুকু সুখদুঃখ বোঝে না!

গৃহিণী বললেন—এই রাত বারোটায় কোথায় চললে?

ছাদে। ভয় নেই। লাফিয়ে পড়ে মরবো না, হাড় মাস যাতে আরও কিছুদিন চিবিয়ে খেতে পারো সেজন্য সকালবেলা সশরীরে নেমে আসবো।

খোলা হাওয়ায় খানিকক্ষণ শুয়ে থাকতে চোখটা জুড়ে এসেছিলো। হঠাৎ মাঝরাতে ঘুমটা ভেঙে গেলো। আকাশে মেঘ, মনে হয় বৃষ্টি হবে। এবার নীচে যাওয়া যাক।

উঠে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো চক্রবর্তী দম্পতির ঘরের জানালায় পর্দার ফাঁকে আলোর-রেখা। হঠাৎ হাওয়ায় পর্দাটা নৌকোর পালের মত ফুলে উঠতেই যে দৃশ্য চোখে পড়লো তাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। পাঁচিল ঘেঁষে রুদ্ধনিশ্বাসে দাঁড়ালুম। দেখলুম—মিঃ চক্রবর্তী একটা চাবুক নিয়ে মিসেসকে সপাত্ করে এক ঘা কষিয়ে দিলেন, আর মিসেসের সে কি চেহারা! গায়ের কাপড় অসম্বৃত ক্রুদ্ধা-সর্পিণীর মত ফুঁসছে।

কোথায় তাঁর সেই স্নিগ্ধ শ্রী! রাত নিশুতি বলেই বোধহয় অতোটা দূর থেকেও কথাগুলি ভেসে এলো কানে—'আমি কি জানি না তুমি দুপুর রাত অবধি কোথায় ঘুরে বেড়াও? কার কার সঙ্গে কাটাও?'

'আর তুমি? তুমি রোজ ঐ মণিমালা মেয়েটার ঘরে যাও না!'

'হ্যাঁ যাই। জানি, আমার ঘরে যে স্ত্রী আছে সে পাঁচজনের উচ্ছিষ্ট, তাই মণিমালার ঘরে গিয়ে আমাকে শান্তি খুঁজতে হয়।'

'ইস্! ঐ মণিমালা একেবারে ধোয়া তুলসী পাতা কি না! সতীলক্ষ্মী, তাই না!'

'না, ঠিক ততোটা নয়। তবে সে আমার কাছে তোমার চেয়ে বেশি বিশ্বস্ত। কিছুদিন আগে আগরওয়ালাব সঙ্গে পনেরো দিন পুরী কাটিয়ে এলে—'

'কেন যাব না। আগরওয়ালা আমাকে তোমার মতো চাবুক মারে না, আমার দু'পায়ে সে কুবেরের ঐশ্বর্য ঢেলে দিতে চায়—'

আমি হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম, এ কি শুনছি! অথচ কিছুদিন আগে মিঃ চক্রবর্তীকে বলতে শুনেছি স্বাস্থ্যের জন্য স্ত্রীকে নাকি পুরী পাঠিয়েছেন তিনি। এতো সৌন্দর্য এতো মাধুর্য—এই তার স্বরূপ। ওঁদের দিকে তাকিয়ে কেউ কল্পনা করতে পারবে যে দু'জনের ভেতর দু'টো কুটিল বিষাক্ত সাপ সর্বক্ষণ হিস হিস করছে! ওঃ, এত পাপ লুকিয়ে আছে এঁদের দু'জনের মধ্যে!

এই মাঝরাতে তারাভরা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আবার নতুন করে ভাবলাম গৃহিণীকে। জীবনযন্ত্রণার আঘাতে আঘাতে মাঝে মাঝে বেসুরো বাজে বটে কিন্তু সতীলক্ষ্মী আজও আমার সংসারের পুণ্যের প্রদীপশিখাটিকে অনির্বাণ রেখেছে। তার দু'টি শীর্ণ হাতের ছোঁয়ায় আজও আমার দারিদ্র্যের সংসারে কতো শ্রী। এই যে এতো তিরিক্ষি মেজাজ কিন্তু আমার একটু অসুখবিসুখ হলে দেখেছি তার নাওয়া খাওয়া ঘুচে যায়। কতোবার যে পুজোর আশীর্বাদী ফুল এনে আমার কপালে ঠেকায় তার ইয়ত্তা নেই। জন্মজন্মান্তর যেন তার মতো সঙ্গিনীই পাই।

ঐ মিসেস চক্রবর্তীর সঙ্গে কতোদিন তার তুলনা করে তাকে

ছোটো করেছি ভেবে মনে মনে তার কাছে আজ ক্ষমা চাইলাম, কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা? পুজোর প্রসাদের সঙ্গে মদের গেলাসের! কীর্তনের ভাবাবেগের সঙ্গে মাতালের মাতলামির! মাথায় থাক আমার নকল মুক্তোর মালার জেল্লা, মিহিসুরের ইন্দ্রজাল।

আমার ঘরের ভাঙা কাংস্যপাত্রটি চিরদিন ঝন ঝন শব্দে বাজতে থাকুক।

এ দেশের মেয়ে ॥

সময়ের হাত

পুজোর ছুটিতে গিরিডি যাচ্ছিলেন বিশ্বরঞ্জন বসু। বিশ্বরঞ্জন একজন নামকরা সাহিত্যিক, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর নাম প্রথম সারিতেই প্রতিষ্ঠিত।

ট্রেন চলেছে। রাস্তায় সময় কাটাবার জন্য বিশ্বরঞ্জন একখানা বহুল প্রচারিত সাহিত্যপত্রিকার শারদীয় সংখ্যা সঙ্গে নিয়েছিলেন। এতে বিশ্বরঞ্জনেরও একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রতিটি রচনার শীর্ষদেশে রচনা-লেখকের ছবি মুদ্রিত ছিলো। বিশ্বরঞ্জনের ছবিও ছিলো।

বিশ্বরঞ্জন ম্যাগাজিনখানায় খানিকক্ষণ চোখ বুলিয়ে পাশে রাখতেই তাঁর সামনের সিটে বসা ভদ্রমহিলাটি হাত বাড়িয়ে একটু হেসে বললেন—বইখানা একবার দেখতে পারি ?

বিশ্বরঞ্জন বললেন—নিশ্চয়।

মহিলা বইখানা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছেন। বিশ্বরঞ্জন আড়চোখে তাকে লক্ষ্য করলেন। মাঝবয়সী মহিলা। ফর্সা রঙ, সুশ্রী চেহারা, মানানসই মতো গোলগাল। চেহারায় পোশাকে সম্ভ্রান্ত ঘরের ছাপ। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বিশ্বরঞ্জনের গল্পের পাতায় এসে থমকে গেলেন মহিলা। ভ্রু-কুঞ্চিত করে একবার বইয়ের পাতায় ছবির দিকে আর একবার বিশ্বরঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছবিতে মানুষে মেলালেন বুঝি। তারপর আগ্রহ ভরে গল্পটি পড়তে লাগলেন। আড়চোখে সবকিছু লক্ষ্য করলেন বিশ্বরঞ্জন।

কিছুক্ষণ বাদে মহিলার প্রশ্ন—আপনি কি গল্পলেখক বিশ্বরঞ্জন বসু ?

স্মিতমুখে বিশ্বরঞ্জন বললেন—হ্যাঁ।

আচ্ছা, আপনার এই গল্পটা কি পুরোটাই কল্পনা না বাস্তব কোনো ঘটনার সংগে এর কোনো যোগ আছে ?

বিশ্বরঞ্জন একটু গম্ভীর হলেন, বললেন—এই গল্পটি বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

মহিলাটি একটু চুপ করে থেকে বললেন—যদি কিছু মনে না করেন

তা হলে জিজ্ঞাসা করি—মানে—হয়তো অনধিকার চর্চা হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু আমি কখনও কোনো লেখককে মুখোমুখি দেখিনি তাই খুব কৌতূহল হচ্ছে।

বিশ্বরঞ্জন হেসে বললেন—কি জানতে চান আপনি? অসংকোচে বলতে পারেন।

গল্পের নায়ক তো দেখছি নিজের কথা নিজে বলছেন। এই 'আমি' কি আপনি? এটা আপনার নিজের জীবনের ঘটনা?

ধরে নিতে পারেন তাই।

লিখেছেন—মেয়েটির সঙ্গে আপনার পরিচয় যখন নিবিড় তখন দৈবক্রমে আপনারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কোনো একটি কথা তাকে বলা হয়ে ওঠে নি। সেই কথাটি বলার জন্য আপনি আর একবার তার সাক্ষাৎ চান। অপেক্ষা করে আছেন যদি কখনও কোথাও দেখা হয়ে যায়।

ঠিক তাই। তার সঙ্গে যেদিন আমার শেষ দেখা হয় তার পরদিন তাকে আমার একটা কথা বলার ছিলো। কিন্তু সেই দিনই হঠাৎ একটা পারিবারিক বিপর্যয় ঘটে গেলো। যার ফলে আমি বেশ কিছুদিন তার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। তারপর যখন তার খোঁজ করতে গেলাম আর কোনো সন্ধান পেলাম না। সে আমার জীবন থেকে একেবারে হারিয়ে গেলো। সে নিশ্চয় আমাকে ভুল বুঝে বসে আছে। তার এই ভুল ধারণাটা আমি ভেঙে দিতে চাই।

কিন্তু সে তো অনেকদিন আগেকার কথা। ধরুন, যদি তার সঙ্গে কোথাও দেখা হয়ে যায়, আপনি হয়তো চিনতেই পারবেন না।

বিশ্বরঞ্জনবাবু একটু হাসলেন। বললেন—সে প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা বটে। কিন্তু আমি তাকে দেখলেই চিনতে পারবো। আমি তাকে এতোটুকু ভুলি নি। তার চেহারাটি এখনও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে আমার মনে।

বিশ্বরঞ্জন জানালার বাইরে দৃষ্টি ফেলে যেন আত্মমগ্ন হয়ে গেলেন।

একটু পরে বিশ্বরঞ্জনের হাতে বইখানি ফিরিয়ে দিয়ে মহিলা বললেন—খুব আনন্দ হলো আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে। সামনের স্টেশনেই আমরা নামবো।

ট্রেন স্টেশনে দাঁড়াতেই তাঁকে নমস্কার করে অন্যান্য সংগীসহ মহিলা নেমে গেলেন।

বিশ্বরঞ্জন অন্যমনস্কভাবে বইটা নাড়াচাড়া করছিলেন। হঠাৎ নজরে পড়লো ছোট্ট এক টুকরো ভাঁজকরা কাগজ। কৌতূহলের সংগে খুলে দেখলেন তাতে লেখা আছে—রঞ্জন, আমি তো এতোক্ষণ তোমার সামনে বসেছিলুম। কতো কথা বললুম। কই, তুমি তো আমায় চিনতে পারলে না।—মল্লিকা।

বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো লাফিয়ে উঠলেন বিশ্বরঞ্জন। ভিড় ঠেলে একে মাড়িয়ে, ওকে ধাক্কা মেরে সবার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে ছুটে গেলেন ট্রেনের দরজায়। গলা বাড়িয়ে যতোটা সম্ভব ঝুঁকে দেখলেন—না, ট্রেন তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। স্টেশন পড়ে রয়েছে অনেক পেছনে।

সময়ের হাত যে তাঁর জীবনের উজ্জ্বল একটা ছবিকে এতোটা ধূসর করে দিয়েছে এর আগে তা ভাবতেই পারেন নি বিশ্বরঞ্জন।

মরীচিকা

অসহ্য বিস্ময়ে বোবা দৃষ্টি মেলে সুধাময়ী পুত্রবধূ জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কি বলছে ও? অনেক সাধ করে মাত্র কয়েক বছর আগে লক্ষ্মীর মত রূপ দেখে যে মেয়েটিকে অভির বৌ করে ঘরে এনেছেন তার মুখে এ কি কথা শুনছেন তিনি? ঐ সুন্দর মুখ থেকে এমন অরুচিকর কথা বেরোতে পারে, এ যেন ভাবতে পারেন না সুধাময়ী। আর এসব কথা জানলো কি ক'রে মেয়েটা। নিশ্চয় তারই পুত্র অভিমন্যুর কাছ থেকে শুনেছে। তাঁর ছেলে অভিমন্যু, যে অভিকে মাত্র—

দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন সুধাময়ী—ক্ষোভে ধিক্কারে। পুত্রের উপর নয়, পুত্রবধূর উপর নয়—নিজের ভাগ্যের উপর, এই দুনিয়ার উপর। আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, তারপর শিথিল পায়ে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানার উপর বসলেন।

মুহূর্তে মন উধাও হয়ে গেল ষাট বছর আগেকার এক ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। একটি তেরো বছরের ভীরু কিশোরী লজ্জানত চক্ষে দুরু দুরু বক্ষে বাইশ বছরের এক তরুণের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিচ্ছে। লজ্জায় ভারী দু'টো চোখের পাতা জোর করে তুলে শুভদৃষ্টি বিনিময় করছে। শুধু মনে পড়ে—সেদিন তরুণ মুখখানি বেশ হাসি হাসি মনে হয়েছিলো সুধাময়ীর। কিন্তু অনেকদিন সে মুখ আর মনে করতে পারেন না তিনি। কবে ঝাপ্‌সা হয়ে হারিয়ে গেছে। একখানা ফটোও নেই যা দেখে মনে পড়তে পারে।

সুধাময়ী সবে পনেরোয় পা দিয়েছেন। সেই সময় মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে স্বামী অবিনাশ বিয়ের দেড় বছর পরে টাইফয়েড-এ মারা যান। কি যে হয়ে গেল প্রথমে যেন কিছু বুঝতেই পারেননি সুধাময়ী, হতচকিত হয়ে গেছেন। সর্বনাশ ও শোকের পরিমাণটা পরে উপলব্ধি করেছেন দিনে দিনে তিলে তিলে।

মাত্র পনেরো বছর বয়সে সৌভাগ্যের সবটুকু রক্তিমা ললাট থেকে

নিঃশেষে মুছে ফেলে পিত্রালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন সুধাময়ী, অভিমন্যু তখন সুধাময়ীর দেহে অঙ্কুরমাত্র।

সুধাময়ীর এই ভাগ্যবিপর্যয়ে বাড়ির সবাই মুষড়ে পড়লো। পিতা ছিলেন উদারপন্থী। বললেন, ঐ একটু চিহ্ন রেখে গেছে তাই। নইলে আবার আমি বিয়ে দিতাম সুধার।

অভিমন্যুর জন্ম হলে এই শিশুটিকে বুকে আঁকড়ে দিন কাটাতে লাগলেন সুধাময়ী। সুধাময়ীর বিয়ের সময় তার একমাত্র দাদা কমলাক্ষ বিলেতে অধ্যয়নরত ছিলেন, এবার দেশে ফিরে তিনি তার বিলেত দেখা দৃষ্টিভঙ্গিতে বললেন তেরো বছর বয়সে একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কোনো মানে হয়! আর পনেরো বছর বয়সে তাকে বিধবা বানিয়ে রাখা! এই দেশটার 'মানুষ' হতে এখনও কয়েক যুগ লাগবে। সুধার বিয়ে আবার দিতেই হবে।

সুধাময়ীর কানে সবই যেতো! অভিকে সজোরে বুকে চেপে ধরে নীরব কান্নায় ভেঙে পড়তেন সুধাময়ী—ছি ছি, ওরা কি বলে! সুধার কোলে রয়েছে যে সন্তান।

কিন্তু নাটক জমে উঠলো আরও পরে। বিলেতে পরিচিত দাদার বন্ধু জ্যোতির্ময় দত্ত ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, ক্রমেই তিনি এই পরিবারের সবার সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। সুধাময়ীকে নিয়েও জ্যোতির্ময় কমলাক্ষর সঙ্গে আলোচনা করতেন যে একটা সুন্দর সতেজ জীবনকে শৈশবেই পঙ্গু করে দেওয়া শুধু অনুচিত নয়, অপরাধও বটে।

কমলাক্ষর নিজেরও তাই মত। কিন্তু কিছু করার উপায় ছিলো না। তাই চুপ করে থাকতেন।

জ্যোতির্ময়ের অন্দরেও অবাধগতি ছিলো। তিনি এক গ্লাস জল বা এক কাপ চায়ের ফরমাস করে সুধাময়ীকে তার আড়ষ্টতার খোলস থেকে বের করে আনতে চাইতেন। সহজ স্বাভাবিক করে তুলতে চাইতেন মেলামেশার মধ্য দিয়ে। একদিন জ্যোতির্ময় কমলাক্ষকে স্পষ্ট ভাবেই বললেন—কমলাক্ষ, সুধার জীবনটা তোমরা এভাবে নষ্ট ক'রে দিও না। তার আবার বিয়ে দাও।

সবই তো বুঝি জ্যোতি, হিন্দু সমাজ বড়ো কঠোর। তাছাড়া, ওর

যে একটি সন্তান আছে, ওকে বিয়ে করবে কে ?

জোর গলায় জ্যোতির্ময় বললেন—আমি করবো।

কিন্তু ঐ ছেলে ?

ঐ ছেলেকে আমি নিজের বলে গ্রহণ করবো।

শুধু সমাজ নয় রে ভাই, সুধার মনটাও জানি। জানিনা ও রাজি হবে কি না।

জ্যোতির্ময় মনে মনে উপযুক্ত মুহূর্ত খুঁজছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় সুধাময়ী পুত্রক্রোড়ে ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তিনি ছাদে এসে হানা দিলেন। নির্জন ছাদে তাঁকে একা দেখে সুধাময়ী সঙ্কুচিত হলেন, জড়োসড়ো হয়ে আলসেতে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। জ্যোতির্ময় বেপরোয়া, তিনি অভিকে কোলে টেনে নিলেন।

শিশু তাঁকে চিনতো, দু'হাত বাড়িয়ে কোলে গেলো। সে সময় তার মুখে সবে একটি দু'টি বোল ফুটেছে, মুখে প্রচুর থুথুর বুড়বুড়ি উঠিয়ে বলতে লাগলো—বা-বা-বা—

সশব্দ হাসিতে জ্যোতির্ময় বললেন—ইয়েস মাই চাইল্ড, ইউ আর রাইট—

লজ্জায় সুধাময়ী জমে যান আর কি !

জ্যোতির্ময় বললেন—না না সুধা, লজ্জা নয়। আমি আজ তোমার কাছে আর্জি পেশ করতেই এসেছি, তুমি অনুমতি দাও। আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

না না, ছি ছি, না না ! অবরুদ্ধকণ্ঠ থেকে আর কোনো কথা বেরোয় না।

এতে ছিছি-র কিছু নেই সুধা, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই প্রমাণ দিয়ে গেছেন বিধবাবিয়ে শাস্ত্রসম্মত।

আপনার অসীম দয়া, কিন্তু আমি যে মা, বড়ো হয়ে অভি আমাকে কি ভাববে ! তাই আপনার দয়া গ্রহণ করার শক্তি আমার নেই।

ভুল করছো সুধা, দয়া নয়। তোমাকে দয়া দেখিয়ে অপমান করতে আমি আজ আসিনি। আমি তোমাকে ভালোবাসি, তাই তোমাকে বিয়ে করে সারাজীবনের সঙ্গিনী হিসেবে পেতে চাই।

সুধাময়ী কেঁপে কেঁপে উঠলেন। অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—না না, তা হয় না।

বেশ, আমি অপেক্ষা করবো, যতোদিন তোমার মন তৈরি না হয় ততোদিন অপেক্ষা করবো, তোমার জন্য অপেক্ষা না করে আমার উপায় নেই সুধা!

তারপর দিনের পর দিন গড়িয়ে গেছে, অপেক্ষার গণ্ডি বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়েছে, অভিমন্যু একটু একটু করে বড়ো হয়েছে, সুধাময়ী যৌবনের উচ্ছল সমুদ্র বৈরাগ্যের ভেলায় ধীরে ধীরে পাড়ি দিয়েছেন, জ্যোতির্ময় দত্ত যথারীতি এসেছেন, সীমানা বাঁচিয়ে মেলামেশা করেছেন। বয়সের সিঁড়িগুলো যতো ধাপে ধাপে তিনি এগিয়েছেন, অপরাধবোধের বিড়ম্বনায় সুধাময়ী ততোই কুঁকড়ে গেছেন, মনে মনে বলেছেন, ছি ছি, আমার জন্য—

একদিন বলেই ফেলেছিলেন—আপনি সংসারধর্ম করুন, এভাবে আমাকে অপরাধী করার কোনো মানে হয় না।

অপরাধ স্খালনের উপায় তো তোমার হাতেই সুধা!

না না, বিশ্বাস করুন আমি নিরুপায়, অভি যখন বড়ো হয়ে সব বুঝতে শিখবে তখন তাকে আমি কি কৈফিয়ৎ দেবো? সন্তানের ঘৃণার দৃষ্টির নিচে কি কোনো মা টিঁকতে পারে?

জানি না সুধা, আমি পুরুষ, বিশেষ করে বিদেশ ঘুরে অনেক সংস্কারমুক্ত হয়ে এসেছি, আমি বুঝি হৃদয়ের দাবিকে। তোমার মাতৃহৃদয় আমার কাছে চিরদিন দুর্গম অরণ্যই থেকে গেল সুধা।

জ্যোতির্ময় দত্ত আর সংসারধর্ম করেননি। দূর থেকে স্থিরদৃষ্টিতে সুধাময়ীর দিকে তাকিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছেন। ব্যারিস্টারিতে বেশ নাম হয়েছিলো। পসার-প্রতিপত্তি হয়েছিলো। দূর থেকে যতোটা সম্ভব মা ছেলেকে দেখাশোনা করেছেন, প্রয়োজনবোধে বহু সাহায্য সহায়তা করেছেন। অভিমন্যুর লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। তার চাকরিটাও ব্যারিস্টার দত্তর সুপারিশের জোরেই হয়েছে। অভিমন্যুর বিয়েতে বৌকে দামী জড়োয়া নেকলেস উপহার দিয়েছেন ব্যারিস্টার দত্ত।

মাত্র পাঁচ বছর আগে অতৃপ্ত জীবনের সবটুকু বঞ্চনা পৃথিবীর মাটিতে

ফেলে রেখে চোখ বুজেছেন জ্যোতির্ময় দত্ত। অবস্থা খারাপ শুনে সুধাময়ী দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে এতো যন্ত্রণার মধ্যেও মৃদু হাসিতে জ্যোতির্ময় বলেছিলেন—চললাম সুধা, এ জন্মে তো অনেক সুখ পেলাম। আশীর্বাদ করো পরজন্মে যেন এমন উপোসী হয়ে না কাটাতে হয়।

সুধাময়ীর বুক ঠেলে কান্না আসছিলো। অশ্রুর সমুদ্রটা যেন দু' চোখের আড়ালে স্তব্ধ হয়েছিলো লোকলজ্জায়। তিনি চুপ করে বসে থেকেছিলেন শুধু। তিনদিন পর্যন্ত অন্ন গ্রহণ করতে পারেননি তিনি। অথচ এ শোকের কথা কাউকে জানাতেও পারেন না যে!

জয়ন্তী বলেছিলো—উনি আমাদের কে হন মা?

দাদার বন্ধু—জবাব দিয়েছিলেন সুধাময়ী।

কিন্তু শুধু কি এই? তার চেয়ে বেশি কিছু নয়? অভিমন্যুর পিতার চেহারা তো সুধাময়ী আজ ভুলেই গেছেন। স্বামী বলতে তাঁর মনে যে ছবিটা ভেসে ওঠে সে তো জ্যোতির্ময় দত্ত।

শুধু অভির মুখ চেয়ে সুধাময়ী সেই ছবি চাপা দিয়ে রেখেছেন। দু'টো উদ্যত বাহুর আহ্বানকে চোখ বুজে অস্বীকার করেছেন, এক বুক ব্যাকুলতাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন।

আর সেই অভির বৌ কি না—

একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছিলো শাশুড়ি বৌ দু'জনের মধ্যে। সুধাময়ী আক্ষেপের কণ্ঠে বলেছিলেন—আমার কি দুঃখ তা তুমি বুঝবে না বৌমা। সারাজীবন কি মরুভূমি পাড়ি দিয়ে এলাম—

জয়ন্তী বাঁকাসুরে বলে উঠলো—কি দরকার ছিলো, ব্যারিস্টার দত্তকে নিয়ে বাগান সাজালেই হতো।

ইলেকট্রিক শক্ খাওয়া মানুষের মতো সুধাময়ীর দেহটা বার দুই ঝাঁকুনি দিয়ে উঠেছিলো। অসহ্য বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কে বললো তাঁকে এই কথা? অভির বৌ? জীবনে কখনও যা শুনতে হয়নি তা শুনতে হলো এই চুয়াত্তর বছর বয়সে? নিদারুণ মরু তৃষ্ণায় একটি মাত্র ওয়েসিস ভেবে শুধু অভির দিকে তাকিয়ে পথ চলেছেন শেষ জীবনে একটু শীতলতার আশায়—সে কি তাঁর মরীচিকা? হাতের

কাছে সুশীতল পানীয় রেখেও তিনি যে অসীম ধৈর্যে ও সংযমে নিজের একবুক পিপাসা চাপা দিয়ে রেখেছেন সারাজীবন—তার কি এই পুরস্কার ?

বাইরের আকাশে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর। বুকের ভেতরটা খাঁ-খাঁ করে জ্বলছে। সুধাময়ীর ঘোলাটে চোখ দুটোও যেন জ্বলতে লাগলো রৌদ্রদীপ্ত আকাশটার মতোই।

দেয়াল

॥ শর্মিলার কথা ॥

এয়ারপোর্টে বিমলেন্দুই এসেছিলো আমাকে নিতে। একমাস পর আমি ফিরে এসেছি। সংগে আমার ছ' বছরের ছেলে টুবলু।

বিমলেন্দু হেসে বললো—কি, কেমন আছো? শরীর-টরীর ভালো তো?

ভালো।

তোমার রঙটা একটু ময়লা হয়ে গেছে। রোগাও হয়ে গেছো মনে হচ্ছে। আমার কথা ভেবে বুঝি?

আমি হাসলাম।

টুবলুটাও বেশ ময়লা হয়ে গেছে।

ওখানকার জলের জন্যই হয়তো।

তোমার মুখটা এতো শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন শর্মি?

রাস্তাঘাটে চলার একটা ধকল আছে তো। হয়তো সে জন্যেই। যাক্—তুমি কেমন আছো বলো।

নাঃ, ভালো নেই।

আমি শঙ্কিত কণ্ঠে বললাম—কেন? কি হয়েছে?

বিমলেন্দু মুচকি হেসে বললো—বাঃ, তুমি কাছে ছিলে না পুরো একটা মাস। বুঝতেই তো পারছো।

এই!—আমি ভুরু কুঁচকে চোখের ইঙ্গিতে টুবলুকে দেখালাম। বিমলেন্দুর যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকতো! টুবলুটা যে কাছে রয়েছে সে হুঁস নেই।

বিমলেন্দু ঠোঁট টিপে হাসি চাপলো। তারপর বললো—সুনীলার বিয়ে কেমন হলো বলো। আমার হয়ে দু'টো রাজভোগ বেশি খেয়েছো তো?

নীলার বিয়ে খুব ভালোভাবেই হয়েছে। জামাইটিও বেশ। তুমি যেতে পারোনি বলে মা বাবা দাদা সবাই কতো দুঃখ করলেন। আমারও খুব খারাপ লাগছিলো। আর নীলা তো বলতে গেলে তোমার নাম

জপ করেছে। শুধু 'বিমলদা এলো না, বিমলদা এলো না' বলছিলো কথায় কথায়।

কি করবো বলো! কপালে নেই, ঠিক এই সময়ে অফিসে এমন একটা কাজ পড়লো যে ছুটি পাওয়া অসম্ভব ছিলো। যাক্, আমার অনুপস্থিতিটা তুমি আর টুবলু দু'জনে মিলে পুষিয়ে দিয়ে এসেছো তো? কি গো টুবলুবাবু!—এবার বিমলেন্দু আমাকে ছেড়ে টুবলুর দিকে মন দিলো।

টুবলু মহা উৎসাহে বলতে লাগলো—ওঃ, বাবা, যা মজা হলো না মাসির বিয়েতে! আর সবাই আমাকে কি খাতির করেছে জানো? দিদা সন্দেশ, রসগোল্লা, আচার সবকিছু আমাকে বেশি বেশি করে দিতো। বলতো—তোমাকে কি দিয়ে আদর-যত্ন করবো বলো। তুমি হলে কলকাতার মানুষ। আর দাদু কি বলতো জানো বাবা? বলতো—কইলকাতার বাবুরে একটু ভালো কইরা আদর যত্ন কইরো। মানী লোক।

টুবলুর কথায় আমি আর বিমলেন্দু দু'জনেই হেসে উঠলাম। টুবলুও হাসতে লাগলো।

এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম—বাড়ির খবর কি? মানে সবার হাবভাব কেমন—মানে—

এক্ষুণি তো বাড়ি যাবে। গেলেই সবকিছুর মানে নিজেই বুঝতে পারবে।

শুনে তো আমার গলায় আর জল নেই।

বুকের ভেতরটা দুরদুর করছিলো আমার। নিঃশব্দে বাড়ি ঢুকলাম। প্রথমেই দেখা শাশুড়ির সঙ্গে। তাঁকে প্রণাম করতে খানিকটা নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা পেলাম। শ্বশুর মশাইকে প্রণাম করে নিজের ঘরে চলে এলাম আমি। টুবলু দাদুর কাছেই বসে পড়লো। তার এই ভ্রমণকাহিনী বিশেষ করে দু দু'বার প্লেনে চড়ার অভিজ্ঞতা কারও কাছে বিশদভাবে না বলা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। আর সে জানে এ ব্যাপারে দাদুই একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। তার কথা এমন নিঃশব্দে আর বিনা প্রতিবাদে অন্য কেউ শোনে না।

খাটের উপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে বিমলেন্দু। হয়তো শ্রম অপনোদন করছিলো। আমাকে দেখে একটু হেসে বললো—কি, বোঝাপড়া হলো?

এবার আমার রাগ হলো। ঝঙ্কার দিয়ে বললাম—বোঝাপড়া কিসের! আমি কি চুরি করেছি না ডাকাতি করেছি।

দুপুর বেলা একটু শুয়েছিলাম। টুবলু পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আমার মনে সদ্য ছেড়ে আসা মা বাবা ভাইবোনদের স্মৃতি নড়াচড়া করছিলো। আসার সময় মায়ের অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ দুটো, ভাইবোনদের নিঃশব্দ অশ্রুবর্ষণ আমার মনটাকে বেদনার্ত করে তুলছিলো। হঠাৎ কানে গেলো আমার ননদ তন্দ্রার গলা। এতোক্ষণে কলেজ থেকে ফিরলো হয়তো। তন্দ্রা বলছে—তোমার বৌ এসেছে তাহলে! যাই বলো মা, আর পারবে না। তোমার মুঠো ফসকে একবার যখন উড়লো তখন ইচ্ছে হলেই খোয়ালখুশি মতো আকাশে ডানা মেলবে এ তুমি দেখে নিও।

আমি নিথর হয়ে যাই। নিঃশ্বাস পড়ে না আমার। তন্দ্রা এসব কি বলছে! এ কি সেই তন্দ্রা! আমার বিয়ে হয়েছে আজ বারো বছর। তনুর বয়স তখন কতো? সাত কি আট। রোজ তার চুল বেঁধে দিতাম। চোখে কাজল কপালে টিপ পরিয়ে দিতাম। ইস্কুলে যাবার সময় তাড়াতাড়ি ভাত মেখে খাইয়ে দিতাম। তন্দ্রাকে আমি ছোটোবোনের মতোই ভালোবাসি। সেই তনু আজ অনায়াসে আমাকে ওইসব কথাগুলো বলছে!

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না আমার। কিন্তু কি করেছি আমি! বারো বছর হলো বিয়ে হয়েছে আমার। এই এক যুগ ধরে আমি কম সেবা দিয়েছি সংসারকে! শাশুড়িকে চান করার পর নিজের শাড়িটাও কাচতে দিইনি কোনোদিন। এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেতে দিইনি। ঘন ঘন পান খান তিনি। ঠিক ঠিক সময়ে পান তৈরি করে হাতে তুলে দিয়েছি। তাতে যে তিনি খুশি হয়েছেন সেটা বুঝতে পেরেছি। আমি তাতে কৃতার্থ হয়েছি। আমি যে সবাইকে সুখী করেই নিজে সুখী হতে চেয়েছি। যখন যেটি প্রয়োজন হাতের কাছে পেয়ে শ্বশুর মশাইও কতোদিন সুখের হাসি হেসে বলেছেন—মায়ের আমার সবদিকে নজর। কোথাও এতোটুকু ত্রুটি হবার জো নেই।

তবে? তবে কি আজ সে সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে? শুধু একবার তাদের ইচ্ছের কাছে মাথা নোয়াইনি বলে আমার এই আন্তরিক সেবা

যত্নের দাম থাকবে না ?

আমার মা বাবা থাকেন ত্রিপুরা রাজ্যের কোনো একটি শহরে। যাতায়াতের অসুবিধে এবং অর্থনৈতিক কারণেও বটে, আমার যাওয়াই হয় না সেখানে। মা বাবা ভাইবোনদের কথা ভেবে মাঝে মাঝে আমার মনটা বড়ো কাঙাল হয়ে ওঠে। ছোটো বোন সুনীলার বিয়ের খবর নিয়ে যখন চিঠি এলো, আমি ভেবেছিলাম বোনের বিয়ের আনন্দ তো আছেই এই সুযোগে সবাইকে দেখতে পাবো। সেটাও আমার কাছে কম আনন্দ নয়। কিন্তু বিমলেন্দু জানালো সে কিছুতেই যেতে পারবে না। অফিসে জরুরি কাজ পড়েছে। ছুটি পাওয়া অসম্ভব। শুনে আমি একেবারে ভেঙে পড়েছিলাম। বুকের ভেতরে গোপনে অশ্রুবর্ষণ হচ্ছিলো। আমার এই চরম দুঃখটাও ওদের চোখে ধরা পড়েছিলো রাগ বা জেদ হিসেবে।

বুঝতে পারছিলাম আমার যাওয়া কারও ইচ্ছে নয়। শাশুড়ি বলেছিলেন—সুবিধে অসুবিধে সব সংসারেই আছে। তা বলে এতো অবুঝ হলে চলে ?

সংগে সংগে তন্দ্রাও ফোড়ন কেটেছে—এতোদিনে তোমার ঘোরলাগা চোখে দিব্যদৃষ্টি খুলেছে দেখছি।

আশ্চর্য ! তন্দ্রাও এসব কথা বলে ! আমার সংগে তন্দ্রার এতোদিনের সম্পর্কটা কি সবটাই ছিলো ফাঁকির উপর ! বাড়ির হাওয়া যখন এমনি থমথমে হয়ে উঠছিলো তখনও আমি মনকে বাঁধতে পারিনি। মন থেকে বলতে পারিনি—থাক, সবার যখন অনিচ্ছে, কাজ নেই গিয়ে। বিমলেন্দুকে ছাড়াই নিজে উদ্যোগ করে প্লেনের টিকিট কেটে একদিন প্লেনে চড়ে বসেছিলাম। কিন্তু এমনি আমার কপাল—রওনা হবার দু'দিন আগে শ্বশুরমশাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থ শ্বশুরকে ফেলে শাশুড়ির উপর সংসারের পুরো দায়িত্ব চাপিয়ে চলে যাওয়ার অপরাধও আমার উপর বর্তেছে। ফলে যাবার দিন অপরাধীর মতো, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছি। একমাস পর ফিরেছি—তাও অপরাধীর মতোই।

কিন্তু কি আমার অপরাধ ? নিজের মনের একটা ইচ্ছেকে কি আমি নিজের মতো করে রূপ দিতে পারি না ? এই এতোদিন পরেও ? আমার মনের কোনো দুঃখ, কোনো আকুলতার এতোটুকু মূল্য নেই

এই বাড়িতে ?

বিমলেন্দু হয়তো সবই বোঝে। কিন্তু কোনো কিছু বলে না। তাকে সবদিক মানিয়ে চলতে হয় কিনা। তাই রফা করে নিতে হয় মধ্যবর্তী একটা জায়গায়।

॥ বিভাবতীর কথা ॥

বৌমা চলে গেলো বাপের বাড়ি। তার বোনের বিয়ে। খোকার অফিসে কি কাজ পড়েছে। তাই সে যেতে পারেনি। খোকা যেখানে যেতে পারলো না সেখানে বৌমা যে একা চলে যাবে তা তো ভাবতেই পারিনি। বোনের বিয়ে মানলাম। কিন্তু সংসারের সুবিধে অসুবিধে বুঝতে হয় তো ! আর সুবিধে অসুবিধে কোন্ সংসারে না থাকে ! বেড়ানো, আনন্দ করা খুবই ভালো. কিন্তু আনন্দের চেয়েও কর্তব্য বড়ো নয় মানুষের জীবনে !

বোনের বিয়ের চিঠি এলো কি মেয়ে যেন অজ্ঞান হয়ে গেলো। খোকা যেতে পারবে না জেনে মুখখানা করে রইলো যেন শ্রাবণ মাসের অমাবস্যে। চব্বিশ ঘণ্টা এক ভাব। খোকা যতোক্ষণ বাড়ি থাকতে ততোক্ষণ ঘরের মধ্যে ফোঁস ফোঁস। ছেলেটার আমার হাড় কালি করে দিলো ! খোকা কেন যায়নি সে কি আর আমি বুঝি না। অফিসের কাজ না আরও কিছু। ইচ্ছে করলে বুঝি ছুটি ব্যবস্থা করতে পারতো না। একটা লোকের ওখানে যাওয়া-আসা তো চাট্টিখানি কথা নয়। কতোগুলি টাকার দরকার। বৌ ছেলেকে পাঠাতে আর বিয়ের লৌকিকতা সামলাতেই বাছার আমার পকেট কতোখানি ফাঁক হয়েছে সেটা দিনে দিনে বুঝতে পারা যাবে। যতো হিসেব তো মা'র বেলায়। নাও, এবার তুমি দু' আঙুলে খুঁটে সংসার চালাও !

আমি বলেছিলাম—খোকা যখন যেতে পারছে না তখন না-ই বা গেলে এ সময়ে।

শুনে শর্মিলা বললো—আমার একটা মাত্র বোন, তার বিয়েতে আমি যাবো না মা !

আমি বললাম—না, তা নয়। তবে তোমার বোন তো বিয়ে হয়ে এদিকেই আসবে, খড়্গপুরে। তখন তো সহজেই দেখাশোনা হবে।

মুখখানা আরও কালো করে বলেছিলো—সেটা আর এটা কি এক হলো মা !

আমি আর কিছু বলিনি। বুড়ো বয়সে ছেলের হাত তোলা হয়ে আছি। গলায় আবার একটা আইবুড়ো মেয়ে। বৌ এখন মান্যিগণ্যি করে বটে কিন্তু কালে তো আরও ঝুনো হবে। তখন কপালে কি দুর্গতি আছে কে জানে !

বিয়ের চিঠি আসা থেকে রওয়ানা হয়ে যাওয়া এস্তোক কি ব্যাভারটাই না করলে ! শুধু রাগ আর গোমড়ামুখ। এর মধ্যে উনি পড়লেন অসুখে। শ্বশুরের এমন অসুখটা চোখে দেখেও কেমন চলে গেলো। চোখের একটু চামড়া নেই। একবারও ভাবলো না এমন কঠিন রুগী টেনে তারপর আবার সংসারে যাবতীয় তাল সামলাই কি করে। মেয়েটারও আবার এই সময়েই পরীক্ষা। তাকে যে দিয়ে দু'টো ফাই-ফরমাস করবো তারও জো নেই। কপাল বটে আমার ! অথচ এই বৌকে কি আমি কম ভালোবাসি ? নিজে না খেয়ে যেমন মেয়েকে খাওয়াতে ইচ্ছে করে, নিজে না পরে পরাতে ইচ্ছে করে, তেমনি করতে ইচ্ছে হয় আমার শর্মিলার জন্যে। মেয়ের জন্যে যতোটা করি বৌকেও ততখানিই করি। কিন্তু বৌমা বোঝে সে কথা ! দাম দেয় তার ? তাকায় একটু আমার মনের দিকে ?

॥ তন্দ্রার কথা ॥

বৌদির বোনের বিয়ে লাগলো একেবার সময় বুঝে। এদিকে আমার মাথার উপর পরীক্ষা ওদিকে বাবা অসুখে শয্যাশায়ী। চিত্তির আর কি ! এর মধ্যে বৌদি ড্যাং ড্যাং করে চললো বাপের বাড়ি আমার মাথাটি খেয়ে। এখন মা তো আমাকে নিয়ে সব সময় টানা হ্যাঁচড়া করবে। না করে পারবেই বা কেন ? বৌদি থাকলে সংসারের অনেকগুলো কাজ তো বৌদি সামলায়। সে সবই এখন একা মা'র উপর পড়েছে। তার ওপর বাবার পেছনে যা খাটুনি ! একা পারবেই বা কেন ? মা'রও তো বয়স হয়েছে ! বৌদির একটু বিবেচনা করা উচিত ছিলো না ! এমনিতে তো এমন ভাব দেখায় যেন সবার জন্যে কতো দরদ। আসলে স্বার্থের ঘরে হাত পড়লেই মানুষকে তখন ঠিকঠিক বোঝা যায়। দাদা যেতে পারবে না শুনে ভেবেছিলাম বৌদিরও যাওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই।

আমার পরীক্ষাটা মানে মানে হয়ে গেলে বৌদি যতো খুশি বাপের বাড়ি যাক। দাদাও তো একটু বাধা দিলো না। একটু বুঝিয়ে বললে তো পারতো। এতো অসুবিধে দেখছে! আর বলবেই বা কি করে। বৌদি কিছুদিন থেকে যা চেহারা করে রেখেছিলো আমার তো কথা বলতেই ভয় করতো। অশান্তি হবে বলেই হয়তো দাদা কিছু বলেনি। বৌদি গয়না করে নিয়ে গেলো বোনের জন্যে। যাতায়াতের প্লেন ভাড়া গেলো। দাদার মোটা টাকা খসে গেছে। কোথায় ভেবেছিলাম এমাসে দাদাকে বলবো দু'টো শাড়ির কথা। আগের শাড়িগুলো পুরনো হয়েছে। রঙটঙ উঠে কেমন ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে। প'রে বেরোতে আর ভালো লাগে না। কিন্তু এখন কি আর মুখ খোলবার জো আছে! এখন দাদার কাছে সে কথা বলার সাহসই নেই। সত্যি, নিজের বাবা অক্ষম হলে আর কার কাছে জোর করে দাবি করা যায়! তবে দাদা-ই বা করবে কি! বাবার অসুখেও তো কম টাকা খরচ হলো না। বৌদি এতোটা অবুঝ না হলেও পারতো।

বৌদি আমার পরীক্ষার কথাটাও একবার ভাবলো না। আমার যে ফাইনাল পরীক্ষা। পাশ করতে না পারলে কি ভালো হবে? অথচ বৌদির জন্যে কি আমি কিছু করিনি কখনও? এই যে টুবলুটা আজ ছ' বছরেরটি হলো, ওকে কি কম কোলেপিঠে করেছি। কাঁদতো বলে পায়ের ওপর শুইয়ে দোলাতে দোলাতে নিজের পড়া তৈরি করেছি। টুবলুটা তখন ছোটো। দাদার ঘরে ঢুকেছি—দাদা হেসে বললো, তনু তোর বৌদি মহা এক সমস্যায় পড়েছে।

কি সমস্যা দাদা?

সিনেমায় যাবার ইচ্ছে। কিন্তু টুবলুকে নিয়ে—

দাদার কথা শেষ না হতেই আমি বলেছিলাম—তোমরা যাও না দাদা। আমি টুবলুকে রাখবো।

দাদা হেসে বলেছিলো—দেখলে তো, বলতে না বলতেই কেমন সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। বৌদি বলেছিলো—ও ছেলেমানুষ, ওর কাছে বাচ্চা রেখে আমি সিনেমা দেখতে যাবো! আমার খুব খারাপ লাগে।

আমি হেসে বললাম—তুমি যাওনা বৌদি। কিছু খারাপ লাগবে

না। সিনেমা দেখতে দেখতে ভুলে যাবে।

হাসতে হাসতে দাদা-বৌদি সিনেমায় গেলো। তারপরও বহুদিন গেছে। তাদের পুত্র শ্রীমান টুবলুর ভার এই শ্রীমতী তন্দ্রার উপর দিয়েই। বারোমাস কি আমি ওর কম ঝক্কি সামলাই! আজকালকার কোনো মেয়ে এমন করবে না, এ আমি জোর করে বলে দিতে পারি।

॥ **লেখিকার কথা** ॥

সবাই নিজের কথা বড়ো করে ভাবে। প্রত্যেকেরই একটা আলাদা আলাদা প্রত্যাশার জগৎ আছে। সেখানে ঘাটতি হলেই ক্ষোভ। আসলে মন জিনিসটা বড় বিচিত্র। মানুষ দীর্ঘদিন একসঙ্গে বাস করে, খায় দায় হাসে কাঁদে কথা বলে তবু পরস্পরের মনের মাঝখানে একটা দেয়াল তুলে রাখে। ছোটো ছোটো স্বার্থের দেয়াল। সে দেয়ালটাকে সরিয়ে মনগুলোকে কিছুতেই একসঙ্গে মেলাতে পারে না।

দূর আকাশের তারা

সুন্দর ফ্ল্যাট বাড়ি। বিলাস এবং স্বাচ্ছন্দ্যের বহু উপকরণ দিয়ে সাজানো গোছানো। ছিমছাম, ফিটফাট। বাড়িতে মানুষ মাত্র দু'টি—স্বামী আর স্ত্রী, আর আছে ভৃত্য পাঁচকড়ি।

স্বামী নবেন্দু এক নামকরা অফিসের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত অফিসার। মোটা টাকা বেতন পায়। সে ন'টায় অফিসে বেরিয়ে যায়। ফিরতে রাত আটটা। কোনোদিন তার চেয়েও বেশি। অফিস ছুটির পরও বহু ঝামেলা পোয়াতে হয় নবেন্দুকে। অবশ্য এজন্য সে অখুশি নয়, বরং গর্বিত।

বাড়িতে সারাদিন স্ত্রী অসীমা একা। তার এই এককীত্ব দূর করতে নবেন্দুর চেষ্টার অন্ত নেই। বাংলা সাহিত্যের বাজারটাই বলতে গেলে সে বাড়িতে এনে বসিয়েছে। অখ্যাত প্রখ্যাত কুখ্যাত যতো লেখক আছে—তাদের যতো বই—ততো ম্যাগাজিন, বাদ নেই কিছু। পড়ো যতো খুশি। তাছাড়া আছে, সংগীতচর্চার সরঞ্জাম। হারমোনিয়ম গীটার সেতার। যখন খুশি বাজাও গান কর। শুধু তাই নয়। একপাশে গ্লাস-কেসের মাথায় সাজানো কতো রকমারি বড়ো বড়ো ডল পুতুল, চাবি টিপলে কোনোটা ঘাড় দোলায়, কোনোটা কোমর ঘুরিয়ে নাচে। কেউ ড্রাম বাজায় কেউ সেলাম ঠোকে। দেখলে শুধু ছোটোরা কেন, বড়োদেরও কৌতুক বোধ হয়। ও নিয়ে দিব্যি খানিকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর অসীমা ডানলোপিলো খাটের উপর শুয়ে বই পড়ে। মাথার কাছে টেবিলে সাজানো থাকে কিছু বই। এক সময় ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে তার। কিন্তু সে আর কতোক্ষণ। খাট ছেড়ে ওঠে। রেফ্রিজারেটর খুলে ঠাণ্ডা জল খায়। অকারণেই পাখার স্পিডটা বাড়িয়ে দিয়ে আবার কমিয়ে ফেলে। এ বইয়ের দু'পাতা, সে বইয়ের চার পাতা উলটে পালটে দেখে। নরম গদিটার উপর ঝপাং করে শুয়ে তার দোল অনুভব করে। হাত পা এদিক ওদিক এলিয়ে গদিটার সবটুকু

কোমলতা যেন দেহ ভরে নিতে চায়। আবার ওঠে। হয়তো একটু সময় আয়নার সামনে দাঁড়ায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখে। খোলা চুলগুলো খোঁপায় জড়িয়ে নেয়। তারপর খোলা জানালার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে যেন ভেতরের শূন্যতাকে বাইরের শূন্যতার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।

একসময়ে এসে দাঁড়ায় বাজনার সরঞ্জামগুলোর কাছে। এটা একটু নেড়েচেড়ে দেখে ওটা টেনে নেয়। একটু টুং টাং আওয়াজ তোলে। তারপর ঠেলে সরিয়ে রাখে।

ভালো লাগে না। কিছু ভালো লাগে না। অসীম শূন্যতায় ছেয়ে আছে অসীমার দিন-রাতগুলো। কোনো কিছু দিয়েই যেন জীবনের এই শূন্যতাকে পূর্ণ করা যায় না।

অসীমা কাজের লোকটির উদ্দেশ্যে হাঁক দেয়—পাঁচু, চা নিয়ে আয়—

অসীমা এসে দাঁড়ায় পুতুলগুলোর সামনে। এটার মাথা একটু দুলিয়ে দেয়, ওটার চাবি টেপে। অমনি শুরু হয় নাচ। কেউ ড্রাম পেটে, কেউ ঘুরপাক খায়। খানিকক্ষণ মনোযোগ সহকারে দেখে অসীমা সরে আসে।

একটা জীবন্ত পুতুল যদি থাকতো ঘরে, তবে সব কয়টা পুতুলের কলাকৌশল সে একাই দেখাতে পারতো। ছোট ছোট পায়ের আলপনা আঁকতো ঘরে। কলহাস্যে কলরবে ভরিয়ে তুলতো ঘরের বাতাস। অসীমার জীবনের সব ফাঁক নিমেষে পূর্ণ করে তুলতো।

কিন্তু তা হবার নয়। অসীমার ঘর চিরদিন এমনি শূন্যই থেকে যাবে।

পাঁচু চা নিয়ে আসে। টিপয়ের উপর রাখে, অসীমা একটা সোফায় বসে পড়ে। চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

অসীমার বিয়ে হয়েছে আজ বারো বছর। এখন বয়স প্রায় চল্লিশের কাছে। কিন্তু আজও সন্তান এলো না অসীমার কোলে। ডাক্তার বলেছেন—ভবিষ্যতেও নাকি আশা নেই। অসীমার উদাস দুপুরগুলো চিরদিন এমনি ফাঁকাই থেকে যাবে।

কিন্তু—

না না, সেকথা বলবার নয়। সেকথা ভাবতেও অসীমা মনে মনে কেঁপে ওঠে। সে বড়ো লজ্জা। বড়ো লজ্জা!

তবুও তো কথাগুলো মনের কোণে ভিড় করে আসে। অসীমার বিয়ের আগেকার কথা। তখন সে কলেজে পড়ে। সেই সময়ে দাদার বন্ধু হিসেবে নবেন্দু অসীমাদের বাড়িতে যাতায়াত করতো।

পরিচয় মেলামেশা ঘনিষ্ঠতা। ক্রমেই নবেন্দুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলো অসীমা। বাড়ির কেউ ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কারণ ততোদিনে নবেন্দু বাড়ির সবার সঙ্গেই আন্তরিকতায় অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে।

তারপর হঠাৎ একদিন—মুহূর্তের ভুল মুহূর্তের দুর্বলতা—আশঙ্কায় দুরু দুরু করছিলো অসীমার বুক। কিন্তু তবু সে এতোটা ভাবতে পারেনি। সত্যি সত্যি যে এমনটা হবে, তার ভুলের ফসল যে এমনি ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে তা সে বুঝতে পারেনি।

প্রথমে চোখ পড়লো মায়ের। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে খানিক তাকিয়ে থেকে বললেন—তোর কি হয়েছে রে সীমু! তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

নত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল অসীমা। কোনো জবাব দিতে পারে নি। ভয়ে লজ্জায় আড়ষ্ট। হাতের তেলোয়, কপালে ঘাম।

মা'র সন্দেহ তীব্র হলো। বললেন—কি রে, জবাব দিচ্ছিস না যে!

অসীমা কেঁদে ফেলেছিলো—আমি বলতে পারবো না—বলতে পারবো না—কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন মা। তারপর কঠিন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—কে তোর এমন সর্বনাশ করলে। সত্যি করে বল কে দায়ী?

অতি কষ্টে অসীমা উচ্চারণ করেছিলো—নবেন্দু।

আশ্চর্য সাহস তার! এরপরও সে এ বাড়িতে আসে! তাকে জানাস নি এ কথা?

অসীমা মাথা নাড়লো—না জানায় নি। জানাতে পারে নি।

এখন, এখন কি করবো আমরা? আমাদের মাথা যে একেবারে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছিস হতভাগী!

অসীমা আকুল কণ্ঠে কেঁদে উঠলো—তোমরা আমাকে নবেন্দুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও মা।

হ্যাঁ, এখন তো বিয়ে দেবারই সময়। এখন বিয়ে দিলে এ কেলেঙ্কারি চাপা পড়বে? দু'তিন মাস বাদেই যখন সব ফাঁস হয়ে যাবে তখন চাপা দিবি কি দিয়ে?

অসীমা নিরুপায় চোখে মা'র দিকে তাকালো।

সেদিন নবেন্দু আসতেই মা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন—তুমি এমন সর্বনাশ করলে আমার মেয়ের!

নবেন্দু প্রথমটা হকচকিয়ে গেল। তারপর সব বুঝতে পেরে অপরাধ স্বীকার করে বললো—আমার অন্যায়ের জন্য আমি যে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত।

তারপর বাড়িতে ডাক্তার এলো। জোর করে অসময়ে একটা জীবনকে পৃথিবীতে টেনে আনা হলো। তখনও প্রাণের স্পন্দন ছিলো ছোট্ট বুকখানার মধ্যে। এতো কষ্টের মধ্যেও অসীমা চোখ মেলে দেখেছিলো—শাঁখের মত সাদা সাদা গায়ের রঙ, রেশমের মিশমিশে কালো এক মাথা চুল, ছোটো-ছোটো হাত পা, যেন একটা ডল পুতুল।

মুহূর্তে ডাক্তারের ইনজেকশানের ছুঁচটা কচি হাতে ঢুকে গিয়েছিলো। বার দুই নড়ে উঠেছিল হাত-পাগুলো। দু' তিন বার ক্ষীণ হিক্কার শব্দ। তারপর শেষ।

ডাক্তার পকেট মোটা করে চলে গিয়েছিলেন, ব্যাপারটা মোটামুটি চাপা পড়েছিলো, তবুও কোনো কোনো প্রতিবেশী আড়ালে ফিসফাস করেছিলেন বৈ কি! তার পর অসীমা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছে। মাস ছ'য়েক পরে এক সন্ধ্যার শুভলগ্নে নবেন্দুর সংগে অসীমার বিয়ে হয়েছে।

তার পরের ব্যাপারটাই আশ্চর্য। বছরের পর বছর কাটতে লাগলো অসীমার কোলে সন্তান এলো না।

ডাক্তার দেখাতে তিনি বললেন—সন্তানাদি নেই বলছেন? হয়েছিলো নিশ্চয় একটি। আচ্ছা, সেই সন্তান জন্মের সময় কি আপনার অবস্থা খুব সঙ্কটজনক হয়েছিলো?

অসীমা হঠাৎ চমকে গিয়ে তারপর নীরবে স্বীকৃতি জানায়।

ডাক্তার জানালেন, সেই থেকে দেহে একটা ডিফেক্ট হয়ে আছে। দীর্ঘকাল চিকিৎসা দরকার।

চিকিৎসা হয়েছিলো ঠিকই। কিন্তু কিছুই হলো না। দেখে শুনে অসীমা সব ছেড়েছুড়ে দিলো। শেষ উপায় হিসেবে ডাক্তার একটা অপারেশান করাতে বলেছিলেন কিন্তু অসীমা রাজি হয়নি। তার ধারণা—একদিন ভগবান অযাচিত ভাবে যা দিয়েছিলেন এবং সেই দানের যে নৃশংস পরিণতি ঘটেছে, তারপর ভগবান আর তাকে দেবেন না। নবেন্দু অনেক বুঝিয়েও তার এই ধারণা পালটাতে পারেনি, অসীমার ঘরের সমস্ত শূন্যতা জুড়ে তার সমস্ত চিন্তায় তন্দ্রায় স্বপ্নে একটি ছবিই ঘুরে বেড়ায়। শাঁখের মতো সাদা রঙ, রেশমের মতো একমাথা মিশমিশে কালো চুল, চাঁদের লেখার মতো ছোট্ট কচি একটি শিশু। সেই শিশু আজ অসীমার কাছে দূর আকাশের নক্ষত্র।

চিত্রাঙ্গদা ॥ শারদীয়া, ৭ম বর্ষ

বাইরের চেহারা

এ পর্যন্ত বংশের সবাই পৈত্রিক পেশা নিয়েই কাটিয়েছে। পৈত্রিক পেশা মানে চাষবাস। এর মধ্যে থেকে ছিটকে বেরিয়ে শচীকান্ত ইংরেজি স্কুলে বেশ খানিকটা লেখাপড়া শিখে ফেললো। ইস্কুল ফাইনাল অবধি। তারপর কি আর লাঙ্গল ধরতে মন চায়। চাকরির খোঁজ করতে লাগলো শচীকান্ত। খুঁজতে খুঁজতে একদিন পেয়েও গেল একটা বেয়ারার চাকরি। কলকাতার এক সরকারি অফিসে। তফসিলীদের এই এক সুবিধে।

কিছুদিন কলকাতা শহরে চরে খেয়ে আর অফিসের বাবুদের দেখে দেখে শচীকান্তর রুচিটাই যেতে লাগলো বদলে। চোখের নজর পালটালো। মোটা ছিটের জামা আর মোটা ধুতিতে মন ওঠে না তার। বাবুরা কেমন টেরিলিন টেরিকটের জামা প্যান্ট পরে—তার নজর সেদিকে। পুজোর সময় অ্যাডভান্স নিয়ে করে ফেললো একটা টেরিলিনের জামা। অফিসের বাবুদের মতো একটা টেরিকটের ফুলপ্যান্ট করতেও খুব ইচ্ছে হয়েছিলো শচীকান্তর। কিন্তু ক্ষমতায় কুলোয়নি। তাই মোটামুটি একটা করে নিয়েছে। তবে মনের কথা মনেই আছে। তক্কে-তক্কে আছে শচীকান্ত। সুযোগ পেলেই করে ফেলবে একটা।

আর একটা ব্যাপারে ভারি সঙ্কোচ শচীকান্তর। বাড়ি থেকে যখন কলকাতা আসে ডালায় গোলাপফুল আঁকা একটা টিনের সুটকেসে জামা কাপড় ভরে নিয়ে এসেছিলো। মাঝে মাঝে বাড়ি যায় শচীকান্ত। ট্রেনে দেখতে পায় বাবুরা সব কি চমৎকার চামড়ার সুটকেস হাতে নিয়ে চলাফেরা করে। ঐ টিনের সুটকেসটা নিয়ে চলতে তার ভীষণ লজ্জা হয়। সেবার পুজোর ছুটিতে কলকাতা থেকে বাড়ি যাচ্ছিলো শচীকান্ত টিনের সুটকেসটি সঙ্গে নিয়ে। সুটকেসের ব্যাপারে তার একটু সঙ্কোচ-মিশ্রিত দুর্বলতা রয়েছে বলেই পায়ের কাছে বেঞ্চির তলায় চালান করে দিলো ট্রেনে উঠেই।

নাঃ, এবারে যে করে হোক একটা চামড়ার সুটকেস কিনতেই হবে।

এমনি সময় ঐ কামরায় উঠলো এক যুবক। পরনে দামী জামা প্যাণ্ট জুতো মোজা। ঈষৎ রুক্ষ চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, তার মধ্যেও একটু ইচ্ছাকৃত এলোমেলো, আর হাতে—আ-হ্—দেখে শচীকান্তর দু'চোখ জুড়িয়ে গেল—কি চমৎকার একটা ঢাউস সুটকেস, একেবারে ঝকঝকে নতুন।

যুবকটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে এগিয়ে এলো এবং বসলো শচীকান্তর ঠিক পাশেই। বসেই সুটকেসটা পায়ের কাছে বেঞ্চির তলায় ঢুকিয়ে দিলো। শচীকান্তর সুটকেসের পাশেই। যুবকটির শরীর থেকে এক আঁজলা মিষ্টি গন্ধ এসে শচীকান্তর ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ছুঁয়ে গেল। তার প্রসাধনের গন্ধ। আঃ কি চমৎকার! শচীকান্ত আড়চোখে যুবকটির মুখের দিকে তাকালো। চেহারাখানা একেবারে রাজপুত্তুরের মত। শহুরে বাবুদের চেহারার জেল্লাই আলাদা। তাদের সারা গাঁ খুঁজলেও বোধ হয় এমন একখানা চেহারা দেখতে পাওয়া যাবে না।

ট্রেন চলেছে। সহযাত্রীরা নানা কথায় মুখর হয়ে উঠেছে। জানালার পাশে বসা যাত্রীরা বাইরের দিকে তাকিয়ে চলমান দৃশ্যাবলী দেখছে। ভেন্ডারদের তারস্বরে হরেক রকম জিনিসের গুণাবলী বর্ণনায় ট্রেনের কামরা সরগরম। কোনো কোনো যাত্রী নীরবে ধূমপান করে চলেছে। তাই এখানে ওখানে ধোঁয়ার আবর্ত। শচীকান্তর পাশের সেই যুবকটি একখানা পত্রিকা মুখের সামনে মেলে ধরে তার উপর ঝুঁকে পড়েছিলো। শচীকান্ত দাঁতের মাজনওয়ালাকে ডেকে একটা মাজন কিনলো। একজন হকার হাতকাটা তেল বেচছে। এতোগুলি লোকের চোখের সামনে ব্লেড দিয়ে কচ্ করে নিজের আঙুল কেটে ফেললো সে। রক্ত বেরিয়ে গেল। তারপর সংগে সংগে সেই তেল লাগিয়ে কেমন জুড়ে দিলো কাটা জায়গাটা। ভারি আশ্চর্য তো। শচীকান্ত সেই তেলও এক শিশি কিনলো, ছোটো ভাই-বোনদের জন্য কিনলো টকমিষ্টি লজেন্স্। জিনিসগুলি সুটকেসে রাখতে গিয়েও রাখলো না। থাকগে, ঘটা করে আর ঐ সুটকেস দেখাতে হবে না লোকজনকে। বিশেষ করে পাশের ঐ দামী সুটকেসওয়ালা বাবুটি দেখবে এটা শচীকান্তর ভালো লাগছিলো না। সে জিনিসগুলি পকেটে রেখে দিলো।

ইতিমধ্যে শচীকান্তর নামার সময় হলো। তার স্টেশন প্রায় এসে গেছে। সে উঠে দাঁড়ালো। এবার বেঞ্চির নীচে থেকে সুটকেসটা টেনে নেবে, ঠিক সেই সময়ে পাশের সেই সুশ্রী যুবকটি উঠে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। ট্রেন থেমেছে। হঠাৎ শচীকান্তর চিন্তায় যেন একটা বিপ্লব ঘটে গেল। সেই মুহূর্তে সে যা করে বসলো পূর্ব মুহূর্তেও এমন দুঃসাহসিক এবং সাংঘাতিক কাণ্ড করার কথা কল্পনাও করেনি, নিজের সুটকেসে হাত না দিয়ে সে পাশের নতুন চামড়ার সুটকেসে হাত রাখলো, এক সেকেন্ড সময়ের মধ্যে তড়িদ্বেগে যে চিন্তাগুলো তার মস্তিষ্ককে ছুঁয়ে গেল,—তার একে তো টিনের সুটকেস, তার মধ্যে পুরনো গোটা কয় জামা পায়জামা ছাড়া আর কিছু নেই। আর ঐ দামী সুটকেসটার মধ্যে দামী দামী জামা-কাপড় রয়েছে নির্ঘাৎ, কারণ বাবুটিকে দেখলেই বোঝা যায় ধনী ঘরের ছেলে। ভদ্রলোক সবেমাত্র বাথরুমে গিয়ে ঢুকেছে এই ফাঁকে শচীকান্ত অনেকদূর চলে যেতে পারবে। পাপ পুণ্য ন্যায় অন্যায় পরে বিচার করা যাবে। আপাততঃ তার প্রয়োজন এই সুটকেসটা আর কিছু দামী পোশাক। এখন তো নিয়ে যাওয়া যাক—

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। শচীকান্ত যুবকটির সুটকেসটা হাতে নিয়ে চটপট নেমে পড়লো এবং দ্রুতপায়ে প্ল্যাটফরম এলাকা পার হয়ে গেল। তার নিজের সুটকেসটা পড়ে রইলো ট্রেনের কামরায়।

বাড়ি ঢুকতেই ভাইবোনেরা সুটকেসটা দেখে বলে উঠলো—বাঃ, কি সুন্দর সুটকেস!

মা বললেন, নতুন কিনলি বুঝি?

শচীকান্ত 'হুঁ' বলে জবাব এড়িয়ে গেল। সুটকেসটা নিয়ে নিজের ঘরে তক্তপোষের একেবারে তলায় ঠেলে ঢুকিয়ে রাখলো। রাত্রিবেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চুপিচুপি খুলে দেখবে ওটার ভেতরে কোন্ ঐশ্বর্য লুকিয়ে আছে! কিছু দামী জামা-কাপড় থাকাটাই তো শচীকান্তর কাছে পরম ঐশ্বর্য।

রাত ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শচীকান্তর ঘুম আসছে না, বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। রান্নাঘরে তখনও খুট্‌খুট্ আওয়াজ, মা বোধ হয় পরের দিনের ঘরকন্নার কাজ কিছু কিছু সেরে রাখছে। শচীকান্ত সুটকেসটা অন্য কারো সামনে খুলতে চায় না। কি জানি, যদি একটা

মোটা অঙ্কের টাকাই থাকে! নিজে আগে খুলে দেখে নেবে ভেতরে কি আছে, তারপর বুঝে শুনে সবাইকে দেখাবে।

অধৈর্য অসহিষ্ণুতায় ছটফট করতে থাকে শচীকান্ত। সন্ধ্যের দিকে পাড়ার বীরুদার বৌয়ের কাছ থেকে একটা সুটকেসের চাবিও জোগাড় করে রেখেছে।

ক্রমে রাত নিঃঝুম হয়ে এলো। গোটা বাড়িটা ঘুমে অচেতন। শচীকান্ত ধীরে ধীরে উঠলো। খুব আস্তে হ্যারিকেনটা জ্বালালো। কাগজ দিয়ে আলোটা এমন ভাবে আড়াল করলো যাতে বাইরে থেকে একটুও না দেখা যায়। তারপর সন্তর্পণে সুটকেসটা টেনে আনলো।

শচীকান্তর হাত কাঁপছে, বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছে। সে এর আগে কখনও কোনো অন্যায় কাজ করেনি। সবার চোখের সামনে দিয়ে পরের জিনিস চুরি করে নিয়ে আসা—এমন দুঃসাহসিক কাজও করে নি। কোন্ দুষ্ট দেবতা তাকে দিয়ে একাজ করালো সে জানে না। এখন তার ভাগ্যে কি আছে দেখা যাক্। কতখানি সম্পদ ধরা দিলো তার হাতের মুঠোয়। কাঁপা কাঁপা হাতে শচীকান্ত চাবি ঘোরালো। তারপর ডালাটা তুলে ধরলো। কিন্তু একি! ওঃ! মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠলো শচীকান্তর।

শচীকান্তর গলা চিরে একটা ভয়ার্ত চীৎকার বেরিয়ে আসতে চাইলো। কিন্তু নিমেষে নিজেকে সামলে নিলো সে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সুটকেসের ভেতরটায়।

একটা মেয়ের দেহ খন্ড খন্ড করে কাটা। কাটা মুন্ডুর স্থির দুটো চোখ যেন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে। রক্ত শুকিয়ে রয়েছে। শুকনো রক্তমাখা একটা তোয়ালে।

একটা দুরন্ত ভয়ে সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এলো শচীকান্তর। হাড় কাঁপানো শীতবোধে দাঁতে দাঁতে ঠক্‌ঠক্‌ করতে লাগলো। সুটকেসের ডালাটা ঝপ্‌ করে ফেলে দিলো সে। দ্রুতহাতে চাবি ঘুরিয়ে সুটকেস বন্ধ করলো। যেন মেয়েটা এক্ষুণি তেড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াবে। কাটামুন্ডুর স্থির চোখ দুটো তখনও তার দিকে তাকিয়ে আছে মনে হতে লাগলো।

এখন সে কি করবে? এই অসহ্য ভয়ের বোঝাটাকে নিয়ে অনেক

দূরে পালাতে হবে। গ্রাম ছাড়িয়ে বহুদূরে কোথাও ফেলে দিয়ে ফিরে আসতে হবে ভোর হবার আগেই। তারপর সুটকেস উধাও হবার একটা গল্প বানাতে হবে। থানা পুলিশে জড়িয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। ভাগ্যিস অন্য কারও সামনে ওটা সে খোলেনি। সুটকেসটার বাইরে দেখতে এতো চমৎকার। কে জানতো ভেতরের চেহারাটা এতো বীভৎস।

ঐ লোকটার কথা মনে পড়লো শচীকান্তর। তাকে দেখে ধনী, বড় ঘরের ছেলে, উচ্চশিক্ষিত, ভদ্র—কত ভালো ধারণা হয়েছিলো শচীকান্তর। চেহারাখানা কি সুন্দর ছিলো লোকটার। তার গা থেকে ভুরভুর করে কি চমৎকার গন্ধ বেরোচ্ছিল, তখন কি শচীকান্ত ভাবতে পেরেছিলো তার ভেতরটা এতো নোংরা! কিন্তু শচীকান্ত নিজের হাতে দাগ লাগালো কেন? কোন অশুভ দেবতার ইঙ্গিতে? লোভ? এই সুটকেসটা স্পর্শ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে ছিলো সৎ, খাঁটি মানুষ। ঐ লোকটার চেয়ে অনেক বড়। যদি এই স্পর্শের কালি হাত থেকে মুছে ফেলতে পারতো সে তবে আবার তার সেই টিনের সুটকেসটা হাতে নিয়েই মাথা উঁচু করে চলতে পারতো।

সেই সুটকেসটা যেটা হাতে নিয়ে চলতে তার লজ্জা বোধ হতো, নিতান্ত অকিঞ্চিতকর সস্তা পোশাকে ভরা ট্রেনের কামরায় ফেলে আসা সেই টিনের সুটকেসটার জন্য ভীষণ মন কেমন করে উঠলো শচীকান্তর। বুকের ভেতর খুব কষ্ট হতে লাগলো সেই নিষ্কলঙ্ক সুটকেসটার জন্য। এখন সেটা পেলে হাতে বয়ে বেড়াতে লজ্জাবোধ হতো না তার। মাথা উঁচু করেই চলতে পারতো।

চিত্রাঙ্গদা । শারদীয়া ১৪শ বর্ষ

অশ্রু নদী পেরিয়ে

আমার নাম ইরা। আমার বয়স পঁচিশ। আমি যখন ছোটো, শৈশবের গণ্ডি পেরোইনি তখন আমার বাবা মারা যান। মায়ের আমিই একমাত্র সন্তান। বাবা অল্প বয়সে মারা যান বলে তেমন কিছু সংগতি রেখে যেতে পারেননি। তবু ঐ যৎসামান্য সংগতি এবং আমাকে নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে মা সংসার-তরীর হাল ধরেছিলেন। বাবার কোনো আপনজন ছিলো না। শুনেছি তাঁর একমাত্র বোন বিয়ের পর থেকেই সিংগাপুরের বাসিন্দা। বিয়ের আগে থেকেই ওখানে পিসে-মশাইয়ের কাঠের কারবার ছিলো। বিয়ের প্রথম দশ বছরে পিসীমা নাকি বার দুই দেশে এসেছিলেন। একবার মায়ের বিয়ের ঠিক পরে আমার জন্মের আগে। আর একবার আমি ছোটো থাকতে। কিন্তু পিসীমাকে আমার মনে পড়ে না। তার পরে পিসীমা আর আসেননি। আস্তে আস্তে সংসার বড়ো হয়ে যেতে ওখানেই তিনি নানা দড়িদড়ায় জড়িয়ে পড়েছেন। এখন ওখানকারই বাসিন্দা হয়ে গেছেন তাঁরা। ছেলেমেয়েদের কর্মজীবন বিয়ে-থা সব ওখানে। এখন তাঁরা আর দেশে ফেরার কথা ভাবেন না। এমন কি চিঠিপত্রের যোগাযোগও নেই।

বাবাকে আমার জীবনে খুব কম সময় পেয়েছি। যখন তাঁকে হারাই তখন আমার বয়স মাত্র সাত বছর। বাবাকে আমার বেশ মনে আছে। মনে পড়ে বাবা কি আদর করতেন আমাকে। তাঁর পাশে বসে আমি না খেলে বাবার মন উঠতো না। রোজ দু'বেলা কোলের কাছে বসিয়ে পড়া বলে দিতেন। নিত্য নতুন উপহারে দু'হাত ভরে দিতেন আমায়। তারপর একদিন বাবা চলে গেলেন, আমার কতোখানি গেলো তা বোঝার বা শোক অনুভব করার বয়স তখন আমার নয়। সেটা বুঝতে পেরেছিলাম মায়ের মৃত্যুর সময়।

বাবা মারা যাবার পর মা আমাকে নিয়ে খুব কম ভাড়ার একটি ঘরে দুঃখের সংসার পেতেছিলেন। সেই সময় মামা মাকে তাঁদের সংসারে গিয়ে থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু মা রাজি হন নি। বলেছিলেন—

যখন কোনো উপায়ান্তর থাকবে না তখন তো তোমার ওখানে গিয়েই উঠতে হবে দাদা। আর তো আমার দাঁড়াবার মতো জায়গা কোথাও নেই। তবে যতোদিন পারি আমাকে নিজের দায়িত্ব নিজেকেই বইতে দাও।

মামা এ-নিয়ে আর কিছু বলেননি, হয়তো চক্ষুলজ্জার দায়ে যা বলেছিলেন তার থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচে গেলেন। দু'টো বাড়তি লোকের বোঝা নিজের সংসারে টেনে আনা কি চাট্টিখানি কথা! হোক না সে যতোই আপন লোক!

মা সামান্য উইডো পেনশন পেতেন। আর বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন তাই দিয়ে কোনো রকমে চলতো আমাদের। আমি স্কুলের পর্ব চুকিয়ে কলেজেও ঢুকেছিলাম। মা বলতেন—সামান্য পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে রে! আর বেশিদিন হয়তো চলবে না। এর মধ্যে তুই পাশ করে বেরিয়ে একটা কিছু করলে তবেই সুরাহা। নইলে যে কি হবে!

কিন্তু মাকে আর বেশিদিন এই দুঃখের সমুদ্রে ঢেউ ভাঙতে হলো না। মানসিক কষ্টে দুশ্চিন্তায় ও অভাব-অনটনে তাঁর শরীর দিন দিনই ভেঙে যাচ্ছিলো। হার্ট খুব দুর্বল ছিলো তাঁর। আমি যখন ডিগ্রী কোর্সের সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, সামান্য জ্বর উপলক্ষ করে হার্ট ফেল করে মা মারা গেলেন।

তারপর থেকেই আমি মামার বাড়িতে আশ্রিত। কারণ এছাড়া আর আমার উপায় ছিলো না।

সর্বাগ্রে মামীমা আমার পড়া বন্ধ করে দিলেন। তারপর ঘরকন্নার কাজ প্রায় সবটাই চাপিয়ে দিলেন আমার উপর।

ভাগ্যের বিধান আমি মাথা পেতে নিলাম, সারা দিন নীরবে কাজ করি, রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে মাকে মনে করে চোখের জল ফেলি।

মামাতো ভাই-বোনদের অজস্র-ফাই-ফরমাস খাটতে হয় সারাদিন, তবে ওরা কেউ খারাপ ব্যবহার করে না আমার সঙ্গে, বরং ভালোই বাসে বলতে গেলে। শঙ্কুদা তো সব সময় বলে—ভাগ্যিস ইরুটা ছিলো তাই এটা ওটা হাতের কাছে পাই। মিন্তুটাকে দিয়ে যদি একটা কাজ আদায় হয়। যদি বলি—জামার বোতামটা একটু বসিয়ে দে না, অমনি বলবে—ইরুদিকে বল। অকর্মার ধাড়ি একটা!

অমনি মিন্তি বলতো—আহা, দিদি থাকতে আমি করবো কেন? সব বাড়িতে দিদিরাই করে। এটাই নিয়ম, দিদির বিয়ে হয়ে যাক্‌—তখন দেখো আমি সব করবো।

শঙ্কুদা বলে—হ্যাঁ, ততোদিন তুমি ধিন ধিন করে খুব নাচো!

আমি হেসে বলি—তোমার জামায় বোতাম পরাবার ওর সময় কোথায়? বরং ওর কলেজ যাওয়ার শাড়ি ইস্ত্রি করতে করতে আমার হাতে কড়া পড়ে গেলো।

মিন্তি আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে—আচ্ছা, আমার সময়টা কোথায় বল না, ও ইরুদি। সাতটার আগে ঘুম থেকে উঠতে পারি না, একটু পড়তে হয়, তারপর চান খাওয়া সাজগোজ উঃ, সে এক পর্ব, এতোসব করে কখন শাড়ি ইস্ত্রি করবো বলো। তুমি যে দিদি, তাইতো তোমার ঘাড়ে ফেলে রাখি।

নিশ্চয় নিশ্চয়, বেশ কর।

ওরা আমাকে ভালোবাসে, শঙ্কুদা মিন্তি নানুকু মিলি। ওদের অজস্র ফাই ফরমাস খাটতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই, আমাকে ছাড়া ওদের চলে না হয়তো সেজন্যই ভালোবাসে, মামা আমাকে একটু বকাঝকা করেন, আমি বুঝি মধ্যবিত্ত সংসারে নিজের দু' দুটো কন্যাদায়ের উপর যদি আর একটা বাড়তি কন্যাদায় চাপে তবে মেজাজ তিরিক্ষি হয় বৈ কি!

কিন্তু আমি সব চাইতে ভয় করি মামীমাকে, তিনি আমাকে কখনও কিছু বলেন না কিন্তু এমন ঠাণ্ডা ব্যবহার, তার সামনে আমি কেমন গুটিয়ে যাই, কখন কি ভুল করে বসি ভেবে তটস্থ হয়ে থাকি, কেমন ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে শক্ত মুখে বলেন—এটা তোমার বোঝা উচিত ছিলো কিংবা, এটুকু বোঝার বয়স তোমার হয়েছে বলেই তো মনে হয়।

এর চাইতে মামীমা যদি মামার মতো দু'টো বকাঝকা করতেন তাতেও বুঝি অনেকটা স্বস্তি পাওয়া যেতো।

মাঝে মাঝে মামা আমার জন্য পাত্রের সন্ধান আনেন। বার কয়েক আমাকে সেজেগুজে পাত্রপক্ষের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। কিন্তু পাত্রের নমুনা দেখে আমার মন একেবারে বিগড়ে গেছে। আমি মনকে জোর করে বুঝিয়েছি বিধাতার যদি ইচ্ছে থাকে তবে এর হাতে পড়েই

আমি সুখী হবো, আমার ভাগ্যে যা আছে তাই মেনে নেবো, কিন্তু দাবি-দাওয়ায় বনেনি বলে সে সব সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে। আমি মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। মামা চান আমাকে একেবারে শাঁখা সিঁদুরে পার করতে, কিন্তু তেমন পাত্র এখনও জোগাড় করতে পারেন নি।

সেদিন বিকেলে আমি চা খাবার করছি, মামীমা বসে রুটি বেলে দিচ্ছেন, এমন সময় পিসী পিসী বলে ডাকতে ডাকতে একজন একেবারে রান্নাঘরে এসে হাজির।

মামীমা বললেন—আরে, বিমান যে! তুই কবে এলি?

দু'দিন হলো অফিসের কাজে এসেছি। থাকার ব্যবস্থাও ওরাই করেছে।

রাত্তিরে এখানে দুটি খেয়ে যাস্। চল্ ওঘরে গিয়ে বসি। রান্নাঘরে বড় গরম।

না না, এখানেই ভালো, তুমি তোমার কাজ কর না। এখানে বসেই গল্প করবো।

লোকটা ঘন ঘন আমার দিকে তাকাচ্ছিলো। আমি অস্বস্তিতে ঘেমে উঠছিলাম। 'ওদের চা দিয়ে আসছি' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আমি হাঁফ ছাড়লাম।

যেতে যেতে শুনলাম বিমান জিজ্ঞাসা করছে, মেয়েটা কে গো পিসী?

বিমান প্রায়ই আসে। মাঝে মাঝে রাত্তিরে খেয়ে যায়। আমি বুঝতে পারি ওর দৃষ্টি সব সময় আমাকে যেন বিঁধে রাখে। আমি যতো এড়াতে চাই ও কোনো-না-কোনো ছুতো ধরে আমার কাছে হাজির হয়। সেদিন মামীমাকে দিয়েই তার চা পাঠিয়ে দিয়েছি। রান্নাঘরে কাজ করছি, ঘরে আর কেউ নেই, বিমান চায়ের কাপ হাতে এসে হাজির—ইরা, চায়ে আর একটু চিনি মিশিয়ে দাও তো!

কাপটা বিমানের হাতে। আমি এক চামচ চিনি নিয়ে মিশিয়ে দিচ্ছিলাম, বিমান খপ্ করে আমার হাতটা চেপে ধরলো। আমি চাপা গলায় বললাম—ও কি হচ্ছে! হাতটা ছাড়ুন।

হাত ছেড়ে দিয়ে বিমান চলে গেলো।

বিমান বাড়ি এলেই আমি টের পাই ও তক্কে তক্কে—থাকে আমাকে

কখন একলা পাবে, আমিও সেই বুঝে এমন ভাবে থাকি যেন কখনও আমাকে একা না পায়। বিকেলের রুটি করার ভার আমার উপর। আমি জানি, বিমান ছলছুতো করে রান্নাঘরে আসবেই, তাই আগেভাগেই মামীমাকে বলে রাখি—মামীমা, রুটিগুলো একটু বেলে দিয়ে যাও তো। আমি একা পেরে উঠছি না।

সেদিন বিকেলে মামীমা গা ধুতে বাথরুমে ঢুকেছেন, বাড়িতে আর কেউ নেই, কেউ তখনও ফেরেনি, এমন সময় বিমান এলো, আমি প্রমাদ গণলাম, তাড়াতাড়ি বললাম—মামীমা গা ধুতে গেছেন। এক্ষুণি আসবেন। আপনি ওঘরে একটু বসুন।

বিমান মোড়া চেপে রান্নাঘরে বসে পড়ে বললো—কেন, এখানেই বসি না কেন? তুমি দেখছি আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচো।

—বাঃ, আমি আপনাকে তাড়াবার কে?

এত দূরে দূরে থাকো কেন? একটু কাছে বসে গল্প করলে কি দোষ হয়?—বলতে বলতে বিমান উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো—আমি যে তোমাকে দেখতেই বার বার ছুটে আসি ইরা।

আমি কোনো রকমে বিমানের কবলমুক্ত হয়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার কান দু'টো ঝাঁ ঝাঁ করছে। শরীরের সব রক্ত বুঝি মাথা আর মুখে জমা হয়েছে। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললাম—আপনি সুযোগ পেলেই আমাকে এমন অপমান করেন কেন? আমি অসহায় বলে?

—না না ইরা, অপমান নয়। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আমি এবার চাপা কঠিন গলায় বললাম—তাই যদি হয় বিয়ে করতে পারবেন আমাকে? অন্যান্য প্রাপ্তিযোগ কিন্তু একেবারে শূন্য। করবেন?

আমি এমন একটা প্রশ্ন করতে পারি এটা বিমানের হয়তো ধারণার অতীত ছিলো। থতমত খেয়ে সে বললো—বিয়ে! হ্যাঁ—তা—

—শুনুন, আর কোনোদিন এমন করলে আমি কিন্তু চেঁচাবো। ইতিমধ্যে মামীমা বাথরুম থেকে এসে পড়ায় নাটকের ইতি। এরপর বিমান আর আমাকে বিরক্ত করেনি।

সেদিন সন্ধ্যার পর আমার হাতের কাজ মিটে গেলে ভাবলাম—যাই, ছাতের থেকে একটু ঘুরে আসি। মামীমার ঘরের পাশে ছাতের সিঁড়ি।

ঘরের ভেতর বিমান মামীমার সঙ্গে গল্প করছে। যেতে যেতে হঠাৎ আমার কানে এলো বিমান হেসে হেসে বলছে—জানো পিসী, মেয়েটা আমাকে বলে কিনা, আপনি আমাকে বিয়ে করুন না। করবেন?

ইরু, ইরু তোকে একথা বলেছে?—মামীমার বিস্মিত কণ্ঠ।

তবে আর বলছি কি!—তেমনি বিদ্রূপের হাসি বিমানের গলায়—আবার বলে, কিচ্ছু কিন্তু পাবেন না। একেবারে শূন্য হাতে শুধু শাঁখা সিঁদুরে আমাকে নিতে হবে। করবেন আমাকে বিয়ে?

মামীমার সাড়া পাওয়া গেলো না। বোধ হয় বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছেন। আর আমি এদিকে অবশ হয়ে গেছি। পা দু'টো পাথর।

বিমান তখনও বলে চলেছে—তোর মতো একটা হাড়-হাভাতে মেয়েকে আমি বিয়ে করতে যাবো কেন? ত্রিকূলে কেউ নেই অপয়া একটা মেয়ে! কত ভালো ভালো সম্বন্ধ আসছে। মেয়ের বাপেরা বাবার কাছে ঝুলোঝুলি করছে। তাই পাত্তা দি'না!

বিমান চলে গেছে। কিন্তু মামীমার মুখ সেই থেকে পাথর কঠিন।

বিমান-পর্বের কিছুদিন পরই শুরু হলো দেবাশিস পর্ব। মামার বন্ধুর ছেলে দেবাশিস। সেই সূত্রেই এ বাড়িতে আসা যাওয়া। দেবাশিস প্রিয়দর্শন ভদ্র শান্ত। আমি বুঝতে পারি মামা মামীমা তাকে নিয়ে কোনো স্বপ্ন দেখেন।

বিধাতা আমাকে অনেক দিকেই ভাগ্যহীন করেছেন কিন্তু রূপ দিতে কার্পণ্য করেন নি। দেবাশিসের মুগ্ধ দৃষ্টি আমার উপর পড়েছে আমি টের পাই। কিন্তু সে বিমানের সগোত্র নয়। সংযত আচরণ বজায় রাখতে জানে। ওরা সবাই একসঙ্গে বসে গল্পগুজব করে দেবাশিস এলে। আমি সেখানে অনুপস্থিত থাকি। তার চা-খাবার মামীমা নিজে নিয়ে দেন। কদাচিৎ কোনো কারণে সামনে পড়ে গেলে দেবাশিস হেসে আমন্ত্রণ জানায়—আসুন না আমাদের গল্পের আসরে। আপনি শুধু পালিয়ে বেড়ান।

আমার কাজ আছে—বলে আমি আবার পালাই। কারণ আমি বুঝতে পারি মামীমা চান না আমি দেবাশিসের সান্নিধ্যে বেশি যাই।

সেদিন মামীমার আসতে দেরি হচ্ছে এবং চা-ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে দেখে

আমিই দেবাশিসের চা-খাবার নিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় মামীমা এসে ছোঁ মেরে ট্রেটা আমার হাত থেকে নিয়ে কঠিন মুখে বললেন—তুমি ওর সামনে না গেলেই ভালো। তোমার তো আবার রোগ আছে—হয়তো বলে বসবে, তুমি আমাকে বিয়ে কর। জেনে রেখো ওর সঙ্গে আমরা মিন্তির বিয়ে দেবো বলে ঠিক করেছি।

অসহ্য লজ্জায় অপমানে আমার দু'কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো। বলার আমার অনেক কিছুই ছিলো কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না। বললে কি মামীমা তা বিশ্বাস করবেন? বিমান যে তাঁর ভাইপো।

সেদিন সারারাত আমি কাঁদলাম। মাকে মনে ক'রে, বাবাকে মনে করে। অসহায় ভবিষ্যতের কথা ভেবে। এতোটুকু আলোর রেখাও যে আমার সামনে নেই! নিজের এই দুঃসহ অবস্থা থেকে কি করে মুক্তি পাবো যখন পাগলের মতো একথা ভাবছি তখন একটা জিনিস আমার চোখে পড়লো। পত্রিকায় কর্মখালির বিজ্ঞাপনে দেখলাম মফঃস্বল শহরে একটা অনাথ আশ্রমে অনাথ শিশুদের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন মহিলা কর্মী চাই। যোগাযোগ করার ঠিকানাটা কলকাতায়ই। এবং খুব বেশি দূরেও নয়।

লুকিয়ে একখানি আবেদনপত্র লিখে 'আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আসি' বলে বাড়ি থেকে বেরোলাম।

মামীমা প্রশ্ন করেছিলেন—তোর আবার বন্ধু কে?

আমি মৃদুকণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম—আমার বুঝি কেউ থাকতে নেই?

মামীমা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গিয়েছিলেন। বাধা দেন নি। যথাস্থানে গিয়ে কর্তৃপক্ষ স্থানীয় প্রবীণ এক ভদ্রলোকের কাছে অনুনয়ে ভেঙে পড়লাম—আমি নিজেও অনাথ। আপনাদের অনাথ আশ্রমে আমার একটু আশ্রয় চাই। আমি বড় অসহায়। ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—দরখাস্ত রেখে যান। আমি আপনার জন্য বলবো, দেখি কি করতে পারি। তারপর থেকে আমার কাজ হলো লেটার বক্সের দিকে চোখ রাখা। যদি কোনো চিঠি আসে আর অন্যের চোখে পড়ে যায় তাই ভেবে শঙ্কিত হয়ে থাকি। অবশেষে চিঠি এলো। তারা আমাকে কাজে ডেকেছেন।

এক সপ্তাহের মধ্যে কাজে যোগ দিতে হবে। আমি সবাইকে না জানিয়ে চুপিচুপি চলে যাবো স্থির করলাম।

যতো দিন যায় ততো আমার অস্থিরতা বাড়ে। কাজকর্ম এলোমেলো হয়ে যায়। মামীমা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন—তোর কি হয়েছে বলতো!

পরদিন ভোরে ট্রেন। সারারাত ঘুমোলাম না। একটা স্যুটকেসে কয়েকটা জামা-কাপড় নিয়ে শেষ রাতের হালকা অন্ধকারে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে। আলোও জ্বালালাম না পাছে মিন্টুর ঘুম ভেঙে যায়। বালিশের নিচে চিঠি লিখে রেখে এলাম—আমার খোঁজ করো না। আমি একটা ভালো কাজ ও নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছি। খোঁজ পেলেও আমি আর ফিরবো না।

নতুন জায়গায় এসে সাতদিন কেটে গেছে। বেশ ভালোই লাগছে এ কাজ। অনাথ শিশুগুলোর উপর এর মধ্যেই একটু মায়া পড়ে গেছে। সবচাইতে বড় কথা, আমি যেন এক অসহায় বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি। নিশ্বাস নিতে পারছি প্রাণভরে।

সেদিন বিকেলে আশ্রমের সামনের উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিলাম এমন সময় গেট ঠেলে যে ভেতরে ঢুকলো তাকে দেখে আমার বুকের রক্ত চলকে উঠলো। সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের শিহরণ। দেবাশিস!

দেবাশিস আমার দিকে এগিয়ে এলো। বললো—ইরা, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

আমি বিস্ময়বিহ্বল গলায় বললাম—আপনি আমার সন্ধান পেলেন কি করে!

সেদিন তোমাদের বাড়ি গিয়ে সব জানতে পারলাম। তোমাদের ঝি চুপিচুপি আমাকে বললো—দিদিমণি তোমার সঙ্গে কথা বলতো বলে মা বকাঝকা করলেন! দিদিমণি খুব কাঁদলো। মনে হয় সেই দুঃখেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তোমাদের ঘরে টেবিলের উপর একটা পুরনো খবরের কাগজ পড়েছিলো। সেটা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে চোখে পড়লো একটা চাকরির বিজ্ঞাপনের পাশে কালির দাগ। সন্দেহ হলো। বিজ্ঞাপনে যোগাযোগের যে ঠিকানা ছিলো সেখানে খোঁজ নিতেই তোমার

সন্ধান পেয়ে গেলাম। নইলে, আমার জন্য তোমাকে বাড়ি ছাড়তে হয়েছে এ আফশোষ আমি রাখতাম কোথায় ?

আমার নিশ্বাস মন্থর হয়ে এসেছিলো। ঝাপ্‌সা গলায় বললাম—শুধু এজন্যই আমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন ?

দেবাশিস গভীর গলায় বললো—ইরা, আমি তোমাকে ভালবাসি।

—কিন্তু মামা মামীমা যে মিন্তির সঙ্গে—

—না, তা হয় না, মিন্তি সব জানে। চলো ইরা। আমার মা তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন।

দেবাশিস আমার হাত ধরলো।

আঃ, আকাশ মধু, বাতাস মধু। পৃথিবী কি সুন্দর ?

আমার দুঃখের সমুদ্র মুহূর্তে অমৃতসমুদ্রে রূপান্তরিত হলো। একসঙ্গে হাজার আলো জ্বলে উঠলো আমার অন্ধকার জীবনে। সৌভাগ্যের ডালে ডালে হাজার ফুল ফুটলো। অশ্রুনদীর তীরে বসে এতোদিন ভগবানকে শুধু অনুযোগই করেছি। আজ তাঁকে মনে মনে গভীর কৃতজ্ঞতা জানালাম।

সুনীলার মন

বৈকালিক প্রসাধন সেরে সুনীলা তেতলার ঝুল বারান্দায় এসে বসলো।

ঝি কিরণ বললো—মা, তোমার চা এখানে নিয়ে আসি।

আনো।

কিরণ চা এবং সেই সঙ্গে হালকা কিছু খাবার ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে এলো। সুনীলার পাশে বেতের ছোটো টেবিলের উপর সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল। সুনীলা খাবারের ডিস টেনে নিয়ে অল্প কিছু খাবার দু'চার বার মুখে তুললো। তারপর কাপে চা ঢেলে প্রয়োজন মতো চিনি মিশিয়ে নাড়তে লাগলো।

মাথাটা টিপ টিপ করে ব্যথা করছে। বোধ হয় সারা দুপুর বই পড়েছে বলে। চোখে বেশি জোর দিলেই সুনীলা দেখেছে তার মাথা ধরে। দেখা যাক—চা খেয়ে ছাড়ে নাকি!

বই না পড়ে করবেই বা কি! দু'হাতে ঠেলে যেন দিনগুলোকে সে ফুরোতে পারে না। সময় কাটতে চায় না। আর অজস্র—অজস্র সময়।

সংসারের কাজ কিছুই করতে হয় না। ঠাকুর আছে, রান্না করে। চাকর আছে, ঝি আছে অন্যান্য যাবতীয় কাজ ওরাই করে। সুনীলার কাজ শুধু একটু দেখাশোনা করা। ছেলেমেয়েরা দশটার মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। ছেলের কলেজ, দু'মেয়ের স্কুল। বিকেলের দিকে তাদের ক্লাব, খেলাধুলা, নাচের স্কুল, গানের ক্লাস। কাজেই সুনীলা সারাদিনই একা। আগে সেও বিকেলের দিকে এখানে ওখানে বেরিয়ে যেতো। আজকাল আর ভালো লাগে না। বাড়িতেই থাকে সারাক্ষণ।

একা! চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে দীর্ঘশ্বাস ফেললো সুনীলা।

সুরজিৎও আজকাল কতো দূরে সরে গেছে। তার ব্যবসা দিনে দিনেই বাড়-বাড়ন্ত হচ্ছে। সকাল আটটায় বেরিয়ে যায় ফেরে রাত বারোটায়। আর যে অবস্থায় ফেরে তখন তার মধ্যে সুরজিৎকে খুঁজে

পায় না সুনীলা। দেখে বুকের ভেতরটা পুড়ে যেতে থাকে তার কিন্তু ছেলেমেয়ের কাছে ব্যাপারটা চাপা রাখার জন্য অনেক যন্ত্রণা অনেক অপমান দাঁত চেপে সহ্য করে সে।

যখন সুরজিতের সঙ্গে সুনীলার বিয়ে হয় তখন তারা বাস করতো ভাড়া বাড়িতে। তখনও সুরজিতের ব্যবসাতে মন্দ আয় ছিল না। তবে এতোটা ফুলে ফেঁপে ওঠে নি। এখন মোজেইক করা তেতলা বাড়ি হয়েছে। সেই অনুযায়ী আসবাবপত্র, বোলচাল, ঝি চাকর ঠাকুর—সবকিছু। মা বাবা দাদা বৌদি বেড়াতে এসে সুনীলার এতো ঐশ্বর্য দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, তৃপ্তিতে প্রশান্ত হন। সুনীলা তাদের এই শান্তি ভেঙে দিতে চায় না।

বৌদি মণিকা বলে—ঠাকুরঝি, তোমার চিরদিন এমনি বাড়-বাড়ন্ত হয়েই চলুক। কিন্তু একে কি বলবো ? তোমার ভাগ্য না সুরজিৎবাবুর পুরুষকারের জয়জয়কার ?

সুনীলা হেসে বলে—তোমার যা খুশি।

মা বলেন প্রায় প্রতি কথায়ই—আমি ঠিকই বুঝেছিলাম সুরজিতের যোগ্যতা আছে। সে ভবিষ্যতে উন্নতি করবে। ওর বাবা তো ঝুঁকেছিলেন এক প্রফেসর পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে। ভাগ্যিস হয় নি, তাই আজ ভাগ্যের দান ওর দু'হাত উপচে পড়ছে। কি পেতো সে ওই প্রফেসরের ঘরে যদি ওখানে বিয়ে হতো ?

সুনীলা ভাবে—সবাই তার বাইরের ঐশ্বর্যটাই দেখে। তার মন যে দেউলে হয়ে যাচ্ছে সেটা কারও চোখে পড়ে না।

তাই সুনীলার মনের মধ্যে যখন যন্ত্রণার রক্ত ক্ষরণ হয় তখনও চেষ্টাকৃত হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে রাখতে হয়।

বুকের ভেতরটা যখন খুব ফাঁকা লাগে তখনও সুনীলা তার অভাব বোধের কথা স্বামীকেও জানাতে পারে না। সুরজিৎ তিক্ত কণ্ঠে শুনিয়ে দেয়—তোমাকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরিয়ে দিই নি আমি ? এতো পাবার পরও তোমার ঐ ভিখিরির মতো ঢঙ সহ্য হয় না আমার।

সুরজিৎ হয়তো ভাবে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দিয়ে মানুষের হৃদয়ের সব ফাঁক-ফোকর ভরিয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু মা বাবা যে জামাইয়ের কৃতিত্বে এমন পঞ্চমুখ তাঁদের চোখে কি

এটাও পড়ে না যে আজ কতদিনের মধ্যে সুনীলা সুরজিতের সংগে বাপের বাড়ি যায় না। তাঁরা হয়তো ভাবেন—কর্মব্যস্ততা। কিন্তু হৃদয়ের তাগিদ থাকলে এই কর্মব্যস্ততাকে একটু সময়ের জন্যও কি দূরে সরিয়ে রাখা যায় না?

শুধু বাপের বাড়ি কেন, কতো বছরের মধ্যে সুরজিতের সংগে একটা সিনেমাও কি সে দেখতে গেছে? সুরজিতের সময়ের অভাব। আর ব্যবসার কাজে—সুরজিৎ তো তাই বলে, যখন সে দিল্লী বোম্বে ঘুরে বেড়ায় তখনও সুনীলা তার সংগিনী নয়। তবে সে সময় সংগিনী যে একজন থাকে সুনীলা তা জানে। কিন্তু বলে লাভ কি। সুনীলার মনে পড়ে একই সংগে দুটো বিয়ের প্রস্তাব চলছিলো তার। এক পাত্র সুরজিৎ ঘোষ অন্যজন রণেন চৌধুরী, কোনো এক কলেজের লেকচারার ছিলো সে। পাত্রী দেখতে এসে সুরজিৎ ছটফটিয়ে কথা বলেছিলো। নিজের ব্যবসার বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ছবি বেশ উজ্জ্বল করে সবার সামনে তুলে ধরতে পেরেছিলো। সপ্রতিভতার জেল্লায় বাড়ির সবার মনে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলো। আর রণেন চৌধুরী? পাত্রী দেখতে এসে লাজুক লাজুক মুখে বসেছিলো একটা ম্যাগাজিনের আড়ালে মুখ লুকিয়ে। তবে সুনীলার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিলো সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় নি তার। বুদ্ধির দীপ্তির সংগে শান্ত নম্রতার অপূর্ব সংমিশ্রণ। খুব ভালো লেগেছিলো সুনীলার। কিন্তু বাড়ির সবাই পছন্দ করলো সুরজিৎকে।

সুরজিৎ ঘোষের কাছে হেরে গিয়েছিলো সেদিন রণেন চৌধুরী।

বাড়ির গাড়িটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় সেদিন বিকেলে ট্যাক্সির অপেক্ষায় রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিলো সুনীলা। এমন সময় দেখা কলেজের বান্ধবী আরতির সংগে।

আরে সুনীলা, তুই?

কে? আরতি না? আশ্চর্য!

কতোদিন পর দেখা। আজ তোকে ছাড়ছি না। চল আমার বাড়িতে। এই তো, কাছেই।

আজ থাক। আর একদিন যাবো।

কিন্তু আরতি ছাড়লো না। জোর করে ধরে নিয়ে গেল।

ছিমছাম দু'কামরার ফ্ল্যাট। সাজানো গোছানো। সুনীলা যে ঘরে বসলো সে ঘরে সাজানো রয়েছে প্রচুর বইপত্র। সুনীলা বললো—অনেক বইপত্র দেখতে পাচ্ছি।

আরতি বললো—অধ্যাপক মানুষ কিনা। খুব পড়াশোনার ঝোঁক।

আরতির এক ছেলে এক মেয়ে। সে ডাকলো ওদের—বাবলু, মিতুন, এদিকে এসো। মাসীমাকে প্রণাম করো।

সুনীলাকে প্রণাম করে ওরা মা'র পাশে বসলো। মেয়ে মায়ের চেয়ারের হাতলে বসে মা'র গলা জড়িয়ে ধরলো। আরতি হেসে বললো—কিছু মনে করিসনে ভাই, ওরা মাথায়ই যা বড় হয়েছে কিন্তু পারলে এখনও মায়ের কোলে বসতে চায়।

মেয়ে লজ্জা পেয়ে ফিক্ করে হেসে মায়ের কাঁধে মুখ লুকোলো।

ছেলে বললো—ও তোমার আদুরে মেয়েকে বলো। আমি নই কিন্তু।

আরতি হেসে বললো—সুযোগ পেলে তুমিও বড়ো কম যাও না।

তারপর মেয়ে গেল চায়ের জল চাপাতে। ছেলে গেল মিষ্টি আনতে।

সুনীলার বুকের ভেতর একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেনিয়ে উঠলো, পড়লো। বললো—ভদ্রলোক কখন বাড়ি ফেরেন?

কলেজের পর টিউশানি সেরে ফেরেন কিনা তাই একটু দেরি হয়। এমন মানুষ ভাই ঐ কলেজ আর ছেলেপড়ানো ছাড়া একা যদি কোথাও যাবেন! যেখানেই বেড়াতে যান সবাইকে নিয়ে যাবেন। বিয়ের পর আমাকে ছাড়া একা একটা সিনেমাও দেখেন নি বোধ হয়।

আরতির মুখে গভীর শান্তির কোমল ছায়া।

সুনীলা আবার চেপে চেপে একটা নিঃশ্বাস ফেললো।

চা পানের পর বসে বসে আরও খানিকক্ষণ গল্পগুজব হলো। পুরানো দিনের অর্থাৎ কলেজ জীবনের গল্প। কথা বলতে বলতে টেবিলের উপর থেকে একখানা বই তুলে নিলো সুনীলা। মলাট খুলতেই এক জায়গায় চোখ দু'টো তার যেন আটকে গেল। সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা রয়েছে—রণেন চৌধুরী।

বুকের ভেতরটা ধ্বক্ করে উঠলো। তাই দেয়ালের গায়ে টাঙানো

ভদ্রলোকের ছবিটা চেনা লাগছিলো এতোক্ষণ।

সুনীলা উঠে দাঁড়ালো। এবার পালাতে হবে। যদি ভদ্রলোক তাকে দেখে চিনে ফেলেন! আর সেও কিছুতেই ভদ্রলোকের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে না।

আরতিকে একদিন তার বাড়িতে আসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে পালিয়ে এসেছিলো সুনীলা।

আরতি আমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলো। সুনীলার এমন চমৎকার বাড়ি ও সেই বাড়িতে ঐশ্বর্যের এমন সুচারু আলপনা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলো। অন্যান্যদের মতোই সেও বলেছিলো—তুই সত্যি ভাগ্যবতী সুনীলা!

সুনীলা মনে মনে বলে—আরতি, তুই জানিস না তোর ঘরে যে পরম ঐশ্বর্য রয়েছে তার এক কণা পাবার জন্য আমার মন কতো কাঙাল। তোর ঘরখানার সঙ্গে যদি আমার এই ঘরটা বিনিময় করতে পারতাম। ভাগ্য দামী দামী রত্নগুলো তোর ঘরেই দিয়েছে রে। আমাকে ভোলাতে চেয়েছে তাল তাল নকল সোনা দিয়ে। এ কথা অন্যরা বুঝতে পারে না। কিন্তু আমি তো বুঝি। আমি দেখতে পাচ্ছি মা'র হিসেবটা আজ কি সাংঘাতিক রকম ভুল হয়ে গেছে।

মূল্যায়ন

কথাটা শুনে প্রথমে ছোট্ট করে হেসে ফেললো সুনন্দা। তারপর ব্যাপারটাকে আরও তলিয়ে বুঝে নিয়ে আবারও হেসে উঠলো। বললো—আমি? আমি যাবো—

ভ্রূকুঞ্চিত করে অভিজিৎ বললে—বোকার মত হেসো না। মাথায় তো মগজ বলে কিছু নেই। আজ না হয় ঝাড়া-হাত পা। শাড়ির আঁচল দুলিয়ে বেড়াচ্ছো। মাটিতে পা ঠেকছে না, হাওয়ায় উড়ছো। কিন্তু চিরটাকাল তাই থাকবে? তিনচারটি ছেলেমেয়ে হলে—

উঁহুঁহুঁ, হবে না, হবে না। দু'টি। শুধু দু'টি। দুই আঙ্গুল দেখিয়ে সংখ্যা নির্দেশ করলো সুনন্দা। চোখ কান নেই তোমার? এত প্রচার বিজ্ঞাপন দেখতে পাও না? শুনতে পাও না? সুখের সংসার সীমিত পরিবার—

ফাজলামি রাখো তো, একটু সিরিয়স হও, দু'টি ছেলেমেয়েকে ভালো ভাবে মানুষ করাওতো, আজকালকার দিনে চাট্টিখানি কথা নয়। এমন কোনো অফিসারের হাতে পড়োনি তুমি। তাছাড়া—হক্ ছাড়বে কেন?

হক্? আমাকে গিয়ে দাদাদের কাছে বলতে হবে—বাবা যা কিছু বিষয় সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন তার তিন ভাগের এক ভাগ আমার পাওনা। আমার পাওনাগণ্ডা আমাকে মিটিয়ে দাও। ও মাগো—আবার হেসে ওঠে সুনন্দা!

থামো! এবার ধমকে ওঠে অভিজিৎ। আইন হয়ে গেছে পৈত্রিক সম্পত্তিতেও ছেলেমেয়ের সমান অধিকার। তোমার বাবা প্রচুর পয়সা, বাড়ি রেখে গেছেন। তোমার দুই দাদার সঙ্গে তুমিও তাতে সমান অধিকারী। তোমার পাওনা থেকে কেন তুমি বঞ্চিত থাকবে?

দাদারা আমাকে অনেক পয়সা খরচা করে বিয়ে দেননি?

বিয়ে দেবে না তো কি আইবুড়ো রেখে সারা জীবন ঘরে পুষবে? ভেবে দেখো অমন বাড়িখানা—

সুনন্দা ভাবতে বসে।

দুই দাদার একটিমাত্র বোন সে। দাদাদের চেয়ে অনেক ছোটো। তার খুব ছোট বয়সে বাবা মারা গেছেন। কিন্তু সে জন্যে আদর কমতি পড়েনি। দুই দাদাই অজস্র স্নেহ আর সতর্ক দৃষ্টিতে তার জীবনের সব অভাব পূর্ণ করে রেখেছেন। দেখে শান্তিতে ও তৃপ্তিতে মা'র মন ভরে গেছে।

বড়দা শান্ত-গম্ভীর ধীরস্থির বিচক্ষণ। ছোটদা চঞ্চল প্রগল্‌ভ ভাবপ্রবণ। কিন্তু স্বভাবের এই তারতম্য ছোট বোনের প্রতি স্নেহে কোনো ঘাটতি সৃষ্টি করতে পারেনি। শুধু তার প্রকাশভঙ্গীটা ছিলো ভিন্ন ধরনের।

কোনো উপহারসামগ্রী এনে বড়দা ডাকতেন—নন্দা, এদিকে আয় তো। কাছে এলে মাথায় একটু স্নেহস্পর্শ রেখে হাতে জিনিসটা দিয়ে বলতেন— দেখতো কেমন হলো। তোর পছন্দ হয় কি না। আর ছোটদা! নন্দা, নন্দা বলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে বাড়ি ঢুকতো। হাঁকডাক শুনে সুনন্দা ব্যস্ত পায়ে ছুটে এলে হয়তো তার বিনুনীটা জোরসে টেনে নয়তো মাথায় ঠক করে একটা চাঁটি মেরে তার সামনে প্যাকেটটা ফেলে দিয়ে বলতো—এই নে।

সুনন্দা বিনুনী সামলাতে সামলাতে বলতো—উহুঁহুঁ, ছাড়ো ছাড়ো লাগে। চাইনে যাও। কিছু চাইনে আমার। ছাড়ো—

চাইনে! ঠিক আছে, দে, ফিরিয়ে দি'—

সুনন্দা কাঁদো কাঁদো গলায় বলতো—ইস্! তাহলে শুধু শুধু এমনি করে চুল টানলে কেন? দিচ্ছি আর কি ফিরিয়ে—

একই ব্যাপারে দু'জনের কৌতুক করার নমুনাও ছিল ভিন্ন রকম। মা বুঝি দু'ছেলেকেই ডেকে কিছু বলেছেন। তারপর বড়দার জন্য চা নিয়ে গেছে সুনন্দা। বড়দা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—এখানে একটু দাঁড়াতো নন্দা। বেশ সোজা হয়ে।

কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে সুনন্দা বেশ টানটান হয়ে বড়দার সামনে দাঁড়ালো।

বড়দা গম্ভীরভাবে তার আপাদমস্তক বারবার নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

শঙ্কিত কণ্ঠে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করলো—কি হয়েছে বড়দা।

বড়দার চোখেমুখে কৌতুকের চাপা হাসি চিক্ চিক্ করে উঠলো। বললেন—না, মা বলছিলেন কি না তুই নাকি বড়ো হয়ে গেছিস্, তাই দেখছি কতোটা বড়ো হয়েছিস।

ধ্যাৎ! হেসে পালালো সুনন্দা।

আর ছোটদা—

সুনন্দা দাঁড়িয়ে আছে জানালার কাছে, হঠাৎ ছোটদা কোথা থেকে একটা ময়লা ছেঁড়া দড়ি জোগাড় করে এনে সুনন্দার মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাপতে লাগলো।

সুনন্দা হাঁ হাঁ করে উঠলো—ওকি ছোটদা, ওকি। ওই ঝুলকালিমাখা দড়িটা আমার গায়ে ঠেকাচ্ছো কেন? মাগো—

চুপ করে দাঁড়া। মা বললেন কিনা—তুই নাকি বড়ো হয়েছিস এবার তোর বিয়ে দিতে হবে, তাই মেপে দেখছি কতো বড়ো হয়েছিস।

সুনন্দা কৃত্রিম কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো—উঁ, সব সময় শুধু আমার পেছনে লাগা। একবার বড়দা একবার তুমি—

বড়দা কিছু বলেছেন না কি! কি বলেছেন রে!

জানি না, যাও। সুনন্দা পালালো। জানে, না পালানো পর্যন্ত নিস্তার নেই।

দুই দাদার অকৃত্রিম চেষ্টায় সাধ্যাতিরিক্ত আড়ম্বরে সুনন্দার বিয়ে হলো।

মা অজস্রধারায় কাঁদলেন। যতো মেয়ের বিচ্ছেদ-বেদনায় ততো ছেলেদের আন্তরিকতা দেখে। স্বামীকে স্মরণ করে মনে মনে বললেন—দেখো তোমার ছেলেরা কতো নিষ্ঠায় তোমার কর্তব্য পালন করছে। শুধু দাদারাই বা কেন, বৌদিরাও আন্তরিকতায় কম যান কি! বড় বৌদির বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। তার দুটি ছেলে। একটি দশ বছরের আর একটি আট বছরের। ছোটো বৌদির বছর তিনেকের একটিমাত্র মেয়ে। বড়ো বৌদিকে সুনন্দা শ্রদ্ধা করে আর ছোটো বৌদি তার সখী। গলায় গলায় ভাব।

সুনন্দার বিয়ের বছরখানেক পরেই মা মারা গেলেন। তারপর থেকে দাদারা যেন আরও ব্যাকুল স্নেহে তাকে কাছে টানেন। পাছে

সে মনে করে মা নেই বলে বাপের বাড়িতে দরদের অভাব।

একবার নানা কারণে বেশ কিছুদিন যেতে পারেনি সুনন্দা। বড়দা এসে হাজির। গভীরকণ্ঠে বললেন —কিরে নন্দা, মা নেই তাই বুঝি আর যাস না? বৌদিরা তেমন আদর করে না বুঝি। বড়দা স্নেহাবেগে কেমন এক গভীর দৃষ্টিতে সুনন্দার দিকে তাকান।

সুনন্দার বুকটা দুলে ওঠে। ইচ্ছে হয় বড়দার পায়ে লুটিয়ে একসঙ্গে সাতটা প্রণাম করে।

তারপর আসে ছোটদা। হৈ-হৈ করে বাড়ি মাথায় তোলে—এই নন্দা, খুব পায়া ভারী হয়েছে দেখছি। অনেকদিন যাচ্ছিস না যে বড়ো। ওদিকে তোর ছোট বৌদির তো পেট ফুলে ঢোল।

সুনন্দা সচকিত হলো। তবে কি ছোটো বৌদির আবার—। ছোটদা-টার তো মুখের আগল নেই। সব বলতে পারে। কিন্তু নিজের কৌতূহল ও খুশির উচ্ছ্বাস দমন করেও রাখতে পারে না। সঙ্কোচ কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করে—ছোটো বৌদির আবার বাচ্চা হবে বুঝি!

আরে ধ্যাৎ! ছোটদার দু'চোখে তিরস্কার ফুটে উঠলো—গাধা! দু'হাত প্রসারিত করে পরিমাণ দেখিয়ে বলে—এত কথা জমেছে তোর ছোটো বৌদির পেটে। ঝুড়ি ঝুড়ি কথা। তুই যাচ্ছিস না তাই বলতেও পারছে না। পেট ফুলে মরবার জোগাড়। মানুষটাকে হত্যা করতে না চাস যদি তো যাস। বুঝলি?

এদিকে সুনন্দারও হাসতে হাসতে পেট ফেটে মরবার জোগাড়।

অভিজিৎ বলে কি? এই দাদাদের সঙ্গে সুনন্দা পয়সা নিয়ে মামলা করবে? দুর্লভ স্নেহের স্বর্গীয় যে অমৃত অহরহ পান করে সুনন্দা সঞ্জীবিত হয়ে আছে তার বদলে কিনা দু'পয়সার জলো সরবৎ!

না না, চায় না সুনন্দা।

তুচ্ছ! তুচ্ছ!! তুচ্ছ!!!

অভিজিৎ বলে—বড়দার কাছে কথাটা তাহলে তোমাকেই পাড়তে হয়

দৃঢ়কণ্ঠে সুনন্দা বলে—না, আমি পারবো না।

তবে আমিই বলবো।

তারপর আর এক মুহূর্তও পাবে না আমাকে। জেনো, তুমি যা

চাইছো তার চাইতে আমার দাদাদের স্নেহ অনেক বেশি দামী। সেই অমূল্য স্নেহের মূল্যে একটা বাড়ির একটুকরো অংশ আমি কিছুতেই কিনতে পারবো না। না না, কিছুতেই না।

এ যুগের সাবিত্রী

একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সত্যবান মজুমদারের সঙ্গে স্বর্ণালীর দেখা হয়েছিলো। স্বর্ণালীর বন্ধু ইরার মাসতুতো দাদা সত্যবান। ইরার সূত্রেই এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছিলো যে অনুষ্ঠানে স্বর্ণালী ছিল শিল্পী। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেছিলো সে।

অনুষ্ঠানের শেষে ইরা সত্যবানের সঙ্গে স্বর্ণালীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো। সত্যবান স্বর্ণালীর গানের প্রশংসা করেছিলো এবং বাড়ি ফেরার সময় নিজেদের ট্যাকসিতে স্বর্ণালীকে একটা লিফ্‌ট দিয়েছিলো। প্রথম দিন এই পর্যন্ত।

দৈবের যোগাযোগ। মাসখানেকের মধ্যেই আবার দেখা ট্রামে। বেজায় ভিড়। সিট না পেয়ে স্বর্ণালী হ্যান্ডেল ধরে ঝুলছিলো। ভিড়ের চাপে নাজেহাল। এমন সময় পাশের জেন্টস্‌ সিট থেকে আহ্বান এলো —এই যে আপনি এখানে বসুন। বলে যে ভদ্রলোক স্বর্ণালীকে নিজের সিটটি ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে সত্যবান।

আপনি!

চিনতে পেরেছেন! বসুন।

না না, আপনি বসুন। আমি ঠিক আছি।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। বসুন।

অপ্রতিভ হেসে স্বর্ণালী বসে পড়লো। বললে—আমার খুব খারাপ লাগছে!

স্বর্ণালীর পাশে বসা যুবকটি সত্যবানের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো—আমি এখানে নেমে যাচ্ছি, বসতে পারেন।

সত্যবান ঝুপ করে বসে পড়লো। বললো—বা-বা, বাঁচোয়া। এবার যা হোক দু'টো কথা বলা যাবে।

সেই দিনই মনে রঙ লাগলো দু'জনেরই। সেই দ্বিতীয় দিনেই।

আর এমন অবস্থায় যা হয়। চোখে স্বপ্নের ঘোর, গোটা দুনিয়াটাই রঙিন। আকাশে রঙ, বাতাসে রঙ, সন্ধ্যায় রঙ। প্রতিটি রঙিন সন্ধ্যা

কাটতে লাগলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, আউটরাম ঘাট নয়তো ইডেন গার্ডেন-এ। কোনোদিন সিনেমা হল-এ পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখা।

সেদিন ময়দানে বসেছিলো ওরা দু'জন। বসেছিলো ঘন হয়ে। ওদের বুকে ছিলো তরঙ্গ, গলায় ছিলো আবেগ।

সত্যবান!

কি স্বর্ণা। না, স্বর্ণা নয়। তুমি আমার সাবিত্রী।

সত্যবান!

সাবিত্রী!

প্রয়োজনে নয়, তবু বার বার ডাকার ইচ্ছেতেই ডাকা। বলার মতো কোনো জরুরি কথা নেই তবু অবিশ্রান্ত প্রলাপকূজন।

অস্তগামী সূর্যটা কেমন মুঠো-মুঠো সোনা ঝরাচ্ছে দেখো সত্যবান।

এই কনে-দেখা আলোয় তোমাকে কি অপূর্ব দেখাচ্ছে সাবিত্রী। এই আলোর সোনায় তোমার সিঁথিটা কেমন রাঙা দেখাচ্ছে।

সত্যবান বাঁ হাতে মুঠো করে স্বর্ণালীর একখানা হাত চেপে ধরলো। ডান হাতে স্বর্ণালীর সিঁথির উপর আলতোভাবে আঙুল বুলিয়ে দিয়ে বললো— এই আমি তোমার সিঁথিতে গোধূলির সিঁদুর পরিয়ে দিলুম। আজ আমাদের বিয়ে হলো সাবিত্রী। ঐ অস্তগামী সূর্য পুরোহিত। ঐ আকাশ সাক্ষী।

আবেগজড়িত কণ্ঠে স্বর্ণালী বললো—তোমার জীবনে আমাকে গ্রহণ করলে সত্যবান। সত্যিই গ্রহণ করলে?

হ্যাঁ করলুম। তোমাকে গ্রহণ করলুম। আর আমাকে বিলিয়ে দিলুম। নিঃশেষে বিলিয়ে দিলুম তোমার হাতে। আজ থেকে আমরা বাগ্‌দত্ত।

বাড়ি গিয়ে ডায়েরিতে তারিখটা লিখে রাখলো স্বর্ণালী—নয়ই ফাল্গুন। তারপর আরও কতো রঙিন সন্ধ্যা এখানে ওখানে সেখানে। কতো আলাপ-প্রলাপ। কতো স্বপ্ন, কতো রঙ, কতো প্রতিশ্রুতি।

কিন্তু হঠাৎ একদিন থমকে দাঁড়াতে হলো স্বর্ণালীকে। সে লক্ষ্য করলো সত্যবান অনেকদিন সন্ধ্যার বাসরে অনুপস্থিত।

অফিসে ফোন করে জানলো—সত্যবান দীর্ঘ ছুটি নিয়ে কলকাতার বাইরে গেছে।

বাইরে গেছে! স্বর্ণালীকে না জানিয়ে! কি ব্যাপার!

ভাবলো—নিশ্চয়ই কোনো জরুরি প্রয়োজনে হঠাৎ যেতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্যই সত্যবান চিঠি লিখবে স্বর্ণালীকে এবং তাড়াতাড়ি ফিরেই তার সঙ্গে দেখা করবে।

অপেক্ষার দিন অনেকগুলো কেটে গেলো। কিন্তু না এলো চিঠি, না এলো সত্যবান।

মনে উদ্বেগ দেখা দিলো—সত্যবান ভালো আছে তো? কোনো বিপদ হয়নি তো? তবে কি অফিস থেকে বাড়ির ঠিকানা নিয়ে বাড়িতে খোঁজ করে দেখবে? স্বর্ণালী সত্যবানের বাড়ি চিনতো না।

ময়দানে তাদের চিহ্নিত সেই জায়গাটিতে বসে বসে ভাবছিলো স্বর্ণালী। সেদিন ছিলো নয়ই ফাল্গুন। তাদের দ্বিতীয় বিবাহ-বার্ষিকী। অন্ততঃ স্বর্ণালী তাই মনে করে। বাগ্‌দান মানেই বিবাহ। আগের বছরও এই দিনটিতে ঠিক এই জায়গায় পাশাপাশি বসেছিলো ওরা দু'জন। সে ও সত্যবান। স্বর্ণালী ডেকেছিলো—সত্যবান!

কি সাবিত্রী!

আজকের দিনটি একটি বিশেষ দিন কেন বলোতো?

জানি না তো!

বারে, মনে নেই! আজ যে নয়ই ফাল্গুন। গত বছর এই তারিখে আমাদের বিয়ে হয়েছিলো না!

তাই তো! সত্যবান স্বর্ণালীর হাতটি টেনে নিজের কপালে বুলিয়ে নিয়ে বলেছিলো—চলো তাহলে, আজ কোনো রেস্তোরাঁয় বসি নয়তো একটা ভালো ছবি দেখে আসি।

না না, আজ আর কিছু নয়। এই পাশাপাশি বসে থাকা, দু'জন দু'জনকে অনুভব করা—এই ভালো।

সত্যবান গলায় আবেগ এনে বলেছিলো—সাবিত্রী, আমার সাবিত্রী। কবে যে সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তোমাকে আরও একান্ত করে পাবো। স্বর্ণালী সেই স্মৃতি-চারণে ডুবে গিয়েছিলো।

সত্যবানের বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করবে বলে অফিসে ফোন করেছিলো স্বর্ণালী। জানতে পারলো সত্যবান ফিরে এসে কাজে জয়েন করেছে তবে অন্য ডিপার্টমেন্টে বসে। অন্য একটা নাম্বার দিয়ে তাকে

বলা হলো সেই নাম্বারে ফোন করলে সত্যবানকে পাওয়া যাবে।

ফিরে এসেছে! অথচ দেখা করেনি। অভিমানে বুক উদ্বেল হয়ে উঠলো। রইলো বাড়ির ঠিকানা। রইলো ফোন নাম্বার।

অভিমানের সমুদ্রটা তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে হৃদপিণ্ডের উপর আছড়ে পড়ছে। অশ্রুর সমুদ্রটা থমকে রইলো দু'চোখের আড়ালে।

তারপর কেটে গেছে অনেকগুলি দিন। এক মেঘমেদুর শ্রাবণের সন্ধ্যায় পথ চলছিলো স্বর্ণালী। পথের পাশে একটা ম্যারাপ বাঁধা বাড়ি আলোর মালা দিয়ে চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছিলো। বিয়েবাড়ি। স্বর্ণালী দেখতে দেখতে যাচ্ছিলো। এমন সময় বরযাত্রীর গাড়ির সারি বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু ফুল সাজানো গাড়ি থেকে টোপর মাথায় কে নামছে? সত্যবান না?

এক নবই ফাল্গুনের স্বর্ণ-সন্ধ্যায় যে প্রতিশ্রুতি জন্ম নিয়েছিলো, এই মেঘমেদুর শ্রাবণ সন্ধ্যায় সেই প্রতিশ্রুতির মৃত্যু হলো। সাবিত্রীর জীবনে মৃত্যু হলো সত্যবানেরও। কিন্তু এ যুগের সাবিত্রীর তো সাধ্য নেই ধর্মরাজের কাছ থেকে মৃত সত্যবানের আত্মাকে অর্থাৎ হারিয়ে যাওয়া সত্যবানের মনকে জয় করে আনে!

চিত্রাঙ্গদা। শারদীয়া, নবম বর্ষ

গলিত তুষার

ঘন ঘন উলু আর শাঁখের আওয়াজের মধ্যে মালাবদল হয়ে গেলো। এবার শুভদৃষ্টি। বন্ধু-বান্ধব আর কমবয়সী আত্মীয়-আত্মীয়ারা সবাই হৈ-হৈ করে উঠলো—ভালো করে তাকাও—ভালো করে—

লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারছিলো না ঊর্মিলা। তবু পর পর দু'বার দু'পলক তাকালো। কি সুন্দর মুখখানা মানুষটার, কিন্তু মুখখানা বড় চেনা-চেনা মনে হচ্ছে, যেন কোথায় দেখেছে এ মুখ ঊর্মিলা। কোথায় যেন—এমন সময় বরের বন্ধুরা আবার কলরব করে উঠলো—এ কি বন্ধু! ছয় চোখে শুভদৃষ্টি করা তো নিয়ম নয়, চার চোখেই শুভদৃষ্টি হয় জানি। খোল, খোল, চশমাটা খুলে ফেলো—

বন্ধুদের অনুরোধে বর চশমা খুলে হাতে নিলো। মোটা কালো ফ্রেমটা সরে যেতেই দেখা গেলো ডান চোখের নীচে একটা বড়ো কালো আঁচিল। সেই মুহূর্তে ঊর্মিলা আবার চোখ তুলে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে ঐ আঁচিলটা যেন ধাক্কা মেরে তার স্মৃতির ঘরের কপাট খুলে দিলো। মাথাটা ঘুরে উঠলো ঊর্মিলার। ওঃ, ঐ মুখ যে আজ আট বছর ধরে তার বিভীষিকার স্বপ্ন হয়ে আছে!

তারপরই ঊর্মিলা যেন পাথরের মূর্তি। বিয়ে বাড়ির হাসি গান আনন্দ কলরবের বিন্দুমাত্রও তার মনকে স্পর্শ করতে পারলো না। রাত গভীর হলে হৈ-হল্লায় ক্লান্ত মেয়েরা একে একে বাসর ছেড়ে উঠলো। যেতে যেতে শেষবারের মতো পরিহাসের তীর ছুঁড়ে গেলো—ও ভাই বর, আমরা চলে যাচ্ছি। এবার দু'জনে ভালো করে দু'জনকে জেনে শুনে নাও—

বর মৃদু হাসলো।

আর এই যে ডিসে মিষ্টি রয়েছে। নিজের হাতে কনেকে কিন্তু খাইয়ে দিতে হয়। বুঝলে? তবে তো মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনতে পাবে।

আর একজন আরও এককাঠি চড়িয়ে বললো—যদি এর চেয়েও মিষ্টি কিছু তোমার কাছে থাকে তবে তাই দিয়েই মিষ্টি মুখ করিও। মুখ সহজে খুলবে।

বর কৌতুকহাস্যে বিনীত ভাবে বললো, আপনাদের অনুরোধ আমার মনে থাকবে। কলহাস্যে মুখর হয়ে মেয়েরা সব বেরিয়ে পড়লো।

বিজিত উঠে কপাটে খিল তুলে দিলো। বেশি পাওয়ারের আলোটা নিবিয়ে নীলচে মৃদু আলোটা জ্বালালো। বুকে স্বপ্ন আর চোখে নেশা নিয়ে উর্মিলার একান্ত কাছটিতে বসে দুষ্টুমি করে বললো—শুনলে তো সব। বলোতো, কার কথাটা আগে রাখি।

উর্মিলা নীরব, নিথর।

বিজিত ভাবলো নববধূর লজ্জা। দু'হাতে উর্মিলার মুখখানা তুলে নিজের মুখের একান্ত কাছটিতে এনে বললো—তাকাও, তাকাও আমার দিকে—

উর্মিলা নিরুত্তাপ পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে বিজিতের মুখের দিকে তাকালো।

বিজিত উর্মিলার সুন্দর মুখখানার দিকে নির্ণিমেষনেত্রে তাকিয়ে রইলো।

সহসা দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে বললো—আচ্ছা, তোমাকে তো আমি বিয়ের আগে কখনও দেখিনি। মা, বাবা অনেক বলা সত্ত্বেও পাত্রী দেখতে আসিনি। কিন্তু তোমার মুখখানা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। হয়তো কোথাও দেখে থাকবো।

স্পষ্ট গলায় উর্মিলা বললো – কলকাতায়।

এ কথা বললে যে! তুমি কি আমাকে চেনো নাকি! কোলকাতায় কোথায় দেখেছি বলোতো ?

আরও স্পষ্ট এবং কঠিন গলায় উর্মিলা বললো—জুবিলি হোটেলে।

চমকে উঠে দু'হাত সরিয়ে নিলো বিজিত। বিস্ফারিত চক্ষে উর্মিলার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো—ওঃ!

মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেলো মায়াময় বাসরঘর। ফুলের গন্ধটা যেন শ্বাসরোধ করছে। পাশে সুসজ্জিত নববধূর অস্তিত্ব অর্থহীন।

মেজেয় কার্পেটের উপর উপুড় হয়ে শুয়েছিলো উর্মিলা। আট বছর আগেকার ঘটনাগুলো বড়ো স্পষ্ট বড়ো তীক্ষ্ণ হয়ে তার মনটাকে রক্তাক্ত

করে তুলছিলো। সেদিনের লজ্জা সেদিনের গ্লানিটাকে ভুলে যাবার জন্যে তার যে আপ্রাণ চেষ্টা তা যেন মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেলো।

ষোলো বছর বয়স ছিলো তার। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে। মামাতো বোনের বিয়েতে গিয়েছিলো কোলকাতায়। বিয়ে চুকে গেলে মামাতো ভাইবোনদের সংগে ঘুরে ঘুরে কোলকাতা শহর দেখলো। ঊর্মিলার এক বান্ধবীর বিয়ে হয়েছিলো কোলকাতায়। একদিন গেলো তার সংগে দেখা করতে। মামাতো ভাই পৌঁছে দিলো। বললো— আমি একটা কাজ সেরে এসে ঘণ্টা দুই বাদে তোকে তুলে নেবো ঊর্মি।

বান্ধবী বললো—তোদের বাড়ি এখান থেকে তো সোজা রাস্তা। আমি যদি এখানে তোকে ট্রামে তুলে দি, ওখানে তুই নেমে যেতে পারবি না? কন্ডাকটারকে বললে ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব পারবো। রোজই বেরোই তো। ট্রাম-রাস্তা থেকে বাড়ি যাবার ঐ পথটা আমার মুখস্ত হয়ে গেছে।

মামাতো ভাই বললো—না না, আমিই আসবো, শেষে যদি পথ ভুলে যাস, বাবার কাছে বকুনি খেয়ে মরবো আমি।

না মিণ্টুদা, আমি ঠিক যেতে পারবো। বুলু আমাকে ট্রামে তুলে দেবে। তুমি এলে তো শুধু তাড়া লাগাবে। গল্প করতে দেবে না।

মিণ্টু চলে গিয়েছিলো।

কিন্তু অঘটন ঘটলো। ঊর্মিলা বুঝতেই পারলো না এমন মুখস্ত করা রাস্তাটা কি করে এতো গোলমাল হয়ে গেলো, হয়তো ঠিক স্টপেজে নামে নি। এধার ওধার এ-গলি ও-গলি করে কিছুতেই পরিচিত রাস্তাটার সন্ধান পেলো না ঊর্মিলা। ঘাবড়ে গিয়ে দিশেহারার মতো আরও এদিক-ওদিক করতে গিয়ে যা হবার তাই হলো, অনেক দূরে ছিটকে পড়লো ঊর্মিলা। ভয়ার্ত মুখ। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, চোখের কোলে কোলে জল। ততোক্ষণে বেশ রাত হয়ে গেছে।

এতোক্ষণ কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি ঊর্মিলা। যদি দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়ে। এবার লক্ষ্য করলো একটি সুন্দর চেহারার ছেলে কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। ঊর্মিলার মনে হলো একে যেন বিশ্বাস করা চলে। সে তার কাছে গিয়ে রাস্তার হদিস জানতে চাইলো।

ছেলেটি বললো—সে তো অনেক দূর। এখান থেকে বাসে যেতে হবে।

ঊর্মিলার মুখ আরও শুকিয়ে গেলো। চোখের কোলে জমা জলবিন্দুগুলো গড়িয়ে পড়লো গাল বেয়ে। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বললো—তাহলে আমি কি করে যাবো?

একদম রাস্তা চেনো না বুঝি?

না, আমি কলকাতায় নতুন এসেছি।

চলো, আমি তোমাকে বাসে তুলে দিচ্ছি। কন্ডাকটারকে বলবো ঠিক জায়গায় নামিয়ে দিতে।

তাহলেও পারবো না। আমার বন্ধু আমাকে ট্রামে তুলে দিয়েছিলো। কিন্তু আমি সব গুলিয়ে ফেলেছি। এদিকে অনেক রাত হয়ে গেছে। বাড়িতে সবাই ভাবছে।

ছেলেটি একটু চিন্তা করে বললো—ঠিক আছে। চলো, আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।

ঊর্মিলা যেন পায়ের নীচে মাটি পেলো।

কিন্তু দু'পা হেঁটে না যেতেই যে সে-মাটি পায়ের তলা থেকে সরে গিয়ে তাকে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবে তা কি তখন ভাবতে পেরেছিলো?

খানিক দূর গিয়ে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে ছেলেটি বললো—মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে হবে। আমাকে একটা বিশেষ জরুরী কাজ সেরে যেতে হচ্ছে।

শঙ্কিতকণ্ঠে ঊর্মিলা বলেছিলো—অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে যে!

বেশি দেরি হবে না। ঠিক দশ মিনিট। এসো, ভিতরে এসে একটু বসো।

ঊর্মি ছেলেটির পেছন পেছন বাড়িটাতে ঢুকে পড়লো। সে জানতো না যে সে মৃত্যু গহ্বরের দিকে পা বাড়িয়েছে। আর তখনই দেখেছিলো বাড়িটার নাম 'জুবিলি হোটেল'। হোটেলওয়ালার সঙ্গে কি কথা বলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে খাট বিছানা চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজানো একটা ঘরে ঊর্মিকে বসিয়ে ছেলেটি বললো—একটু বসো। আমি কাজ সেরে আসি।

হ্যাঁ একটু বাদেই ফিরেছিলো ছেলেটি। কিন্তু ঘরে ঢুকেই—

ঊর্মিলা চেঁচিয়ে উঠেছিলো, ও কি, দোর বন্ধ করছেন কেন?

যুবকটি যখন তার দিকে এগিয়ে এলো তখন ঊর্মিলা দেখেছিলো এতো সুন্দর চেহারাটা কেমন বীভৎস দেখাচ্ছে। চোখে সাপের মত ক্রুর দৃষ্টি! ডান চোখের নীচে বড় একটা কালো আঁচিল। তখন চোখে চশমা ছিলো না।

যুবকটি হিসহিস করে বললো—চেঁচামেচি করে লাভ নেই। টাকা পেলে ওরা কানে তুলো দিয়ে রাখে।

কিছুক্ষণ বাদে বিধ্বস্ত দেহমন নিয়ে ঊর্মিলা বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলো। রাস্তায় বেরিয়েই ছেলেটি ভিড়ের মধ্যে উধাও হয়ে গেলো। আর রাস্তার মধ্যেই অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়লো ঊর্মিলা। ভিড় জমে গেলো। পুলিশ এলো। তারপর পুলিশের সাহায্যে গভীর রাতে বাড়ি। বাড়িতে তখন তোলপাড় পড়ে গেছে। পুলিশের কাছেও ঊর্মিলা লজ্জায় কিছু বলেনি, মামার বাড়িতেও না। শুধু বলেছিলো—পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

অথবা মামা-মামীমা বুঝতে পেরেও চেপে গেলেন। কেলেঙ্কারি ঘেঁটে কে লোক জানাজানি করে! কিন্তু বাড়ি ফিরে মা'র কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলো সব। সেই থেকে মামার বাড়ির সঙ্গে মা-বাবার সম্পর্ক ছিন্ন।

কিন্তু এখানেই কি শেষ? এর জের কি আরও অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায় নি? ঊর্মিলা রাত দিন শুধু কেঁদেছে। নিজের মৃত্যুকামনা করেছে। কি তিক্ত লজ্জাকর গ্লানিময় অভিজ্ঞতা। মেয়ের চোখের জল আর মা'র চোখের জল গঙ্গা-যমুনার ধারা সৃষ্টি করেছে। এই লজ্জাকে চাপা দেওয়ার জন্য দেশত্যাগ করতে হলো। বাবার অনেক টাকা খরচ হলো। ঊর্মিলা মরতে মরতে বেঁচে গেলো। সেই থেকে তারা আর দেশে যায় নি। প্রবাসী হয়ে আছে। তার এতো লাঞ্ছনা এতো অপমানের কারণ যে লোকটা সেই কি না আজ এই বাসরে অতিথি। না, পারবে না, ঊর্মিলা পারবে না এই লোকটার কাছে আত্মসমর্পণ করতে। তার সেই সাপের মতো ক্রুর দৃষ্টি ঊর্মিলা আজও ভুলতে পারে নি।

তারপর শুরু হলো এক নতুন ধরনের জীবনযাত্রা। বাইরের আবরণ

ঠিকই রইলো। এমন কি গৃহভৃত্য রামকানাইকেও বুঝতে দিলো না ওরা। কিন্তু ভেতরে এক দুস্তর ব্যবধানের সমুদ্রের দুই তীরে দু'জন দাঁড়িয়ে রইলো। ঊর্মিলা বিজিতের কাছে আসতে পারে না ঘৃণায়, আর বিজিত ঊর্মিলার কাছে এগোয় না সাহসের অভাবে। তার মনের মধ্যে অনুশোচনার গ্লানিও ছিল বৈ কি !

রামকানাই বহুদিনের চাকর। দীর্ঘকাল বিজিতের কাছে আছে। বিজিতের পরিচর্যা সম্বন্ধে সে ওয়াকিবহাল। তাই আগ বাড়িয়ে সব কিছু করে নেয়। ফলে ঊর্মিলা বিজিতকে এড়িয়ে চলবার সুযোগ পায়। তবে মাঝে মাঝে রান্নায় হাত লাগায়। বিজিত খেতে বসে বলে— রামকানাই, আজ যে তোর রান্নার হাত খুব খুলেছে রে ! তরকারিটা চমৎকার হয়েছে।

রামকানাই বিগলিত হাস্যে বলে—ওটা যে বৌদি রেঁধেছে গো দাদাবাবু।

তাই না কি ! তোর বৌদির দেখছি রান্নায় খাসা হাত।

বৌদি যে মা অন্নপুন্নো। আর তুমি ভিকিরি শিব, কেমন ভিকিরির মতো তরকারিটা চেটেপুটে খাচ্ছো।

নিজের রসিকতায় রামকানাই হেঁ হেঁ করে হাসে।

সেদিন বিজিত অফিসে চলে গেলে রামকানাই বললো—বৌদি, দাদাবাবুর অনেকগুলো জামার বোতাম ছিঁড়েছে। তুমি দেখে দেখে একটু বসিয়ে দাও তো।

ঊর্মি দেরাজ খুলে জামা বের করতে গিয়ে দেখতে পেলো জামা-কাপড়ের তলায় একখানা ডায়েরী। কৌতূহলী হয়ে মলাটটা খুলতেই চোখে পড়লো নিজের নাম। অমনি ঊর্মির চোখ এবং মন দুই-ই ওতে বসে গেলো।

পাতায় পাতায় অনেক কিছুই লেখা। এক জায়গায় লেখা—ঊর্মিলা স্বর্গের ফুল। আমি জানি তার মধ্যে কোনো কলুষতা নেই। কিন্তু আমি কলুষিত। সে আমার চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। আমার বড়ো লোভ হয়। কিন্তু না, একদিন চরম অসংযমের পরিচয় দিয়েছিলাম। তাই আজ চলেছে আমার সংযমের পরীক্ষা। একদিন তাকে লুঠ করেছিলাম। আজ তাকে জয় করবার সাধনা আমার। আজ সে আমার

স্ত্রী। অগ্নি নারায়ণ সাক্ষী রেখে বিয়ের পবিত্র বাঁধনে আমরা আবদ্ধ। আজ তো আমি তাকে অপমান করতে পারি না। যদি জয় না করতে পারি আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে আজীবন অপেক্ষা করেই থাকবো।

পাতা উল্টে যাচ্ছিলো ঊর্মিলা। আর এক জায়গায় দেখতে পেলো—কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি। আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ছটফট করেছি। এক এক বার ইচ্ছে হচ্ছিলো মাঝখানের ঐ কপাট ভেংগে ঊর্মির ঘরে ঢুকে পড়ি। জোর করে লুঠে নিই ওকে। আমার তো দাবী রয়েছেই। সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী। তার উপর জোর করার অধিকার আমার আছে। কিন্তু মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে ইচ্ছেটাকে দমন করলাম। একদিন যে পাপ করেছিলাম তার প্রায়শ্চিত্ত হয়তো এখনও শেষ হয়নি। অপেক্ষা আমাকে করতেই হবে।

আর এক পাতায় লেখা—হায়রে! তোমার ঐ বরফ-কঠিন মন কোনোদিনই কি গলবে না? তুমি বুঝছো না কেন, সেদিন তুমি যেমন ছেলেমানুষ ছিলে আমিও ছেলেমানুষ ছিলাম। দুষ্ট দেবতা আমার শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। সেই গ্লানিতে আমি নিজেও কি কম জ্বলছি না কি! দেখি, তুমি আমাকে কতো কষ্ট দিতে পারো।

ঘড়িতে সাড়ে তিনটে বাজলো। ঊর্মিলা খাতা বন্ধ করলো। বিজিত অফিস থেকে ফিরবার আগে বোতাম লাগানোর কাজ শেষ করতে হবে। ঊর্মিলা এবার নতুন করে ভাবতে বসলো—যে মানুষটা অনুতাপের আগুনে সর্বক্ষণ দগ্ধে মরছে তার প্রায়শ্চিত্তের বাকি কতো?

এর মধ্যে একদিন বিজিতের জ্বর হলো। ঊর্মিলা নেপথ্যে থেকে রামকানাই মারফত ওষুধ-পথ্যের কোনো ত্রুটি রাখলো না। কিন্তু ঊর্মিলা ভাবলো অসুস্থ স্বামীর সান্নিধ্যে যাওয়াও কি স্ত্রীর কর্তব্য নয়?

সেদিন রামকানাই বাজারে গেছে। ঊর্মি রান্নাঘরে কর্মব্যস্ত। বিজিতের গলা শোনা গেলো—রামকানাই, এক গ্লাস জল।

ঊর্মি কি সংকটেই না পড়লো। অসুস্থ মানুষ জল চাইছে, না দিয়ে পারা যায়? অথচ পা-ও যে চলে না।

ঊর্মিলাকে প্রত্যাশা করে নি বিজিত। তাই একটু চমকে উঠলো। তারপর ঊর্মিলার হাত থেকে জল নিয়ে খেলো। আবার শুয়ে পড়ে ক্লান্তিতে চোখ বুজলো। ঊর্মিলা লক্ষ্য করলো সেই ক্লান্তি। মনটা

তার নরম হয়ে এলো।

দু'চারদিন ভুগে বিজিত ভালো হয়ে উঠলো। ভাত পথ্য করলো পরদিনই অফিসে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলো। রামকানাই এসে জানালো—বৌদি, দাদাবাবু বললেন আজ অফিস যাবেন।

সে কি! কাল সবে ভাত পথ্য করেছেন, আজ বেরোনো ঠিক নয়। মানা করে দাও।

তা কি আর করি নি। শুনছেন কোথায়?

কি ভেবে ঊর্মিলা উঠলো। বিজিতের কাছে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললো—আজ অফিসে না গেলে হয় না?

বিজিত স্থির চোখে ঊর্মিলার দিকে তাকালো। বললো—কেন?

জ্বর সেরেছে বটে কিন্তু শরীর তো সারে নি। মনে হয়, না গেলেই ভালো।

থাক। তাহলে যাবো না।

ঊর্মিলা চলে গেলো। সেদিকে তাকিয়ে বিজিত মনে মনে বললো—তুমি বলছো তাই রইলুম, কিন্তু এই শূন্য ঘরে আমার কিসের আকর্ষণ। তবু, তুমি যে আমার কথা ভাবো এই আমার পুরস্কার।

দুপুরবেলা খাবার পর বিজিত বিছানায় শুয়েছিলো। এক সময় ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলো। এমন সময় কাছেই খুট্ করে একটা শব্দ হওয়ায় তাকিয়ে দেখে তার মুখে রোদ পড়েছে বলে ঊর্মিলা জানালা বন্ধ করছে।

বিজিত চোখ খুলতে ঊর্মিলা অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বিজিত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ঊর্মিলার দিকে তাকালো।

কতো কোমল মুখের রেখা। কিন্তু মনটা এমন কঠিন কেন?

বিজিত অনুনয় জানালো—একটু কাছে বসবে ঊর্মি?

একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ঊর্মিলা বিজিতের মাথার কাছে খাটের উপর বসলো। বিবাহিত জীবন আরম্ভ হবার তিন মাস পর।

বরফের চাঁইটা কি গলছে?

ঊর্মিলার একখানা হাত খাটের উপর পড়েছিলো। বিজিতের বড় লোভ হচ্ছিলো ঐ হাতের উপর নিজের হাতখানা রাখে। কিন্তু রাখলো না।

উর্মিলা নতনেত্রে মৃদুকণ্ঠে বললো—তোমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবো ?

বিজিতের চোখে বুঝি জল এসে যায়। চোখের উপর হাত চাপা দেয় সে ! হায়রে, তেষ্টায় যার গলা শুকিয়ে আছে, তাকে বলে কি না—জল খাবে ?

উর্মিলা আলতো ভাবে বিজিতের কপালে নরম হাতখানি রাখলো।

অকস্মাৎ বাঁধভাঙা জোয়ারের প্লাবনে যেন তলিয়ে গেল বিজিত। চট্ করে উঠে বসে বিহ্বল আবেগে উর্মিলার মুখখানা বুকে চেপে ধরলো। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বার বার বলতে লাগলো—উর্মি, আমায় ক্ষমা করো—আমায় ক্ষমা করো—ক্ষমা করো—ক্ষমা করো—।

চিত্রাঙ্গদা ॥ শারদীয়া ১১শ বর্ষ

নিয়তি

বিকেলে গা ধুয়ে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে সযত্নে প্রসাধন সারছিলো ইভা। মাথাভর্তি একঢাল কালো চুলকে বাগ মানাতে রীতিমত কসরৎ করতে হচ্ছিলো তাকে। পরিপাটি করে খোঁপা বেঁধে খুব নরম হাতে আস্তে আস্তে চোখের কোলে কাজল আঁকলো। কাজল তো নয়, যেন চোখের কোলে স্বপ্ন আঁকছে। সুন্দর করে সিঁদুর পরলো। তারপর আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার দেখলো। নিজের মনেই একটু হাসলো, নাঃ, ভগবান তাকে গড়বার সময় বেশ যত্ন নিয়েই গড়েছিলেন। ইভা অন্ততঃ এ নিয়ে তাঁকে কোনো অনুযোগ দিতে পারবে না।

এই দু'কামরার ফ্ল্যাটটিতে ইভা এখন একা। দীপ্তিময় অফিসে, ঝি চারুও কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেছে।

বিছানার ঢাকাটা এলোমেলো হয়ে পড়ে ছিলো। সারাটা দুপুর ওটার উপর খুব গড়িয়েছে ইভা। যা একখানা গরম পড়েছে! ঘুম হয় না অথচ একটা তন্দ্রার ভাব কেমন আচ্ছন্ন করে রাখে। ঘরে ফুল স্পিডে পাখা চলে তবু গরমে শুধু এপাশ ওপাশ করে।

বেড-কভারটা টান করে বিছানা পরিপাটি করলো ইভা। আলনাটা একটু গুছোলো। আলমারি শো-কেস সবকিছু আলতো হাতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলো বড়ো মমতায়।

তার ঘর। ইভার।

এই ঘরটি, এই ঘরের প্রতিটি জিনিস ইভার। আর ঘরের মালিকটি! দীপ্তিময়! সুদর্শন সুযোগ্য প্রাণবন্ত। ইভার পৃথিবী যেন পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। তিন আঙুল চওড়া কপালটায় অনেক সৌভাগ্য জ্যাম হয়ে আছে। অথচ এই সৌভাগ্য তার কপাল থেকে প্রায় ফসকে গিয়েছিলো আর কি! যেতে বসেছিলো ইভার নিজেরই ভুলের জন্য। তখন ইভা বিভ্রান্ত।

দীপ্তিময়ের অফিস থেকে ফিরতে তখনও অনেক দেরি। চারু ফিরে এসেছে, রান্নাঘরে তার কাজ গোছানোর ঠুক্ ঠুক্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ইভা চারুকে বলে দিয়েছে দীপ্তিময় ফিরলে একসঙ্গে চা খাবে। একা একা চা খেতে তার ভালো লাগে না।

হাল্কা বেতের চেয়ারটা জানালার কাছে টেনে নিয়ে বসলো ইভা। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, খুব ভাল লাগছে ইভার। সারা গায়ে যেন শান্তির ঘন চন্দন বুলিয়ে দিচ্ছে। মন যদি পূর্ণ থাকে পৃথিবীর সব কিছুই এমনি সুন্দর মনে হয়।

ইভা জানে পৃথিবীর এই আলো হাওয়া তার জীবনে বিষিয়ে যেতে পারতো যদি সেদিন 'সে' ইভাকে সতর্ক করে না দিতো। কে? ইভা জানে না। কাউকে দেখেনি। শুধু একটা কণ্ঠস্বর শুনেছে।

কে সে? ইভার নিয়তি?

ইভা শান্তিশীতলতার চন্দনপঙ্কে গা ডুবিয়ে বসে ভাবতে লাগলো— একবার নয়, দু' দু'বার সেই কণ্ঠস্বর তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছে। ইভা তো সেই মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়েই দিয়েছিলো। শুধু আর এক পা এগোবার অপেক্ষা। এমনি সময় সেই কণ্ঠস্বর— সেই সতর্ক হুঁশিয়ারি।

ইভা রক্ষা পেয়েছে। দু' দু'বার।

দীপ্তিময় ফিরে এসেছে, ঘাম-ঘাম মুখখানায় ক্লান্তির ছাপ, এসেই একটা সোফায় ধপাস্ করে বসে পড়ে। খুব খাটুনির কাজ দীপ্তিময়ের। বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদে রয়েছে কি না!

ইভা উঠে পাখার স্পিড বাড়িয়ে দেয়। পোশাক ছাড়তে সাহায্য করে, হাতের কাছে তোয়ালে এগিয়ে দেয়, দীপ্তিময় হাত-মুখ ধুতে কল ঘরে গেলে চারুকে চা দিতে বলে।

চা খেতে খেতে দীপ্তিময় বলে—চোখ মুখ এমন ভার-ভার যে! দুপুরে খুব ঘুমিয়েছো বুঝি।

কি করবো বলো তো সারা দুপুরটা। কোনো কাজ নেই। সত্যি, তুমি সারাদিন খেটে খেটে অস্থির হও। আর আমার শুয়ে-বসে দিন কাটে না। এতো খারাপ লাগে!

দীপ্তিময় হাসে, বলে ঠিক আছে, চারুকে না হয় ছাড়িয়ে দেওয়া

যাক্।—

তাই দাও না হয়, চারুর মত অতো ভালো হয়তো রাঁধতে পারবো না। কষ্ট করে খেতে হবে আর কি।

তা তুমি নুনে পোড়া ঝালে কড়া যা খেতে দাও খেয়ে হজম করবো। কিন্তু আমার আইভিলতা কোমরে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে ব্রহ্মতালুতে চুলের ঝুঁটি বেঁধে ডালে কাঠি দিচ্ছে, শিলে মশলা পিষছে—এ দৃশ্য কি চট করে হজম করতে পারবো? ঐ সুন্দর আংগুলগুলোতে হলুদের ছোপ লাগবে সেটা সহ্য করাও কঠিন ব্যাপার।

ইভা হেসে ফেললো—তবে এমনি শুয়ে-বসে থেকে কিন্তু আমি মোটা হয়ে যাবো বলছি। ঠিক আমার সেজ মাসীর মতো।

দীপ্তিময় বললো, মন্দ কি! রোগা হলে আমার বদনাম হতে পারে মেয়ে অযত্নে থাকে বলে। মোটা হলে বরং আমার প্রশংসাই হবার কথা, সবাই বলবে আমাদের হীরের টুকরো জামাই, মেয়েকে কতো সুখে রেখেছে, সর্বাংগে সুখ উপচে পড়ছে।

ইভা হাসতে হাসতে বললো, তাই হোক হীরের টুকরো মশাই, তোমার আইভিলতা মেদভারে এবার বটগাছের গুঁড়ি হোক।

চা খাওয়া হলে দীপ্তিময় বলে—চলো, একটু ঘুরে আসা যাক্।

ইভা বলে, আজ থাক না, এই তো সারাদিন খেটেখুটে এলে, এখন একটু বিশ্রাম করো।

না, তুমি সারাদিন বাড়িতে একা থাকো, সন্ধ্যেবেলায় খোলা হাওয়ায় একটু ঘুরে এলে ভালো লাগবে। তুমি পাশে থাকলে আমার ক্লান্তি আসে না ইভা। তুমি আমার সঞ্জীবনী সুধা।

ইভার বুক থেকে ছোট্ট একটা সুখের নিশ্বাস উঠে আসে।

ছোটো একটা গাড়ি আছে দীপ্তিময়ের। মাঝে মাঝেই সন্ধ্যের দিকে ইভাকে নিয়ে বেরোয় সে। খোলা হাওয়ায় খোলা আকাশের নিচে বসে দু'জনে। তারপর এক সময় ফিরে আসে।

দীপ্তিময় লক্ষ্য করে রাস্তায় বেরোলেই ইভা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়, গাড়ির জানালায় অপলক চোখ রেখে রাস্তায় কি যে খোঁজে তা ওই জানে, কথা বলতে বলতে থেকে থেকেই খেই হারিয়ে যায়।

সত্যিই হারিয়ে যায় ইভা, সত্যিই রাস্তায় সে একজনকে খোঁজে। সে

তার নিয়তি।

এক সময়ে কুশলকে ভালো লেগেছিলো ইভার, কুশল ইভার দাদার পরিচিত। সেই হিসেবে ইভাদের বাড়িতে আসতো। দীর্ঘ দেহ, উজ্জ্বল চেহারা, একমাথা এলোমেলো ফাঁপানো চুল, স্বপ্ন-স্বপ্ন দুটো চোখ। প্রথমে পরিচয়, তারপর আলাপ, তারপর ঘনিষ্ঠতা, এক দুর্নিবার আকর্ষণে ধাপে ধাপে কুশলের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলো ইভা, বাড়িতে সবার মাঝখানে সুযোগ পাওয়া যেতো না ঘনিষ্ঠ মেলামেশার। তাই ছলছুতো করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গোপনে দেখা করতো কুশলের সংগে, এক সংগে ঘুরে বেড়াতো, সন্ধ্যের দিকে কোনো নিভৃত স্থানে পরস্পরের গা ঘেঁষে বসতো, হাতে হাত রাখতো, চোখে চোখ, কুশলের নিবিড় সান্নিধ্য আচ্ছন্নচিত্তে অনুভব করতো ইভা। কুশল বলতো তুমি আমাকে ছেড়ে কখনো চলে যাবে না তো ইভা।

ইভা সজোরে কুশলের হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে বলতো—কখনো না, কখনো না।

কিন্তু তোমার মা-বাবা কি তোমাকে আমার হাতে দেবেন? সামান্য চাকরি করি আমি, তারা কি তোমার যোগ্য ভাবেন আমাকে?

ইভা জানতো, মা বাবার বিচারে কুশল চালচুলোহীন। কিন্তু ইভার মনের জগতে কুশলই নায়ক, তাই ইভা দৃঢ় গলায় বলতো, আমাকে কেউ তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না, আমার সমস্ত পৃথিবী এক দিকে আর তুমি এক দিকে।

এমনি এক সন্ধ্যায়, একটা ঘন ঝোপের আড়ালে বসেছিলো ওরা দু'জন, ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এসেছিলো ওদের চারদিকে, জায়গাটা ছিলো নির্জন। কুশলের প্রবল আকর্ষণে ইভা নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলো। সম্মোহিতের মতো কুশলের নাগপাশে আত্মসমর্পণ করেছিলো। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে—হ্যাঁ, মৃত্যু ছাড়া আর কি—পা বাড়িয়েছিলো! শুধু আর এক পা এগোবার অপেক্ষা, ভাবলে এখনও ভয়ে শিউরে ওঠে ইভা, সেই চরম দুর্বল মুহূর্তে কি সর্বনাশই না হয়ে যেতে পারতো। এমনি সময়ে খুব কাছে কে গলা ছেড়ে হেঁকে উঠলো—খ-ব-র- দার!

চমকে উঠে ওরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো, ইভা

দ্রুতহাতে পোশাক সংযত করেছিলো, বুকের ভেতর দ্রুততালে ঢিপ ঢিপ শব্দ, দুকান দিয়ে আগুন ছুটছে। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে কুশল বলেছিলো—চলো, বাড়ি ফেরা থাক।

কিছুদিন পর। ইভা জানতে পারলো মা বাবা, তার জন্য পাত্র ঠিক করছেন, ইভা কুশলকে বললো—চলো আমরা কোথাও পালিয়ে যাই। পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করি। এছাড়া, ঘটনাকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা আমার নেই।

কুশল রাজি হয়েছিলো।

গভীর রাত। ইভা দ্রুতহাতে সুটকেসে নিজের জামাকাপড় ভরে নিচ্ছিলো। কথা হয়ে আছে রাত ঠিক তিনটায় কুশল এসে দাঁড়াবে বাড়ির সামনে। ইভা তার ঘরের জানালা দিয়ে লক্ষ্য রাখছিলো। কুশল দেশলাই জেবলে সিগারেট ধরাবে। এটা তার উপস্থিতির ইংগিত, অমনি ইভা বেরিয়ে পড়বে, তারপর হাওড়া স্টেশন, তারপর দূর পাল্লার ট্রেন।

কুশলের ইংগিত পেয়েই সুটকেস হাতে নিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়েছিলো ইভা, বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব করছিলো, উত্তেজনায় এলোমেলো পা পড়ছিলো। বারান্দার শেষ মাথায় পেঁাছে উঠোনে নামতে যাবে, হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা চিরে খুব কাছে থেকে তীব্র আওয়াজ এলো—খ-ব-র-দা-র!

সেই স্বর!

আচমকা কেঁপে উঠেছিলো ইভা। হাত থেকে সুটকেসটা খসে পড়েছিলো কলতলায় এঁটো বাসনের গাদার উপর। ঝনঝন শব্দ উঠেছিলো, আর নিজে টাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে পড়ে গিয়েছিলো বারান্দায় রাখা একটা জলভরা কুঁজোসুদ্ধ, টুলের উপর। টুল এবং কুঁজো দুই-ই সশব্দে পড়ে গেলো, কুঁজো ভেংগে চুরমার। শব্দ শুনে ঘুম ভেংগে গিয়েছিলো বাড়ি সুদ্ধ সবাইয়ের। গোটা বাড়ি সরব হয়ে উঠেছিলো—কে রে? কে রে? কে রে? ইভার সর্বাংগে বিদ্যুৎ শিহরণ। সে এক ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছিলো। সবাই হৈ-হৈ করে বেরিয়ে এলো, ইভার সুটকেস কুঁজো এবং টুলের অবস্থা দেখে ধরে নিলো—বাড়িতে চোর ঢুকেছিলো। কিন্তু ইভার ঘরে ঢুকলো কি করে? দোর বন্ধ ছিলো না?

ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার উপযুক্ত সুযোগ আপনা থেকে গড়ে ওঠায় ইভা যেন বেঁচে গেলো, তখনও তার মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে, কাঁপা-কাঁপা গলায় বললো—আমি কল ঘরে গিয়েছিলাম বোধ হয় এই ফাঁকে—

সেদিন ইভা দ্বিতীয়বার মৃত্যু থেকে বেঁচে গিয়েছিলো।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, ইভার ছোটো ভাই টুনু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে একদিন বলেছিলো—জানো দিদিভাই, কুশলদার কি হয়েছে?

ইভার বুকটা ধড়াস্ করে উঠেছিলো। বলেছিলো—কি রে?

কুশলদা নাকি ডাকাতি করে, একটা বড়ো ডাকাত দলের সঙ্গে যুক্ত। গতকাল ট্রেন ডাকাতি করতে গিয়ে একজন যাত্রীকে নাকি খুন করেছে কুশলদা, পালাতে চেষ্টা করেছিলো, পারেনি, পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেছে, চাকরি-টাকরি সব মিথ্যে কথা, ডাকাতিই নাকি ওর পেশা।

ইভার মাথাটা বোঁ করে ঘুরে উঠেছিলো, এক অতলান্ত মৃত্যু-গহ্বরের কিনার থেকে কে শেষ মুহূর্তে তাকে রক্ষা করলো? কে?

একদিন বড়মাসী বেড়াতে এসেছিলেন, কথায় কথায় পাগলের প্রসঙ্গ উঠেছিলো। বড়মাসী বললেন—আমাদের পাড়ায় এক অদ্ভুত পাগল আমদানি হয়েছে। অন্য কোনো কথা বলে না, শুধু থেকে থেকে চেঁচিয়ে ওঠে—খ-ব-র-দা-র! হঠাৎ শুনলে পিলে চমকে যায়।

ইভা উৎকর্ণ হয়ে মাসীমার কথা শুনছিলো, ভাবছিলো—ও পাগল, না ইভার নিয়তি!

ইভার বিয়ে হলো দীপ্তিময়ের সঙ্গে, ইভা এখন বড়ো সুখে আছে। দীপ্তিময়কে পেয়ে সে পরিপূর্ণ।

সেই লোকটাকে একবার বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে ইভার, তাই বাইরে বেরোলেই রাস্তার দিকে চোখ রাখে যদি কখনও দেখা পেয়ে যায়। ঠিক সময়ে, ওই হুঁশিয়ারি না পেলে আজ কি গতি হতো ইভার? ইভা শিউরে উঠে দীপ্তিময়ের দিকে সরে যায়। একেবারে গা ঘেঁষে বসে, একখানা হাত তার কোলের উপর রাখে। দীপ্তিময় এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্য হাত সস্নেহে ইভার কাঁধের উপর রাখে, একটু হেসে বলে—কি হলো? কিছু দেখে ভয় পেলে না কি! দীপ্তিময়ের দুই চোখে নির্ভরতার আশ্বাস, তার হাতের স্পর্শ ইভার পরম আশ্রয়। ইভা দীপ্তিময়ের কাঁধের উপর মাথাটি রেখে স্বস্তির গভীর নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বললো—না, কিছু না।

চিত্রাঙ্গদা। শারদীয়া, ১৩৮২

ঝুমকির ভয়

ঝুমকি সম্পর্কে আমার নাতনি।

ঝুমকির রঙ কালো, চোখ দুটো ডাগর—চেহারাখানি মায়া-মায়া। ঝুমকির বয়স সর্বসাকুল্যে চার। বয়সের তুলনায় সে যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে এবং বেশ গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছে।

সেদিন বিকেলে আমি ঝুমকিদের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। দোতালার বারান্দায় বসেছিলো ঝুমকির দাদু ঠাকুমা মা বাবা সবাই। আমিও গিয়ে তাদের কাছেই বসলাম। অনেকদিন পর দেখা। তাই খুব জমিয়ে গল্প-গুজব হচ্ছিলো। ঝুমকি সেখানে মেজেয় বসে তার রকমারি পুতুল হাঁড়িকুড়ি নিয়ে খেলা করছিলো এবং ক্রমাগত বকবক করছিলো। অর্থাৎ পুতুলকে কখনও আদর করছিলো, কখনও শাসন করছিলো, নাওয়াচ্ছিলো খাওয়াচ্ছিলো। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঝুমকির মা ঝুমকিকে যা যা বলে থাকে ঝুমকি এখন সেইসব কথাগুলো তার পুতুল ছেলেমেয়ের উপর প্রয়োগ করছিলো। ঝুমকিদের বাড়িটা বড়ো রাস্তার উপরেই। এমন সময় বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে এক বিয়ের শোভাযাত্রা যাচ্ছিলো। ফুল সাজানো গাড়িতে বর যাচ্ছে। গরদের পাঞ্জাবি পরা, গলায় ফুলের মালা, কপাল ঘিরে চন্দনের ফুটকি, টোপরটা পাশে রাখা। পেছনে পেছনে বরযাত্রীদের গাড়ি চলেছে। একেবারে পেছনে একটা হুড খোলা গাড়িতে মিউজিক পার্টি। সেখান থেকে আবার সামনের গাড়িগুলির দিকে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সারা রাস্তায় তা ছড়িয়ে পড়ছে। খুব জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা। পাত্র নিশ্চয় ধনী ঘরের ছেলে। আমরা সবাই রেলিংএর উপর ঝুঁকে পড়ে শোভাযাত্রা দেখছিলাম।

শোভাযাত্রা চলে গেলে তাকিয়ে দেখি ঝুমকি সেখানে নেই।

কি ব্যাপার! ঝুমকিরই তো সবচেয়ে বেশি কৌতূহলী হবার কথা। তার যা বয়স—এ বয়সে চোখে থাকে জগতকে নিত্য নতুনভাবে আবিষ্কার

করার বিস্ময়; তুচ্ছ জিনিসকেও শিশু অবাক্ চোখে দেখে। চোখের সামনে এমন সমারোহ ফেলে ঝুমকি গেল কোথায়?

বললাম—ঝুমকি কই?

ওর মা হাসতে হাসতে বললো—ঘরে পালিয়েছে।

কেন? পালিয়েছে কেন? বর দেখলো না?

বলতে বলতে আমি ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখি ঘরের কোণে দেয়ালের সংগে মিশে ঝুমকি দাঁড়িয়ে। ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। তার এক হাতে দাদুর লাঠি অন্য হাতে দিদুর মানে ঠাকুমার চটি, কাঁধে মা'র শাড়ি জামা, দুই বগলদাবায় পুতুল খেলনা। অর্থাৎ বারান্দায় যা যা জিনিস ছিলো সব ঝেঁটিয়ে তুলে নিয়ে এসেছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—এ কি! কি হয়েছে?

ঝুমকির মা আর ঠাকুমা হাসছিলো। বললো—ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।

আমি বললাম—কি হয়েছে রে ঝুমকি? এতসব জিনিস-পত্তর নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

ঝুমকি চোখ দু'টো বড়ো বড়ো করে ভয়-ভয় গলায় বললো—বর সব নিয়ে নেবে। বর যাচ্ছে দেখছো না?

আমি আরও বিস্মিত—তার মানে?

ঝুমকি তেমনি ভাবে বললো—বরগুলো সব জিনিস নিয়ে নেয়। আমার ছোট পিসীকে নিয়ে গেছে। দিদুর গলার হার নিয়ে গেছে। আমাদের আয়নার টেবিলটাও নিয়ে গেছে।

তখন ঠাকুমার মুখে শোনা গেলো ঝুমকির ভয়ের কারণ। ঠাকুমা বললেন—তার তিন মেয়ের মধ্যে বড়ো এবং মেজো মেয়ের বিয়ে দিতেই তাঁরা আর্থিক সংগতির দিক থেকে প্রায় ফতুর হয়ে গিয়েছিলেন। তার ওপর ছোটো মেয়ের বিয়েতে পাত্রপক্ষের দাবিদাওয়া একটু বেশিই ছিলো। পাত্রটি ভালো তাই সাধ্যের অতিরিক্ত খরচের ঝুঁকি নিয়েছিলেন তাঁরা। খরচ কিছুটা বেশিই হয়ে গিয়েছিলো। ফলে সামলাতে না পেরে নিজের গলার হার ও বাড়িতে নতুন কেনা ড্রেসিং টেবিলটি বিয়েতে খয়রাত করতে হয়েছিলো। ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে ঝুমকি নাচতো। তাই ওটা চলে যেতে সে বারবার প্রশ্ন করছিলো। ওরা আমাদের আয়নার টেবিলটা

নিয়ে গেছে কেন ? আর একদিন ঝুমকির দাদু তার ঠাকুমাকে বলেছিলেন, মেয়ের বিয়ের কল্যাণে তোমার গলাটা খালি হয়ে গেলো। কি করবো, খরচ সামলাতে পারলাম না যে। ঝুমকির ঠাকুমা বলেছিলেন, তা হোক, জামাইটি ভালো পেয়েছি এই আমাদের শান্তি।

কথাগুলো তাঁরা ঝুমকির সামনেই বলেছিলেন।

ঝুমকি তার চার বছর বয়সের অভিজ্ঞতায় কি বুঝেছিল কে জানে, কিন্তু সেই থেকে তার বরভীতি।

আমি হাসতে হাসতে বলি—ও, এই ব্যাপার ! তাই তুমি বগলদাবা করে সবকিছু সামলাচ্ছো। আচ্ছা ঝুমকি, তুই বিয়ে করবি না ? তোরও তো বর আসবে। ঝুমকি ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো—না না, তাহলে বর আমাকে নিয়ে যাবে, আমার মা'র গলার হার নিয়ে যাবে। আমার পুতুল খেলনা নিয়ে যাবে। আমি কক্ষণো বিয়ে করবো না।

ঝুমকি চোখ বড়ো বড়ো করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি ঝুমকির ভয়-ভয় চোখ দুটোতে আমাদের সমাজের প্রতিচ্ছবি দেখলাম।

কাচের মতো

কাচের পাত্রটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে গেলো।

যাঃ! গেলো এমন সুন্দর জিনিসটা। আক্ষেপের উক্তি শোনা গেলো প্রণতির কণ্ঠে।

বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমায় দার্জিলিং গিয়েছিলো প্রণতি আর আদিত্য। তখন একটা দোকানে এই কাচের পাত্রটা দেখে খুব চোখে লেগে গিয়েছিলো প্রণতির। বাটির মতো পুরোপুরি গোলাকার নয়, ডিমের মতো একটু লম্বাটে ধরনের—সারা গায়ে পল কাটা। ঈষৎ গোলাপী রঙ। তার ভেতর দিয়ে যেন একটা নীলাচে আভা ফুটে বেরোচ্ছে। তাতে আলো পড়লে প্রতিটা পলে রঙের বিচ্ছুরিত দীপ্তি ঝকঝক করে ওঠে। অপূর্ব দেখায়। প্রণতির বড়ো পছন্দের জিনিসটা। সে রোজ তাতে করে টেবিলের উপর ঝুরো ফুল সাজিয়ে রাখে—গোলাপ গন্ধরাজ যুঁই। শিউলির কালে শিউলি। টেবিল পরিষ্কার করতে গিয়ে অসাবধানে হাত লেগে সেটা পড়ে চুরমার হয়ে গেলো।

বড়ো মন খারাপ হয়ে গেলো প্রণতির।

কাচের জিনিস বড় ভঙ্গুর! আর মানুষের জীবনের সুখ, আশা! সেটাই কি বড়ো চিরস্থায়ী?

অন্ততঃ প্রথম যখন আদিত্যর জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের গ্রন্থি বেঁধে সে এই ঘরে এসেছিলো তখন তো প্রণতির তাই মনে হয়েছিলো। আনন্দের হীরের কুচিতে উজ্জ্বল, সুখের রঙে রঙিন। নিশ্চিন্ত নির্ভরতার শান্তি যেন ঘন চন্দনের প্রলেপ। জীবনটা যেন হালকা পাখির পালক। যেন ইচ্ছে করলেই ডানা মেলে ভেসে যেতে পারবে আকাশে। ছুঁয়ে দিতে পারবে মেঘগুলোকে। আর আদিত্যর চোখে সে কি মুগ্ধ দৃষ্টি। ভালোবাসায় রঙিন, মমতায় কোমল। সে দৃষ্টি অহরহঃ ঘিরে রাখতো প্রণতিকে। কবে থেকে যে সেই দৃষ্টির পরিবর্তন হতে শুরু হয়েছিলো প্রণতি তার হিসেবই রাখে নি। সহসা একদিন লক্ষ্য করেছিলো আদিত্যর চোখে মুগ্ধতার পরিবর্তে কুটিলতা ছায়া ফেলেছে।

বাড়িতে কাজ করে নাণ্টু নামে একটি ছেলে। মাইনের পুরো টাকাটা মনি-অর্ডার করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। অথচ এখানে বেশ খরচাও করে। সিনেমা দেখে ফি হপ্তায়। প্রণতি বলে—মাইনের সব টাকা বাড়িতে পাঠিয়ে দিস তবে এতো সিনেমা দেখার পয়সা কোথায় পাস রে ?

নাণ্টু পুরো দু'পাটি দাঁত বের করে বললো—বাবু দেয়।

প্রণতি একদিন আদিত্যকে এ-কথা জিজ্ঞাসা করেছিলো। আদিত্য রেগে গিয়ে বলেছিলো—এ কথা বলেছে বুঝি বাঁদরটা। জুতো মেরে যদি ওর মুখ না ভাংগি তো—

প্রণতির আদিত্যর এত রাগের কারণ খুঁজে পায় নি। সে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলো।

প্রণতির পিসতুতো দাদা সুধেন্দু পশ্চিমের কোনো শহরে কাজ করে। প্রণতির থেকে অল্পই বড়ো। বিয়ের সময় সে উপস্থিত ছিলো না। বছর খানেক পর বাড়ি এলে প্রণতি তাকে একটা চিঠি লিখেছিলো। চিঠিতে অনুযোগ তো ছিলোই একটু রংগকৌতুকও ছিলো। লিখেছিলো—এখনও বিয়ে থা করো নি, এখনই আমাদের ভুলে গেলে। পনেরো দিন হয় এসেছো একদিন এসে দেখা করলে না। বিয়ে-টিয়ে করলে তো আমাদের চিনতেই পারবে না। নাণ্টুকে চিঠিটা পোস্ট করতে দিয়েছিলো। পরদিন নাণ্টুর বিছানার নীচে সেই খামের চিঠিটা খোলা অবস্থায় দেখতে পেয়ে খাপ্পা হয়ে উঠলো প্রণতি। ডাকলো নাণ্টুকে।

প্রথমটায় কি সে কিছু বলতে চায়! পরে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললো—বাবুকে বলবে না তো মা, তা হলে বাবু আমাকে আস্ত রাখবে না।

না, তুই বল্।

নাণ্টু বললো—আদিত্য তাকে বলে রেখেছে প্রণতি যখনই তাকে কোনো চিঠি পোস্ট করতে দেবে সে যেন লুকিয়ে রেখে দেয়। আদিত্যকে দেখিয়ে পরে পোস্ট করে। আর দুপুর বেলা কেউ বাড়িতে আসে কিনা সেটাও যেন লক্ষ্য রাখে। এ সব কথা প্রণতিকে বলতেও মানা করেছে আদিত্য। এজন্য বাবু তাকে অনেক পয়সা দেয়। চুপিচুপি আঠা লাগিয়ে খাম বন্ধ করে। চিঠিটা সে আজই পোস্ট করে দিতো। এমন সে প্রায়ই করে।

বটে! সন্দেহ! প্রণতিকে সন্দেহ করে আদিত্য। নজর রাখে তার উপরে! তাও কিনা নাণ্টুকে দিয়ে! ছি!

প্রণতি স্তম্ভিত। তার জীবনের সরল শুভ্র পটভূমিকায় একটা মোটা দাগের কালির আঁচড় পড়লো।

মা'র চিঠি এসেছিলো। বিধবা মা অনেক দুঃখের কথা লিখেছেন। তবে জামাইকে এ-সব কথা জানাতে বারণ করেছেন, তাই আলমারিতে চিঠিটা লুকিয়ে ফেলেছিলো প্রণতি। যখন গুঁজে রাখছে তখনই ঘরে ঢুকেছিলো আদিত্য। কিন্তু সে দেখতে পেয়েছে বলে প্রণতির মনে হয় নি। তিন-চার দিন পর আদিত্য যখন ওর কাছ থেকে আলমারির চাবি চেয়ে নিলো তখন চিঠির কথা সে ভুলেই গিয়েছে। ভেবেছিলো সে রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকায় টাকা-পয়সা নেবার জন্যই হয়তো চাবি নিয়েছে। কিন্তু আদিত্য যখন বসার ঘরে দোর দিয়ে বসলো তখন প্রণতির কি মনে হলো।

ঘরে গিয়ে আলমারি হাতড়ে দেখলো চিঠিটা নেই।

খানিক পরে আদিত্য বেরিয়ে এলে প্রণতি ঠাণ্ডা গলায় বললো—একটা চিঠি পড়তে এতো সময় লাগলো ?

চিঠি ?

হ্যাঁ, মা'র চিঠিটা। বুড়োমানুষ, ছেলে-বৌ অনাদর করে সেটা তো মা'র পক্ষে খুব গৌরবের ব্যাপার নয়। সে কথা পেটের মেয়ের কাছে বলা চলে কিন্তু জামাইকে জানাতে লজ্জা। তাই চিঠিটা তোমাকে দেখাই নি; তুমি এভাবে চিঠিটা না নিলেও পারতে।

হাতে-নাতে ধরা পড়ে এবং কোনো প্রতিবাদ করতে না পেরে আদিত্যর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিলো।

শরীর অসুস্থ হওয়ার দরুণ আদিত্য পনেরো দিনের ছুটি নিয়েছিলো। তেমন গুরুতর কিছু নয়, বিশ্রাম নেওয়াই আসল উদ্দেশ্য। তাই বাড়িতে বসেই ছুটিটা কাটাচ্ছিলো। এর মধ্যে একদিন বোনের অসুখের খবর পেয়ে বোনকে দেখতে গিয়েছিলো। দিনটা ছিলো শনিবার। এদিকে আদিত্যর অফিসের এক বন্ধু বিনয় ছুটির পর আদিত্যর খবর নিতে এসেছিলো। সে বাড়ি নেই দেখে বিনয় হেসে বললো—ব্যাপার কি বৌদি। রুগী দেখতে এসে দেখছি রুগী পলাতক।

প্রণতি হেসে বলেছিলো—একটু অপেক্ষা করুন। রুগী হয়তো এখনই ফিরে আসবে।

সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থেকে বিনয় চলে গিয়েছিলো।

আদিত্য এলে প্রণতি খবরটা তাকে দিয়েছিলো। আদিত্য বললো—এতোক্ষণ ও এখানে কি করছিলো?

কি আর করবে, চা খেলো, গল্প করলো আর তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলো।

হঠাৎ আমার জন্য ওর দরদ উথলে উঠলো কেন?

সে তোমার বন্ধুকেই জিজ্ঞাসা করো।

কিছু দিন পর আর একদিন সন্ধ্যের দিকে বিনয় এসেছিলো। দৈবের এমনই যোগাযোগ সেদিনও আদিত্য বাড়ি ছিলো না। বিনয় ঠাট্টা করে বললো—কি বৌদি, অমন দড়ি ছেড়ে দিয়ে রেখেছেন কেন? যখনই আসি কর্তাটি বাড়ি নেই।

প্রণতিও পরিহাস করেছিলো—তবেই দেখুন, আপনারা কত বাঁধা থাকেন। এ সময়ে আপনার গিন্নীকেও কেউ এ কথা বলছে কি না খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

বিনয় উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠেছিলো, বলেছিলো—ওঃ, খুব বলেছেন তো।

সেদিন আবার নাণ্টুও বাড়ি নেই। রান্নাঘরে প্রণতির দেদার কাজ পড়ে রয়েছে। এদিকে অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা। কি মুশকিলেই না পড়লো প্রণতি। আদিত্য ফিরতে কেন যে এত দেরি করছে!

রাত প্রায় সাড়ে আটটায় বিনয় যখন উঠি উঠি করছে, তখন আদিত্য বাড়ি ফিরলো। এতো রাত করে বাড়ি ফেরায় গল্প আর জমলো না, দু'চার কথার পর বিনয় বিদায় নিলো। সে চলে যেতেই আদিত্য প্রশ্ন করলো—বিনয় এতো রাত অবধি এখানে কি করছিলো?

তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলো।

ও আজকাল এতো ঘন ঘন আসে কেন?

আমি কি করে বলবো?

আমি কবে বাড়ি থাকবো না ও কি তা হিসেব করেই আসে না কি!

প্রণতি গম্ভীর গলায় বলেছিলো—সেটা তোমার বন্ধুকেই জিজ্ঞাসা করো।

তার পরেও বিনয় আরও দু'চার দিন এসেছে।

বিয়ের বছর তিনেক পর প্রণতির কোল জুড়ে এলো খোকন। এখন তার দু'বছর বয়স হয়েছে। ঘরের বাতাসে তার কলকাকলির ঝঙ্কার; ঘরের বুকে ছোট ছোট পায়ের দুরন্ত দাপাদাপি কি মিষ্টি!

কিন্তু প্রণতির জীবনের সেই আনন্দ-পাত্রটা কি হলো?

খোকনের মুখের দিকে কেমন এক দৃষ্টিতে তাকায় আদিত্য। প্রণতি ভাবে এ বুঝি পিতৃহৃদয়ের মুগ্ধতা। কিন্তু সেদিন—

অফিস থেকে ফিরেছে আদিত্য। তাকে চা-খাবার দিয়ে গা ধুতে বাথরুমে ঢুকেছিলো প্রণতি। হঠাৎ খেয়াল হলো সাবান আনা হয় নি। তাই সাবান নিতে ফের ঘরে এসেছিলো। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলো — আদিত্য খোকনের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে কি দেখছে। তার হাতে ধরা একটা জিনিস। এক একবার সেটার দিকেও তাকাচ্ছে।

কৌতূহলী প্রণতি পা টিপে-টিপে আদিত্যর পেছনে এসে দাঁড়ালো। তার মুখে কৌতুকের হাসি। এতো মন দিয়ে ছেলের মুখে কি দেখা হচ্ছে!

কিন্তু যা দেখলো তাতে মাথাটা ঘুরে উঠলো প্রণতির। আদিত্যর হাতে একটা ছবি। সে একবার ছবির দিকে আর একবার খোকনের মুখের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি খুঁজছে? সাদৃশ্য?

ছবিটা বিনয়ের। তেমনি পা টিপে টিপে প্রণতি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো আদিত্যর চোখে পড়বার আগেই।

যেখানে বিশ্বাস নেই সেখানে জীবনের ভিতটাই তো নড়বড়ে। ঘর সংসার স্বামী সন্তান—প্রণতির জীবনপাত্রের প্রতিটা কারু-কাজ করা পলে নির্ভরতার আলো পড়ে সুখের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হতো।

সেই পাত্রটা প্রণতির হাত থেকে পড়ে গিয়ে কাচের পাত্রটার মতোই আজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

একটি গানের কলি

লাঠি ঠক্‌ঠক্‌ করে চলতে চলতে বৃদ্ধা থমকে দাঁড়ালো। নিষ্প্রভ চোখের ভারি পাতাগুলো টান করে উপরে তুলে তাকালো সামনের বাড়িটার নেমপ্লেটের দিকে। মনে মনে পড়লো—সোমনাথ চৌধুরী।

বুড়ি পড়তে জানে মনে হয়।

নামটা বড় চেনা লাগলো তার কাছে। অনেকদিন আগেকার একটা হারিয়ে যাওয়া নাম। বুড়ি ভিক্ষে করে খায়। কিন্তু তার মধ্যে সাধারণ ভিখিরির চাইতে একটা আলাদা ধরনের বৈশিষ্ট্য ছিলো! এককালে যে সে রূপসী ছিলো এখনও তার ছিটে-ফোঁটা দেহে লেগে আছে। টিকোলো নাকে চামড়া কোঁচকানো চোখের কোণে বলিরেখা চিহ্নিত চিবুকের খাঁজে খাঁজে এখনও অতীত রূপের আভাস। তাছাড়া তার জরাকম্পিত গলায় এখনও বেশ সুর খেলে। বেশ ভালো গান গায় বুড়ি। গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে করে।

গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লো ভিখারিণী। বাড়ির হাতায় বসে পড়ে গান ধরলো—'ও বলরাম যারে চলে যা, গোপালকে আজ গোষ্ঠে দেবো না।'

গানের আওয়াজ শুনে কৌতূহলী ছেলেমেয়েরা একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। রুমি, রিনি, চিত্রা, বাপ্পন। রিনি বললো—বাঃ! বুড়িটা তো বেশ ভালো গান গায় রে।

চিত্রা বললো—বাপ্পন, মা'র কাছ থেকে চেয়ে বুড়িটার জন্য পয়সা নিয়ে আয়তো।

রুমি বললো—কি বুড়িটা বুড়িটা করছিস! অমনি করে বলতে আছে!

রিনি হেসে ফেলে বললো—তবে কি ঠাকুমা বলবো না কি।

রিনির কথায় ওরা সবাই হেসে উঠলো।

বৃদ্ধার গান শেষ হতেই সব ক'জন একসঙ্গে কলরব করে উঠলো—ও ঠাকুমা, আর একটা করো।

'ঠাকুমা' সম্বোধনে ভিখারিণী একেবারে বিগলিত। গদগদ গলায়

বললো—ও আমার বাছারা, কি মিঠে কথা গো। কি গান গাইবো মাণিক। তোমরা কতো জানো। শুধু হাতে ভিক্ষে নেবো তাই ঠাকুরের নাম করে ভিক্ষে করি। ও কি আর গান গো বাছারা।

না না, বেশ গান, তুমি করো।

বুড়ি আবার গান ধরলো—আমার গোপাল লুকোলো কার ঘরে।

বুড়ির গানের ভাঁড়ারে বাৎসল্য-রসের গানের স্টকই বেশি। এই গান গাইতেই সে খুব ভালোবাসে।

ভিক্ষে নিয়ে বুড়ি ফের রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। লাঠি ঠুকঠুক করে হাঁটছে। তার নিষ্প্রভ দুই চোখে তখন এক ধূসর স্মৃতি দুলছে। সুন্দর একটা ঘর। সেই ঘরে ঘুরছে-ফিরছে একটি রূপসী বধূ। স্বাস্থ্যবান চরিত্রবান স্বামী। কোলে একটি ফুটফুটে শিশু। একটি ছেলে। উঠোনের একপাশে তুলসী মঞ্চ। রোজ সন্ধ্যায় বৌটি তুলসী তলায় প্রদীপ দেখিয়ে প্রণাম করতো। স্বামী গান রচনা করতে পারতেন। বৌটির গলায় সুর ছিলো। সে গান গাইতে পারতো, বড়ো সুন্দর সংসার ছিলো। তারপর একদিন—বুড়ির বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো—একদিন সেই ঘরে সিঁদ কাটলো এক চোর। স্বামীরই বন্ধু বলে যার পরিচয়। সিঁদ কাটলো সেই বৌটির জীবনের মূল ভিতেও। তারপর একদিন বৌটিকে চুরি করে পালালো।

হতচ্ছাড়ি কেমন করে গেলো গো—বিড় বিড় করে উঠলো ভিখারিণী—অমন স্বামী ফেলে, যাক্‌গে স্বামীর কথা, কিন্তু কোলের শিশু ফেলে। অমন ফুটফুটে ছেলে, তিন বছরের বুকের ধন। হতচ্ছাড়ি মরলো না কেন সেদিন, মরলো না কেন?

সেই থেকে বুড়ি প্রায়ই ওই বাড়িতে যেতো ভিক্ষে করতে। ওকে দেখলেই ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসতো ঘর থেকে। রুমি, রিনি, চিত্রা, বাপুন। ঘিরে ধরতো বুড়িকে—ঠাকুমা এসেছে, ঠাকুমা এসেছে। ও ঠাকুমা, একটা গান করো।

বুড়ি দাঁতহীন মুখে হাসে। বলে—কেমন আছো দিদিমণিরা সব! কেমন আছো দাদাভাই! কি গান গাইবো বলো। আমি কি ভালো গান জানি?

রিনি বলে—না না, তুমি খুব ভালো গান জানো। আমাদের খুব

ভালো লাগে।

রুমি বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ, রেডিওর ঐ প্যান-প্যানে নাকি কান্নার চাইতে অনেক ভালো।

বুড়ি খুশির হাসি হাসে।তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় গান ধরে—যশোদা দুলাল নাচে যশোদা কোলে, গোপাল হেলিয়া দুলিয়া নাচে আধো আধো মা মা বলে—।

ছেলেমেয়েরা একটার পর একটা গানের ফরমাস করে। আসর বেশ জমে ওঠে। একসময় বিরক্ত হয়ে ওদের মা মায়ালতা বেরিয়ে অসেন। ধমক দিয়ে বলেন—পড়াশুনো ফেলে সকালবেলা কি করছিস তোরা।

বাবা সোমনাথ গম্ভীর গলায় বলেন—তোমরা ঐ ভিখিরি বুড়িকে নিয়ে বড়ো বাড়াবাড়ি করছো। ভিক্ষে চাইতে আসে, তাড়াতাড়ি ভিক্ষে দিয়ে বিদেয় করে দেবে। ব্যস, ফুরিয়ে গেলো।

বুড়ি লাঠি হাতে ঠুকঠুক করে হাঁটে আর আপন মনে বিড় বিড় করে– আহা, কেমন সোনার চাঁদ ছেলেমেয়েরা গো। কতো সুন্দর করে ডাকে ঠাকুমা—ঠাকুমা—ঠাকুমা। কি সুন্দর ডাক! কান জুড়িয়ে যায়, প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আহা, বেঁচে থাকো বাছারা আমার। বেঁচে থাকো।

সেদিনও যথারীতি ভিক্ষে করতে বেরিয়ে বুড়ি ভিখারিণী চৌধুরী বাড়িতে ঢুকলো। তার গলার সাড়া পেয়ে অমনি বেরিয়ে এলো সব দুষ্টুগুলো। রিনি বললো–ঠাকুমা, আজ শুধু একটা গান শুনবো। পড়া ফেলে বেশিক্ষণ বসে গান শুনলে মা বাবা দু'জনেই বকে।

বুড়ি বলে—তবে আজ থাকুগো দিদিমণি! পড়ার ক্ষতি করে গান শুনতে হবে না। মা বাবা রাগ করবে।

না না তুমি একটা গান করো। একটা গান শুনলে মা বাবা কিছু বলবে না।

বুড়ি গান গাইতে ভালোবাসে। অন্যকে শুনিয়ে আনন্দ পায়। একটা গানই যখন গাওয়া তখন বেশ ভালো দেখে করতে হবে।

খানিক ভেবেচিন্তে বুড়ি গান ধরলো—তুলসী তলায় সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালি আমি/মঙ্গল কর মংগল কর হে জীবনস্বামি! /আমার সখার আমার শিশুর/যত অকল্যাণ করো তুমি দূর/তোমার করুণা বৃষ্টির মতো

মাথায় আসক্ত নামি।

গান গাইতে গাইতে বুড়ির চোখ দুটো বুজে এলো। আবেগে গলা কাঁপলো। চোখের কোণ ভিজে এলো। হঠাৎ দেখা গেলো পায়ে পায়ে সোমনাথও এসে ছেলেমেয়েদের পেছনে দাঁড়িয়েছেন। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বৃদ্ধার মুখের দিকে।

বাবাকে দেখে ছেলেমেয়েরা বিস্মিত এবং শঙ্কিত। শঙ্কিত, বাবা বুঝি বকুনি দিতে এসেছেন। বিস্মিত, বাবাকে এমন অবাক্ হয়ে বুড়ির গান শুনতে দেখে।

গান থামতেই সোমনাথ প্রশ্ন করলেন—এ গান তুমি কোথায় শিখেছো?

বুড়ি চমকে উঠে তাকালো সোমনাথের দিকে। তাকিয়েই রইলো। জবাব দিতে ভুলে গেলো। সোমনাথ আবার জিজ্ঞাসা করলেন—এ গান তুমি কার কাছে শিখেছো?

সম্বিত ফিরে পেয়ে বুড়ি বললো—কতো জায়গায় ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করি; কতোজনের কাছে শিখি অতো কি ঠাওর রাখতে পারি বাবা। কেন একথা জিজ্ঞাসা করছো বাবা।

অন্য সময় হলে একটা ভিখারিণীর কথার জবাব দেওয়ার হয়তো কোনো প্রয়োজনই মনে করতেন না সোমনাথ। কিন্তু আজ এই গানটা তাকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে।

সোমনাথ বললেন—এ গানটা আমার মা গাইতেন। আমার বাবার রচনা। তাঁর খাতায় লেখা আছে।

বুড়ি কেমন বোকার মতো সোমনাথের দিকে তাকিয়ে রইলো। যেন কথাগুলো বুঝতে পারছে না। সোমনাথ মানিব্যাগ খুলে এক টাকার একটা নোট এগিয়ে ধরলেন। বুড়ি ইতস্তত: করছে! হাত বাড়িয়ে নিতে পারছে না। অথচ ছোটোদের দেওয়া পাঁচ-দশ পয়সা কতো হাসিমুখে হাত পেতে নেয়। এখন সোমনাথের হাত থেকে টাকা নিতে তার হাত থর থর করে কাঁপছে।

বুড়ি তার ডেরায় ফিরছে। আর যাবে না সে ও-বাড়িতে। নিঃসংশয় হয়েছে সে। মনে পড়ছে সেই হতভাগিনী বৌটার কথা। অন্ধ মোহের যে প্রচণ্ড উন্মাদনায় একদিন সে তার অমন স্বর্গ ছেড়ে নরকে

এসেছিলো সেই নরকও তাকে বেশিদিন আশ্রয় দেয়নি। তাকে রাস্তার পাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিলো সেই লোকটা। তারপর আর কি। রাস্তায়ই আস্তানা। যতদিন দেহে শক্তি ছিলো খেটে খাওয়া। তারপর অক্ষম হলে শেষ জীবনে ভিক্ষে।

বেশ হয়েছে! যেমন আগুনে ঝাঁপ দেওয়া! মরণ ডেকেছিলো যে। মরবেই তো, বেশ হয়েছে! বুড়ি পথ চলে আর বিড় বিড় করে গাল পাড়ে। কাকে কে জানে!

গানটা সোমনাথকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিলো। খুব ছোটোবেলা থেকেই সোমনাথ মাতৃহীন। তার খুব আবছা আবছা মনে পড়ে মা গানটা গাইতেন। বাবা গান রচনা করতেন। এখনও সোমনাথের আলমারিতে বাবার কালো মলাটে বাঁধানো গানের খাতাটি রয়েছে। সব তাঁর নিজের রচনা। তার মধ্যে এই গানটিও রয়েছে। সেই গান এই ভিখারিণীর মুখে শুনে চমকে উঠেছেন সোমনাথ।

সোমনাথের মা হঠাৎ একদিন কি করে হারিয়ে গিয়েছিলো তার কোনো নির্দিষ্ট চিত্র নেই সোমনাথের মনে। শৈশবে শুনেছেন তার তিন বছর বয়সে মা মারা গেছে! ছোটো বেলায় এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলেন মানুষ মরে ঈশ্বরের কাছে যায়। তাই একদিন পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— আমার মা মরে ঈশ্বরের কাছে গেছে, তাই না পিসীমা?

পিসীমা মুখে তীব্র একটা বিতৃষ্ণার ভাব ফুটিয়ে বলেছিলেন— ঈশ্বরের কাছে না ছাই! নরকে গেছে।

পিসীমার মুখের সেই তীব্র ঘৃণার ছবিটা সেই বয়সেও সোমনাথের চোখে পড়েছিলো। আর কোনোদিন মা'র কথা তিনি কাউকে জিজ্ঞাসা করেন নি।

বড়ো হয়ে ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার না হলেও মোটামুটি তিনি বুঝেছিলেন। দেখেছিলেন বাবার সেই নির্লিপ্ত যোগী-যোগী ভাব। বুঝেছিলেন ব্যাপারটা অগৌরবের। আর অগৌরবের ব্যাপার নিয়ে যে নাড়াচাড়া করতে নেই সেটা বোঝার বয়স তখন তাঁর হয়েছে।

দিন দুই বুড়ির কথা খুব ভাবলেন সোমনাথ। আর একদিন বুড়ি এলে চেপে ধরে কথা বার করতে হবে। জেনে নিতে হবে ঐ গান সে কোথায় শিখেছে।

বেশ কিছুদিন কেটে গেলে সোমনাথের খেয়াল হলো বুড়ি তো আর আসছে না। তিনি ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করলেন—তোদের সেই বুড়ি আর আসে না, না ?

বাবাকে বুড়ির ব্যাপারে কৌতূহলী দেখে ওরা সোৎসাহে বললো—না বাবা, ঠাকুমা আর আসে না।

সোমনাথ বিস্ময়ের সুরে বললেন—তোরা ওকে ঠাকুমা ডাকিস না কি ! রিনি লাজুক-লাজুক মুখে হাসলো। রুমি হেসে রিনিকে দেখিয়ে বললো—ও-ই নাম দিয়েছে।

মায়ালতা পরিহাস করলেন—তুমিও বুড়ির গানের ভক্ত হয়ে গেলে না কি ! তাহলে তো মুশকিল। ছেলেমেয়েরা তবু দু'পাঁচ পয়সা দিচ্ছিলো। তুমি যে আবার গোটা গোটা টাকা দিতে শুরু করেছো।

কয়েক মাস পরের কথা। সেই ভিখারিণী বড়ো অসুস্থ। কয়েকদিন ভিক্ষেয় বেরোতে পারে নি। খাওয়াও জোটেনি ক'দিন। শরীর-গতিক ভালো ঠেকছে না তার। ধুঁকতে ধুঁকতে পথ চলেছে সে। মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে বসে পড়ছে। ফের লাঠি ভর দিয়ে অতি কষ্টে উঠছে। কোনো রকমে গিয়ে পোঁছাতে হবে। ঐ বাড়িটার সামনে গিয়ে তাকে পোঁছাতেই হবে।

অতি কষ্টে প্রাণপণ চেষ্টায় যখন সে এই বাড়ির দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালো তখন তার আর দম নেই। আচ্ছন্নের মতো শুয়ে পড়লো।

বাড়িতে যে ছেলেটি কাজ করে তার নাম মধু। ছুটতে ছুটতে এসে জানালো—বাবু, একটা ভিখিরি বুড়ি আমাদের দোর গোড়ায় শুয়ে পড়ে ধুঁকছে। কত বলছি এখান থেকে চলে যেতে তা উঠতেই পারছে না।

চমকিত হলেন সোমনাথ। ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে এলেন। ছেলেমেয়েরাও সবাই এসে ভীড় করে দাঁড়ালো। সোমনাথ বললেন—তুমি অসুস্থ শরীর নিয়ে এখানে এসেছো কেন ?

বুড়ি সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বললো—একটু জল। সোমনাথের নির্দেশে মধু জল নিয়ে এলো। তিনি মধুকে বললেন বুড়িকে জল খাইয়ে দিতে। মধু এগিয়ে যেতেই বুড়ি বললো—না বাবা, তুমি দাও।

সোমনাথ বিরক্ত হয়ে ভুরু কোঁচকালেন। প্রশ্রয় পেয়ে মানুষের মাত্রাজ্ঞান থাকে না। বুড়ো মানুষ বলে, ছেলেমেয়েরা একটু প্রশ্রয় দিতো তারই সুযোগ নিচ্ছে বুড়ি। কিন্তু মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধার অনুরোধ ঠেলতেও পারলেন না তিনি। মধুর হাত থেকে জলের গ্লাস নিয়ে বুড়ির মুখে একটু একটু করে ঢেলে দিলেন।

জল খেয়ে বুড়ি পরম তৃপ্তিসূচক শব্দ করলো—আঃ! তার কোটরগত দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

সোমনাথ আবার বললেন, একটু অপ্রসন্ন গলায়—এই শরীর নিয়ে তুমি এখানে এসেছো কেন?

বুড়ি থেমে থেমে অতি কষ্টে বললো—তোমার হাতে একটু জল পাবো বলে।

সোমনাথ মনে মনে চমকে উঠলেন।

বুড়ি বললো—তোমাকে একটা কথা বলবো বলে এসেছি।

বলো।

সেই গানটা আমার খোকার বাবার লেখা। গানটা আমি তার কাছেই শিখেছিলাম।

কি বললে! কি বললে!

কিন্তু বুড়ির কাছ থেকে আর কোনো কথা পাওয়া গেলো না। গোটা দুই হিক্কা তুলে বুড়ি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলো।

সোমনাথ নিজের অজ্ঞাতসারে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন—ও! বুড়ির কথার অর্থ আর কেউ না বুঝলেও সোমনাথ বুঝেছিলেন।

দুই ভুরুর মাঝখানে বিরক্তির রেখা ফুটিয়ে মায়ালতা বললেন—কি কাণ্ড! বুড়ি মরবার আর জায়গা পেলে না।

সোমনাথ বললেন—মায়া, তোমার পুজোর ঘরে ফুল আছে? আমাকে কয়েকটা দাও তো।

ফুল! ফুল দিয়ে কি হবে? ঐ ভিখিরিটাকে তুমি ফুল দেবে না কি!

হোক না ভিখিরি। কিন্তু এ যে মৃত্যু। ছোটো হোক বড়ো হোক, যার দরজায়ই মৃত্যু আসে বড়ো মহিমময় রূপে আসে। তখন তাকে ফুল দিয়েই অভ্যর্থনা করতে হয় মায়া!

মায়ালতা কয়েকটা ফুল এনে দিলেন। সোমনাথ সেই ফুলগুলো যত্নে বুড়ির উপর ছড়িয়ে দিলেন। তারপর হাত জোড় করে প্রণাম করলেন।

কাকে? বোধ হয় মহিমময় মৃত্যুকে।

মনে মনে প্রার্থনা করলেন—ঈশ্বর! এই পথভ্রান্ত পথিককে তোমার অনন্ত করুণার এককণা দিয়ো ঠাকুর! এই মহাযাত্রার পথে তুমি ওকে শান্তি দিও, শান্তি দিও।

উপরমহল

কুসুমিতা চাকরি করে। প্রখ্যাত বিশ্বাস আন্ড বিশ্বাস কোম্পানির টাইপিস্ট সে। অবনীমোহন বিশ্বাস এবং অনিরুদ্ধ বিশ্বাস—পিতাপুত্রের নামে এই কোম্পানি। কুসুমিতা এখানে কাজ ক'রে আজ তিন বছর।

অবনীমোহন বিপত্নীক। বছর বাহান্ন বয়স। একমাত্র সন্তান অনিরুদ্ধ শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে বছর দুই অফিসে যাতায়াত করছে। এখনও অবিবাহিত। মার্জিত, বুদ্ধিমান, সুদর্শন। কাজে অখণ্ড নিষ্ঠা। অফিসের সবার ছোটো সাহেব। আর অবনীমোহন! তাকে বলা চলে কর্মযোগী। হয়তো ঘর শূন্য বলেই সাংসারিক অন্যান্য ব্যাপারে উদাসীন! সবটা মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে শুধু অফিসের কাজে। উদারচেতা স্বল্পভাষী প্রত্যেকটি অফিসকর্মীর প্রতি সমান দরদী এই মানুষটি যেন আভিজাত্য আর ব্যক্তিত্বের প্রতীক। কুসুমিতা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে মানুষটিকে। অফিসের সবার বড়ো সাহেব তিনি।

বড় সাহেবের ঘরের মাঝখানে কাঠের পার্টিশান, এদিকে বসেন বড় সাহেব। একটা বড় টেবিলের উপর তাঁর কর্মযজ্ঞ। ও পাশে টাইপ রাইটারে খট খট আওয়াজ তুলে কাজ ক'রে চলে কুসুমিতা। মাঝে মাঝেই ডিকটেশন নিতে তার ডাক পড়ে বড়ো সাহেবের টেবিলে। স্যুইং ডোর ঠেলে এদিকে আসে। তার জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসে নোট নেয়। তার পর আবার ওদিকে গিয়ে টাইপ রাইটারে শব্দ তোলে—খট্ খট্ খট্—অফিসের অন্যান্য ঘর থেকে এই কামরাটি সম্পূর্ণ পৃথক্। সারি সারি ঘরের সামনে টানা লম্বা প্যাসেজ, আর তার উল্টোদিকে এই ঘরটি যেখানে বড়ো সাহেব বসেন। দোরের সামনে টুলের উপর বসে থাকে বেয়ারা। দরকার মতো কলিং-বেল টিপে তাকে ডাকা হয়। এই ঘরেরই গায়ে ভারী পর্দা ঢাকা বড়ো সাহেবের বিশ্রাম-কক্ষ।

কুসুমিতা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বাবা সামান্য বেতনে কাজ করতেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত ও ভগ্নস্বাস্থ্য। মা আছেন। আছে ছোটো

ভাই তমাল ও ছোটো বোন মধুমিতা। ওরা এখনও পড়ে। অবশ্য পড়ার খরচটা যার যার তার তার। কারণ সংসারের আয় বলতে একমাত্র কুসুমিতার উপার্জন। সে তো খেতে পরতেই কুলোয় না। দু'-দু'জনের কলেজের পড়ার খরচ যোগাবে কোথা থেকে। প্রতিটি পয়সা ধরে ধরে হিসেব ক'রে খরচ করতে হয়। আর অসুখবিসুখ হলে? ডাক্তারকে পয়সা দিতে গেলে পেটে টান ধরবে নির্ঘাৎ।

একটা পুরানো বাড়ির একতলায় দুখানা ঘর নিয়ে কুসুমিতাদের সংসার। একতলায় আর এক ভাড়াটে আছে। দোতলায় থাকে বাড়িওয়ালারা। বাড়িওয়ালাও বটে পয়সাওয়ালাও বটে। তাই দোতলার কিছু কিছু বেহিসেবী ব্যবহার নীচের তলার ভাড়াটেদের মাঝে মাঝেই অভিনন্দন জানায়। ভাড়াটেরা প্রতিবাদের কলরব তোলে। কিন্তু দুর্বলের প্রতিবাদে প্রবলের দম্ভ আর অহংকারের ভিত কবে টলেছে? তাই উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলা নানাবিধ অবাঞ্ছিত পদার্থ যথারীতিই নীচে পড়তে থাকে আর নীচের বাসিন্দারা মিথ্যেই চেঁচিয়ে মরে।

বছর শেষ হবার আগে অফিসে কাজের খুব চাপ পড়ে। দেশ-বিদেশের নানা কোম্পানির সঙ্গে বিশ্বাস অ্যান্ড বিশ্বাস কোম্পানির লেনদেন। তাই সারা বছরের বকেয়া ফাইল, হিসেব-নিকেশ সব সেরে রাখতে হয়। সেজন্যে এই সময়ে অফিসে খুব ব্যস্ততা। কুসুমিতার কাজ আরও বেশি। বড়ো সাহেব ক্রমাগত ডিকটেশন দেন আর সে ক্রমাগত টাইপ করে। অফিস ছুটি হয়ে যায়। তবু কুসুমিতার ছুটি নেই। অবশ্য এর জন্য কুসুমিতা 'ওভারটাইম' পায়। শুধু তাই নয় তার বৈকালিক চায়ের ব্যবস্থাও থাকে বড়ো সাহেবের টেবিলে। প্রথম প্রথম কুসুমিতা আপত্তি করেছে। কিন্তু বড়ো সাহেব সস্নেহ আন্তরিকতায় তার সে সংকোচ ভেঙে দিয়েছেন। মানুষটির প্রতি কুসুমিতার শ্রদ্ধা আরও বেড়েছে।

এই সময়টা অফিস থেকে ফিরতে রাত প্রায় আটটা বেজে যায়। অপরিসীম ক্লান্তির তিক্ততা আরও বেড়ে যায় বাড়ি ফিরে যখন শোনে মা'র বাতের ব্যথা বেড়েছে, ওষুধ চাই। তমালের তিন মাসের কলেজের মাইনে ও পরীক্ষার ফি একসঙ্গে দাখিল করতে হবে। অতো টাকা একসঙ্গে সে পাচ্ছে কোথায়? তাই দিদির কাছ থেকে কিছুটা সাহায্য

চায়। মধুমিতার টিউশানি হাতছাড়া হয়েছে এবং শাড়ি ছিঁড়েছে।; কলেজে যেতে অসুবিধে হচ্ছে শাড়ির অভাবে।

ফিরিস্তি শুনে মেজাজ বিগড়ে যায় যদি কুসুমিতার তবে সেটা কি দোষের ?

গোটা সংসারটা যেন দারিদ্র্যের হাঁ দিয়ে তাকে গিলতে আসছে। কুসুমিতা আর পারে না এই জোয়াল টানতে। সে বড়ো ক্লান্ত ; মনটা বিশ্রাম চায়। ছুটি চায়।

অবনীমোহনের বাড়ি থেকে টিফিন কেরিয়ার ভর্তি জলযোগের সরঞ্জাম আসে। বেয়ারা তা বিশ্রাম-কক্ষের টেবিলে সাজিয়ে দেয়। বড়ো সাহেব আর কুসুমিতা একই সঙ্গে চা খায়। সেদিনও অফিস ছুটির পর তারা বিশ্রাম-কক্ষে বসে চা খাচ্ছিলো। বড়ো সাহেব বেয়ারার হাতে কিছু টাকা দিয়ে কোনো জিনিস কিনে আনতে তাকে মার্কেটে পাঠালেন।

চা পানের পর কুসুমিতা আবার তার কলম হাতে নিতে যাচ্ছে অবনীমোহন টুক ক'রে কলমটা তুলে নিয়ে আবার টেবিলের উপর রাখলেন। বললেন—না, আজ আর কাজ নয়।

কুসুমিতা অবাক্ হয়ে তাকায়—কর্মযোগীর হঠাৎ কর্মবিমুখতা ! সহসা সৌম্য স্থৈর্যের আবরণটা যেন দুলে উঠলো। আবেগে স্পন্দিত হলেন অবনীমোহন—কুসুমিতা, আমি বড় ক্লান্ত, বড় একা। তোমার কাছে আমি আশ্রয় চাইছি, তুমি আমায় আশ্রয় দাও—অবনীমোহন কুসুমিতার হাত দুটো চেপে ধরলেন।

—এ কি ! না না, না না—

—তুমি রাজি হও সুমিতা। আমার বিরাট ঐশ্বর্য। কিন্তু তবু আমি শূন্য। আমার ঐশ্বর্যের স্বর্ণচূড়ায় আমি তোমাকে রানী করবো। ভয় পেয়ো না, আমি তোমাকে বিয়ে, হ্যাঁ, বিয়েই করবো। আমার শূন্য ঘরের শূন্য জীবন পূর্ণ ক'রে তুলতে চাই তোমাকে নিয়ে। অনেক দিন ধরে, তোমাকে পাশে নিয়ে কাজ করেছি আর তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে একথা ভেবেছি। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে বলতে পারি নি। কিন্তু আর আমি পারছি না—

বিয়ে করবে ! সামাজিক আভিজাত্যে উজ্জ্বল ধনকুবের অবনীমোহন তাকে বিয়ে করবে ! কুসুমিতা বিহ্বল।

অবনীমোহন তাকে আরও কাছে আকর্ষণ করলেন—কুসুমিতা—

—না না, না না, না না—

কুসুমিতার চিন্তায় পলকে ঝিলিক মেরে গেল সংসারের নগ্ন দারিদ্র্যের চরম তিক্ততার ছবিটা। এই প্রৌঢ় লোকটার কাছে আত্মসমর্পণ করলে তো সেই দারিদ্র্যের পীড়ন থেকে সহজেই মুক্তি মেলে। পরিবারকে বাঁচাতে পরিবারের একটা মেয়ে আত্মবলি দিক না! বিতৃষ্ণার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এই প্রৌঢ়কে বিয়ে করতে যদি কুসুমিতা রাজীই হয় তবে আজই বা—

আর আজ মুক্তিই কি পাবে সে? প্ল্যান ক'রেই বেয়ারাটাকে—

আত্মবলি দিলো কুসুমিতা। বিহ্বল কম্পিত দেহটা অবনীমোহনের কবলে ছেড়ে দিয়ে আত্মবলি দিলো। কিন্তু তখনও আচ্ছন্নের মতো সমানে উচ্চারণ ক'রে চলেছে—না না, না না, না না—

দু-তিন মাস পরের কাহিনী। কুসুমিতা বড়ো সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বললো— আর দেরি করা হয়তো ঠিক হবে না, বিয়েটা সেরে ফেলা দরকার।

—বিয়ে! কার বিয়ে!

কুসুমিতা হকচাকিয়ে গেল। অতিকণ্টে বললো— আপনার—মানে —আমার—

—আর ইউ ম্যাড? কি যা-তা বলছো তুমি!

কুসুমিতার দুই চোখে সমুদ্রের উচ্ছ্বাস জাগতে চাইলো। রুদ্ধকণ্ঠে বললো—আমাকে দয়া করুন, আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেছে।

—তা হয় না, আমার সমাজ আছে, প্রেস্টিজ আছে।

কুসুমিতা সোজা হয়ে দাঁড়ালো, দৃপ্ত কণ্ঠে বললো—আমার নেই?

শীতল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে অবনীমোহন বললেন—মুহূর্তের দুর্বলতায় ভুল তোমারও হয়েছিলো, আমারও হয়েছিলো। ডাক্তারের কাছে যাও, যা টাকা লাগে আমি দেবো।

—আর আমি যে আত্মহত্যা করলাম! আমার সে জীবনের দাম? কে দেবে সেটা?

—স্পর্ধারও একটা সীমা থাকা উচিত কুসুমিতা। আর একটি কথাও উচ্চারণ করলে আমি তোমাকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হবো।

কুসুমিতার দু'চোখের সমুদ্রটা অগ্নিশিখায় পরিণত হ'ল।

বাড়ি ফিরে দেখে মা গজ গজ করছেন—কেমন আক্কেল বল দি'কিনি। ওপর থেকে একগাদা জঞ্জাল আর ময়লা জল ছুঁড়ে ফেললো, আমার সাবান-কাচা কাপড়গুলো শেষ, কাল ফের এগুলো কাচতে হবে। অকারণে মানুষ মানুষের এমন ক্ষতিও করে—

কুসুমিতার চোখ দু'টো আরও জ্বলে উঠলো। চাপা কঠিন গলায় বললো—করে মা করে। যেমন সমাজের তেমনি বাড়ির—ওপর মহলের লোকদের ছুঁড়ে ফেলা জঞ্জালে নীচুতলার মানুষের জীবনযাত্রা এমনি ক'রেই পংকিল হয়ে ওঠে। আজকের যুগের এটাই রীতি মা।

প্রতিদ্বন্দ্বী

সেই স্কুলজীবন থেকে প্রতিযোগিতা, ইরা ও কাবেরীর মধ্যে একজন যদি হয় ফার্স্ট তো অন্যজন সেকেন্ড। তীব্র প্রতিযোগিতা, স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে আবার একই কলেজে ভর্তি হয়েছে দু'জনে। এখানেও চলেছে সেই প্রতিযোগিতার জের। এই পড়াশোনাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবেও পরস্পরের প্রতি একটা রেষারেষির ছায়া পড়েছে। হয়তো ক্লাসের মেয়েরা দল বেঁধে কোথাও বেড়াতে যাবে। তারা ইরা ও কাবেরীকে ধরেছে যাবার জন্যে। ইরা বললো—না ভাই, আমার যাওয়া হবে না, অসুবিধে আছে।

অমনি কাবেরী হুল ফোটাতে চেষ্টা করলো, বললো ঠাট্টার সুরে—কি অসুবিধে রে। পড়াশুনোর ব্যাপার তো। তা পরীক্ষার এখনও এক মা—স বাকি। একদিনে তোর পড়ার এমন কিছু ক্ষতি হবে না, ফার্স্ট তুই-ই হবি, বুঝলি?

তোকে ডিঙিয়ে? বলিস কি? আর পড়াশুনো তো যা করছি। দিনে দু'ঘণ্টা পড়ি কি না সন্দেহ। বাবা এক একদিন যা বকুনি লাগান। তোর মতো আমি অত পড়তে পারি না বাপু। বাড়িতে অসুবিধে আছে তাই বলছিলাম।

সত্যি ইরা, তুই কি আর কখনও ফার্স্ট হয়েছিস। আর না পড়েই এত ভালো রেজাল্ট করিস। তোর মতো 'মাথা' পেলে আমরা ধন্য হয়ে যেতাম।

রাগে ইরার গা জ্বলে যায়। তবু সৌজন্য বজায় রেখে হাসিমুখে বলে—বেড়ালের ভাগ্যেও শিকে ছেঁড়ে। তেমনি আমিও এক আধবার ফার্স্ট হই আর কি!

ইরা চলে গেলে কাবেরী সক্রোধে মন্তব্য করে—পড়ে না আবার! মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে পড়ে। জীবন পণ করে পড়ে, আর বলে কি না পড়ি না। ন্যাকামি দেখলে গা জ্বলে যায়।

বাইরে বোঝার জো নেই কিন্তু মনে মনে দু'জনের মধ্যে এত

রেষারেষি যে পরীক্ষা এগিয়ে এলে দু'জনেই মনে মনে বলে—ঐ মেয়েটার কি জ্বরজ্বারিও হতে নেই। ভগবান কি ওকে পনেরোটা দিন অসুখ দিয়ে শুইয়ে রাখতে পারেন না। সে সুযোগ আমি একটু এগিয়ে থাকতাম। কিন্তু কারও কিছু হয় না। দু'জনেই বহাল তবিয়তে পরীক্ষা দেয়। এবং যথারীতি একজন ফার্স্ট আর অন্যজন সেকেন্ড হয়।

ইরার দিদি ধীরার বিয়ে হয়েছে কয়েক বছর হলো। বেহালায় থাকে। সে তার মামাতো দেওর সুরঞ্জনের সঙ্গে ইরার বিয়ের প্রস্তাব এনেছে। ইরাকে সুরঞ্জন এবং তার মা ধীরাদের বাড়িতে দেখেছে। সেই থেকে পছন্দ, সুরঞ্জনের আগ্রহটা আরও বেশি। বৌদি হিসেবে ধীরার কাছে তা প্রকাশ করতেও সে সঙ্কোচ বোধ করে নি। ইরাও তো সুরঞ্জনকে দেখেছে ধীরাদের বাড়িতে।

ভালো পাত্র। উচ্চশিক্ষিত। উপার্জন ভালো, দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। লম্বা-চওড়া। বাঙালির মধ্যে অমন স্বাস্থ্যবান চেহারা কমই দেখতে পাওয়া যায়।

শুনে ইরা বললো—দিদি, তোর ঐ হোৎকা দেওরটাকে নাকি আমদানি করছিস্।

সে কি রে! ও সব কি বলছিস। একটা পুরুষের মতো চেহারা, অমন পাত্র বাংলাদেশে কয়টা আছে শুনি।

তা হয়তো নাও থাকতে পারে। কিন্তু ওর শুধু মুখখানাতেই হাফ কে-জি মাংস আছে, তুই ওজন করে দেখিস।

ইরার কথার ধরনে প্রথমটায় ধীরা হেসে ফেললো। তারপর রাগ করে বললো—তোর ভাগ্যি যদি ও তোকে বিয়ে করে।

আচ্ছা দিদি, জামাইবাবু তো অমন হোৎকা নয়। তাহলে তোর মতে তার পুরুষের মতো চেহারা নয়। তুই বল্, চেহারার দিক দিয়ে তার সঙ্গে ঐ লোকটার তুলনা হয়?

জামাইবাবুকে যদি তোর এত পছন্দ হয় তো নিয়ে নে না। আমি দিয়ে দিচ্ছি।

দেখ্ দিদি, যা-তা বলবি তো জীবনে আর তোর বরের সামনে যাবো না। আর শোন্, তোর গুণের দেওর তোর দেওরই থাকুক! নতুন সম্পর্ক পাতাতে যাস্নে।

ধীরা থেমে যায়। জানে, যদি ইরা একবার বেঁকে বসে তাকে সিধে করতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। আর তার অমতে বিয়ের সম্বন্ধ করার কথা তো ভাবাই যায় না। কোন্ কেলেঙ্কারী করে বসে ঠিক কি? তাই এ বিয়ের প্রস্তাব চাপা পড়লো।

কয়েক মাস পরের কথা, সেদিন কলেজে গিয়ে ইরা দেখলো কাবেরীকে ঘিরে একদল মেয়ে খুব হৈ-হুল্লোড় হাসিঠাট্টা করছে। কাবেরী হাসিমুখে তা বেশ উপভোগ করছে।

তোকে যখন দেখতে এলো, তুইও তাকে ভালো করে দেখে নিয়েছিস তো কাবেরী?

বা রে, চোখের সামনে একটা মানুষ বসে থাকলে তার দিকে চোখ পড়বে না?

ওদের নিশ্চয়ই পছন্দ হয়েছে তোকে?

তাইতো শুনেছি। আর বাবা তো বলেছেন অমন পাত্র কিছুতেই হাতছাড়া করবেন না। দরকার হলে বিশ হাজার টাকা খরচ করবেন।

তাহলে তো হয়েই গেল ধরে নিতে হবে। আগামী ফাল্গুনে একটা নেমন্তন্ন পাচ্ছি নিশ্চয়ই।

হলে বাদ যাবি না একথা বলতে পারি।

দেখতে কেমন রে কাবেরী, তোর পছন্দ হয়েছে তো?

দেখবি?

কি করে? ও, ছবি এনেছিস বুঝি সংগে। দেখি দেখি—কাড়াকাড়ি করে তার বইয়ের ভেতর থেকে ছবি বার করে নিলো মেয়েরা। সবাই একসংগে ঝুঁকে পড়লো ছবির উপর। ঝুঁকে পড়ল ইরাও। এ কি, এ যে সুরঞ্জনের ছবি, দিদির মামাতো দেওর।

আচ্ছা, ভগবান কি তার সংগে রেষারেষি করার জন্যই কাবেরীটাকে সৃষ্টি করেছেন। ইস্কুলে, কলেজে, আবার বুঝি বিয়ের আঙিনায় দাঁড়িয়েও প্রতিযোগিতা।

আর আদেখলেপনা দেখো মেয়েটার। কলেজে এসেছে তো পাত্রের ছবি ট্যাঁকে করে নিয়ে এসেছে। লজ্জা-সরমের বালাই নেই। দর তো মেয়ের ঐ। ইরা যে পাত্রকে পাত্তা দেয় নি, অবহেলায় বাতিল করে দিয়েছে সেই পাত্রের গন্ধ পেয়ে মেয়েটা যেন বর্তে যাচ্ছে। আচ্ছা, ব্যবস্থা

করছি, ঐ বেহায়া মেয়েটাকে কখনো দিদির আত্মীয় হতে দেবো না। আর সুরঞ্জন। না হয় একটু দশাসই চেহারা। তাই বলে অমন একটা অপদার্থ মেয়ে ওর বৌ হবে না কি! দিদির বাড়ি বেড়াতে গেলে হয়তো মুখোমুখি দেখাই হয়ে যাবে। সে আমার সইবে না। কিছুতেই না।

সেদিনই বিকেলে দিদির বাড়ি গেল ইরা। একথা সে-কথার পর জিজ্ঞাসা করলো—দিদি, তোর হোঁৎকা বাবুর খবর কিরে?

তোর সে খবরে দরকার কি? তুই তো আর তাকে বিয়ে করছিস না। ওরা অন্য জায়গায় সম্বন্ধ দেখছে, শুনেছি, কথাবার্তাও প্রায় ঠিক। অমন ভালো পাত্র, ছেড়ে দিতে হলো।

ঝাঁঝের সঙ্গে ইরা বললো—ছেড়ে দিতে কে বলেছে শুনি!

কেন, তুই-ই তো বললি ওকে বিয়ে করবি না।

'করবো না' বলবো না তো কি 'বিয়ে করবো' 'বিয়ে করবো' বলে নাচতে হবে না কি! জামাইবাবুর সঙ্গে তোর বিয়ের কথা চলবার সময় তুই বুঝি তাই করেছিলি!

ও, পেটে খিদে মুখে লাজ।—ধীরা মুখ ফিরিয়ে উদ্গত হাসি চাপলো। সামনে হাসবার সাহস নেই। আবার যদি বিগড়ে যায় মেয়ে। এখনও চেষ্টা করলে হয়তো সুরঞ্জনকে পাওয়া যেতে পারে, কারণ সুরঞ্জনের তো ষোলো আনা ইচ্ছে এখানেই বিয়ে করে।

পাত্রী নিজে বাড়ি বয়ে এসে বিয়েতে মত দিয়ে গেছে, এহেন সুখবরটি বৌদি হিসেবে বেশ রসিয়ে রসিয়ে ধীরা সুরঞ্জনের কানে তুলেছিলো। তাই সুরঞ্জনের মন ভরে গিয়েছিলো একটি গোলাপী আমেজে।

মিলিত জীবনের প্রথম রাত্রিতে ইরার একান্ত কাছটিতে বসে চিবুক ধরে তার নত মুখখানা তুলে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে সুরঞ্জন বললো—তোমার লজ্জার জন্য আর একটু হলে আমি এমন রত্ন হারাতাম। সে কি আফশোষের কথা হ'ত বল দেখি।

লজ্জা! কিসের লজ্জা!

কেন? এ বিয়েতে যে তোমার মত আছে একথা তুমি আগে লজ্জায় স্বীকার করোনি। ফলে বৌদি ভুল বুঝে আমাদের জানিয়েছিলো—তোমার মত নেই।

মত তো ছিল-ই না!

তবে পরে আবার মত পাল্টালে কেন ?

একটা বাজে মেয়ে তোমার বৌ হবে এ আমার সহ্য হচ্ছিলো না তাই আমি পরে রাজি হয়েছি।

সুরঞ্জন একটু অবাক্ হলো। বললো—আমার বৌ বাজে হলে তোমার তাতে কি এসে যায় ?

কেন ? তুমি দিদির দেওর না ? ঐ মেয়েটা দিদির জা হবে এ আমি ভাবতে পারি না। মেয়েটা আমার সঙ্গে পড়ে তো। এবার পরীক্ষায় এতো চেষ্টা করেও তিন নম্বরের জন্যে সেকেন্ড হয়ে গেলাম। পরীক্ষায় ওর কাছে হেরেছি বলে বিয়ের ব্যাপারেও হেরে যাবো ! আমার চোখের সামনে থেকে ও তোমাকে নিয়ে নেবে আর আমি চেয়ে-চেয়ে দেখবো। তা আর হয় না।

ও, ব্যাপারটা তাহলে ঈর্ষা। সুরঞ্জন হো-হো করে হেসে উঠলো। লজ্জা পেয়ে সুরঞ্জনের কাঁধে মুখ লুকোয় ইরা। বললো—তোমার মতো ছেলে ঐ কাবেরীটার বর হবে এ আমার কিছুতেই সহ্য হচ্ছিলো না। মুখ তুলে সুরঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো—জানো, বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছিলাম কিন্তু কাবেরীটা আসে নি। হিংসেয় জ্বলে যাচ্ছে তো ! বড়ো বাহাদুরি করে বলেছিলো দরকার হলে ঐ পাত্রের জন্য বাবা বিশ হাজার টাকা খরচ করবে। এখন আসে কোন্ মুখে বলো ?

পাতা ঝরার পালা

শিবনাথবাবু আজ অস্তাচলের পথের যাত্রী।

উজ্জ্বল কর্মময় জীবন কাটিয়েছেন শিবনাথবাবু। শিক্ষা-জীবনে তিনি কৃতী ছিলেন। চাকরি জীবনেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রথমে সাধারণ কর্মী হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের আবহাওয়া দপ্তরে ঢুকেছিলেন। তারপর যথেষ্ট যোগ্যতা দেখিয়ে নানা পরীক্ষার ঘাট পেরিয়ে উচ্চপদ অধিকার করেছেন। তিনটি ছেলে আর একটি মেয়ে শিবনাথবাবুর, মেয়েটিকে ভালো ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। ছেলে তিনটিই কৃতী। তাদেরও মনের মতো বিয়ে-থা দিয়েছেন। পুত্রবধূরা শিক্ষিত, ভালোঘরের মেয়ে। এক কথায়, মানুষ যা চায় শিবনাথবাবু তার জীবনে সে-সব ইচ্ছেকেই রূপায়িত করেছেন। এবং সবশেষে রিটায়ার করে বেশ কিছু টাকা নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। বাড়ি করেছেন, জমিজমা করেছেন, একটি জমজমাট সংসার সাজিয়েছেন। ভেবেছেন শেষ বয়সটা নাতি-নাতনি সবাইকে নিয়ে শান্তিতে কাটাবেন। রিটায়ার করেছেন শিবনাথবাবু তাও অনেকদিন হয়ে গেছে। এখন বার্ধক্য হয়েছে তাঁর অঙ্গের ভূষণ। জীবনের দৌড়ঝাঁপ কমে গিয়েছে। ঘরেই বসে থাকেন প্রায় সব সময়। আর খুব সম্ভব জীবনের দিন গোনেন।

পাঁচ বছর হলো গৃহিণী মনোরমা দেহত্যাগ করেছেন। সেই থেকে শিবনাথবাবু নিঃসঙ্গ। ছেলেরা কর্মব্যস্ত। বধূরা যার-যার ঘর আগলাতে ব্যস্ত আর নাতি-নাতনিদের লেখাপড়ার বয়স হতে তারাও তাদের পড়াশুনো স্কুল নিয়ে ব্যস্ত। কাজেই শিবনাথবাবুর নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার লোকের একান্ত অভাব। আগে ছেলেরা দিনে একবার অন্ততঃ দেখা করতো। জিজ্ঞাসা করতো কেমন আছো? এখন সেটুকুও বন্ধ। তিনি ঘরে বসে ধর্মগ্রন্থ পড়েন। কখনও কখনও সাহিত্য পুস্তকও। কিন্তু খুব বেশি পড়তে পারেন না। চোখ বাদ সাধে। আটাত্তর বছর বিশ্বস্তভাবে সার্ভিস দিয়েছে যে চোখ, এখন ক্লান্ত হলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

জানালার ধারে চেয়ারে বসে রাস্তার লোকচলাচল দেখেন। চেনামানুষ দেখলেই ডাকেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা আছে তাঁর। তিনি পাড়ার সার্বজনীন দাদু। যতদিন পর্যন্ত গৃহিণী ছিলেন ততোদিন তেমন টের পাননি কিন্তু গৃহিণী গত হওয়ার পর থেকে ক্রমেই বুঝতে পারছেন আজকাল তিনি কতো মূল্যহীন হয়ে পড়ছেন। আগে তাঁর প্রতিটি কথার একটা দাম ছিলো। প্রতিটি কার্যকলাপকে সমীহ করতো ছেলেরা, বধূরা। কিন্তু এখন ছেলে-বৌ দূরে থাক বাড়ির ঝি-চাকরগুলোও তাঁর কথার তেমন গুরুত্ব দেয় না। তিনি কথাবার্তা বলার জন্য যে সঙ্গীদের রাস্তা থেকে ডেকে আনতেন, ভদ্রতার খাতিরে তাদের অন্ততঃ এক কাপ চা দেওয়া হোক—এটুকু তিনি চাইতেন। বাড়িতে বলেও রেখেছিলেন যেই আসুন তাঁকে অন্ততঃ এক কাপ চা দিও।

প্রথম প্রথম না বলতেই চা আসতো। তারপর, বললে পরে আসতো। তারপর অনেক দেরি করে আসতো, সবশেষে একেবারে বন্ধই হয়ে গেছে। একাধিক-বার চায়ের তাগিদ দিতে গেলে, অতিথি নিজেই ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়েন। লজ্জিত হন।

শিবনাথবাবু ক্ষোভে গুম হয়ে যান।

পরে তাঁর কানে এসেছে বড়ো বৌ, মেজো ও ছোটোর কাছে বলছে—রোজ রোজ উনি রাস্তার লোক ধরে আনবেন গল্প করার জন্য। বারবার অতো চা জোগায় কে?

আশ্চর্য! শিবনাথবাবু অবাক হয়ে ভাবেন—অতো চা জোগায় কে মানে! এখনও তো তিনি পেনসন পান। নিজের বাড়িতে বাস করেন। যে বাড়ির ছাদের তলায় বসে বড়ো বৌমা মুখ ঝামটা দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে বলছে, সেই বাড়ি উঠেছে কার পয়সায়?

তাঁর ধার কি আজ এতোই কমে গেছে? এতোটা মূল্যহীন হয়ে পড়েছেন তিনি?

ইদানীং শিবনাথবাবু দেখছেন তার চা-জল-খাবার বা খাওয়ার সময়েরও বেশ খানিকটা এদিক সেদিক হচ্ছে। নিয়মমাফিক দেওয়া, দিলেই হলো এক সময়, এমনি ভাব, সময় নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ।

ছেলেরা সবাই ন'টার মধ্যে খেয়ে অফিসে বেরোয়। তাই সাত-সকালে তাদের চা হয়। শিবনাথবাবু অতো সকালে উঠতে পারেন না।

প্রভাবতী ক্রিয়াকর্ম পুজো-আহ্নিক সেরে আসতে তাঁর একটু বেলা হয়ে যায়। তখন তাঁর জন্য আবার চা হয়। কিন্তু আজকাল বসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় চায়ের জন্য।

সেদিন সকালেও শিবনাথবাবু চায়ের অপেক্ষায় বসেছিলেন। অনেক বেলা হয়ে গেছে। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন তিনি। আশ্চর্য! তিনি যে বাড়ির একটা মানুষ এ-বোধটা কি এ-বাড়ির কারও নেই? তাঁর আত্মজদের! বড়ো সাধ করে ঘটাপটার ভেতর দিয়ে যাদের এ বাড়িতে এনে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাদের! ছেলেরাও কি বলতে পারে না—বাবার দিকে একটু লক্ষ্য রেখো।

বাড়িতে ভিখু নামে যে ছোটো ছেলেটি কাজ করে তাকে দিয়ে তাগাদা পাঠালেন ভেতরে। বেলা আটটা বাজে। এখনও একটু চা জুটলো না।

বেশ খানিকক্ষণ পরে ভিখু ফিরে এসে জানালো—সে প্রথমে বড়ো বৌদিকে গিয়ে বলেছে দাদুকে চা করে দেবার জন্য। তিনি বললেন—বড়দা অফিসের কাজে বাইরে যাবেন তাঁর জিনিসপত্র গোছগাছ করতে হবে। দশটায় ট্রেন। তাঁর একদম সময় নেই। তিনি বললেন—অন্য কাউকে বলু।

তাহলে মেজো বৌমাকে বলু।

মেজো বৌদিকে বলেছিলাম—দাদুকে চা করে দিন। অনেক বেলা হয়ে গেছে। তা মেজো বৌদি বললেন—আমি এখন অফিসের ভাত নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। এখনি সব খেতে আসবে। আমার তো একদম হাত খালি নেই, অন্য কাউকে বলু।

শিবনাথবাবু একটু গম্ভীর হলেন। বললেন—ছোটো বৌমাকে বলেছিলি?

বলেছিলাম দাদু। ছোটো বৌদি এখন টিটুকে পড়াচ্ছেন। বললেন—আমার ছেলের আজ পরীক্ষা, আমি তো এখন ভীষণ ব্যস্ত। তুই অন্য কাউকে বলু। আর কাকে বলবো দাদু? রঘুদাকেও তো দাদাবাবু মুদির দোকানে পাঠিয়েছেন।

শিবনাথবাবু গুম হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন—ভিখু, তুই চা করতে পারিস?

ভিখু দুঃখের স্বরে বললো—আমি তো চা করতে পারি না দাদু।

শিবনাথবাবুর সাত বছরের নাতি মলু একপাশে বসে লাল নীল

পেনসিল দিয়ে খাতার পাতায় চিত্রাঙ্কনে ব্যস্ত ছিলো, এবং দাদু-ভিখু সংলাপে বোধ হয় তার আগাগোড়াই কান ছিলো। এবার খাতা পেনসিল ফেলে দাদুর কাছে এগিয়ে এসে বললো—দাদু, আমার কাছে দশ পয়সা আছে। বাবা আমাকে লজেনস খেতে দিয়েছে, তুমি নেবে? চা কিনে খাওনা এই পয়সাটা দিয়ে।

এতোক্ষণের অনাদর যদিও বা সহ্য হচ্ছিলো, শিশুর এই দরদ শিবনাথবাবুর বুকের মধ্যে একটা ধস নামিয়ে দিলো। চোখ ভিজে উঠলো তাঁর। দেখলেন—সরল নিষ্পাপ একটা মুখ, পৃথিবীর স্বার্থবুদ্ধির ছোঁয়া তাতে এতোটুকু লাগেনি। মলুকে কাছে টেনে নিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—না দাদুভাই, ও দিয়ে তুমি লজেনস খেয়ো। আমি আজ আর চা খাবো না।

র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে গুটিগুটি উঠোনে নামলেন শিবনাথবাবু। পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলেন বাড়ির বাইরে। বাগান পেরিয়ে পুকুর। ঘাটটার উপর শীতের নরম রোদ পড়েছে। সেই রোদে এসে দাঁড়ালেন।

এখনও তিনি ছেলেদের কাছে প্রার্থী নন। তাঁর পকেটে এখনও পয়সা আছে। ইচ্ছে করলে তিনি পাড়ার চায়ের দোকানে চা-খাবার খেয়ে আসতে পারেন। কিন্তু তাতে কি তাঁর সম্মান থাকবে, না ছেলেদের সম্মানই বাড়বে? বৌদের উপর জোর গলায় অভিযোগ আনতে পারেন—তোমরা পেয়েছো কি আমাকে? আমি ভিখিরি নই। এই যে এতো সুখে সম্মানে গৌরবে প্রতিষ্ঠায় আছো, সে কার প্রসাদে?

কিন্তু না, তাতেও তাঁর গৌরব বাড়বে না। আত্মসম্মান আহত হবে। চেয়ে মান আদায় করবেন! ছিঃ! বাগানে বহু গাছ-গাছালি। শীত ঋতু ওদের সব পাতা ঝরিয়ে দিয়েছে। পত্রহীন ডালে ডালে রিক্ততার উদাস দীর্ঘশ্বাস। শিবনাথবাবুর মনে হলো তিনিও যেন আজ একটা পাতাঝরা গাছ। শীত চলে গেলে বসন্তকালে ওদের আবার নতুন পত্রোদগম হবে, কিন্তু তিনি দিনে দিনে আরও রিক্ত হয়ে যাবেন। শুধু ফুরিয়ে যাওয়ার দিন গুনবেন।

এই তো জীবন! এরই জন্য এতো আয়োজন!

সেই শৈশব থেকে কতো প্রস্তুতি কতো পরিশ্রম অধ্যবসায়, কতো

রঙ ঢঙ কতো পেখম-মেলা, সময়ের রোদে জলে সব কিছুই হয় বিবর্ণ, মূল্যহীন।

যে গাছে ফুল নেই, পাতা ঝরে গেছে, কে চোখ তুলে তাকায় সেই গাছের দিকে! অসহায় অভিমান বুকের মধ্যে গুমরে উঠতে থাকে শিবনাথবাবুর।

বিজয়িনী

সুব্রত আর অনিমেষ দু'জনে এককালে ছিলো বন্ধু তারপরে প্রতিদ্বন্দ্বী।

ওরা দু'জনেই দু'বছরের সিনিয়র হয়েও পড়বি তো পড়, একই মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল।

কি করে যে কলেজের লাইব্রেরী রুমে তনিমার সঙ্গে হঠাৎ সুব্রতর পরিচয় হলো এবং পরিচয় পরিণত হলো ঘনিষ্ঠতায় তা কেউ জানে না। আর দেখা গেল—বন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনিমেষও কখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর আর কি। টাগ-অব-ওয়ার। কে কাকে এড়িয়ে তনিমার সঙ্গ বেশিক্ষণ উপভোগ করবে, কে কতোটা বাহাদুরি দেখিয়ে তাকে খুশি করবে—এই নিয়ে যেন প্রতিযোগিতা। বন্ধু হয়ে দাঁড়ালো প্রতিদ্বন্দ্বী, বলতে গেলে প্রায় শত্রু।

তনিমা কারও প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব দেখায় না। দু'জনকেই সঙ্গদান করে চলে। দু'জনের প্রতিই তার স্নেহ প্রকাশ পায়।

তারপর একদিন বি. এ. পাশ করে অনিমেষ চাকরি করতে গেল আর সুব্রত পড়তে গেল ইউনিভারসিটিতে। তনিমা আই. এ পাশ করে বি. এ. পড়তে লাগলো। ওরা দু'জনেই যেতো তনিমার বাড়িতে। কখনও কলেজের গেট-এ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতো যদি একসঙ্গে বেড়াবার সুযোগ জুটে যায়। যেদিন যে-কেউ একজন থাকতো সেদিনটা বেশ আনন্দেই কাটতো কিন্তু যদি দৈবাৎ দুই বন্ধুর দেখা হয়ে যেতো সেদিন বিরক্তি উপচে উঠতো। মুখভার হতো দু'জনেরই। তনিমা একবার এদিকে একবার ওদিকে তালিম দিয়েও প্রসন্ন করতে পারতো না কাউকেই।

সুব্রত এম. এ. পরীক্ষা দিলো আর তনিমা বি. এ.। ওদের দু'জনের যতোটা মেলামেশা করবার সুযোগ ছিলো চাকুরে অনিমেষের ততোটা ছিলো না। তাই ঈর্ষার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরছিলো সে। এমনি সময়ে অগ্নিতে আহুতি পড়লো। অনিমেষ শুনলো—সুব্রতর সঙ্গে তনিমার বিয়ে।

সেই থেকে অনিমেষের আনাগোনা বন্ধ হলো, বিয়ের পর সুব্রত

করতে লাগলো প্রফেসরী আর তনিমা পড়তে গেল ইউনিভারসিটিতে। মাঝে মাঝে অনিমেষের সঙ্গে দেখা হয় রাস্তায়। কথাবার্তাও হয়।

তনিমা অনুযোগ দেয়—একেবারেই যে আর ও-রাস্তা মাড়াও না অনিমেষ!

নিস্পৃহ কণ্ঠে অনিমেষ জবাব দেয়,—সময় হয় না।

একটু সময় করে নিতে হয়। বন্ধুবান্ধবকে কি একেবারে বাতিল করে দিলে চলে!

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অনিমেষ তনিমার মুখের দিকে তাকায়। ব্যঙ্গ করছে না তো!

সেদিন তনিমা তার এক বান্ধবীর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলো। ফেরার পথে খেয়াল হলো সিঁদুর কিনতে হবে। রুপোর সিঁদুর কৌটোও কিনলো একটা। কিনে তাতে সিঁদুর ভরে নিলো। সেখান থেকে ফিরছে, দেখা হলো অনিমেষের সঙ্গে। হাসিমুখে তনিমা প্রশ্ন করলো—কোথায় চলেছো, আমাদের ওখানে যে মোটেই যাওনা অনিমেষ। চলো, আজ তোমাকে ধরে নিয়ে যাবো।

সে হবে আর একদিন—আজ আমার বাড়ি চলো না। এই তো কাছেই। যাবে?

একটু ইতস্ততঃ করলো তনিমা, তারপর বললো—চলো। তার ইচ্ছে, সুব্রত ও অনিমেষের বিচ্ছিন্ন বন্ধুত্ব ফের জোড়া লাগুক। বিশেষ করে সে-ই যখন বন্ধু বিচ্ছেদের কারণ।

দোতলায় উঠে তনিমা প্রশ্ন করলো—কোনো সাড়াশব্দ নেই যে! তোমার দাদা বৌ সব কোথায়?

তারা কেউ বাড়ি নেই। হাজারিবাগে গেছে।

থমকে দাঁড়ালো তনিমা—কেউ নেই বাড়িতে?

আমি ছাড়া কেউ নেই। কেন, ভয় পেলে নাকি! অনিমেষের মুখে বক্র কটাক্ষ।

দ্বিধা কাটালো তনিমা।—বাঃ, ভয় পাবো কেন? বরং ভয়ের কিছু কারণ ঘটলে তুমিই তো রয়েছো। পুরুষও বটে, বন্ধুও বটে। রক্ষা করবে আমায়।

বসো তনিমা, চা খাও।

আঃ, আবার ওসব হাঙ্গামা কেন? গৃহ এমনিতেই গৃহিণীশূন্য।

গৃহিণীশূন্য গৃহে কি চা-পান নিষিদ্ধ না কি? আমার দারোয়ানই এখন গৃহিণীর কাজ করে। বসো।

অনিমেষ তনিমাকে সযত্ন আতিথেয়তায় আপ্যায়ন করলো।

তনিমা বললো— হলো তো! এবার চলি।

একটু বসোনা। এসে অবধি শুধু পালাই পালাই করছো।

বাঃ, সন্ধ্যে হয়ে এলো। বাড়ি ফিরতে হবে না?

যদি যেতে না দিই।

ওকি কথা!—চমকে উঠলো তনিমা। অনিমেষের কণ্ঠস্বর অমন বিকৃত শোনাচ্ছে কেন? মুখে হাসি টেনে এনে বললো—কি যে পাগলামি করো! অনিমেষ, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ।

না, সত্যি বলছি। সুব্রত আমার সর্বনাশ করেছে। আমি যদি সুব্রতর সর্বনাশ করি।

ম্লান একটু হাসলো তনিমা। বললো—তুমি যদি আজ আমায় অপমান করো অনিমেষ, সর্বনাশটা পুরোপুরি আমারই হবে। তার কি ক্ষতি হবে বলো!

বলো কি! ক্ষতি হবে না?

একটুও না। আমার জীবনটাই শুধু নষ্ট হয়ে যাবে। তার কি? তোমাদের জীবনে অমন কতো আসে কতো যায়।

একটু চুপ করে রইলো অনিমেষ, বললো—অন্ততঃ তার কাছ থেকে তোমায় ছিনিয়ে নিতে তো পারবো। সে যে আমার কাছ থেকে তোমায় ছিনিয়ে নিয়েছে; এ হবে তার প্রতিশোধ।

ভুল করেছো অনিমেষ। সে তোমার কাছ থেকে আমায় ছিনিয়ে নেয়নি। আমিই তার কাছে গিয়েছি!

কিন্তু আমি যে প্রত্যাখ্যানের অপমান, বঞ্চনার জ্বালা ভোগ করছি তাই বা সইবো কেন! আমি কি তোমাকে সুব্রতর চাইতে কম ভালোবেসেছিলাম?

শান্ত মৃদু কণ্ঠে তনিমা বললো—কিন্তু আমি যে শুধু তাকেই ভালোবেসেছিলাম অনিমেষ। একটা মন কি দু'জনকে ভালোবাসতে পারে?

তীব্র কণ্ঠে অনিমেষ বললো—যদি আমায় নাই ভালোবেসে থাকো

তবে অমন প্রশ্রয় দিয়েছিলে কেন? কেন প্রথমেই আমায় তাড়িয়ে দাওনি, কেন তুমি লোভ আর আশা দিয়ে আমায় অতোটা উঁচুতে তুলেছিলে? তারপর ঠেলে ফেলে দিয়ে আমার জীবনটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছো। তার শাস্তিই বা তুমি পাবে না কেন? আজ সেই শাস্তি নিয়ে যাও তনিমা!

ভীষণ হয়ে উঠলো অনিমেষ। তবুও চঞ্চল হলো না তনিমা। তেমনি মৃদু গলায় বললো—আমি তোমায় স্নেহ করেছি অনিমেষ তাই তোমায় তাড়িয়ে দিতে পারিনি। এখনও তোমায় আমি স্নেহ করি।

একটু থমকালো অনিমেষ। তারপর দ্বিগুণ ক্ষেপে গিয়ে বিকৃত গলায় বললো—ও, স্নেহ কর, ওটুকু করে আমার সর্বনাশ না করলে চলতো না তোমার! তুমি যখন আমায় মানুষের মতো বাঁচতে দিলে না তবে পশু হতে ক্ষতি কি! আজ আমার পশুত্বের খানিকটা নমুনা তুমি দেখে যাও। বলে দু'পা এগিয়ে অনিমেষ তনিমার দিকে দুই হাত বাড়ালো।

আর ত্রস্তে চেয়ারটা ঠেলে কয়েক পা পিছু হটে তীক্ষ্ন কণ্ঠে তনিমা বললো—আর এগিয়ো না অনিমেষ, নাটুকেপনা অনেক করেছো, এবার থামবে কি?

চীৎকার করে উঠলো অনিমেষ—না না, কিছুতেই ছাড়বো না আজ। নাটক না সত্যি, দেখে নাও, এদিক ওদিক তাকিয়ে কোনো লাভ হবে না। এই একদিক ছাড়া পালাবার রাস্তা নেই। শত চীৎকার করলেও শুনতে পাবে না কেউ। দারোয়ানটা নীচে, গেটের কাছে। বাইরে গিয়ে না ডাকলে ওখান থেকে শোনা যায় না। একটা কুৎসিত পশুর মতো পা'য় পা'য় এগোতে লাগলো অনিমেষ। অনিমেষের পেছনে পড়েছে বেরোবার দরজা। তনিমা নিরুপায় হয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়ালো। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় হাতের সিঁদুর ভরা কৌটোটাই ছুঁড়ে মারলো অনিমেষের দিকে। যেন কুটোগাছা আঁকড়ে ধরে ভেসে থাকার চেষ্টা!

ঠক্ করে কৌটোটা অনিমেষের কপালে গিয়ে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল কৌটোর মুখ আর অজস্র সিঁদুর গুঁড়োয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল অনিমেষের দুই চোখ, সেই ফাঁকে তার পাশ কাটিয়ে পালালো তনিমা। যেতে যেতে বলে গেল—অনিমেষ, চোখটা ভাল করে ধুয়ে নিয়ো আর একজন ডাক্তার দেখিও। সিঁদুর লেগে চোখ দুটো খারাপ হতে পারে।

বেরোবার মুখে দারোয়ানকে বললো—ওপরে যাও, তোমার বাবু ডাকছেন।

তিন-চার দিন পর। ছুটি হয়ে যেতে রাস্তায় বেরিয়েই তনিমা দেখলো অনিমেষকে।

অনিমেষ বললো—তোমার সিঁদুর কৌটোটা সেদিন ফেলে এসেছিলে তনিমা, এই নাও।

হাত পেতে নিলো তনিমা। বললো—তোমার চোখ কেমন আছে? খারাপ হয়নি তো কিছু? ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

দেখিয়েছিলাম, নইলে তো চোখদুটো জন্মের মতো যেতো। দু-তিন দিন খুব যন্ত্রণা হয়েছিলো, কাল থেকে কম।

ব্যস্ত হয়ে তনিমা বললো—কি মুশকিল! তাহলে আজ এই রোদে বেরোলে কেন? কৌটোটা কি পালিয়ে যাচ্ছিলো?

না, কিছু হবে না, আজ কম আছে। তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছো তনিমা, নয়?

না অনিমেষ, আমি তো বলেছি, আমি তোমাকে স্নেহ করি। তাই তোমার ওপর রাগ করতে পারি না।

কোমল হয়ে এলো অনিমেষের চোখের দৃষ্টি আর মুখের ভঙ্গী। বললো—তনিমা, তোমার মনটা কি সুন্দর। আর আমি পশু।

সুন্দর একটু হাসলো তনিমা,—না, পশু নও, শিশু, ছেলেমানুষ। নিজের ভালোমন্দ নিজেও বুঝতে পারো না।

একটু স্তব্ধ হয়ে রইলো অনিমেষ। বললো—বলতে সাহস হয় না, তবু, আজ যদি তোমার হাতখানা একটু ছুঁতে দাও তবে শপথ করে বলতে পারি, এমন বিকৃত মন নিয়ে আর কোনোদিন তোমার কাছে এসে দাঁড়াবো না।

অনিমেষের মুখের দিকে একটু সময় তাকিয়ে কি যেন খুঁজলো তনিমা। তারপর আস্তে আস্তে নিজের একখানা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

সেই হাতখানি হাতে তুলে নিলো অনিমেষ। তার মুখে সুন্দর এক

টুকরো হাসি ফুটে উঠলো। বললো—তোমার এই চরম ক্ষমা দেবতার নির্মাল্যের মতো মাথায় তুলে নিলাম তনিমা আর শপথ করলাম, তোমার এই স্নেহের মর্যাদা আমি রাখবো। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি সুব্রত দেখতে পায় সে ঠিক ভুল বুঝবে আমাকে।

স্মিত প্রসন্নহাস্যে তনিমা বললো না অনিমেষ, তোমার এই মুহূর্তের সুন্দর হাসিটুকু দেখে কেউ তোমায় ভুল বুঝবে না। চলো, তোমাকে আজ তারই কাছে নিয়ে যাবো। তোমাদের বিচ্ছিন্ন বন্ধুত্বকে জোড়া লাগাবার দায়িত্ব যে আমারই।

বড়দি

না না, লালিমা (পুং) নয়, আমার মামীমার বোন সুপ্রভা মাসীর ভাসুরঝি লালিমা মানে লালীদির কথা বলছি। ছোটোবেলায় লালীদি সুপ্রভা মাসীর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার মাসীমার বাড়ি বেড়াতে আসতো, এদিকে আমিও মামার বাড়ি বেড়াতে যেতাম, তখন লালীদির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিলো এবং বেশ ভাবও জমে উঠেছিলো, লালীদি আমার থেকে তিন-চার বছরের বড়ো ছিলো এবং আমাকে খুব ভালোবাসতো।

লালীদি ছোটোবেলা থেকেই কেমন একটু ক্ষ্যাপাটে ধরনের ছিলো, সবাই বলতো পাগলী। সুপ্রভা মাসীতো ওর কাকীমা ছিলো। হঠাৎ একদিন শুনি লালীদি তাঁকে মাসী ডাকছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম— লালীদি, তুমি তোমার কাকীমাকে মাসী ডাকছো কেন?

লালীদি গলায় বেশ ঝাঁঝ ফুটিয়ে খরখর করে বললো—কি করবো, মাসী নেই বলে কি আমার মাসী ডাকতে ইচ্ছে করে না?

আর একদিন মর্নিং ইস্কুল সেরে বাড়ি ফিরছি, দেখি লালীদি একটা রিক্সা করে কোথায় যাচ্ছে। পায়ে ব্যান্ডেজ। আমি ডাকলাম --লালীদি, কোথায় যাচ্ছো? লালীদি রিক্সা থামালো, বললো—পা'টা বড্ড কেটে গেছে, ডাক্তারখানায় ব্যান্ডেজ করাতে গিয়েছিলাম, এখন বাড়ি ফিরছি।

একা?

রামধনদা আমাদের পাড়ার লোক। চেনা রিক্সা তাই একাই যাওয়া যায়। কোনো অসুবিধে হয় না।

কি করে পা কাটলো লালীদি।

নিজেই বঁটিতে পা তুলে দিয়েছিলাম।

নিজে? ইচ্ছে করে? —আমার তো চোখ কপালে।

দেবো না তো কি—লালীদি রেগে গিয়ে বললো—দ্যাখ্ কাল ইতিহাসের ক্লাস ছিলো, আমার পড়া শেখা হয়নি। পড়া না পারলে ইতিহাসের দিদিমনিটা যা গা জ্বালানো কথা বলে না! তাই বলছিলাম—ইস্কুলে যাবো না। তা বাড়িসুদ্ধ সবাই যেন হামলে পড়লো। এমন

পেছনে লাগলো। ইস্কুলে যা ইস্কুলে যা বলে পাগলা করে দিলো। যেন একদিন ইস্কুলে না গেলে কি সর্বনাশ হয়ে যাবে। দিলাম বঁটিতে পা তুলে। অনেকটা কেটে গেছে রে। নাও এবার পাঠাও ইস্কুলে, কম করেও সাতদিনের জন্য বসলাম বাড়িতে।

এই হলো ছোটো লালীদি।

ক্রমে লালীদি বড়ো হলো, আমিও একটু বড়ো হয়েছি। ইস্কুল থেকে কলেজে ঢুকেছি। নূতন বন্ধু বান্ধব, নূতন নূতন উপলক্ষ। মামার বাড়ি একটু কম যাই টাই। তাই লালীদির সঙ্গেও তেমন দেখা হয় না। এর মধ্যে একদিন শুনলাম লালীদির বিয়ে হয়ে গেছে, বিয়েতে আমার মামা-মামীমার নিমন্ত্রণ ছিলো সুপ্রভা মাসীর বাড়িতে। মামীমার মুখে গল্প শুনেছি বেশ ভালো হয়েছে লালীদির বর। দেখতে বেশ। চাকরি ভালো করে, আর স্বভাবটিও নাকি খুব ভালো। আচার-ব্যবহার চমৎকার।

এহেন সুপাত্রটিকে একদিন দেখারও সুযোগ হলো আমার। অবশ্য মামার বাড়িতেই। মামীমা সুপ্রভা মাসীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন লালীদি ও নতুন জামাইকে নিয়ে বেড়াতে আসার জন্য। ও'রা এসেছিলেন এবং সেদিন আমিও গিয়ে পড়েছিলাম অজান্তেই।

আমাকে দেখে লালীদি তো হৈ-হৈ করে উঠলো—আরে সুপ্তি, তুই? আয় আয় আলাপ করিয়ে দি। সেদিনই সরিৎ বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয়টা পাকা হয়ে গিয়েছিলো। লালীদি আমাকে একটু নিরিবিলি জায়গায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে নিজের বিবাহিত জীবনের সুখ-সৌভাগ্যের কথা উচ্ছ্বসিত ভাবে বলেছিলো। সুখে গর্বে খুশিতে ঝলমল করতে করতে লালীদি বলেছিলো—সবাই বলে খুব নাকি চালাক, খুব বুদ্ধি, কিন্তু জানিস সুপ্তি, আসলে তার উল্টোটা, একেবারে বোকা, আর আমার মুখের একটা কথা খসালেই হলো—হুকুম তামিল করার জন্য এক পায়ে খাড়া। বিনা বাক্যে প্রতিটি আদেশ প্রতিপালন।

একেবারে বশংবদ বলো।

ও মা, সুপ্তি, তুই অতো শুদ্ধ ভাষা বলছিস কেন? বশম্বদ! সোজা বাংলায় বলনা, ভেড়া।— লালীদি হেসে গড়িয়ে পড়ে।

সে কি লালীদি, তুমি কামরূপ-কামিখ্যের মন্ত্র জানো নাকি।

লালীদি হাসিমাখা ঠোঁট দু'টি ফুলিয়ে জবাব দিলো—ওসব কামরূপ কামিখ্যে জানতে হয় না রে। ছেলেগুলো ভেড়া হবার জন্য তৈরি হয়েই বিয়ে করে।

লালীদির স্বামীসৌভাগ্যে আমি খুশিই হয়েছিলাম, তারপর বহুদিন লালীদির সংগে আমার দেখা হয়নি। ইতিমধ্যে আমারও বিয়ে হয়ে গেছে। মামার বাড়ি কদাচিৎ যাই, শুনেছি লালীদিও আর আসে-টাসে না। সংসার-তরংগ ঘনিষ্ঠতার সূত্র ছিঁড়ে মানুষকে দূরে ভাসিয়ে নেয়। আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

হেমন্তের এক সন্ধ্যায় কলেজ স্ট্রীটে কেনাকাটা করছিলাম, এমন সময় চোখ পড়লো, কে? লালীদির মতো মনে হচ্ছে না? প্রথমটা ঠিক চিনতেই পারিনি। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করার পর সন্দেহ দূর হলো, কি চেহারা হয়েছে লালীদির। রোগা, চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, রঙ মলিন। চোখের নীচে কালি। লালীদিও জিনিসপত্র দরাদরি করছিলো।

আমি এগিয়ে গিয়ে ডাকলাম—লালীদি! লালীদি চমকে উঠে মুখ ফেরালো। আমার দিকে চোখ পড়তেই বললো—আরে সুপ্তি, তুই?

এ কি চেহারা হয়েছে তোমার লালীদি, অসুখ-টসুখ করেছিলো না কি!

লালীদি ম্লান মুখে বিষণ্ণ গলায় বললো—আর চেহারা! চেহারার দিকে তাকাচ্ছে কে?

লালীদির কপালে মাথায় সিঁদুর নেই। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম—সরিৎ বাবু কেমন আছেন?

সংগে সংগে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো লালীদি—ওর কথা আর জিজ্ঞাসা করিস না, ও আর মানুষ নেই।

আমি অবাক হয়ে লালীদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। নববিবাহিতা লালীদির উজ্জ্বল মুখটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। মাথার মধ্যে ঘুর-ঘুর করতে লাগলো সেদিনের সেই কথাগুলো। বললাম—সেকি!

লালীদি বললো—এখানে বলা যাবে না। চল্ কোথাও বসি।

লালীদিও একাই এসেছিলো, দু'জনেরই কেনা-কাটা শেষ হলে কলেজ স্কোয়ারে গোলদীঘির পাশে একটা বেঞ্চিতে বসলাম।

লালীদি যা বললো—ইতিমধ্যে লালীদির দুটি ছেলে হয়েছে, একটির বয়স সাত আর একটির পাঁচ। সরিৎ বিশ্বাসের সঙ্গে ইদানীং মোটেই নাকি বনিবনা হচ্ছিলো না তার। এখন তার সংগে কোনো সম্পর্ক নেই লালীদির। তারা এখন সেপারেশনে আছে। লালীদি ডিভোর্স চাইছে।

শুনে আমার তো চোখ কপালে। ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে?

কি করে হলো লালীদি! তুমি না বলেছিলে তোমার একেবারে বশম্বদ।

লালীদি দপদপ করে জ্বলতে জ্বলতে বললো—হুঁ, বশম্বদ! ওসব নতুন নতুন ক'দিন আদিখ্যেতা দেখিয়েছে, তবে যা হয়েছে বলবো ওর দোষে হয়েছে, আমার দোষে কিছু হয়নি।

কিন্তু দোষটা কি?

সর্বাংগে দোষ, বুঝলি সুপ্তি, সর্বাংগে দোষ। আগাপাশতলা দোষ!

নাঃ, ব্যাপারটা যে আর খোলসা হচ্ছে না! বললাম—কি, নেশাটেশা করে না কি?

তা ছাই কে জানে, করতেও পারে।

বাঃ, ওসব দোষ থাকলে কি চাপা দেওয়া যায়, পষ্টই টের পাওয়া যায় লালীদি, গন্ধই পাওয়া যাবে।

না, সে সব কিছু টের পাইনি।

তবে কি অন্য কোনো মেয়ের সংগে কিছু—

আমি কথাটা শেষ করি না।

কি জানি, কিছু আছে হয়তো, নইলে এতোরাত করে বাড়ি ফেরে কেন?

তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করোনি?

তা আর করিনি! এই নিয়ে রোজ রাত্তিরে কি কম অশান্তি গেছে!

কি বলেন?

বলেন—তাস খেলি।

আমি এবার হেসে ফেলি। বলি—লালীদি, হয়তো সত্যিই তাই। তুমি হয়তো রজ্জুতে সর্পভ্রম করছো।

না রে না, আগে আমার একটু কিছু হলে অস্থির হয়ে পড়তো, রাগ

করে রাত্তিরে না খেলে খোসামোদ করে করে খাইয়ে ছাড়তো। এখন যদি রাগ করে না খাই একবার মুখের একটা কথাও বলে না, চুপচাপ নিজে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে। কোনো কারণ ছাড়া এতো পরিবর্তন হয়!

হয়তো ভয় পান লালীদি, তুমি রাগ করে থাকো বলে ভয়ে কিছু বলেন না।

লালীদি ফোঁস করে উঠে বললো—ভয়? তুই আর দালালি করিসনে সুপ্তি, যদি ভয়ই করবে তাহলে এত রাগারাগি করা সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে না কেন? না, আমার জন্য ওর আর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। এমন সংসার করার চেয়ে না করা ভালো। ডিভোর্স আমি নেবোই।

কিন্তু ছেলে দু'টো?

ছেলে দু'টো আমার কাছে থাকবে। —লালীদি জোর দিয়ে বললো —খোরপোষ আদায় করবো, খোরপোষ, বুঝলি?

তা লালীদি যাই বলুক আমার মন কিন্তু মেনে নিতে পারছিলো না, আমার তো সরিৎবাবুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আছে। এতোটা খারাপ লোক তাঁকে কখনও মনে হয়নি। কিন্তু আমি কিছু বলতেই পারছিলাম না, লালীদি আমাকে দাবড়ে থামিয়ে দিচ্ছিলো।

তারপর বহুদিন লালীদির কোনো খবর পাইনি। হঠাৎ দেখা ট্রামে, সেই আগেকার লালীদি বড়ো করে সিঁদুর পরা। পানের রসে ঠোঁট টুকটুকে, চেহারার জৌলুষও বেশ ফিরেছে। বললাম—লালীদি, কি খবর তোমার?

লালীদি আমার দিকে তাকিয়ে একটু লাজুক হেসে বললো—সেটা মিটে গেছে। এখন এক সঙ্গেই আছি, আজ ছেলেদের নিয়ে ননদের বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি, তোর সরিৎদা অফিস থেকে সেখানে যাবে। রাত্তিরে খেয়ে-দেয়ে ফিরবো।

খুব খুশি হলাম লালীদি! কিন্তু কি করে মিটলো ব্যাপারটা?

আর বলিসনে, সেই যে সেপারেশন চলছিলো তখন একদিন বাড়ি গেছি আমার কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসার জন্য। আর দেখেও আসবো কাজের লোকটা ওর খাবার-টাবার ঠিক মতো করে কি না।

সে কি লালীদি! তুমিতো ডিভোর্স-ই করবে ঠিক করেছিলে। তবে ওর খাবার-টাবারের খোঁজে তোমার দরকার কি?

লালীদি অপ্রস্তুতভাবে একটু হাসলো, বললো—তখনওতো হয়নি, তাই ভাবলাম—সে যাক্, ভেবেছিলাম—ও অফিসে চলে গেছে এই ফাঁকে কাজ সেরে আসবো, তা গিয়ে দেখি বাবু অফিস কামাই করে এক সুন্দরী মেয়ে নিয়ে কি হাসাহাসি আর ফষ্টিনষ্টি করছে। মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। বললাম—ও, আমাকে সরিয়ে দিয়ে ভেবেছো এসব করবে? করাচ্ছি দাঁড়াও।

হাতে-নাতে ধরা পড়ে একেবারে মুখ চুন। মেয়েটা লজ্জায় লাল হয়ে ঘেমে নেয়ে উঠলো। দু'জনেই বোবা, এক সময় মেয়েটা মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেলো। আমি বললাম—এমন বেহায়া তুমি! বাড়িতে অন্য মেয়ে এনে—ছিঃ ছিঃ! ও বললো কি জানিস! বললো—তুমি তো আমাকে ডিভোর্স'ই করবে। কাউকে নিয়ে তো সংসার করতে হবে আমাকে।

বুঝলি সুপ্তি, যেন হাত ধুয়ে বসেছিলো, কবে আমি সরবো অমনি ঐ মেয়েটাকে আহ্লাদ করে ঘরে নিয়ে আসবে। আমিও পাল্টা চাল দিলাম। সেদিনই সন্ধ্যেবেলা ছেলেদের নিয়ে বাড়িতে উঠলাম। আমি বেঁচে থাকতে—অন্য মেয়ে নিয়ে—তা হবে না! না বাবা, ভালো হোক মন্দ হোক ও আমারটা আমারই থাক।

সরিৎবাবুর সংগেও একদিন দেখা হয়েছিলো। হেসে বললাম—এখন ভালো আছেন তো?

তিনিও ঠোঁট টিপে হেসে জবাব দিলেন—ভালো। একটা ফাঁড়া কেটে গেছে।

আমি বললাম—তবে যাই বলুন, লালীদির সংগে মিটমাটের চেষ্টা না করে—অন্য মেয়েকে বাড়িতে এনে—এসব কিন্তু ঠিক নয়। এটা অন্যায় হয়েছে।

হেসে উঠলেন সরিৎবাবু। বললেন—আমি তোমার লালীদিকে অনেক বুঝিয়েছি, ফেরাতে চেষ্টা করেছি, পারিনি। ভাগ্যিস সে দিন ঐ মেয়েটি আমার বাড়ি এসেছিলো, তাইতো ঘটনাটা এতো তাড়াতাড়ি মোড় নিলো।

তার মানে ?

আসলে ও আমার আপন মাসতুতো বোন, সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো। বরাবর পশ্চিমে থাকে। দশ বছর বাদে দেশে এলো। লালী ওর নাম জানে কিন্তু মুখ চেনে না। কখনও দেখেনি—মজাটা হলো সেখানেই। ঘরে বসে আমরা গল্প করছিলাম, কথা বলতে বলতে হাসছিলাম এমন সময় লালী এসে ঘরে ঢুকলো। সুমনাকে দেখেই এমন কাণ্ড শুরু করলো যে বেচারি লজ্জায় ভয়ে কুঁকড়ে গেলো, এদিকে আমি মওকা পেয়েছি। আমি চাইছি ঘটনাটা এভাবেই সাজানো থাকুক। তোমার লালীদির মনে ঈর্ষা জ্বলে উঠুক। ঐ ঈর্ষার বড়শিতে গেঁথে যদি মাছ ঘরে তুলতে পারি। তাই আমি সুমনাকে ক্রমাগত চোখের ইসারা করছি। তাকে মুখ খুলতে দিচ্ছি না, যা বলার লাগসৈ দু'চারটে কথা আমিই বলছি। বেচারি সুমনা একরাশ লজ্জা নিয়ে পালিয়ে বাঁচলো, তা হোক, তার এই লজ্জা-টুকুর বিনিময়ে আমি অনেক পেলুম। এজন্য ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই পৃথিবী

আমার তো দুঃখ হয় না, দীর্ঘশ্বাস পড়ে না, আমার হাসি পায়।

হ্যাঁ, সত্যিই হাসি পায়, অফিসের ছুটি হয়ে গেলে আমি পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরি। হেঁটে আসি এইজন্যে—এই সময়টাতে যেমন থাকে ট্রামবাসের ভিড় তেমনি আমার ব্যাগে পয়সাও থাকে ঘাটতি। তাই পদব্রজই প্রশস্ত মনে হয়।

অনেকবার সেলাই করা ও তালি লাগানো চটিজোড়াটাকে ক্লান্ত পায়ে টেনে পথ চলি। কখনও কখনও ফট্ করে ছিঁড়ে যায় চটির ফিতে। চলতে চলতেই ফুটপাথে বসে থাকা সেলাই-বুরুশওয়ালাকে দিয়ে সারিয়ে নিই। সেই সময় দেখি তোমার হাল্কা নীল রংয়ের দামী গাড়িখানা আমার পাশ দিয়ে হুস্ করে চলে যায়। কোনোদিন চৌমাথায় লাল আলো জ্বলে উঠলে মন্থর হয়ে আসে তোমার গাড়ির গতি। আস্তে আস্তে গাড়িটা থেমে যায়। যতোক্ষণ না ট্রাফিক পুলিশের ইংগিতে সবুজ আলোটা জ্বলে ওঠে ততোক্ষণ গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকে। সেই সময়টুকুর মধ্যে আমি বেশ ভালো করে দেখে নিই তোমাকে। তোমার নিখুঁত বিলিতি স্যুট। তোমার ব্যাকব্রাশ করা মসৃণ চুল। ডান হাতের কব্জিতে বাঁধা দামী ঘড়ি। মুখে দামী সিগ্রেট্। মাঝে মাঝে হাতটা একটু বাড়িয়ে সিগ্রেটের ছাই ঝেড়ে নাও। কখনও বাঁহাত দিয়ে গলার টাইটা অকারণেই টেনেটুনে দাও। লাল আলোটা নিভে যেতেই স্টার্ট দাও গাড়িতে।

অনেক তফাৎ। যেন আকাশ আর পাতাল বা সমুদ্র আর গোষ্পদ। তবু আমি তোমাকে ঠিক চিনতে পারি রঞ্জন। চিনতে পারি, তুমি সেই রঞ্জন বোস।

কতই বা বয়স হবে আমার তখন। ষোল সতেরো আঠারো। স্কুলের শেষ দু'একটা ক্লাস আর কলেজের প্রথম দু'একটা বছর। এই সময়টাতে তোমার সংগে আমার পরিচয় ছিলো। শুধু পরিচয় নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু হয়তো ছিলো। সেকথা আমার মনে থাকলেও আজ তোমার হয়তো

তা মনে নেই। এখন যে তোমার অতীতটাকে ভুলে যাবারই সাধনা রঞ্জন বোস! এখন তোমার প্যালেসের মত বাড়ি, হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া গাড়ি। এখন কি তোমার কলুটোলার এক গলির বারো টাকা ভাড়ার স্যাঁতসেতে ঘরটাকে মনে পড়বার কথা! এখন তোমার মাটিতে পা ফেলে চলার সময় নয়। এখন তোমার উড়ে বেড়াবার সময়।

প্রথমে নাণ্টুই একদিন তোমাকে ধরে এনেছিলো আমাদের বাড়ি। লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকে বলেছিলো—দিদিভাই দেখ দেখ, কাকে ধরে এনেছি।

আমি ভাবলাম আত্মীয়-স্বজন কেউ হবেন। ব্যস্ত হয়ে বাইরের ঘরে ঢুকে থমকে গেলাম। অপ্রস্তুতের একশেষ। নাণ্টুটার যদি কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকতো! অপরিচিত কোনো ছেলের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তাও জানি না। আনাড়ির মত দাঁড়িয়ে রইলাম। নাণ্টু বললো—দিদিভাই, এই আমাদের রঞ্জনদা। আমাদের পাড়াতেই থাকেন। কলেজে খেলায় ওর যা নাম! হয়তো শিগগীরই মোহনবাগানে চান্স পেয়ে যাবেন।

তুমি উঠে দাঁড়িয়ে বললে—ওসব কথায় কান দেবেন না। নাণ্টু সব সময়ই আমার কথা একটু বাড়িয়ে বলে। আমাকে ভালোবাসে কি না।

আমি তখন 'আপনার চা নিয়ে আসি' বলে তাড়াতাড়ি পালিয়ে বাঁচলাম। সেই থেকে শুরু। তারপর তুমি প্রায়ই আসতে শুরু করলে। প্রথম দিকে নাণ্টুকে সঙ্গে নিয়ে তারপর তাকে ছাড়াই। তুমি এসেই অবশ্য নাণ্টুর খোঁজ করতে, সে বাড়ি থাকলে তার সঙ্গেই গল্প করতে। কখনও মা'র সঙ্গেও কথাবার্তা বলতে কিন্তু আমি ঠিক টের পেতাম তোমার আসার উদ্দেশ্য কি। মাঝে মাঝে তুমি গোলাপ ফুল এনে নাণ্টুকে দিতে। আমি বুঝতে পারতাম কার উদ্দেশে এ উপহার। নাণ্টুকে ভুলিয়ে ফুলটা নিতে আমার দেরি হতো না। তারপর আড়াল থেকে কান পেতে তোমাদের কথা শুনতাম।

নাণ্টুবাবু, তোমার ফুলটা কই?

দিদিভাই নিয়ে নিলো যে!

নিয়ে নিলো! ভারি অন্যায় তো! তবে যাই বল নাণ্টু ঐ ফুলটুল কিন্তু আমাদের চেয়ে মেয়েদেরই রাখবার সুবিধে। তাদের বেশ মন্তো

একটা খোঁপা থাকে। তাতে গংজে রাখতে পারে। আমরা গংজি কোথায় বলোতো? দুই কানে?

নাণ্টু হেসে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ইংগিত বুঝতে আমার দেরি হয় না। তারপর আমি যখন তোমাকে চা দিতে যাই তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো, গোলাপটা আমার খোঁপায়। আমি যেদিন স্কুল ফাইনাল পাশ করলাম সেদিন তুমি এসে বললে—নাণ্টুর মুখে সুখবর পেয়েই চলে এসেছি। ভালো করে খাওয়াও মুক্তি! মাসীমা, মিষ্টি খাওয়াতে হবে।

আমি নিরীহ মুখভংগী করে বললাম—মা, আজকে না রেশন তোলা হয়েছে। চিনি আছে তো ঘরে। তাই খানিকটা ডিসে করে দিয়ে দাও না।

মা হাসলেন, তুমিও। আমি হাসি চেপে পাশের ঘরে চলে এলাম। জানালার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম, তুমি এলে। পকেট থেকে আধফোটা একটি রক্তগোলাপ বের করে এনে নিজের হাতে আমার খোঁপায় পরিয়ে দিলে। তখন সূর্য তার স্বর্ণসম্পদকে ভেংগে চূর্ণ চূর্ণ করে পশ্চিম আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। তুমি বললে—মুক্তি, আজকের বিকেলটার কথা তুমি হয়তো একদিন ভুলে যাবে কিন্তু আমি কখনোও ভুলতে পারবো না।

ভুলে যাবো! ঐ স্বর্ণকান্ত দেবতা সাক্ষী, প্রতিটি সন্ধ্যায় আজও আমি সে সন্ধ্যাটিকে স্মরণ করি। কিন্ত তুমি ভুলে গেছ রঞ্জন বোস। বড়ো নির্মমভাবেই ভুলেছো।

তারপর কতদিন তোমাদের বাড়িতে গেছি। বারো টাকা ভাড়ার সেই স্যাঁতসেতে ঘরটিতে দেখেছি সে কি কঠোর জীবন-সংগ্রামের ছবি। তোমার বিধবা মা আর তুমি, সংসারে দু'টি মাত্র প্রাণী। তোমার মা ঘরে বসে অষ্টপ্রহর সেলাই কল চালাতেন আর তুমি করতে টিউশনি। তখন তুমি বি. এ. পড়তে। এতো অভাবের মধ্যেও তুমি পড়াশুনো চালিয়ে যাচ্ছো এতে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত ছিলো না। তোমার মাকেও আমি খুবই শ্রদ্ধা করতাম, এখনও করি। অভাবের সংগে এতো কঠিন সংগ্রামের মধ্যেও তাঁর সেই প্রশান্ত মূর্তি স্মিত হাসি আমার মনে সম্ভ্রম জাগাতো। তোমার মা আশা করতেন, তুমিও করতে বি. এ.'টা পাশ করলেই এই সংগ্রামের ইতি হবে, আমিও ভাবতাম তাই। যখন

তোমার কোনো টিউশনি হাত ছাড়া হয়ে যেতো তখন দুর্দশার আর সীমা থাকতো না। আমি কতোবার বাড়িতে মিছে কথা বলে কলেজের এটা ওটা চাঁদার নাম করে টাকা নিয়ে তোমার বই-খাতা জুগিয়েছি। ছেঁড়া স্যান্ডেলের বদলে তোমার পায়ে উঠেছে নতুন স্যান্ডেল। সেবার আমার আংটিটা হারিয়ে যেতে বাড়িতে প্রচুর বকুনি খেলাম, কিন্তু তুমি তো জানতে আংটিটা আসলে হারায় নি। তোমার বি. এ. পরীক্ষার ফি জোগাড় করতে ওটাকে চুপিচুপি স্যাকরার ঘরে বিক্রি করতে হয়েছিলো। তুমি প্রতিবাদ করেছো, আপত্তি করেছো। আমি বলেছি—এতো দ্বিধা কেন তোমার? আমি কি তোমার পর?

অমনি তুমি ব্যাকুলভাবে আমার হাত দু'টো চেপে ধরে বলেছো—মুক্তি, তোমার চেয়ে আপন আমার আর কেউ নেই। তুমি আমার জীবনলক্ষ্মী। একটু সময় দাও আমায়। আমার জীবনের মূর্তিমতী কল্যাণীকে আমি গৃহলক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠা করবো।

তোমার বি. এ. পরীক্ষার কিছুদিন পর। একদিন নাণ্টু ছুটতে ছুটতে এলো—দিদিভাই, দিদিভাই, ও দিদিভাই, দিদিভাই—

কি হলোরে, একদমে আর ক'বার ডাকবি!

দিদিভাই, রঞ্জনদা—এত ছুটে এসেছে নাণ্টু যে হাঁফাচ্ছে, কথা বেধে যাচ্ছে।

কি? রঞ্জনদা কি?—

রঞ্জনদা লটারীতে টাকা পেয়েছে।

আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম—টাকা পেয়েছে! কত টাকা?

ফার্স্ট প্রাইজ। তিন লাখ টাকা।

আমি কি কেঁদে ফেলবো। আমি কি অজ্ঞান হয়ে যাবো? মনে হলো টাকাটা যেন আমিই পেয়েছি। সেই মুহূর্তে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি। দেহ-মন যেন আনন্দের প্রবল ধাক্কায় অবশ হয়ে গেছে। অবশ দেহটা নিয়ে ঠাকুর ঘরে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলাম, টের পেলাম গরম গরম চোখের জল ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে।

তার পরের ইতিহাস একটু অন্যরকম। বারো টাকা ভাড়ার ঘরে কি অতো টাকা ধরে? না, টাকার মালিককেই ধরে? তাই এক ভালো

পাড়ায় বাড়ি নিতে হলো। আর বাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে গাড়ি একখানা না হলে কি চলে? আর সেই বিরাট গাড়ি কলুটোলার এঁদোগলিতে যদি না ঢোকে সেটাকেও তো অস্বাভাবিক ঘটনা বলা যায় না। তাই কলুটোলার তিনের বি বাড়িটার সঙ্গে তোমার সম্পর্কের মোটা কাছিটা ক্ষীণ হতে হতে একদিন সুতোয় পরিণত হলো। সেই সুতোটুকুও ছিঁড়লো যখন তুমি আর এক প্রাসাদোপম বাড়ির রূপসী বিদুষী কন্যাকে বিয়ে করলে। শ্বশুরের বিরাট ফার্মে মোটা মাইনেয় চাকরি নিলে। তোমার নিজের তেতলা বাড়ি হলো।

এর মধ্যে আমার বাবা মারা গেছেন। মা'র সঙ্গে মনান্তর হয়ে মা'র মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করে দাদা আলাদা বাড়িতে চলে গেছেন। মা, ছোটবোন শুক্তি ও নান্টুর আজ আমিই একমাত্র অবলম্বন। তাই আমি আজ দু'শ পঁচিশ টাকা বেতনের মেয়ে-টাইপিস্ট। নিজের বিয়ের কথা তো ভাবতেই পারি না।

তাই বলছি রঞ্জন বোস, আজ তুমি আমায় চিনবে না। তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেও না। আমার এই মলিন শাড়ি আর জীর্ণ চটি আজ তোমার চেনার কথা নয়। তিন লাখ টাকা আর দু'শ পঁচিশ টাকায় যে অনেক তফাৎ! তবু সত্যি বলছি—আমার দুঃখ হয় না। দীর্ঘশ্বাস পড়ে না। আমি জানি, একতলা যখন তেতলায় ওঠে তখন কিছুতেই একতলার কথা মনে রাখতে পারে না। একতলা আর তেতলায় যে অনেক ব্যবধান। সে ব্যবধান কিছুতেই ঘোচবার নয়। তোমার গাড়ি বরাবর এমনি করেই আমার পাশ দিয়ে ছুটে চলে যাবে। আর আমি সারাজীবন এমনি ভাবে জীর্ণ চটি ক্লান্ত পায়ে টেনে টেনে পথ চলবো।

স্রোতের গতি

কোথায় যাচ্ছো ?

এক বন্ধুর বাড়ি। সেখানে আজ তাসখেলার জমাট আসর বসবে।

বারে, দাদা যে ফোন করেছিলেন আজ সন্ধ্যায় ওবাড়ি যেতে।

তুমি চলে যাওনা মলি! আমার তো আজ কিছুতেই যাবার জো নেই। বন্ধুরা এমন ধরেছে। না গেলে চটে যাবে।

বারে, আমি একা যাবো বুঝি ?—মলি ঠোঁট ফোলালো।

আজকের দিনটা দাও না চালিয়ে। এই তো এখান থেকে ওখানে। বাসে উঠলে কতোক্ষণ আর—বলতে বলতে রাজীব বেরিয়ে গেল।

মলির বুকের ভেতরটা গুমরে গুমরে ওঠে। স্তব্ধ হয়ে খানিক বসে থেকে তারপর ঘরকন্নার কাজে হাত লাগায়।

রাত বারোটায় বাড়ি ফিরে রাজীবের একথা জিজ্ঞাসা করতেও খেয়াল থাকে না মলি তার দাদার বাড়ি গিয়েছিলো কি না।

অভিমান মলির বুকের ভেতরটা কুরে কুরে খায়। তবুও মাঝে মাঝে মলি তার আবেদন জানিয়ে রাখে—কাল তো শনিবার। তোমার অফিস তাড়াতাড়ি ছুটি হবে। বসুশ্রীতে ভালো একটা বই এসেছে। চলো না, দেখে আসি।

তুমি গিয়ে দেখে এসো মলি! আমাকে কাল বিকেলে ছুটতে হবে আবার সেই যাদবপুরে।

কেন, যাদবপুরে আবার কি ?

সেই যে আমাদের বন্ধু বিকাশ চৌধুরী, তার বাড়িতে গান-বাজনার আসর বসবে। তাই সব বন্ধুদেরই নেমন্তন্ন করেছে। আসল কথাটা কি জানো ? বিকাশের বৌ নাকি গান শিখেছে। বেশ ভালোই নাকি গায় আজকাল। তাই বন্ধু-বান্ধব ডেকে শুনিয়ে দেওয়া আর কি।

পরদিন রাজীব অফিস থেকে ফিরে তিলমাত্র দেরি করলো না। সঙ্গে সঙ্গেই আবার তৈরি হয়েই রওনা।

চাপা ক্ষোভে থমথম করতে লাগলো মলি। একটা ছেলে-মেয়ে থাকলেও এই নিঃসংগ-শূন্যতার অন্ততঃ কিছুটা উপশম হতো।

মলির একটু গান-বাজনার চর্চা আছে। হারমোনিয়াম নামিয়ে বসে দু'একটা গাইলো। মন লাগলো না। গান বন্ধ করলো। রাজীব কি বসে কোনোদিন তার একটা গানও শুনেছে ছাই!

রাজীবের সব সময় বন্ধুবান্ধব নিয়েই মাতামাতি। আজ এটা, কাল সেটা। আর কিছু না হয়তো তাস খেলা তো আছেই। মলিকে এত্তোটুকু সংগ দেওয়া প্রয়োজন মনে করে না রাজীব। মলির মনটার কথা একটুও ভাবে না। আগের রাত্তিরেই বলে রেখেছিলো মলি পরদিন রবিবার সে মার্কেটিং-এ যাবে। তার কিছু কেনাকাটা আছে। রাজীব সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিলো—বেশতো, যেয়ো। মলিকে যে একা যাবার জন্যই উদার অনুমতি দিয়েছিলো রাজীব মলি তখন সেকথা বুঝতে পারেনি। সকালবেলা চা-পানের পরই রাজীবকে সাজগোজ করতে দেখে মলির দৃষ্টি সন্দেহে তীক্ষ্ন হলো। জিজ্ঞাসা করলো—কোথায় বেরোচ্ছ সকালবেলা?

ওঃ, আজ দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার মলি। মৎস্য শিকার হবে, মৎস্য শিকার। দেখোনা, আজ কতো বড়ো মাছ ধরে এনে ফিস্ট লাগাই রাত্তিরে।

মৎস্য শিকার? কোথায়?

বেশি দূরে নয়, তবে কলকাতার বাইরে। ট্রেনে করে যেতে হবে। বন্ধুবান্ধবরা সব দল বেঁধে যাবে। ওখানে আমাদের বীরেনদের বাড়ি। পুকুরে চারটার ফেলে, মাছের খাবার জোগাড় করে—

আর নিজেদের খাবার? দুপুরের খাওয়া কোথায় হবে? ঝাঁঝালো গলায় বললো মলি।

সে-ও তো বীরেনদের বাড়ি। আরে, সে-ই তো নাটের গুরু। সবাইকে বললে—

কিন্তু আমি যে আজ মার্কেটিং-এ যাব বলেছিলুম।

দ্রুতহাতে সাজসজ্জায় চুলে ফিনিসিং টাচ দিতে দিতে রাজীব বললো—বেশ তো যাও না, আলমারিতে টাকা আছে। যা লাগে নিয়ে যেও।

রুদ্ধকণ্ঠে মলি বললো—একা একা মার্কেটিং করা যায়?

কি মুশকিল। কিন্তু আমার তো মোটেই—আর কাউকে নিয়ে যাও না মলি।—বলতে বলতে রাজীব সিঁড়ির শেষ মাথায়।

একটা অন্ধ আক্ষেপে মলির ভেতরটা তোলপাড় হতে লাগলো। চোখ দু'টো উঠলো জ্বলে। সে মনে মনে বললো—তা-ই করবো। এবার থেকে তাই করবো। পরিপূর্ণ সমর্পণের নৈবেদ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তোমার সামনে। কিন্তু তুমি সেদিকে ফিরেও চাইলে না। ঠিক আছে। আজ থেকে সে নৈবেদ্য সরিয়ে নিলাম, সরিয়ে নিলাম, সরিয়ে নিলাম—

একটা আবেগের তাড়নায় মলিও বেরিয়ে পড়লো। সারাদিন এন্তার ঘুরলো।

রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে রাজীব সোৎসাহে সারাদিনের শিকার-কাহিনীর চমকপ্রদ বিবরণ দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু অপর পক্ষ থেকে বিন্দুমাত্র সাড়া না পেয়ে অগত্যা থেমে যেতে হলো।

পরদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে বুড়ি ঝি ভিখুর মা রাজীবকে চা-খাবার এনে দিলো।

রাজীব জিজ্ঞাসা করলো—তোমার বৌদি কোথায় ভিখুর মা?

বৌদি বাইরে গেছেন।

রাজীবও তার তাসের আড্ডায় বেরিয়ে পড়লো।

তারপর থেকে রোজই অফিস থেকে বাড়ি ফিরে রাজীব মলিকে দেখতে পায় না।

ভিখুর মা চা খাবার এনে দেয়। চায়ে কেমন বার্লি বার্লি গন্ধ। পরোটা শক্ত পোড়া-পোড়া। মলির হাতের খাবার-খাওয়া অভ্যস্ত জিভের যেন চমক ভাঙলো। তাইতো মলি কোথায়? সেই সঙ্গে মনও যেন সহযোগিতা করলো।

সেদিন রাজীব মলিকে জিজ্ঞাসা করলো—ক'দিন ধরে অফিস থেকে ফিরে তোমাকে দেখতে পাইনা তো মলি! কোথায় যাও?

আমারও কাজ থাকতে পারে—একথা তোমার জানা উচিত।

এমন বাঁকা জবাব পেয়ে রাজীব চুপ করে গেল।

বাইরের মুক্তিতে মলি নিজেকে ছড়িয়ে দিলো। সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে যায়। রজত দত্তর সঙ্গে সিনেমায় যায়। রথীন গুহর আমন্ত্রণে স্টিমার পার্টিতে যোগ দেয়।

রাজীব চিরদিন একটু খেয়াল-ছাড়া মানুষ। কিন্তু মলির এই দূরে সরে যাওয়ার ব্যাপারটা তাকে রীতিমতো নাড়া দিলো। কোনো জিনিস যতোক্ষণ মানুষের মুঠোর মধ্যে থাকে ততক্ষণ তার প্রতি একটা অভ্যস্ত নিশ্চিন্তভাব থাকে। কিন্তু যখন মুঠো ছাপিয়ে তা উপচে পড়তে চায় তখন তার প্রতি মন আপনা থেকেই সচেতন হয়ে ওঠে। রাজীবেরও তাই হলো। বললো—তুমি যে আজকাল মোটেই বাড়িতে থাকো না মলি।

তুমি থাকো?

বন্ধুদের সংগে তাসের আড্ডায় বসে ক্ষণে ক্ষণে আনমনা হয়ে যায় রাজীব। এ রোগ তার নতুন।

বারীন বললো—রাজীব, তোমার বৌকে কাল দেখলাম বসুশ্রী সিনেমা হলে। সংগে আমাদের রমেশ দত্তর ছেলে রজত দত্ত। তোমাদের আত্মীয় না কি?

ও, হ্যাঁ, না। মানে—মলিদের কি হয় বোধ হয়।

সমীরেন্দ্র বললো—রথীন গুহর সংগেও প্রায়ই ঘুরতে দেখি তোমার বৌকে। রথীন গুহ আমার মামাতো বোন সুনীলার দেওর হয় কিনা। সেদিন ওরা স্টিমার পার্টিতে গেল। তোমার বৌকেও দেখলাম ওদের সংগে যেতে।

রাজীবের খেলায় ভুল হয়ে যায়।

সেদিন মলি খুব সেজেগুজে বেরোবার উদ্যোগ করছে এমন সময় রাজীব এলো। বললো—কোথায় চলেছো?

বাইরে যাচ্ছি একটু।

সেতো দেখতেই পাচ্ছি। রজত দত্তর সংগে না রথীন গুহর সংগে? এদের জোগাড় করলে কোত্থেকে।

মলির দু চোখ জ্বলে উঠলো। বললো—রজত দত্ত আমার দাদার বন্ধু আর রথীন গুহ আমার বন্ধুর দেওর।

এখন তোমার কোথাও যাওয়া হবে না।

অসম্ভব। আমি কথা দিয়েছি। না গেলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না।

প্রেস্টিজ! খুব প্রেস্টিজের কাজ করছো আজকাল! তাই না? আজ তোমাকে আমার সংগে এক জায়গায় যেতে হবে; চলো।

মলি বললো—তোমার বড়ো দেরি হয়ে গেছে। এখন আর ওকথা বলে লাভ নেই। এমন একদিন ছিলো যখন 'হাত ধরে আমায় নিয়ে চলো সখা আমি যে পথ চিনি না' বলে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমার কাজ ছিলো। কিন্তু সেদিন তুমি আমার হাত ধরোনি। আজ আমি নিজেই পথ চিনে নিয়েছি। এখন ও-কথা বললে চলবে কেন? ওঃ, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলি—

মলি গটমট করে বেরিয়ে গেল।

নদীর স্রোত যখন গতি পরিবর্তন করে তখন কি তাকে আর পুরানো খাতে বহানো যায়?

একটি ইচ্ছের মৃত্যু

কে? জয়া না? জয়ন্তী!

আপনমনে পথ চলছিলো জয়ন্তী। চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে তাকালো।

মহিলাটি কে? মুখখানা যেন চেনাচেনা মনে হচ্ছে। স্মৃতির ঘরে অন্ধভাবে হাতড়াতে লাগলো জয়ন্তী। মহিলার মুখের দিয়ে তাকিয়ে রইলো। মহিলাটি রহস্যভরে মিটিমিটি হাসছে। তার ঐ হাসিটাই জয়ন্তীর স্মৃতির ঘরের কপাট খুলে দিলো। বড় চেনা ভংগী। তাই তো! এ যে তন্দ্রা, তার কলেজ-জীবনের বান্ধবী।

আরে তন্দ্রা! তুই!

চিনতে পেরেছিস তাহলে।

চেনা অবশ্য একটু মুশকিল-ই। অনেক বদলে গেছিস কিনা।

আর তুই বুঝি বদলাসনি? খুব রোগা হয়ে গেছিস কিন্তু। তবু দ্যাখ, আমি এক নজরেই চট্ করে চিনতে পারলুম।

আমার বাড়িতে চল্ না, এইতো কাছেই। এতোদিন পর দেখা হলো। এক্ষুণি তোকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। চল্ একটু গল্প করি বসে।

তন্দ্রা ডান হাতের মণিবন্ধ উল্টে হাত ঘড়িতে সময় দেখলো— না ভাই, আজ সময় হবে না, অন্য কাজ রয়েছে। তবে শিগ্গীরই এক-দিন যাবো। তোর ঠিকানাটা বল্তো, লিখে নিয়ে যাই।

ঠিকানা নিয়ে তন্দ্রা চলে গেলো।

জয়ন্তী ভাবতেই পারেনি তিন দিন না যেতেই তন্দ্রা এসে হাজির হবে। হাসতে হাসতে সর্বাংগে সুখ ও সচ্ছলতার স্বাক্ষর বহন করে তন্দ্রা এলো। বহুদিন পর পরস্পরকে কাছে পেয়ে দুই বান্ধবীই উচ্ছ্বসিত। পুরনো দিনগুলো ফিরে পেয়েছে যেন। কতো কথা, কতো গল্প। বয়স ভুলে দুজনেই যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে।

জয়ন্তী, আমাদের সংগে কলেজে পড়তো সুরজিৎ রায়—তাকে মনে আছে তোর? যেমন ছিলো চেহারাখানা তেমনি ছিলো পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে। তাই সবাই ওকে রাজপুত্তুর বলতো।

মনে নেই আবার! খুব আছে।

সেই রাজপুত্তুর তো তোর জন্য একেবারে পাগল ছিলো। হবে না কেন? তোর চেহারাখানাও তো নেহাৎ ফ্যালনা ছিলো না।

জয়ন্তী হাসলো—হ্যাঁরে, তক্কে তক্কে থাকতো। সুযোগ পেলেই পিছু নিতো, পারতপক্ষে সুযোগ হাতছাড়া করতো না।

তোর চেহারা কিন্তু খুব খারাপ হয়ে গেছে জয়া। একটু বেশি বুড়িয়ে গেছিস্।

আর চেহারা! সংসার, ছেলেমেয়ে, অশান্তি-ঝামেলা—চেহারা আর কতোদিন ঠিক থাকে বল্।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বললো—আর অভাবের যন্ত্রণা-ই বা কম কি! সেটা তো আর তোকে বলতে পারবো না। স্টেট গভর্নমেন্টের চাকুরেদের যা মাইনে! ঘষ্টে ঘষ্টে চলতে চলতে জীবনটাই যাচ্ছে ক্ষয়ে; আমার বাবা তো তোর বাবার মতো বেশি টাকা দিয়ে পাত্র যোগাড় করতে পারে নি।

অবশেষে তন্দ্রা বললো—আসছে সাতাশ তারিখে আমাদের বিবাহ-বার্ষিকী। বারো বছর পূর্ণ হচ্ছে কি না, তাই এবার একটু বিশেষ অনুষ্ঠান করার ইচ্ছে। তোকে কিন্তু স-কর্তা যেতেই হবে। না গেলে ভীষণ রাগ করবো, বুঝলি?

জয়ন্তীর সমস্ত সত্তায় একটা খুশির হাওয়া বইয়ে দিয়ে তন্দ্রা চলে গেলো।

জয়ন্তী উচ্ছ্বসিতভাবে রণেনকে বললো—তন্দ্রার বিবাহবার্ষিকীতে যেতেই হবে। তুমি খুব ভালো দেখে খানিকটা রুমালের কাপড় এনো তো, আমি তাতে নিজের হাতে ফুল তুলে দেবো। জানো, এককালে ও আমার হাতের সেলাই খুব পছন্দ করতো। অবশ্য শুধু রুমাল দেওয়া যায় না, সেই সংগে একটা অন্য কিছুও কিনে দিতে হবে। নইলে ভালো দেখায় না।

সংসারের অনেক কাজ সংক্ষেপ করে রুমালে নক্‌শা তুলতে বসলো জয়ন্তী।

একই সংগে কলেজে পড়তো তন্দ্রা ও জয়ন্তী। দু'জনে যতো ছিলো ভাব ততো ছিলো পরস্পরের প্রতি সূক্ষ্ম ঈর্ষা। তন্দ্রা ছিলো সচ্ছল ঘরের মেয়ে। পড়াশুনোয় খুব ভালো। জয়ন্তী সেদিক দিয়ে তার নাগাল পেতো না। আর জয়ন্তীর ছিলো অসাধারণ রূপ। আজকের জয়ন্তী তো সে জয়ন্তীর ছায়া মাত্র। তাছাড়া—সেলাইয়ে জয়ন্তীর হাত ছিলো নিপুণ। এদিক দিয়ে তন্দ্রা পাত্তা পেতো না তার কাছে। তন্দ্রা বলতো—তোকে দেখলে বুঝতে পারি বিধাতা কতো বড়ো শিল্পী। আর তোর সেলাই দেখলে বুঝতে পারি তুই কতো বড়ো শিল্পী।

জয়ন্তীর বিয়ে হলো আগে। বছর খানেক বাদে তন্দ্রার। ক্রমে সংসারের আবর্তে ওরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। দীর্ঘকাল পরে এই দেখা। সেই ছেলেমানুষী ঈর্ষাটা আজ কোথায় হারিয়ে গেছে। আজ দু'জনেই শুধু ভালোবাসার বন্যায় প্লাবিত।

সত্যি, তন্দ্রাটা এখনও বেশ আগের মতোই আছে—জয়ন্তী মৃদু নিশ্বাস ফেলে ভাবে তার মতো বুড়িয়েও যায়নি, ফুরিয়েও যায় নি। হবে না কেন? অভাবের যন্ত্রণা তো তাকে আর সইতে হয়নি। বিয়ের আগেও না, পরেও না। শাঁসালো বাপ মোটা টাকা দিয়ে শাঁসালো পাত্রই গেঁথে এনে দিয়েছে। মনে পড়ে জয়ন্তীর বিয়ের কথাবার্তা যখন ঠিক হচ্ছে মা বাবাকে বলেছিলেন—এখানে বিয়ে ঠিক করছো, ছেলের আয় যে খুব কম। মেয়েটাকে যে পয়সা গুনে দিন কাটাতে হবে।

বাবা গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছিলেন—'তুমি যদি পয়সা গুনে জীবন কাটিয়ে দিতে পারো তোমার মেয়েও পারবে। এর চেয়ে ভালো পাত্র আনার ক্ষমতা আমার নেই।'

মা'র কথাই ঠিক হয়েছে। পয়সা গুনেই দিন কাটছে জয়ন্তীর। বিয়ের পর প্রথম দিকে জয়ন্তীরও জীবনটাকে একটা উৎসব-মণ্ডপ বলে মনে হতো। প্রজাপতির মতো হাল্‌কা পাখনা মেলে উড়ে বেড়াতো সে। সিনেমা দেখা, ময়দানে বেড়াতে যাওয়া, খাওয়া-পরা, হাঁটা চলা সবই যেন উৎসব। সমস্ত জীবন জুড়ে শুধু ভালো লাগা। আশ্চর্য ভালো লাগা! মানুষের এই ভালো লাগার দিনগুলি কি করে যে এতো

তাড়াতাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর্থিক অনটন বোধ হয় তার প্রধানতম কারণ।

সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে জয়ন্তী এখন এতোই ব্যতিব্যস্ত যে তার উৎসব-মণ্ডপের আলোগুলো কখন একে একে সব নিভে গেছে খেয়ালই নেই তার। সংসারের চাপে পিষ্ট হয়ে তার ছোট ছোট ইচ্ছেগুলো গেছে মরে। ছোটোখাটো সব সখ কোথায় গেছে হারিয়ে। সেই ভালো লাগার অনুভূতিটাও কেমন নিঃসাড় হয়ে গেছে। হঠাৎ তন্দ্রা এসে কি তার আলো নেভানো উৎসব-মণ্ডপে আবার একটি আলো জেবলে দিয়ে গেলো? নইলে রুমালে ফুল তুলতে এতো ভালো লাগছে কেন জয়ন্তীর? অনেক দিন আগে হারিয়ে যাওয়া একটা অনুভূতি আবার শিরশির করে জেগে উঠছে বুকের ভেতর।

বিয়ের তেরো বছর পরে এখন জয়ন্তীর একটি মাত্র-ই পরিচয়। সে সুগৃহিণী। রণেনের মাইনের অঙ্কটা তেমন স্ফীত নয়। তিনটি ছেলেমেয়ে জয়ন্তীর। সবাই স্কুলে পড়ে। খাওয়া পরা, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ইত্যাদি যাবতীয় খরচের ব্যাপারে জয়ন্তী নিপুণ শিল্পীর মতো প্রতিটি পয়সার হিসেবের সূক্ষ্ম আঁচড়ে আঁচড়ে ছবির মতো ফুটিয়ে তুলেছে সংসারটিকে। এতোটুকু এলোমেলো হতে দেয়নি। এই হিসেব কবার বাইরে জয়ন্তীর আর কোনো জীবন নেই। কোনো ইচ্ছে নেই। কিন্তু অনেকদিন পর তন্দ্রা এসে জয়ন্তীর সারা বুক ভরে একটি ইচ্ছের প্রদীপ জবালিয়ে দিয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমি যাবোই—এ কথা জয়ন্তী যতোই ভাবে ততোই তার সেলাইয়ের হাত দ্রুত হয়। তার ইচ্ছেটাই যেন রুমালের কোণে সুন্দর ফুল হয়ে ফুটে ওঠে।

কিন্তু উৎসবের ঠিক দু'দিন আগে হঠাৎ শঙ্কুর প্রচণ্ড জবর। ঠাণ্ডা লেগেছে; ইনফ্লুয়েঞ্জা, দু'দিন বাদেই কমে যাবে ইত্যাদি মনকে সান্ত্বনা দেওয়া কথাগুলো তৃতীয় দিনে আর হালে পানি পেলো না। বাড়াবাড়ি জবর দেখে ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার ডাকলো রণেন। ডাক্তারের ফি ও ওষুধ মিলিয়ে বেশ মোটা অঙ্কের একটা টাকা বেরিয়ে গেলো।

ওষুধ পড়তে বিকেলের দিকেই শঙ্কু অনেকটা সামলে উঠলো, অন্ততঃ দুশ্চিন্তা কেটে গেলো।

সন্ধ্যের দিকে রণেন বললো—আজকেই তো তোমার বন্ধুর ওখানে

নেমন্তন্ন, যাবে নাকি ?

জয়ন্তী দ্বিধাগ্রস্ত গলায় রণেনকেই পাল্টা প্রশ্ন করলো—যাবো ?

রণেন আমতা আমতা করে বললো—যেতে গেলেই তো আরও কতগুলি টাকা খরচা। এমনিতেই শঙ্কুর অসুখে ঝট্ করে কতোগুলো টাকা বেরিয়ে গেলো কি না।

আলনায় নামিয়ে রাখা শাড়ি জামাগুলোর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে জয়ন্তী চেপে চেপে একটা নিশ্বাস ফেললো। মৃদু গলায় বললো—তবে থাক্।

রণেন বেরিয়ে গেছে। পাশের ঘরে নীলু ফুলু মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে বসেছে। এ ঘরে খাটের উপর শঙ্কু শুয়ে। রোগের উপশম হওয়াতে আরামে ঘুমুচ্ছে। ঘরের চড়া আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে জয়ন্তী। মৃদু নীলাভ আলোটা সারা ঘরে শান্ত মায়া ছড়িয়ে জ্বলছে। জানালার পাশে একটা চেয়ার টেনে চুপচাপ বসেছিলো জয়ন্তী। এখন তন্দ্রার বাড়িতে উৎসব চলেছে। তন্দ্রা হয়তো তার জন্য অপেক্ষা করছে। ছেলেমানুষের মতো একটা দুরন্ত অভিমান জয়ন্তীর বুকের মধ্যে ফেনিয়ে উঠছিলো। কার উপর কে জানে! ছোটোবেলায় বায়না করে কোনো জিনিস না পেলে যেমন হতো বুকের ভেতরটা তেমনি করছিলো। কেন, তার একটা ছোট্ট ইচ্ছেও এমনি করে মিথ্যে হয়ে যাবে ? আবার নতুন করে তন্দ্রার প্রতি তার ঈর্ষা হলো। কেন তন্দ্রা জীবনে সব কিছু পাবে আর সে কিছুই পাবে না। একটা কান্নার ডেলা বুক ঠেলে উপরদিকে উঠতে চাইলো। মাঝে মাঝে চোখের কোলে গরম জলের অবুঝ ঝাপটাও অনুভব করছিলো সে। তার প্রাণের আলো নেভানো জলসাঘরে একটি ইচ্ছে আবার জেগে উঠে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিলো, আবার নতুন করে তার মৃত্যু হলো।

দিন : রাত

বয়স সবেমাত্র চাল্লিশের ঘর ছুঁয়েছে, এই বয়সেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে সুগত সেন। সুগত সেন একজন রাজনৈতিক নেতা এবং সমাজসেবী। তবে রাজনৈতিক নেতা অপেক্ষা সমাজসেবী হিসেবেই তার খ্যাতি বেশি। সমাজসেবার জন্য ভারি ভারি সব খেতাবও পেয়েছে সুগত সেন। নামের পেছনে লম্বা লেজুড়ের মতো সেগুলো শোভা পায়। পাড়ার তো বটেই, তার এলাকায় সকলেই সুগত সেনকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করে। যে কোনো সমস্যায় পড়লে বা বিশেষ কোনো প্রয়োজনে সবাই এসে দাঁড়ায় সুগত সেনের কাছে। বুদ্ধি-পরামর্শ চায়। সাহায্য-সহায়তা পায়। নিজের হাতের নাগালের মধ্যে উপায় কিছু থাকলে এবং সাধ্যে কুলোলে সুগত সেন কিছু করতে চেষ্টাও করে। নিছক পরোপকারের দায়ে না হোক খ্যাতির লোভে, লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণের মোহেও বটে। রাস্তায় হেঁটে যেতে দশজনে কেউকেটা ভাববে, সম্ভ্রমের চোখে তাকাবে—সেই মোহ-ই বা কম কি! কাজেই সকাল-সন্ধ্যে সুগত সেনের বৈঠকখানায় ভিড় গমগম করে। নানা প্রয়োজন নিয়ে আসে অনেকে। নানা সমস্যার সমাধানে সুগত সেনের নির্দেশ চায়। কেউবা আসে শুধুই তোয়াজ করতে। একজন প্রভাবশালী লোককে তোয়াজে তৈলসিক্ত করে হাতে রাখা ভালো। কখন কি দরকার পড়ে। তাছাড়া—'সুগত সেনের সঙ্গে আমার বিশেষ খাতির আছে, একেবারে মাই ডিয়ার লোক'—এ কথাটা বলতেও তো অনেকের বুক গর্বে ফুলে ওঠে।

সেদিনও বৈঠকখানা-ঘর লোকজনের আনাগোনায় সরগরম। দীপারতি এর মধ্যেই দু' দফা চা পাঠিয়ে দিয়েছে সে ঘরে।

কলতলায় বসে বাসন মাজতে মাজতে ঠিকে-ঝি রাধা বললো—বৌদি, বাবু বাড়ি আছেন তো?

আছেন, বাইরের ঘরে অনেক লোকজন এসেছে। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন।

বৌদি, আমি বাবুর সঙ্গে একটু দেখা করবো।

কেন গো রাধা, কি হয়েছে?

বৌদি, কপালের কথা আর বলবো কি। পেটে ভাত নি, পরনে কাপড় নি, তার ওপর মার খেয়ে খেয়ে গা-গতরের হাড় নড়ে গেল গা! পাঁচ বাড়ি কাজ ক'রে কোনো অবমে জীবন অক্ষে করে আছি। ভাত দিতি পারবিনি, খজ আঁভিবে ভরপেট তাড়ি গিলে এসে পিইটে আমার হাড় গুঁড়ো করবি! ভাত দেবার ভাতার নয় কিল মারবার গোঁসাই। এ কি সয় বৌদি ?- রাধা আঁচল দিয়ে চোখ মুছলো।

দীপারতি বললো—তা বাবু এসে কি করবে রাধা?

বাবুকে এ তল্লাটের সবাই মান্যিগণ্যি করে তো। বাবু মাঝে মধ্যে ওবেও বজ্জাতে ভোগড় করে দেন। দু চার টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। বাবুকে ভয় পায়— তাই একটু জানিয়ে যাবো।

তা হ'লে যাও, ওই ঘরে বাবু আছেন, বলো গিয়ে।

অত নোকের মদ্যি কি ওসব কথা বলা যায়! তুমি একটু ডেকে পাঠাও না বৌদি!

খবর পেয়ে সুগত সেন ভিতরে এলে রাধা তার কাছে কেঁদে পড়লো। 'এই দেখুন বাবু'- বলে ব্লাউসহীন খালি গায়েব পিঠের আঁচলটা একটু সরিয়ে দেখাতেই শিউরে উঠলো দীপারতি। সারা পিঠে দাগড়ো দাগড়ো কালসিটে দাগ।

সুগত সেন বললো—হারান মেরেছে? ইস, করেছে কি হতভাগা? হারামজাদাকে একবার পাঠিয়ে দিও তো আমার কাছে। আমি দেখছি।

সুগত সেন বাইরে যাবার আগে আড়চোখে একবার দীপারতির দিকে তাকালো। সেই সময়ে দীপারতিও সুগতর দিকে একবার তাকিয়েছিলো। দুজনের চোখের নিঃশব্দ ভাষায় দু'জনে কি পড়লো কে জানে।

ঘড়ির কাঁটা রাত বারোটার ঘর পেরিয়ে গেলে সুগত সেন বাড়ি ফেরে। বরাবর এমনি রাত করেই সে ফেরে। বাড়ির সবার খাওয়া হয়ে যায়। টেবিলের উপর তার খাবার ঢাকা দেওয়া থাকে। কোনোদিন দীপারতি জানালার কাছে চেয়ার পেতে জেগে জেগে বসে থাকে, কোনোদিন হয়তো বা বই পড়ে। শুয়েও পড়ে কোনো কোনো দিন। সুগত ফিরে

এলে উঠে আসে। কারণ, সুগত তখন ঠিক ধাতস্থ থাকে না। বড্ড এলোমেলো হয়ে যায়। এক এক দিন খাবার খায় না। যেদিন খায় ঢাকা খুলে খাবারগুলো ঠিকমতো নিয়ে খেতে পারে না। কিছু খায়, কিছু ফেলে ছড়িয়ে উঠে পড়ে। বাটি থেকে থালায় তরকারি ঢালতে গিয়ে হয়তো হাত থেকে বাটিই ফসকে মাটিতে পড়ে যায়। রাত দুপুরে বাসনের ঝনঝন্ শব্দ ওঠে। বাড়ির লোকজন জেগে যায়, লজ্জা বোধ করে দীপারতি। তাই দীপারতি উঠে আসে। ঢাকা খুলে খাবারগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে দেয়। দীপারতি স্ত্রীর কর্তব্য করে। তারপর স্ত্রীর অন্যান্য প্রাপ্য বুঝে নিয়ে নিঃশব্দে নিজের শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে দীপারতি। না কি অনেকক্ষণ জেগে থাকে! ছট্‌ফট্‌ করে জ্বলুনিতে!

সেদিনও অনেক রাত করে বাড়ি ফিরলো সুগত তেমনি অবস্থায়। দীপারতি খাবার গুছিয়ে দিতে গেলে সুগত বললো —আমি খাবো না, বাইরে খেয়ে এসেছি।

দীপারতি চাপা গলায় বললো—বাইরে খাবে একথা আগে বলোনি কেন? কতোগুলো খাবার নষ্ট করা।

সেটা কি আগে জানা ছিলো?

জানা না থাকার তো কথা নয়। যেদিন সন্ধ্যেবেলা ঐ মেয়েটার সংগে বেরোও সেদিন তো বাইরেই খেয়ে আসো। বলে গেলেই হয়।

মেয়েটা মানে সুগতর ঘনিষ্ঠ সহকর্মিণী মলয়া তরফদার।

তেতে ওঠে সুগত। সব কিছু তোমাকে কৈফিয়ৎ দিয়ে করতে হবে না কি?

না, তা দেবে কেন? আমার অধিকার আর কতোটুকু? সেটা তো ক্রমে ক্রমে তুমি মলয়ার হাতেই তুলে দিচ্ছো।

খুব বাঁকা বাঁকা কথা বলছো যে, বড়ো তেজ তোমার, তাই না?

আমার তেজ আমার সামাজিক অধিকারের অহংকার। আমার তেজ থাকবে না তো কি থাকবে ঐ মলয়া তরফদারের? ঐ চরিত্রহীন মেয়েটার? যে চোরের মতো তোমাকে আত্মসাৎ করে নিতে চাইছে!

খবরদার, মুখ সামলে কথা বলো। জানো, তোমার তেজ আমি ভেংগে দিতে পারি? দেয়ালে ঝুলানো চাবুকটা টেনে নেয় সুগত সেন।

ঠাণ্ডা কঠিন গলায় দীপারতি বলে—হ্যাঁ, এবার তোমার নিত্যকর্মটা

সেরে নাও, পাওনা বুঝে নিয়ে চলে যাই। অনেক রাত হয়েছে। ঘুমুতে হবে তো।

রাগে টগবগ করতে করতে সুগত সেন চাবুক চালায়—এই নাও, এই নাও।

হিসহিসে গলায় দীপারতি বলে—হাতে নয়, হাতে নয়, পিঠে পিঠে। নইলে বিখ্যাত সমাজসেবী সুগত সেনের মুখোশটা দশ জনের কাছে খুলে যাবে যে।

আরও দু'চার ঘা কষিয়ে চাবুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো সুগত। দীপারতির স্লিভলেস ব্লাউসের হাতার ঠিক নীচে ফর্সা বাহুমূলে লাল হয়ে ফুটে উঠেছে গোটা দুই দাগ। আরক্ত চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো একটু। চাপা কঠিন গলায় দীপারতি বললো—কি দেখছো? ভয় নেই—আমার দুটো লম্বা হাতার ব্লাউস আছে। তাই পরে সকালবেলা ঘর থেকে বেরোবো।

সুগত সেন খাটের উপর গড়িয়ে পড়ে। ঘরের অন্যদিকে আলাদা খাটে দীপারতির বিছানা। আলো নিভিয়ে দিয়ে দীপারতিও নিজের বিছানায় আশ্রয় নেয়। এমনি ঘটনা প্রায় প্রতিদিনের।

পাশের ঘরে তাদের ছেলেমেয়ে দুটি ঘুমোয়। দীপারতির বড় জা তার বৌদি কতোদিন হেসে ঠাট্টা করে বলেছে—বাব্বা! তোমাদের 'ইয়ে' বটে। ছেলেমেয়ে দুটোকে একেবারে পাশের ঘরে চালান করে দিয়েছো, আবার লোকদেখানো দু'টো খাট রেখেছো ঘরে। আমরা সব বুঝি, বুঝলে?

উত্তরে দীপারতি শুধু হেসেছে। এমন ভাব দেখিয়েছে যাতে ওদের ধারণাটা টোল না খায়। হ্যাঁ, দীপারতি ছেলেমেয়েদের পাশের ঘরে পাঠিয়েছে যাতে বাপের আসল চেহারাটা ওরা দেখে না ফেলে, যতোদিন চাপা দিয়ে রাখা যায়। রাধা লোকের কাছে হাউমাউ করে কেঁদে তার দুঃখের কথা জানাতে পারে। খালি গায়ের পিঠের আঁচল সরিয়ে স্বামীর পৌরুষের চিহ্ন লোককে দেখাতে পারে। কিন্তু দীপারতি তো তা পারে না। রাধার কালো পিঠের চেয়ে দীপারতির ফর্সা পিঠে সে নকশা যে আরও স্পষ্ট। শাড়ি-জামার আড়ালে যে নকশা ঢাকা থাকে, ঢাকা-ই থাকবে। সে তো রাধা নয়, সে যে বিখ্যাত সমাজসেবী সুগত সেনের বৌ দীপারতি সেন।

না বলা বাণী

বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো শাশ্বতী। হঠাৎ কানে গেল—কে? শাশ্ব—? শাশ্বতী চৌধুরী না?

যেন নাম ধরে ডাকতে গিয়ে সামলে নিয়ে সংগে পদবীটাও জুড়ে দিলে।

থমকে দাঁড়াল শাশ্বতী। দেখলো—এক ভদ্রলোক দৃষ্টি তীক্ষ্ম করে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ওঃ, কতোদিন পর দেখা। তাই না?

এবার ভুরু কোঁচকাবার পালা শাশ্বতীর। ভদ্রলোকের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো—কে? এর আগে কোথায় দেখেছে ভদ্রলোককে? কই, মনে করতে পারছে না তো।

শাশ্বতী মনের তলায় হাতড়ে হাতড়ে দেখলো।

কি করা হয় আজকাল?

শাশ্বতী জবাব দিলো—এই তো, একটা মেয়ে স্কুলে পড়াই।

এর মধ্যে কতোগুলো দিন পার হয়ে গেছে, তাই না?

তা ঠিক—বললো চক্ষুলজ্জা এড়াবার জন্য। কিন্তু কোন্ দিন, কবেকার দিন কিছুই বুঝতে পারলো না শাশ্বতী। সে তার স্মৃতির ঘরে চোখ ফেলে ভদ্রলোককে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু না, কোন হদিশই পেলো না।

ইতিমধ্যে একটা বাস এসে পড়েছিলো। আচ্ছা চলি—বলে ভদ্রলোক বাসে উঠে পড়লো।

শাশ্বতী তখনও দাঁড়িয়ে ভাবছে—কে হতে পারে মানুষটা?

বাড়ি গিয়েও ভাবনা। হাত মুখ ধুতে ধুতে, চা খেতে খেতে ভাবলো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবলো। কোথায় দেখেছে ঐ চেহারা শাশ্বতী?

শাশ্বতীর নিজের জীবনে কোনো উৎসব আসেনি বটে কিন্তু সে তো বহু উৎসবে যোগদান করেছে। বিবাহ, জন্মদিন স্কুলের বার্ষিক উৎসব।

কোনো মানুষের মিছিলে এই চেহারা দেখেছে শাশ্বতী। এই তামাটে রঙ, দীর্ঘ দেহ, ভাঙ্গাচোরা চেহারা, অথচ স্বপ্নালু দু'টো চোখের মানুষ। বুকের তলায় হাতড়াতে হাতড়াতে অনেক গভীরে নেমে গেলো শাশ্বতী। যেখানে বাক্সে ভাঁজ করে তুলে রাখা শাড়ির মতো পরতে পরতে ভাঁজ করা স্মৃতিরা তোলা রয়েছে। শাশ্বতী চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে ভাঁজ খুলে খুলে তা দেখতে লাগলো।

তখন শাশ্বতীর সর্বাঙ্গে বাইশের যৌবনের ঢল। আশেপাশে অনেক স্তাবক। তার মাঝে একজন মানস ভৌমিক—হঠাৎ কি করে শাশ্বতীর বড়ো কাছে এসে পড়েছিলো।

ফর্সা রঙ, দীর্ঘ দেহ, প্রাণোচ্ছল চেহারা। কিন্তু আজ শত চেষ্টা করেও সেই মুখখানাকে পুরোপুরি মনে আনতে পারে না শাশ্বতী। সেই স্মৃতির উপর দীর্ঘ সময়ের ধুলো জমেছে। কিন্তু বিকেলে দেখা ঐ লোকটি কে? মনে হয় কোথাও যেন দেখেছে। ট্রামে বাসে না কি সিনেমা থিয়েটারে? কি জানি!

চোখ বুজে বাইশের স্মৃতিতে আবার ডুব দিলো শাশ্বতী। সে যেন তার অবগাহন স্নান। এই চল্লিশোত্তর অনেক পোড় খাওয়া জীবনে সেই স্মৃতি যেন একমুঠো পেলব স্নিগ্ধতা।

কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গানে খুব প্রশংসা পেয়েছিলো শাশ্বতী, আর মানস আবৃত্তিতে। তখন দু'জনের দিকেই দু'জনের চোখ পড়েছিলো। সেই থেকে শুরু। তারপর ঘটনার স্রোত দু'জনকে খুব কাছাকাছি এনে ফেলেছিলো। মানস আর শাশ্বতী।

মানস! সত্যি কি সুন্দর ছিলো সে দেখতে! তার কথা মনে করলে এই উত্তর-চল্লিশেও শাশ্বতীর নিঃশ্বাস মন্থর হয়, বুকের তলায় আবেগ ঘন হয়। নির্জন ঘরে সন্তর্পণে এখনও মানসের স্মৃতিকে নাড়া চাড়া করে শাশ্বতী।

মানস তার স্বপ্নিল চোখ দু'টো শাশ্বতীর চোখের উপর রেখে যখন বলতো—শাশ্বতী, তোমার চোখ দু'টো যেন সমুদ্র। ওই চোখের দিকে তাকালে আমার মনে হয় আমি যেন সমুদ্রস্নান করছি।—তখন শাশ্বতী যেন সত্যিই সমুদ্র হয়ে যেতো। তার মধ্যে তখন শুধু ঢেউ আর ঢেউ। এখনও নির্জনে মানসের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শাশ্বতী সমুদ্র হয়।

দু'তিন দিন পর স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে আবার সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। সেই দীর্ঘ তামাটে দেহ। মাথার সামনের দিকে প্রায় পড়োপড়ো টাক। চোখে বেশি পাওয়ারের চশমা। বললে—কি, স্কুল থেকে ফেরা হচ্ছে বুঝি ?

মহা ফাঁপরে পড়ে শাশ্বতী। সন্তর্পণে কথার জবাব দেয়। প্রথমদিন চেনার ভান করেছে এখন কি করে পরিচয় জিজ্ঞাসাই বা করে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার দেখা হবে কে জানতো !

কে এই ভদ্রলোক ? শাশ্বতীর ভাবনায় একই প্রশ্ন পাক খেয়ে মরে। শাশ্বতীর নির্জন চিন্তার অবসর মুহূর্তগুলো শেষ পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দেয় তার বাইশ বছরের রঙিন জগতে—যে জগতের অধীশ্বর ছিলো মানস। মনে পড়ে এক দিন মানস তার হাতখানি হাতে নিয়ে বলেছিলো—শাশ্বতী, চিরদিনের জন্য এই হাতখানি ধরবার অধিকার আমায় দাও।

শাশ্বতী গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলো—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মানস, এ হাত তোমার রইলো—কিন্তু এ হাত শাশ্বতী মানসকে দিতে পেরেছিল কি ? হাতটা চোখের সামনে এনে ধরে সে।

না, মানসের স্পর্শপীড়িত এই হাত মানসকে সে দিতে পারেনি, অন্য কাউকেও না। আর একবার যদি শাশ্বতী মানসের দেখা পেতো !

'কাল তোমাকে চূড়ান্ত কথা দেবো'—বলেও কেন পরদিন মানসের সঙ্গে যে দেখা করেনি সে কথাটা তাকে জানিয়ে দিতো। মানস নিশ্চয়ই তাকে সাংঘাতিক ভুল বুঝে বসে আছে। ভুল বোঝাই তো স্বাভাবিক।

সেদিনই বাড়ি ফিরে শাশ্বতী শুনেছিল টেলিগ্রাম এসেছে তার দিদির খুব অসুখ। মা-বাবার সঙ্গে শাশ্বতীও কানপুর গিয়েছিলো দিদিকে দেখতে। খুব উদ্বিগ্ন ব্যস্ততায় একমাস কাটিয়ে দিদিকে একটু সুস্থ দেখে বাড়ি ফিরেছিলো ওরা সবাই, এসেই শাশ্বতী খোঁজ করেছিলো মানসের, নিশ্চয়ই খুব অভিমান হয়েছে বাবুর, এবার মান ভাঙ্গাতে হবে, কিন্তু কোথায় মানস ! অনেক খোঁজ করেও সন্ধান পাওয়া গেল না তার, মানুষটা কি উবে গেল নাকি ! আশ্চর্য !

যতো জায়গায় মানসের সন্ধান পাওয়া সম্ভব সর্বত্র হানা দিয়ে বেড়াচ্ছিলো শাশ্বতী। এমন সময় হঠাৎ একদিন স্ট্রোক হয়ে শাশ্বতীর

বাবা মারা গেলেন, সংসারটা কেমন ওলট-পালট হয়ে গেলো, এর মধ্যে শাশ্বতীকে বিয়ের জন্যও যথেষ্ট চাপ দেওয়া হয়েছিলো, শাশ্বতী রাজী হয়নি, কিন্তু শাশ্বতীর জীবনে মানস গেল হারিয়ে।

একবার! শুধু একবার যদি দেখা পেতো মানসের; যা হারিয়েছে সে তো আর কোনোদিনও ফিরে পাবে না শাশ্বতী, শুধু মানসকে একবার জানিয়ে দিতো—আমি তোমাকে প্রতারণা করতে চাইনি মানস, বিশ্বাস করো আমি ইচ্ছে করে তোমাকে প্রবঞ্চনা করিনি, এই দেখো, তোমার জন্য আমার সিঁথি আজও কুমারী। শাশ্বতীর কুমারী মন আজও মানসকে ঘিরেই ভাবনার কাঁথায় ছোট ছোট স্মৃতির ফোঁড় তোলে, হীরের কুচির মত ছোট ছোট অজস্র উজ্জ্বল স্মৃতি।

কিছুদিন যেতে আবার রাস্তায় দেখা, ভদ্রলোক হেসে বললো—আজকে তো ছুটির বার, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

ভালো জ্বালা হলো তো শাশ্বতীর, এতোদিন তো দেখেনি ভদ্রলোককে, হঠাৎ ভুঁই ফুঁড়ে এলো কোত্থেকে, আর দেখা হবি তো হ পরপর হয়েই চলেছে, একজন অচেনা লোকের সংগে কাঁহাতক আর পরিচিতের ভান করা যায়! কিন্তু ভদ্রলোকের হাসির ভঙ্গিটা বড়ো পরিচিত, আর চোখ দুটো! বেশি পাওয়ারের চশমার ভেতর দিয়ে কেমন স্বপ্ন স্বপ্ন দেখায়।

বাস এসে যেতেই ভদ্রলোক লাফিয়ে বাসে উঠে পড়লো, শাশ্বতী দেখলো তার পকেট থেকে একটা নোটবই পড়ে গেলো রাস্তায়।

শাশ্বতী এগিয়ে গিয়ে তা তুলে নিলো, আর একদিন দেখা হলে এটা ফিরিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু নোটবইয়ের মলাটটা খুলে ধরতেই শাশ্বতী বিদ্যুৎ পৃষ্টের মতো চমকে উঠলো, দেখলো পরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা একটি নাম—মানস ভৌমিক, ঠিকানা নয়, আর কিছু নয়, কারণ নোটবইটি নতুন, এখনও ব্যবহার করা শুরু হয়নি। হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়েছে শাশ্বতী—এই তো মানস, বয়সের পোড় খেয়ে ফর্সা রং তামাটে হয়েছে, একমাথা কালোচুল উঠে উঠে কপালের উপর, টাক পড়েছে, চোয়ালে চিবুকে ভাঙচুরের চিহ্ন তবু এই—এই মানস, হাসির ভঙ্গীটি তার তেমনি রয়েছে, আর স্বপ্নালু চোখ দুটো। শাশ্বতীর এতো দেরি হলো তাকে চিনতে।

এবার বলবে শাশ্বতী, যে কথাগুলি সে মনে মনে মানসকে এই কুড়ি বছর ধরে রোজই বলেছে এবার তা উচ্চারণ করে বলবে।

পরদিন রাস্তায় বেরিয়েই সাগ্রহ দৃষ্টিতে শাশ্বতী মানসকে খুঁজলো, কিন্তু দেখতে পেলো না।

তারপর দিনও না, তারপর দিনও না।

না, আর কোনোদিনও দেখতে পেলো না, দিন—মাস—বছর—কোনোদিনও না।

আশ্চর্য; হঠাৎ কোথা থেকে এলো আবার কোথায়ই বা হারিয়ে গেলো, সেদিনও ঠিকানা রেখে যায়নি, আজও রেখে গেলো না, শাশ্বতী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলো, তাতেও কোনো সাড়া পেলো না।

শাশ্বতী তার না-বলা বাণী বুকে বয়ে আজও বেড়াচ্ছে, খুঁজে বেড়াচ্ছে মানস ভৌমিককে কলকাতার রাস্তায় ট্রামে বাসে সর্বত্র। কিন্তু আর দেখা পায়নি তার, শাশ্বতী শুধু একবার তাকে বলতে চায়—মানস, আমি তোমাকে প্রতারণা করতে চাইনি, বিশ্বাস করো আমি ইচ্ছে করে তোমাকে ফাঁকি দিতে চাইনি, এই দেখো, তোমার জন্যই আমার সিঁথি আজও কুমারী।

সমাধান কিসে

দিনরাত কামাই নেই আর।

অষ্ট প্রহরই কেত্তন চলেছে। কার দোষ আর কার গুণ কে বলবে।

মালা বলে—এই 'নেই নেই'-সংসার আমি আর সামলাতে পারি নে। আজ এটা নেই, কাল সেটা নেই। পেটের ভাত হলো তো পরনের কাপড় নেই, পরনের কাপড় হলো তো বাচ্চার ফুড নেই। জীবনের কোনো সখ নেই, একটু রঙ নেই। দিনরাত জন্তুর মত খাটো আর দু'বেলা দু'মুঠো খাও। এর নাম জীবন!

অনাদি ফোঁস করে উঠে বলে—আর আমিই বা কি পাচ্ছি। এই যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে চলেছি সে কি আমার নিজের জন্যে? নিজের প্রয়োজনে ক' পয়সা খরচ করি বলতে পারো? বারো মাস দু'টো শুকনো রুটি ছাড়া টিফিন খাই না, যতোটা সম্ভব পায়ে হেঁটে চলি, পারতপক্ষে ট্রামবাসে পয়সা দিই না। সিনেমা যাওয়ার কথা ভাবি না। নিজের সব সখ সংসারের পায়েই কি জলাঞ্জলি দিই নি! তার বদলে আমি কি পেয়েছি তোমার বাক্য-যন্ত্রণা ছাড়া? সময় মতো এক কাপ চা পাই না, অফিস যাওয়ার সময় জামা কাপড় বা একখিলি পান হাতের কাছে এগিয়ে দিতে কেউ নেই! সংসারে অভাব—সে কি আমার ইচ্ছে? আমি কি করতে পারি? প্রাণপণ করেও চোরদায়ে ধরা পড়েছি নাকি যে সব সময় ঝাল ঝাড়বে?

দেখতে গেলে কারও অভিযোগ মিথ্যে নয়। দু'জনের কথাই ঠিক।

মাত্র চারশোটি টাকা মাইনে পায় অনাদি। তিনটি ছোট-ছোট বাচ্চা নিয়ে ওদের পাঁচজনের সংসার। অনেক ঘষে মেজেও ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। প্রতিটি পয়সা যেন গুনে গুনে খরচ করতে হয়। কাচ্চাবাচ্চার সংসারে কি এত নিক্তি মেপে চলা যায়? তাই প্রয়োজনে আর অনটনে নিত্য সংঘর্ষ। আর এই অভাবের সঙ্গে যুঝে যুঝে মালা যেন বিদ্রোহী। সংসার-সংগ্রামে পযুদস্ত একটা জীবন।

অনাদিও কিছু মিছে বলে না। জীবিকার তাগিদে বাইরে তো হাড় ভাংগা খাটুনি আছেই, বাড়িতে যে একটু আয়েস করবে তারও উপায় নেই। ঘুম থেকে উঠেই মালা পড়ে সংসার নিয়ে, সে সময় বাচ্চাদের আগলাতে হয় অনাদিকেই, সকালবেলাই গলদগর্ম ব্যাপার। তারপর এককাপ চা খেয়ে ছুটতে হয় বাজারে। দু' পয়সা বাঁচিয়ে জিনিস কিনতে গিয়ে যা দর-কষাকষি করতে হয়, মাথা ঝিমঝিম করে অনাদির। ফিরে এসে মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে আগুন-গরম ডাল ভাত কয়েক গ্রাস মুখে দিয়ে ছুটতে হয় অফিসে। ছুটির দিনেও কি রেহাই আছে? র‍্যাশন ধরা, গমভাংগানো, দোকানের জিনিস কেনা, সপ্তাহ ভোর অফিস যাওয়ার জামাকাপড় কাচা, ইস্ত্রি করা—দম ফেলবার সময় নেই। খরচা বেশি পড়বে বলে ধোবা বাড়িতেও কাপড় পাঠায় না অনাদি। নিজেই করে নেয়।

মালা বলে—তোমাকে খাটতে হয় আর আমি বসে থাকছি নাকি! সেই সাত সকালে উঠে শুরু হয় ঘানি টানা। যতো সংসারের কাজ ততো বাচ্চাদের খিদমত্। একটা ঝি পর্যন্ত রাখতে পারি না যে একটু কাজের সাহায্য হবে। সকালবেলা দু'চোখে যেন ধোঁয়া দেখি। সে সব তো কই তোমার চোখে পড়ে না?

মালার অভিযোগও কিছু উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পিঠোপিঠি তিনটি বাচ্চা। কোলেরটি ছ'মাসের। ওদের সামলে এক হাতে সংসার ঠেলা কি চাট্টিখানি কথা! তার উপর কিনা এই পুরস্কার! মালার চোখে জল আসে।

পর পর তিনদিন অফিসে লেট হয়ে গিয়েছিলো অনাদির। তাই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড! মালা বললো—আমি কি ইচ্ছে করে তোমায় লেট করে দি'। আমি তো যথাসাধ্য চেষ্টা করি। না পারলে কি করবো।

অনাদি বলে বসলো—তুমি থাকা না থাকা দুই-ই আমার কাছে সমান।

এমন কঠিন আঘাত! তার থাকা না থাকা দুই-ই অনাদির কাছে সমান! গুম হয়ে গেল মালা। অনাদি চলে গেলে ছেলেমেয়ে তিনটিকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলো। বুকের ভেতর একটা কঠিন আক্রোশ পাক খেয়ে উঠছিলো, মন অনাদির ঐ কঠিন উক্তির একটা উপযুক্ত জবাব খুঁজ... লা। বার দুই ছাদে গিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে ছাদের

উচ্চতা লক্ষ্য করলো। বার বার কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলো। হঠাৎ নজরে পড়লো আলমারির মাথায় দু'প্যাকেট ইঁদুর মারা ওষুধ। ঘরে খুব ইঁদুরের উৎপাত হয়েছে তাই আনা হয়েছিলো। কিন্তু এখনও ব্যবহার করা হয়নি। মালা পুরো দু'প্যাকেট ওষুধ একটা কাপে নিয়ে জলে গুলে খেয়ে ফেললো। খানিকক্ষণ যেতেই অসুস্থ বোধ করতে লাগলো সে। এমন সময় পাশের ভাড়াটেদের মেয়েটি 'বৌদি' বলে ডেকে ঘরে ঢুকেই শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—কি হয়েছে বৌদি? মালা ক্লান্ত-কণ্ঠে বললো—আমার যদি কিছু হয় আমার বাপের বাড়িতে খবর দিয়ে দিও যেন বাচ্চাদের এসে নিয়ে যায়।

কেন? তুমি কি করেছো বৌদি? হেনা তীক্ষ্ম কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো। কাপ, ওষুধের খালি প্যাকেটগুলো দেখিয়ে বললো—এসব কি?

শান্ত কণ্ঠে মালা বললো—আমি বিষ খেয়েছি।

হেনা এক লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

মুহূর্তে কথাটা চাউর হয়ে গেলো। অনাদির অফিসে খবর দেওয়া হলো, অনাদি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে ব্যাকুলকণ্ঠে বললো—তুমি এ কি করলে মালা?

ক্ষতি কি? আমি থাকা না থাকায় তোমার তো কিছু যায় আসে না!

আমি আর তোমাকে কিছু বলবো না মালা। তুমি আমাকে ফেলে চলে যেওনা।

অনাদির এই টুকু ব্যাকুলতাতেই বুঝি মালার প্রাণের তারে সুর বদল হচ্ছিলো। অভিমান বড়ো বালাই। অনাদি পাগলের মতো মালার হাত দু'টো জড়িয়ে ধরলো।

ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছিলো, ডাক্তার ঘরে এসে ঢুকতেই মালা বলে উঠলো—ডাক্তারবাবু, আপনাকে কিছু করতে হবে না। আমি মরতে চাই। আমায় মরতে দিন। মুখে বললো বটে কিন্তু তার মন বলছিলো—মন্দ ছিলাম কি। মরে গিয়ে এর চাইতে বেশি আর কি এমন ভালো থাকবো। ডাক্তারবাবু আমাকে সারিয়ে তুলতে পারবেন তো!

ডাক্তার রুগীর অবস্থা দেখে আশ্বস্ত হলেন। বিষের প্যাকেটগুলি

দেখেও। না, তেমন মারাত্মক বিষ নয়। তাই ডাক্তার ঐ পরিবেশেও একটু কৌতুক করলেন —আহা! মরতে চান একথা আগে আমাকে জানাতে হয়! আমার কাছে কতো ভালো ভালো ওষুধ ছিলো! ইঁদুর মারা ওষুধ খেয়ে কি মানুষ মরে?

উপস্থিত সবাই হেসে উঠলো।

ডাক্তার যথা কর্তব্য করে বিদায় নিলেন।

মালা মরলো না। সামলে উঠলো।

কয়েকদিন একটা থমথমে ভাব। তারপর আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এলো আবহাওয়া। সহজ হলো সংসারের নাড়ি। থমকে দাঁড়িয়ে যাওয়া সংসারটা আবার বাঁধা পথে ধুঁকে ধুঁকে চলতে শুরু করলো। মালা যথারীতি ভোর বেলা উঠে বাচ্চাদের তদ্বির, উনুন, রান্না, কুটনো-বাটনা, আর অনাদি অফিস, বাজার, র‍্যাশন ইত্যাদি নিয়ে পড়লো। কিন্তু এর জন্য আপন ভাগ্যকে ধিক্কার বা একজন অন্যকে দোষারোপ—কারও কণ্ঠে শোনা গেল না।

দারিদ্র্যের পেষণে যে হৃদয় হারিয়ে গিয়েছিলো, দু'প্যাকেট ইঁদুর মারা বিষ কি তা ফিরিয়ে দিয়ে গেল? কিন্তু সে আর ক'দিন। সবকিছু অনর্থের মূল যে আর্থিক অসচ্ছলতা তার তো কোনো প্রতিকার হয় নি। তাই আবার হয়তো দুজনেই একদিন দ্বিগুণ বিক্ষোভে ফেটে পড়বে। এ বিক্ষোভ কার উপর তাও কি তারা ঠিক বুঝতে পারে? পরস্পরকে নাগালের মধ্যে পায় বলে একে অন্যের উপর মনের সবটুকু ক্ষোভ, সব তিক্ততা বর্ষণ করে নিজে হালকা হতে চায়।

আবার হয়তো একদিন বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু মালা আর বিষ খাবে না। সে বুঝতে পেরেছে এই সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি আজকের সমাজ-ব্যবস্থার কোন্ গভীরে লুকানো আছে। মৃত্যু দিয়ে এর কোনো সমাধান করা যায় না।

নবকল্লোল

প্রজাপতি

অসাধারণ রূপের জোরে কলেজের অনেক ছেলের মুণ্ডু ঘুরিয়েছে পৌষালী। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও অনেককে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। এর মধ্যে তার অনুগ্রহ সব থেকে বেশি যে লাভ করেছে সে কুন্তল। এ জন্য পৌষালীর অন্যান্য অনুগ্রহ প্রার্থীরা তাকে ঈর্ষা করে। সময় এবং সুযোগ করে প্রায়ই দু'জনে বেরিয়ে পড়তো জুটির স্বর্গ তেমন সব জায়গাগুলিতে। সেদিনও তেমনি বসেছিলো দু'জনে। পৌষালী উচ্ছ্বসিতভাবে কথা বলে, কথায় হাসির বেলোয়ারি আওয়াজ তোলে। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে লক্ষ্য করলো সে এক তরফাই চালিয়ে যাচ্ছে। কুন্তল গম্ভীর, অর্থাৎ জুটির স্বর্গোদ্যানে ছন্দপতন।

পৌষালী বললো, ব্যাপার কি কুন্তল। অমন মুখগোমড়া করে বসে রয়েছো যে ?

কিছু না।

উঁহু। নিশ্চয়ই কিছু, বলতেই হবে তোমাকে।

কাল তোমার জন্য কতোক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কই, এলে না তো।

ও, তাই অভিমান হয়েছে না কি। কি করবো বলো। তোমার কাছে আসতে যাচ্ছি মণিময়ের সঙ্গে দেখা, পাকড়াও করে নিয়ে গেলো ওর সঙ্গে। অগত্যা—

মণিময়ের সঙ্গে ! —কুন্তল ভুরু কোঁচকালো—ঐ মণিময়ের সঙ্গে সারা বিকেলটা তুমি কাটালে নাকি !

কেন, কি হয়েছে।

কি হয়েছে মানে ! তোমার একটা রুচিজ্ঞান নেই ? একটা থার্ডক্লাস ছেলে—

ওমা, অমন ধমকে কথা বলছো কেন তুমি। আমি কি তোমার ঘরের বউ নাকি ? পৌষালী একরাশ কাঁচভাঙ্গা হাসি ছড়ালো।

কুন্তল গম্ভীরমুখে বললো—তা না হতে পারো, কিন্তু প্রেমেও তো একনিষ্ঠতা থাকা উচিত।

প্রেম! পৌষালী অপরূপ ভ্রূভঙ্গী করলো—ঐ ক্যাবলাকান্তটার সঙ্গে! আমি কি প্রেম করতে ওর সঙ্গে গিয়েছিলাম নাকি!

আর একরাশ হাসি ছড়িয়ে দিলো পৌষালী—জানো, ওকে নাচাতে আমার খুব মজা লাগে।

আমাকেও কি তাই নাচাচ্ছো না কি!

বোকার মতো কথা বলো না কুন্তল। তোমাকে আমি সত্যি ভালোবাসি।

আমার সামনে তো তাই বলো। আড়ালে কি বলো কে জানে, হয়তো কালকেই মণিময়ের কাছে বলেছো—

এবার পৌষালী চটলো, বললো—এখনও কিছু বলিনি, তবে এবার থেকে বলবো ক্যাবলাকান্ত!

দু'জনেরই পরীক্ষার পাট চুকে গেছে, কাজেই অখণ্ড অবসর। রোজই বিকেলে দু'জনে একসঙ্গে কাটায়, হয় কোথাও বসে গল্প করে, নয় সিনেমা দেখে।

সেদিন পৌষালী বললো—তোমার কাছে আসার জন্য বাড়িতে এতোরকম গল্প বানিয়ে বলতে হয় আমাকে! নিত্য নতুন গল্প। বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য। নিজের গল্প বানাবার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে নিজেই এক এক সময় অবাক হয়ে যাই। কলম ধরলে নির্ঘাৎ নামকরা কথাশিল্পী হয়ে যেতাম।

কুন্তল খুব খুশি হয়ে পৌষালীর দু'হাতজড়িয়ে ধরলো। বললো—পুষি, আমার পুষি—

পৌষালী ভুরু কুঁচকে বললো—এই, পুষি পুষি করছো কেন? আমি কি তোমার পোষা বেড়াল! আগেইজানিয়ে রাখছি কুন্তল বেড়ালের মতো পোষ মানতে আমি রাজি নই কিন্তু।

আচ্ছা পৌষালী, বিয়ে মানেই তো পরস্পরের কাছে পোষমানা, কাজেই একদিন তোমাকে পোষ মানতেই হবে।

বিয়ে আমি করবো না।

তার মানে! এই যে আমাদের মেলামেশা, এর পরিণতি কি হবে?

যেমন চলছে তেমন চলবে।

তা কি করে হয়! প্রেমের সার্থক পরিণতি বিয়েতে। বিয়ে ছাড়া

শূন্যের উপর প্রেম বাঁচতে পারে না।

সব ছেলেদের দেখছি একই ধরনের কথা, জয়ন্তও ঠিক এমনি বলতো।

জয়ন্ত! কুন্তল যেন একটা ইলেকট্রিক শক খেলো।

হ্যাঁ, জয়ন্ত সেন। কিছুদিন একটু মিশেছিলাম ছেলেটার সঙ্গে। ওর সঙ্গে গল্প করতে বেশ ভালো লাগতো। কথা বলায় বেশ একটা আর্ট ছিলো ওর। কিন্তু শেষকালে 'বিয়ে বিয়ে' করে এমন ক্ষেপে গেল ছেলেটা যে কেটে পড়তে পথ পাই না। শুধু জয়ন্ত কেন? সলিল রায়, মৃন্ময় গুহ, সত্য ঘোষ—সব শেয়ালের এক রা—'বিয়ে করো।'

কুন্তল বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করলো। এমনি আর কতোজনের সঙ্গে মিশেছে পৌষালী? সবই কি তার ছলনা? সবই খেলা? কুন্তলের সঙ্গেও কি সেই খেলাই করছে? খেলা শেষ হলে ঐ জয়ন্ত, সলিল, মৃন্ময়ের মতো তাকেও চলার পথের এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার যাবে নতুনের সন্ধানে।

অনেক ফুলে উড়ে বেড়িয়েছে প্রজাপতি। এখনও কি ওর ডানা ক্লান্ত হয়নি?

কিন্তু কুন্তল কি করবে? তার জীবনে যে পৌষালী ছাড়া আর কেউ নেই। সে কিছুতেই পৌষালী থেকে দূরে সরে যেতে পারবে না।

কুন্তল বলে—পৌষালী, তুমি যদি আমাকে না ভালোবাসো, সেটা আলাদা কথা, কিন্তু যদি ভালোবেসে থাকো তবে বিয়ে করতে আপত্তি কেন?

দ্যাখো কুন্তল, বিয়ে করলেই মেয়েদের ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য, নিজস্ব সত্তা সব কিছু বিসর্জন দিতে হয়। সে আমি পারবো না।

কে বলেছে তোমাকে একথা।

আমি জানি। আমার দিদি ফার্স্ট ক্লাস এম. এ., নাচ-গান খেলাধুলো সব বিষয়েই তুখোড় ছিল এক কালে। এখন দেখি সেই দিদিকে, জামাইবাবুকে চা দিতে একটু দেরি হলে ঝি চাকরের মতো বকুনি খেতে হয়। খেলাধুলো বা নাচের তো কোনো প্রশ্নই নেই। গানটা দিদি এখনও ছাড়তে পারেনি। কিন্তু সেই গানের প্রতিও দেখি জামাইবাবুর কি অপরিসীম অবজ্ঞা! এই তো মেয়েদের বিবাহিত জীবন। শুধু তোমাদের প্রয়োজনের জোগান দিয়ে যাওয়ার যন্ত্রমাত্র আমরা।

ভুল বলছো পৌষালী। সবাই তোমার জামাইবাবু নন।

এবার পৌষালী ব্যঙ্গভরে হাসলো। বললো—ব্যতিক্রম বোধ করি একমাত্র কুন্তল মজুমদার।

তা বলছি না, তবে একজনকে দেখে গোটা পুরুষ জাতটাকে বিচার করতে যেও না। ব্যতিক্রমও থাকতে পারে।

তা হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু কুন্তল, আমি ঐ বিয়ের দড়ির ফাঁসি গলায় পরতে পারবো না। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

সেই দিনের পর থেকে কুন্তল আর দেখা করে না পৌষালীর সঙ্গে। তার মনটা একেবারেই ভেঙ্গে গিয়েছিলো। সে পৌষালীকে সত্যিই ভালোবেসেছিলো এবং তাকে আন্তরিকভাবে নিজের জীবনে পেতে চেয়েছিলো। কিন্তু পৌষালীর প্রজাপতি-মন কিছুতেই ঘরের বাঁধনে বাঁধাপড়তে রাজি নয় যে, অগত্যা সরে আসা ছাড়া তার আর উপায় কি! আলেয়ার পেছনে ছুটে কি করবে কুন্তল।

কুন্তলের দেখা না পেয়ে দিন কয়েক ছটফট করলো পৌষালী, অপেক্ষায় অপেক্ষায় কণ্টকিত হলো। কি হলো কুন্তলের? অসুখ-বিসুখ করলো না কি!

ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এক সকালে হাজির হলো কুন্তলের বাড়ি। কড়া নাড়তেই এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কাকে চাই?

একটু দ্বিধা করে পৌষালী বললো—কুন্তল আছে? ওকে একটু দরকার।

এই সিঁড়ি ধরে সোজা তেতলায় চলে যাও। ওকে ওর ঘরেই পাবে।

খাটের উপর আধশোয়া হয়ে কাগজ পড়ছিলো কুন্তল। পাশে টিপয়ের উপর শূন্য চায়ের কাপ। দরজার কাছে পায়ের শব্দ পেয়ে চোখ তুলে তাকালো কুন্তল। পৌষালীকে দেখতে পেয়ে কাগজ ছুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে উঠলো—তুমি!

পৌষালী ঘরে এসে খাটের একপাশে বসলো। বললো—কতোদিন ধরে তোমার দেখা নেই যে। কি হয়েছে? শরীর খারাপ?

না।

মন খারাপ?

না।

তবে আসছো না কেন ? আমি রোজ তোমার অপেক্ষায় থেকে ফিরে যাই।

এই নিরর্থক অপেক্ষার কি প্রয়োজন পৌষালী ! আর আমি গিয়েই বা কি করবো ?

ও কথা কেন বলছো কুন্তল ! আমাদের বন্ধুত্বের কি কোনো মূল্য নেই ? একসঙ্গে বসা, কথা বলা, চলা—

সামনে যদি কোনো লক্ষ্য না থাকে তবে এ চলা নিরর্থক। শুধু চলার জন্য চলায় মানুষের কোনো উৎসাহ থাকতে পারে না। লক্ষ্যহীন চলা মূল্যহীনও।

থাক। এ নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। বিকেলে একবার আসতে পারো না তুমি আজ ?

কেন ?

এমনি ! গল্প করা যাবে, আসবে তো ?

দেখি।

দেখি মানে ! এবার রেগে গেল পৌষালী—কি বললে তুমি খুশি হবে ? বলতে হবে—তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারি না ? থাক, আসতে হবে না, আমি চললাম।

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল পৌষালী কুন্তলকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে।

পরদিন কুন্তল গিয়েছিলো তাদের নির্দিষ্ট জায়গায়। কিন্তু পৌষালীর দেখা নেই।

তারপর মাস তিনেক কেটে গেছে। এর মধ্যে পৌষালীর সঙ্গে দেখা হয়নি কুন্তলের। মক্ষিকা চরিত্র পৌষালী নিশ্চয়ই এতোদিনে অন্য বন্ধু জোগাড় করে নিয়েছে। কার কাছ থেকে যেন বরুণ চন্দের নামটা কানে এসেছিলো কুন্তলের। যাকগে। কুন্তল ও নিয়ে আর ভাববে না।

সকাল ন'টা। বাইরে বেরোবে বলে পাঞ্জাবিটা কেবলমাত্র গায়ে চড়িয়েছে কুন্তল, এমন সময় পৌষালী এসে ঘরে ঢুকলো। তার চোখ-মুখ বসে গেছে। দারুণ খারাপ হয়ে গেছে চেহারা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে

কুন্তল বললো—কি হয়েছে পৌষালী ? তোমার চেহারা এতো খারাপ হয়ে গেছে কেন ?

পৌষালী স্থির দৃষ্টিতে কুন্তলের মুখের দিকে তাকালো। বললো —এই তিন-মাস ধরে নিজেকে অনেক পরীক্ষা করলাম কুন্তল। দেখলাম —হ্যাঁ, আমি আজ তোমাকে জানাতে এসেছি আমি সত্যি তোমাকে না দেখে থাকতে পারি না।

কুন্তলের বুকের ভেতরটা দুলে উঠলো। সে হাত ধরে পৌষালীকে খাটের উপর বসিয়ে দিয়ে বললো—বসো পৌষালী !

পৌষালী বললো—তোমাকে ভুলতে অনেক চেষ্টা করেছি। পারিনি।

আমার দুর্ভাগ্য পৌষালী। কিন্তু আমি তোমাকে ইচ্ছে করে কষ্ট দিতে চাই নি।

তুমি আমার জীবন থেকে এমনি করে সরে যেও না কুন্তল—পৌষালী কাঙালের মতো বললো।

কিন্তু আমি কি করতে পারি বলো। তোমাকে ভালোবাসা মানে তো যন্ত্রণা। আমার যন্ত্রণার মাত্রা আরও বেড়ে যাক এই কি তুমি চাও ? তোমাকে ভুলে যাবার সুযোগ তুমি আমাকে দাও পৌষালী !

পৌষালী ক্লান্ত গলায় বললো—আমি আজ পরাজিত কুন্তল। তোমার কাছে হার স্বীকার করতে এসেছি। তুমি আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করবো।

কিন্তু পৌষালী, তুমি যে অবন্ধনা থাকতে চাও। ঘরের বাঁধন কি তোমার সইবে ?

পৌষালী আবেগকম্পিত গলায় বললো—তোমার জন্য আমি সব সইতে পারি কুন্তল। যে-কোনো বাঁধনে বন্দী হতে আমি রাজী। শুধু তুমি দূরে যেওনা।

পৌষালীর গলা কাঁপছে। থরথর করে কাঁপছে শরীর। সে ধীরে ধীরে কুন্তলের কাঁধে মাথা রাখলো। প্রজাপতি বুঝি আর উড়তে পারছে না। তার ডানা আজ ক্লান্ত।

এ বাড়িতে আমার কথার উপর কোনো কথা চলবে না—কঠিন কণ্ঠে বললেন সুবোধবাবু—আমি যা বলছি তাই করতে হবে।

আমি পারবো না বাবা, কিছুতেই পারবো না।

কি বললে! এতো স্পর্ধা! হয় তোমাকে আমার কথা শুনে চলতে হবে, নয়তো বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।

তাই যাবো।

কি! এত দূর! তবে এই মুহূর্তে যাও।

বেশ, এক্ষুণি যাচ্ছি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই যাও—হাঁপাতে লাগলেন সুবোধবাবু।

মহুয়া দ্রুত পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই ঘরে ঢুকলেন মহুয়ার মা বীণাদেবী। শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন—কি হয়েছে? এতো চেঁচামেচি কিসের? মৌয়ের গলা শুনলাম না?

হ্যাঁ, তোমার মেয়েকে আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম, আমার বাড়িতে আমার মত অনুযায়ী না চলতে পারলে সে যেন এক্ষুণি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

বীণাদেবী চোখ কপালে তুলে বললেন—বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে কি গো! কি হয়েছে?

দেখো, আমার বন্ধু সুখময় রায়ের ছেলেটি পাত্র হিসেবে খুবই দামী। লোভনীয় বলা যায়। সুখময়ের কাছে আমি কথাও দিয়েছি। ওরা একদিন মৌকে দেখে যাবার কথা বলছিলো। আজ মৌকে সে কথা জানাতে সে আমার মুখের ওপর স্পষ্ট বলে গেল—তার প্রাইভেট টিউটর ঐ ভ্যাগাবণ্ড তপেন ঘোষ ছাড়া সে আর কাউকে বিয়ে করবে না। আমি জানিয়ে দিয়েছি স্বেচ্ছাচারীর জায়গা এ বাড়িতে নেই।

এমন সময় দেখা গেল মহুয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। মা ছুটে গিয়ে আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন —কোথা যাচ্ছিস মৌ—

আমি চললাম মা, বাবা আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন, আমাকে ফেরাতে চেয়ো না।

মৌ—যাসনে মৌ, ফিরে আয়—

সুবোধবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—ওকে যেতে দাও, ওকে বুঝতে দাও—অবাধ্যতার অপরিণামদর্শিতার ফল কি? অবশ্য যখন বুঝতে পারবে এ বাড়িতে ফিরে আসার পথ তখন ওর আর থাকবে না।

মহুয়া রাস্তায় বেরিয়ে হনহন করে হাঁটতে লাগলো। হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে দু'চারখানা জামাকাপড়। আর আছে কয়েকটি খুচরো টাকা। খানিকক্ষণ যেতে উত্তেজনায় চনচনে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হলো। তখন ভাবলো—এখন যাই কোথায়?

তারপরই ভাবলো চিন্তা করছি কেন? যার আশ্বাসে এবং যার উপর বিশ্বাসে ঘর ছেড়ে এসেছি, যাবো তারই কাছে।

মহুয়া জানতো তপেন একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে একা থাকে। ঠিকানাও জানতো। সে সরাসরি গিয়ে উঠবে তপেনের ফ্ল্যাটে। তাকে সব কিছু জানাবে। বলবে—তপেন, বড় অসময়ে আকস্মিক ভাবে লগ্ন আমাদের দুয়ারে উপস্থিত হয়েছে। নিয়তির এই ইংগিত এসো আমরা মাথায় তুলে নিই। কালই চলো ম্যারেজ রেজেস্ট্রী অফিসে। তোমার ঘর ছাড়া তো আজ আর আমার কোনো আশ্রয় নেই। এ ছাড়া, আর কি করতে পারে মহুয়া। নাই বা বাজলো তার বিয়েতে সানাই, নাই বা পুরুত মন্ত্র পড়লো, নাই হলো ঘটাপটা। তাহলে তো বাবার ইচ্ছেমতো সেই 'হীরের টুকরো পাত্র'টিকে বিয়ে করতে হতো। তারা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছেই মন্ত্র পড়বে। তারপর যাবে কালিঘাটে। মায়ের আশীর্বাদী মালায় মালা বদল করবে। তারপর তপেনের হাতের সিঁদুর মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরবে। তপেনের ঘরে। শুরু করবে নতুন জীবনযাত্রা।

আজ রাত্রিটা কাটাবে বান্ধবী মিনতির হস্টেলে।

তপেন, দাদার বন্ধু তপেন। আজ থেকে তিন বছর আগে মহুয়ার দাদার সঙ্গেই প্রথম তাদের বাড়ি এসেছিলো। প্রথম দিনেই মহুয়াকে জয় করেছিলো তার অপূর্ব সুন্দর চেহারায়। তারপর উচ্ছ্বসিত কথাবার্তায়, সপ্রতিভ চালচলনে, মহুয়ার চিন্তায়-স্বপ্নে ভাস্বর হয়ে উঠলো তপেন।

তপেন মহুয়াকে শুধু জয়ই করলো না। নিজেও ধরা দিলো মহুয়ার কাছে। মহুয়া বলেছিলো—তপেন, তোমাকে ছাড়া আর কারও গলায় আমি মালা দিতে পারবো না।

তোমার বাড়িতে যদি অমত হয়?

তাহলে আমি বিদ্রোহ করবো। কিন্তু তুমি—

আমার দিক থেকে বাধা দেবার কেউ নেই। তোমার জন্য আমার দুয়ার চিরদিন খোলা থাকবে মৌ! তুমি যখনই আসবে আমার ঘর সানন্দ কৃতজ্ঞতায় তোমাকে বরণ করে নেবে।

সেই আশ্বাসের ঘরখানির দিকে পা বাড়ালো মহুয়া।

ঠিকানা খুঁজে খুঁজে বাড়ি বের করলো সে। তখনও তপেন অফিস থেকে ফেরেনি। ফ্ল্যাটে তালা বন্ধ।

মুখোমুখি দুটো ফ্ল্যাটের মাঝখানে রেলিং-ঘেরা এক টুকরো জায়গা। মহুয়া রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা জোরে জোরে লাফাচ্ছে। মাথার ভেতর দপদপ করছে। এক দুঃসাহসের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে মহুয়া। জানে না এর পরিণতি কি!

এমন সময় সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো মহুয়ারই বয়সী একটি মেয়ে। তপেনের ঘরের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করলে—তপেন এখনও ফেরেনি দেখছি।

মহুয়া বললো—আমিও তারই জন্য অপেক্ষা করছি।

মেয়েটি একটু অপেক্ষা করে ছটফট করে উঠলো—ওঃ, এত দেরি করছে কেন? আজ তো আমাকে নিয়ে বেরোবার কথা। ভুলে গেল নাকি?

মহুয়া মেয়েটির সম্বন্ধে সজাগ হলো। বললো—আপনি তার আত্মীয়া বুঝি?

আত্মীয়া নই তবে শিগগীরই নিকটতম আত্মীয়া হবো—কথাবার্তা ঠিক হয়ে রয়েছে।—মেয়েটির মুখে একটু হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

কি বললেন! তপেন ঘোষের সংগে আপনার—মানে—ইয়ে—।

মানে আমার বিয়ে, বুঝতে পারছেন না? সবই ঠিকঠাক। তপেন আমাকে চিঠিতে লিখেছে শিগগীরই তার চাকরিতে একটা প্রমোশন হবার

কথা। ওটা হয়ে গেলেই আমাদের বিয়ে।—মেয়েটি তৃপ্তির ঝকঝকে হাসি হাসলো।

মহুয়ার মাথা ঘুরে গেল। সে আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াতে পারছিলো না। টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নামলো মহুয়া। বুকের ভেতরটা যেন ধসে গেছে। এখন কি করবে মহুয়া? কোথায় যাবে? যে মুহূর্তে তেজ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে, বাড়ির দরজা তার কাছে বন্ধ হয়ে গেছে চিরতরে। বাবাকে সে ভালো করেই জানে। মহুয়ার জীবনে বিশ্বাসের ভিতটা চুরমার হয়ে গেল। সেই আশ্বাসের ঘরখানি চলে গেল অনেক দূরে। মহুয়ার নাগালের বাইরে। তপেন এতোদিন তবে তাকে নিয়ে খেলা করেছিলো! হতে পারে সেই মেয়েটিকে নিয়েও! এই চরিত্র তপেনের? ওঃ, মাগো!

অতিরিক্ত মানসিক যন্ত্রণায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফুটপাথেই লুটিয়ে পড়লো মহুয়া। মুহূর্তে সেখানে ভিড় জমে গেল। ঠিক সেই সময়ে একখানা গাড়ি এসে দাঁড়ালো রাস্তার পাশে। গাড়ি থেকে নামলো এক যুবক। সে মহুয়াকে পড়ে যেতে দেখেছিলো। সে-ই গাড়ি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

হাসপাতালে দিন দুই থাকতে হলো মহুয়াকে। সেই যুবকটি—সুকমল-ই দেখাশুনা করলো তার। কারণ সংজ্ঞা ফিরে এলে মহুয়া বলেছিলো—এখানে তার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। আর ঠিকানা দিয়েছিলো এক বান্ধবীর হস্টেলের।

হাসপাতাল থেকে যখন ছাড়া পেলো মহুয়া, দেখলো সুকমল তাকে নিতে এসেছে। বললো—চলুন, আপনাকে হস্টেলে রেখে আসি।

মহুয়ার মনে দ্বিধা। সুকমলকে সে জানে না। কোন্ ভরসায় তার গাড়িতে সে উঠে বসে! কিন্তু এই দু'দিন সুকমল তার যা উপকার করেছে, মুখের উপর প্রত্যাখ্যান করতেও তার সঙ্কোচ হচ্ছিলো। মহুয়া একটু ইতস্ততঃ করে বললো—আপনি আবার কেন কষ্ট করে এলেন। আমি তো বাসেই চলে যেতে পারবো। এই তো কাছেই—

সুকমল বললো—আপনি অসুস্থ। এখানে আপনার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। দৈবযোগে আমিই আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলাম। তাই মানুষের সাধারণ কর্তব্যবোধে আজ আপনাকে নিতে এসেছি।

আপনি অসংকোচে এবং নিঃশংকচিত্তে গাড়িতে উঠে বসুন। ভয় পাবেন না। বিশ্বাস করুন, আমি দুর্বৃত্ত-টুর্বৃত্ত কিছু নই। রীতিমতো ভদ্রসন্তান।

মনের ভাব ধরা পড়ে যাওয়ায় লজ্জায় মুখ লাল করে মহুয়া গাড়িতে উঠলো। গেল মিনতির হস্টেলে। তাকে সব কিছু খুলে বললো। বললো—আমাকে একটা কাজকর্ম যোগাড় করে দে, খাবো কি?

মিনতি বললো—অন্য কাজ না হোক গোটা দুই ভালো টিউশনি যোগাড় করে দিতে পারি। তাতে একজনের চলে যাবে মনে হয়। কিন্তু খুব বেশিদিন করবার দরকার হবে কি? দু'দিন না যেতেই দু'তরফেরই রাগ পড়ে যাবে। গোলযোগ যাবে মিটে। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে যাবি। তাছাড়া, তুই তো সেই বিশ্বাস-ঘাতক তপেন ঘোষকে বিয়ে করছিস না আর।

কিন্তু বাবার অবাধ্য হওয়া যে কি সাংঘাতিক ব্যাপার সে তুই বুঝবি না। তাঁর কাছে অবাধ্যতার ক্ষমা নেই।

নাঃ, কেউ খোঁজ করলো না মহুয়ার। তবে একজন মাঝে মাঝেই খোঁজ নিতে লাগলো। সে সুকমল।

প্রথম দিন তাকে দেখে মহুয়া বলেছিলো—আপনি!

কেন, আসতে নেই বুঝি? সেদিন আপনাকে পৌঁছে দিতে এসে হস্টেলটা চিনে গেলাম। তাই ভাবলাম একবার দেখা করে যাই। অবশ্য আপনার আপত্তি থাকলে আর আসবো না।

মহুয়া বললো—বারে, আপত্তি কিসের। নিশ্চয়ই আসবেন। আমার অসময়ে আপনি যা করেছেন, তা আমি কখনও ভুলবো না।

সাহস দিলেন কিন্তু। এবার থেকে তবে মাঝে মাঝেই আসবো। কি বলেন? আসলে ব্যাপারটা কি জানেন? আপনাকে আমার খুব ভালো লেগে গেছে।

সুকমল প্রায়ই গাড়ি নিয়ে আসতো। মনের অবচেতনায় মহুয়াও তার জন্য অপেক্ষা করতো বৈ কি। সে এলে দু'জনে গাড়ি করে বেরিয়ে পড়তো। কোথাও গিয়ে পাশাপাশি বসতো, সুকমল অনর্গল গল্প করতো। মহুয়া চুপচাপ বসে থাকতো। কথা বলতো খুবই কম।

তপেনের বিশ্বাসঘাতকতায় তার জীবনে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে, সেই ছায়া সে মন থেকে সরাতে পারতো না। তবু, এই স্নিগ্ধ বিকেলগুলো তার খুব ভালো লাগতো। এমনি করে ওরা দু'জন পরস্পরের কাছে এগিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু মহুয়া নিজের চারদিকে একটা গন্ডি টেনে রাখতো। তপেনের শিক্ষা তাকে হুঁশিয়ার ও হিসেবী করেছে।'

দু'য়ে দু'য়ে চার যেমন অবধারিত অংক ফল তেমনি এই ঘনিষ্ঠতার অংকফল হিসেবে সুকমল প্রস্তাব করলো—মহুয়া, তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই। তোমার মত আছে তো ?

মহুয়া সুকমলের মুখের উপর দৃষ্টি ফেলে বললো—বেশ, ধরুন যদি আমার মত থাকেই তাহলেও কি এই বিয়েতে আর কোনো বাধা নেই ? আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। কুলশীল সম্বন্ধে কিছু জানেন না। এগুলো তো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে ?

না মহুয়া, আমি তোমাকে জানি এই আমার যথেষ্ট।

কিন্তু আপনার পরিবারে আপনার অভিভাবক আছেন। তাঁরা আপত্তি করতে পারেন।

আমি আমার মনোনীতা পাত্রীকে বিয়ে করলে তাঁরা আপত্তি করবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। তবু, আমি আগে কাউকে কিছু জানাতে চাই না। রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে জানাবো যাতে আপত্তি করার সুযোগ না মেলে।

বাধ্য হয়ে মেনে নেওয়া আর মন থেকে গ্রহণ করা দুটো আলাদা জিনিস। তাঁরা যদি আমাকে মন থেকে গ্রহণ না করেন ?

তাঁরা না করুন আমি তো করবো মহুয়া।—সুকমল মহুয়ার এক খানা হাত সজোরে চেপে ধরে।

মহুয়া বলে—এমন কতো প্রতিশ্রুতি তো ভেঙে যেতে দেখা যায়। আজকের এই প্রতিশ্রুতির উপর আমি কি বিশ্বাস রাখতে পারি ?

হ্যাঁ, বিশ্বাস করো মহুয়া, বিশ্বাস করো। আমি তোমাকে কখনও ঠকাবো না, কখনও না।

সুবোধবাবু অন্দরে এসে বীণাদেবীকে বললেন—দ্যাখো কি কাণ্ড।

সুখময়ের ছেলে নাকি মা-বাপকে না জানিয়ে একটা অজ্ঞাতকুলশীল মেয়েকে বিয়ে করেছে। আমাকে নেমন্তন্ন করে গেল বৌভাতে।

দেখো তো, তোমার বন্ধু ছেলের ইচ্ছেকে কেমন মেনে নিয়েছেন। আর তুমি কি না নিজের মেয়েকে বাড়ির বার করে দিলে। একটা খোঁজ পর্যন্ত নিলে না!

সুবোধবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—সবাই সুখময় নয় বীণা! আমার কাছে স্বেচ্ছাচারিতার কোনো ক্ষমা নেই।

বীণাদেবী নীরবে চোখের জল মুছলেন।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা সুবোধবাবু সুখময়বাবুর বাড়িতে বৌভাতের নিমন্ত্রণ রাখতে গেলেন। ফিরে এলেন হন্ত-দন্ত হয়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন ওগো শুনছো। কি আশ্চর্য কাণ্ড! স্বপ্নেও যা কল্পনা করতে পারিনি।

কি হলো আবার?

সুখময়ের ছেলের বৌ দেখতে গিয়ে দেখি সে আমাদের মৌ।

অ্যাঁ! বলো কি! ওগো, আমি এক্ষুণি সেখানে যাবো।

সুবোধবাবু বললেন আমি যখন সুখময়ের ছেলের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব আনলুম হতভাগা মেয়ে তখন বেঁকে বসলো। আর এখন কি না তাকেই—। মা-বাপ পাত্র ঠিক করলেই যত আপত্তি। আর নিজে করলে সেই পাত্রই সুপাত্র হয়ে যায়।

ওগো, মৌ তোমাকে দেখে কি বললে বলো না।

আমি তো বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলুম। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—মৌ! আর কনে চন্দন-টন্দন দিয়ে—যা সুন্দর দেখাচ্ছিলো না মেয়েটাকে। মেয়ে কিন্তু এতোটুকু বিচলিত হলো না। শান্ত গলায় বললো বাবা, ভালো আছো? মা কেমন আছে?—তখন তো বাড়িতে রীতিমতো সোরগোল পড়ে গেল। আসল পরিচয় তো আর দেয়নি। বলেছে ত্রিভুবনে নাকি ওর আপনজন কেউ নেই।

বীণাদেবী রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—নেই তো। থাকলে কি আর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হয়।

সুবোধবাবু অপ্রতিভ কণ্ঠে বললেন—ওই হতভাগা তপেন ঘোষের কথা বলাতেই তো ব্যাপারটা জট পাকিয়ে গেল, যা হোক—বৌ

অজ্ঞাতকুলশীল বলে বিয়ে বাড়িতে এতোক্ষণ একটু মেঘ-থমথম করছিলো। ব্যাপারটা জানাজানি হতেই একেবারে ঝকঝকে রোদের আলো। আর সুকমল, আমাদের ঘরের জামাই গো জামাই—সে তো এখন গৌরবের সপ্তম স্বর্গে। এ পর্যন্ত চোরের মতো ছিলো কি না। প্রণামের সে কি ঘটা যদি দেখতে।—সুবোধবাবু হা হা করে হাসতে লাগলেন।

বীণাদেবী ব্যাকুলকণ্ঠে বললেন—ওগো, আমি একবারটি সেখানে যাবো। কতো দিন হলো মেয়েটাকে দেখিনি।

সুবোধবাবু কৌতুকের কণ্ঠে বললেন—জামাইয়ের বাড়ি তুমি নিজে যেচে যাবে কেন গো! অবশ্য তার আর দরকারও হবে না। আমি শুনে এসেছি সুখময়—মানে আমাদের বেয়াই গো বেয়াই আর বেয়ান, দুজনে গাড়ি নিয়ে আসছে তোমাকে নিয়ে যেতে। দেখো বেয়াই বেয়ান পেয়ে যেন আমাকে একেবারে ভুলে যেও না। সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো কিন্তু। হা—হা—

সুবোধবাবু প্রাণখোলা হাসি হাসতে লাগলেন। দীর্ঘদিনের চাপা জমাট বেদনাটা নিঃশেষে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

জানেন, আমার মা সকালবেলা চান করে ঘরে এসে একপিঠ ভিজে চুল আঁচড়ে বড়ো করে একটা সিঁদুর টিপ পরে প্রথমে ঠাকুরের আসনে প্রণাম করতেন। তারপর ঝকঝকে করে মাজা একটা ছোট্ট পেতলের গ্লাসে জল নিয়ে তাতে বাবার পায়ের আঙুলে ঠেকিয়ে সেই জলটুকু খেতেন। বাবার পাদোদক না খেয়ে আমার মা জল গ্রহণও করতেন না।

বলতে বলতে আবেগে ধরে আসতো মীনা রায়ের গলা। চোখে তার জল এসে যেতো। রুমালের কোণে সন্তর্পণে চোখের জলটুকু মুছে বলতো—মা কি ভক্তিই না করতেন বাবাকে। বাবা রোজ রোজ পাদোদক দিতে চাইতেন না। বলতেন—সাবিত্রী, আমার পাদোদক খেয়ে তোমার পরকালের কাজ কিছু হবে না। তার চেয়ে ঠাকুর-দেবতাকে ডাকো, পুজো-আচ্চা করো, তাতে বরং পরকালের কাজ হবে। সার্থকনামা ছিলেন আমার মা। সাবিত্রী নাম বুঝি তাঁর মতো নারীকেই মানায়। বাবার কথা শুনে মার চোখমুখ ভক্তির আলোয় প্রদীপ্ত হয়ে উঠতো। রুদ্ধ কণ্ঠে মা বলতেন—তুমি আমার ঠাকুর-দেবতা, তুমিই আমার পুজো-আচ্চা, তুমিই আমার ইহকাল পরকাল। বলতে বলতে মীনার মুখও প্রদীপ্ত হয়ে উঠতো। চোখ ছলছল করতো, আবেগে গলা কাঁপতো।

শুনতে শুনতে কেউ হয়তো ফিস ফিস করে মন্তব্য করতো—ওর বাবা কি ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে ওর মাকে এসব কথা বলতেন না কি!

মীনা আমাদের মহিলা সমিতির সদস্যা। প্রতি মাসে একটা করে অধিবেশন হতো আমাদের এলাকায়, প্রায় সব মহিলাই এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বয়স্কাদের মধ্যে ছিলেন মিসেস দত্ত, মিসেস ঘোষ, সাধনা মাসীমা, মলিনাদি, বাসন্তীদি ওরা সব। আর কমবয়সীদের মধ্যে ছিলো শিপ্রা কেটি সুধা রমা কবিতা মীনা ইত্যাদি এবং এই দলে আমিও ছিলাম। সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন রানীদি। সমিতিতে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। ধর্মগ্রন্থ পাঠ হতো। চাঁদা তুলে দুঃস্থ মহিলাদের অনেককে সাহায্য করা হতো। সেলাই বোনা, নানারকম খাবার, আচার

তৈরি—এসব নিয়ে আলোচনাও বাদ যেতো না। একজন থেকে অন্য পাঁচজন লিখে নিতো। সভার শেষে চা ও কিঞ্চিৎ জলযোগ হতো।

সেদিন সভার শেষে এমনি চা খেতে খেতে গল্পগুজব হচ্ছিলো। গরম সিঙাড়াতে কামড় দিয়ে বাসন্তীদি বললেন—বাঃ সিঙাড়াটা তো চমৎকার। কোন্ দোকান থেকে আনালে রানীদি। বেশ করেছে।

সাধনা মাসীমা বললেন—দাঁড়াও শীতটা আসুক। আমি একদিন নিজের হাতে তোমাদের ফুলকপির সিঙাড়া করে খাওয়াবো।

রুমা বললো—হ্যাঁ হ্যাঁ, সাধনা মাসীমা যা চমৎকার ফুলকপির সিঙাড়া কড়াইশুঁটির কচুরি করেন, খেলে আর ভুলতে পারা যায় না।

কবিতা বললো—শুধু তাই নয়, উনি অনেক কিছু খাবার করতে জানেন। একবার ওঁর বাড়িতে গিয়ে বরফি সন্দেশ খেয়েছিলাম। বলেছিলেন ছোলার ডাল আর ক্ষীর দিয়ে করেছেন। খেতে দারুণ হয়েছিলো। ওটা কি করে তৈরি করতে হয় একদিন আমাদের সমিতির সভায় বলে দিন না সাধনা মাসীমা!

মীনা বলে উঠলো—আমার মাও খুব চমৎকার খাবার করতে পারতেন। মুগের নাড়ু, ছোলার ডালের বরফি, ছানার পায়েস, ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরের লুচি—সে আর কত বলবো। আমার ঠাকুরমা ঠাট্টা করে মাকে বলতেন—তুমি বাছা নির্ঘাৎ ময়রার মেয়ে। নইলে অতো রকমারি খাবার করতে জানো কি করে। মা হাসতেন।

তারপর বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এলে ঐসব হাতে করা মিষ্টি একটা বড়ো ডিসে সাজিয়ে মা বাবাকে খেতে দিতেন।

বাবা বলতেন—এতোসব মিষ্টি আনিয়েছো কেন? কি ব্যাপার!

মা হেসে বলতেন, আনাইনি তো। ও সবই আমি ঘরে করেছি।

বাবা বলতেন—এতো রকম খাবার সব তুমি ঘরে করেছো? এতো কিছু জানো তুমি?

মা বলতেন—তুমি খেয়ে খুশি হলে তবেই আমার এসব করা সার্থক।

বাবা বলতেন—খুশি হবো না মানে! এতো ভালো ভালো খাবার পেলে কেউ খুশি না হয়ে পারে?

তারপর একটু হেসে বলতেন—তুমি আমার ময়রানী। রানী কথাটায় একটু জোর দিতেন।

সুধা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললো—এই শুরু হলো মীনার বকুনি। যে-কেউ যে-কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলুক অমনি মীনা তার মা'র কথা তুলবেই। এসব কথা সত্যি সত্যি বলে, না গল্প ফাঁদে কে জানে!

মীনাকে নিয়ে অনেকেই এ ধরনের কটাক্ষ করে। আমার কিন্তু মীনাকে খুব ভালো লাগে। এই যে মাতৃগত প্রাণ, মা'র প্রতি এতো শ্রদ্ধা ভক্তি, এ কি খারাপ?

মীনার সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা।

সেদিন আমাদের সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন ছিলো। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা নিয়ে পালা-গান করবেন প্রখ্যাত গায়িকা বনলতা দেবী, চমৎকার গান হলো। যতোক্ষণ গান চললো সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রইলো। এক সময় গান শেষ হলো। গায়িকা চলে যাবার পরও আমরা সবাই মিলে গানের কথাই আলোচনা করছিলাম।

আমি বললাম—আচ্ছা আজ এতো ভালো গানের ব্যবস্থা হলো অথচ রমা এলো না কেন?

রানীদি বললেন, ও তোমরা জানো না বুঝি, রমার যে মা মারা গেছেন।

রমার মাকে চিনতাম। তিনি রমার সঙ্গে দু'চারদিন আমাদের সমিতির সভায় এসেছেন। আমরা দুঃখ অনুভব করলাম।

মীনা বললো, মনে পড়ে যাচ্ছে আমার মায়ের মৃত্যুর কথা। তোমাদের কাছে বোধ হয় সেকথা বলেছি।

কবিতা মীনার কান বাঁচিয়ে চাপা গলায় বললো—ও গল্প তো কম করেও বিশবার শুনেছি। শুনে শুনে কান পচে গেছে।

কেটি ফিস ফিস করে বললো, মীনার স্বভাব আর গেলো না। প্রতি কথায় মা'র গল্প তোলা চাই। তা বলবি তো নতুন কিছু বল। তা নয়। এক গল্প একশোবার।

মীনার কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে গদগদচিত্তে গভীর আবেগ ভরে বলে চললো—প্রথমে বাবার খুব অসুখ করলো। বাঁচার কোনো আশা নেই। ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিয়েছেন। আমার মার নাওয়া নেই খাওয়া নেই, দিনরাত্রি তাঁর শিয়রে বসে রইলেন। পনেরোদিন সে কি

প্রাণান্তকর চেষ্টা, কি আশ্চর্য সেবা। যেন যমে-মানুষে টানাটানি। তারপর আস্তে আস্তে বাবা সেরে উঠতে লাগলেন। ভাত পথ্য করলেন। একটু হাঁটাচলা করতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন সকালবেলা মা বললেন—বুকের ভেতরটা কেমন করছে।

সেই যে শুলেন, চব্বিশ ঘণ্টা পার হলো না। ভোর রাত্তিরে ব্রাহ্ম মুহূর্তে মা চোখ বুজলেন।

পরদিন খবর পেয়ে পাড়া-প্রতিবেশীরা বাড়ির উঠোনে এসে ভেঙে পড়লো, বাড়ি লোকে লোকারণ্য। উঠোনে মাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিলো। পাড়া ঝেঁটিয়ে সধবা মহিলারা এসে মা'র কপালে সিঁদুর পায়ে আলতা পরিয়ে দিতে লাগলো। পায়ের ধুলো নিলো ; বললো. এ যে সাক্ষাৎ সাবিত্রী। যমের ঘর থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছে প্রাণের বিনিময়ে।

বলতে বলতে মীনার গলা কাঁপে, চোখ বুজে আসে, চোখের পাতা ভিজে ওঠে।

না, যে যাই বলুক মীনার এই বুকভরা ভক্তি শ্রদ্ধাকে আমি অবজ্ঞা বা উপহাস করতে পারি না। বললেই বা বারবার এক কথা!

আমাদের মহিলা সমিতির কয়েকজন সদস্যা ভালো গান জানতো। মীনাও গান গাইতো ভালোই। তাদের নিয়ে একটা সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা গেলো। কার্ড দিয়ে কিছু শ্রোতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। আমার স্বামী তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছিলেন। দর্শকের আসনে তাদের পাশে আমিও বসেছিলাম। মীনা গান ধরেছে। আমার স্বামীর বন্ধু ইন্দ্রবাবু বললেন—বৌদি, এই মীনাবিবিকে আপনাদের মহিলা সমিতিতে জোগাড় করলেন কি করে?

মীনাবিবি! কি বলছেন? ও তো মীনা রায়। রাজেন রায়ের স্ত্রী। অবশ্য দ্বিতীয় পক্ষের, ভদ্রলোক বৃদ্ধ।

স্ত্রী! হাসালেন দেখছি। তাই বলেছে বুঝি। ঐ বৃদ্ধ রাজেন রায়ের রক্ষিতা এই মীনাবিবি। পদ্মবিবির মেয়ে। ভদ্রলোক প্রচুর পয়সাওয়ালা, বুড়ো বয়সে নিজের ঘর সংসার ছেড়ে এই মীনাকে নিয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু ও যে বলে ওর মা—সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম ইন্দ্রবাবুকে।

ইন্দ্রবাবু হাসতে হাসতে বললেন—গল্প বানিয়েছে তো বেশ।

আমার এক বন্ধুর একটু 'ইয়ে' ছিলো, সে প্রায়ই ওদের বাড়ি যেতো। একবার সেখানে গিয়ে বন্ধুটি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে আমি ডাক্তার নিয়ে বেশ কয়েকবার ওদের বাড়ি যাই। মা মেয়ে দু'জনকেই ভালোভাবে চিনি। আচ্ছা দাঁড়ান, আপনাকে প্রমাণ দিচ্ছি।

গানের আসর ভাঙলে মীনা আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। ইন্দ্রবাবু মীনার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—কি মীনাবিবি, আমাকে চিনতে পারছো?

মীনা চমকে উঠলো। তার মুখ পাংশু ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

ইন্দ্রবাবু বললেন—এতোক্ষণ ওঁদের কাছে তোমার মায়ের গল্প শুনছিলাম। তোমার ঠাকুরমার গল্পও। তোমার বাবা আবার কে মীনাবিবি? কে তোমার জন্মদাতা তাই জানো না, ঠাকুরমা চিনলে কি করে, হ্যাঁ মীনাবিবি? আর পদ্মবিবি কবে এমন সতী-সাবিত্রী হলো যে সে মরলে পরে ঝেঁটিয়ে পাড়ার লোক তাকে আলতা সিঁদুর পরাতে এলো? রাজেন রায়ের সঙ্গে কবে তোমার বিয়ে হলো? বেশ গল্প বানাতে পারো তো মীনাবিবি!

ইন্দ্রবাবু বড় বেশি নিষ্ঠুর হচ্ছেন। একটা ভাগ্যহীনা মেয়েকে মারতে কি এতো অস্ত্র লাগে!

আমার খুব খারাপ লাগছিলো। মীনার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিলো না। সে থর থর করে কাঁপছিলো। ইতিমধ্যে সবাই এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ঠোঁট উল্টে ওরা বলাবলি করছিলো—কি গল্পের বাহার! তখনই বুঝেছি এই গল্পে ভেজাল আছে।

একে একে সবাই চলে গেলেন। দু'হাতে মুখ ঢেকে তখনও চেয়ারে বসেছিলো মীনা। আমি কাছে গিয়ে বললাম—উনি যা বলে গেলেন তা সত্যি মীনা?

মীনা স্বীকৃতি সূচক মাথা নাড়লো।

রাজেন রায় তোমার স্বামী নন?

মুখ না তুলে রুদ্ধকণ্ঠে মীনা বললো—না, তবে বিশ্বাস কর ছবি, আমি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে জানি না।

আচ্ছা মীনা, কেউ তো তোমার মা সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইতো না। তবে তুমি কেন যেচে যেচে ওসব কথা বলতে?

আমার হাত দু'টো সজোরে চেপে ধরে ঝর ঝর করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে মীনা বললো—আমি মনে মনে বুকের ভেতর এমনি একজন মায়ের ছবি আঁকি। এমনি এক মায়ের স্বপ্ন দেখি। আশীর্বাদ করো ছবি পরজন্মে যেন এমনি একজন মায়ের ঘরে আমার জন্ম হয়।

তৃষ্ণা

কিছুদিন হলো সুদাসের ভারি অসুখ, সুদাস মৃত্যুশয্যায়, রোজই ডাক্তার আসেন, ওষুধ দেন, ইনজেকশন চলে, কিন্তু রোগের উপশম নেই। ডাক্তারবাবু উপদেশ দিলেন—হাসপাতালে চলে যান, বাড়িতে তেমন যত্নতদ্বির হচ্ছে না, আপনার ঠিকমতো যত্নশুশ্রূষা প্রয়োজন।

. সুদাস হাসপাতালের ডাক্তার নার্স এবং গোটা হাসপাতাল ব্যবস্থার প্রতি বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞায় নাক সিঁটকে একটা খিস্তি করে বললো—ওখানে গেলে আরও তাড়াতাড়ি টেঁসে যাবো, হাত ধরে যমের বাড়ি পাঠিয়ে ছাড়বে।

ডাক্তারবাবুর এই উপদেশের কারণ সুদাসের বাড়িতে কেউ নেই। দেড়খানা ঘরের এই আস্তানায় সুদাস একা থাকে শুধুমাত্র তার ছোকরা চাকর ভন্টুকে নিয়ে, তাও ভন্টু দিন রাত থাকে না, সকালে আসে। যতোক্ষণ না সুদাস বেরিয়ে যায় ততোক্ষণ তার ফাই-ফরমাস খাটে। দোকান থেকে চা খাবার পান সিগারেট এনে দেয়, ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করে, কুঁজোতে জল ভরে রাখে, জুতোয় কালি করে, লন্ড্রি থেকে কাচানো জামাকাপড় আনে, বাড়িতে কোনো রান্না-খাওয়ার পাট নেই। ও পাট সুদাস হোটেলে-হোটেলেই সেরে নেয়। কাজেই ভন্টুরও একবেলা ডিউটি, ভন্টু খায় নিজের বাড়িতে, শুধু টাকার উপরই তার সংগে সুদাসের লেনদেন, তবে মাইনেটা দেয় ভালো, ভন্টু ছেলেমানুষ বলে অন্য জায়গায় কাজ করতে গেলে যা মাইনে দিতে চায় সুদাস দেয় তার দ্বিগুণ। এই যা একটু সান্ত্বনা।

অসুস্থ হওয়ার পর সুদাস ভন্টুকে বলেছে – যতদিন আমি সেরে না উঠি তুই সব সময় আমার এখানে থাকবি। আমার ওষুধ-পথ্য ঠিকমতো দিবি। স্টোভ ধরিয়ে পথ্যি তৈরি করে দিবি, পালাবি না কিন্তু। আর যদি পালাস তবে মাটির উপর যেখানেই থাকিস না কেন সেরে উঠে ঠিক তোকে ধরে আনবো। এনে—বুঝলি—বলে বিছানার নীচে থেকে সাঁৎ করে একটা প্রকাণ্ড ছোরা টেনে এনে ফলাটা ভন্টুর পেটের কাছে ধরলো। বললো—ভুঁড়ি একেবারে ফাঁসিয়ে দেবো।

ভয় ভয় চোখে ভন্টু তাকিয়ে থাকে।

হ্যাঁ, সুদাস এমনি করেই কথা বলে, মাঝে মাঝে ভন্টু চলে যেতে চাইলেই ছোরা দেখিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে। সুদাসকে এ তল্লাটে চেনে না এমন কেউ নেই। সুদাস মস্তান ছিনতাইবাজ গুণ্ডা, তার ভয়ে তার অত্যাচারে গোটা এলাকাটা থরহরি কাঁপে।

সেই সুদাস আজ মরতে বসেছে। তাকে দেখার লোক একমাত্র ভন্টু, ভন্টুর বয়স তেরো-চৌদ্দ। প্রথমে সে সুদাসের কাছে কাজ করতে চায়নি, এমন লোককে কে না ভয় করে, তবে টাকার লোভ বড় বালাই। আর সুদাস বলেছে ঠিকমতো কাজ করলে তোর কোনো ভয় নেই।

সারাটা জীবন ওই কাজই করেছে সুদাস। সন্ধ্যের পর ঘড়ি গয়না নিয়ে কেউ রাস্তায় চলতে পারেনি। আধহাত লম্বা একখানা চকচকে ছোরার ফলা তাদের পেটের কাছে ঝলসে উঠেছে, নয়তো পাইপ গান ঠেকেছে বুকে—দাও, যা যা কাছে আছে দিয়ে দাও। নিরুপায় পথচারী জীবনের মায়ায় ওর হাতে তুলে দিয়েছে তাদের ঘড়ি গয়না মানিব্যাগ, হয়তো বা সারা মাসের শ্রমমূল্য মাসমাইনের পুরো টাকাটা, যথাসর্বস্ব। সবাই সব জানে, কিন্তু ভয়ে কেউ রা কাড়ে না। পুলিশেরও অজানা নয়, তাদের চোখের সামনেই তো কতো কাণ্ড ঘটিয়েছে সুদাস। কিন্তু কয়েকগজ দূরে দাঁড়ানো পুলিশ না-দেখার ভান করে চোখ ফিরিয়ে থেকেছে। পুলিশের সঙ্গে লাইন আছে, তাছাড়া সুদাসের মন্ত্রীদাদা এম. এল. এ. দাদারা আছে। পুলিশ ধরলে সেই দাদারা ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। কাজেই থানা-পুলিশ করেও অত্যাচারিতেরা কোনো প্রতিকার পায়নি, উল্টে নিজেরা হয়রান হয়েছে আর সুদাসের দ্বিগুণ কোপে পড়েছে। অপ্রতিহত গতিতে স্বৈরাচারের রাজত্ব চালিয়েছে সুদাস। শুধু কি ছিনতাই আর গুণ্ডামি। আরও কত কীর্তি করেছে সে। নিজের বৌটাকেই বা কি করলো! মা-বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন সুদাসের। খুব শান্ত সুশ্রীর সাদামাঠা মেয়ে ছিলো মুকুল। সুদাস যেমনই হোক তবু তাকে মুকুল ভালোবাসতো, রেঁধে বেড়ে যত্ন-আত্তি করে খাওয়াতো। কিন্তু কপালে জুটতো দিনরাত খিস্তি খেউড় আর লাঞ্ছনা। রোজ রাত্তিরে আকণ্ঠ মদ গিলে এসে ছুতোয়নাতায় বৌটাকে ধরে গরুপেটা করতো সুদাস। যখন প্রথমবার বাচ্চা হবে মুকুলের সেই সন্তানসম্ভবা অবস্থায়

একদিন সুদাস মদ খেয়ে এসে এমন লাথি মেরেছিলো যে ছিটকে পড়েছিলো মুকুল। অনাগত জীবনের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। আঘাত এতো গুরুতর হয়েছিলো যে তার ফলে চিরদিনের মতো বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিলো বৌটা। ডাক্তার অবশ্য বলেছিলেন একটা বড় রকমের অপারেশন হলে ভবিষ্যতে সন্তান হতেও পারে। কিন্তু সুদাস আর ও-পথে যায়নি। অতো নটখটি তার পোষায় না। স্বামীর নির্মম অত্যাচার সহ্য করেও বেশ কয়েক বছর ঘর করেছিলো মুকুল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকতে পারলো না। একদিন মারধোর করে নেশার ঝোঁকে মাঝরাতে ঘর থেকে বের করে দিলো বৌটাকে। সেই গভীর রাত্রে এক বস্ত্রে কপর্দকহীন বৌটা পায়ে হেঁটে কোথায় গেলো, পরদিন খোঁজও নিলো না সুদাস। ভাবলো—কোন্ চুলোয় যাবে আর! ঠিক ফিরে আসবে। কিন্তু মুকুল আর ফিরে এলো না। অনেক পরে অবশ্য সুদাস জানতে পেরেছিলো তার বৌ নাকি কোনো এক বস্তিতে ঘর ভাড়া করে আছে। আর কোন্ এক নার্সিং হোমে আয়ার কাজ নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তারপরও নিজে গিয়ে ধরেকরে আনেনি বৌটাকে। তার মতো উদ্দাম উচ্ছৃংখল জীবনে কোনো বাধ্যবাধকতার বন্ধন সহ্য করতে পারে না সুদাস। তাই বলে নারীতে অরুচি নেই সুদাসের। বাজে পাড়ায় যাতায়াত তো আছেই, গেরস্থ ঘরের বৌ-ঝিরাও তার ছিনতাইয়ের পাল্লার বাইরে নয়। অসহায় অবস্থার সুযোগে কিংবা জোর-জবরদস্তি করে কতো মেয়ের সর্বনাশ করেছে সুদাস। কোনো সুন্দরী মেয়ের দিকে তার একবার নজর পড়লে তাকে ছলে-বলে-কৌশলে যে ভাবেই হোক্ আত্মসাৎ করেছে। কতো মেয়ের জীবন বরবাদ করে দিয়েছে। নিজের খেয়ালখুশি মতো যাকে যতোদিন ইচ্ছে কবজায় রেখেছে। তারপর কোনো ঝঞ্ঝাটের সম্ভাবনা দেখলে ছেঁড়া জুতোর মতো রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সেই মেয়েগুলো কেউ সুস্থ সমাজ জীবন থেকে হারিয়ে গেছে কেউ বা আত্মঘাতী হয়েছে। সেজন্য সুদাস বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি।

সেই সুদাস আজ মরছে।

ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছেন। ভন্টু দফায় দফায় ওষুধ খাওয়াচ্ছে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে তাই পায়ের উপর হট ওয়াটার ব্যাগ চাপানো।

ক্রমে সুদাসের বাকরোধ হয়ে গেলো এবং সে চৈতন্য হারালো।

সুদাস কথা বলতে পারছে না, হাত পা, নাড়তে পারছে না কিন্তু ভেতরে তখনও জ্ঞান ছিলো। সে টের পেলো কে একজন এসে ঘরে ঢুকলো। কথা শুনে বুঝলো সে ভন্টুর বন্ধু নরু। নরু বললো—কিরে টেঁসে গেছে?

না, এখনও আছে। তবে জ্ঞান নেই। শেষ সময়। ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে।

তবে আর কি, চাবি কোথায় রাখে তুই তো জানিস, বের কর। টাকাকড়ি এবেলা সরিয়ে ফেলি, মরে গেলে অনেক লোকজন জড়ো হবে। টাকাগুলো বেহাত হয়ে যাবে। এইবেলা কাজ সেরে নে।

ভন্টু বললো—দাঁড়া, একেবারে টেঁসে যাক। এখন টাকা সরাই আর ব্যাটা যদি কোনোরকমে বেঁচে ওঠে তবে আমাদের জান খতম করে দেবে।

লোকটার তিন কুলে কেউ নেই? কাউকে খবর দিতে বলেনি?

থাকলেও এই শকুনের কাছে আসবে কে? তাই হয়তো বলেনি, অবশ্য তাতে আমাদেরই সুবিধে, নিজের লোকজন এলে আমাদের কাজ হাসিল করতে অসুবিধে হতো।

সুদাসের ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে ওঠে—অ্যাই ভনটে! তোর এতো সাহস!

কিন্তু পারলো না, না পারলো একটু নড়তে না ফুটলো গলার স্বর, হঠাৎ সুদাস দেখে তার দেহটা পড়ে আছে আর সে দাঁড়িয়ে আছে দেহটার পাশে। ভন্টু বলে উঠলো—এইবার সত্যিই শেষ হয়ে গেলো। ব্যাটা মরেছে। বাবা! মুক্তি পেলাম এতোদিনে। চলে যেতে চাইলেই ছোরা দেখিয়ে আটকে রাখতো আমাকে।

নরু বললো—শিগগীর চাবি বের কর। টাকাগুলো সরিয়ে ফেলি আগেভাগে।

ভন্টু মৃতদেহের বালিশের তলা থেকে চাবি টেনে বের করলো। তারপর বাক্স খুলে কিছু টাকা রেখে বাদবাকি এক বান্ডিল মোট নরুর হাতে দিয়ে বললো—এটা নিয়ে তুই কেটে পড়। এ চুরি আর ছিনতাইয়ের টাকা। এ নিলে আমাদের কোনো পাপ হবে না। রাত্তিরে যাবো।

তখন ভাগ হবে। দশ আনা ছ' আনা বুঝলি? এখন আমি লোকজন ডাকি।

বিদেহী সুদাস চিৎকার করে কিছু বলতে চাইলো। কিন্তু গলায় আওয়াজ ফুটলো না। তার অশরীরী স্বর কেউ শুনতে পেলো না। নরু চলে যেতেই ভন্টু ঘরের বাইরে এসে চিৎকার করে উঠলো—ওগো, তোমরা এসো গো, আমার বাবু একদম সাড়া দিচ্ছে না যে।

সংগে সংগে ঘরে ভিড় জমে গেলো।

ভন্টুই সবার সামনে অত্যন্ত নির্দোষ মুখে বাক্স খুলে 'টাকা পয়সা যা ছিলো' সব বের করে দিয়েছে। তাই দিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা হচ্ছে।

সুদাসকে বের করে বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গায় খাটিয়ায় শুইয়ে বাঁধাছাঁদা করা হচ্ছে। মাত্র কয়েকজন পাড়ার ছেলে এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। কিছু ছেলে আসতে রাজি হয়নি। বলেছে—ও ব্যাটা মহাপাপী, ওকে পোড়ালেও পাপ হবে।

একজন পথচারী জটলা দেখে উঁকি মেরে তাকালো, বললো—আরে, এই মহাপুরুষকে তো আমি চিনি। একদিন একটু রাত করে বাড়ি ফিরতে গিয়ে পড়েছিলাম ওর খপ্পরে। পেটের কাছে ইয়া বড়ো একটা ছোরা ধরে ঘড়ি মানিব্যাগ সব কেড়ে নিলো। ব্যাগে ছিলো পুরো মাসমাইনে। সেদিনই সবে মাইনে পেয়েছিলাম। বললো—জীবনের মায়া থাকে তো আমার নামটা নিয়ে থানা-টানায় যেও না বাপধন।

তবু আমি থানায় ডায়েরি করেছিলাম, কিন্তু কিচ্ছু হয়নি।

আর এক ভদ্রলোক বললেন—একদিন রাত্রিবেলা স্ত্রীকে সংগে নিয়ে রিক্সা করে বাড়ি ফিরছি, রিক্সা থামিয়ে ধরলো এই সুদাস গুণ্ডা। স্ত্রীর হার বালা দুল সব ছিনিয়ে নিলো। আমার বুকে পাইপগান ধরে আছে। টুঁ শব্দটি করতে পারলাম না। আবার শাসিয়ে বললো—আমি স্বনামধন্য ব্যক্তি। আমাকে নিশ্চয়ই চেনো। তবে থানায় আমার নামে নালিশ করতে যেও না চাঁদ। তাতে আমার কিচ্ছু হবে না কিন্তু তোমার জানটি যাবে। —ব্যাটা মরেছে না বাঁচা গেছে।

এমনি অভিযোগের পর অভিযোগ। ছিনতাইবাজ! গুণ্ডা! মস্তান! বদমাশ! —এক একটা ঘৃণার বুলেট যেন ছিটকে ছিটকে পড়ছে। সুদাস সব শুনতে পাচ্ছে। সবার মুখে মুখে ঘৃণা থমথম করছে। চোখে স্বস্তি

চকচক করছে। সুদাস গুণ্ডা মরেছে আর ওরা সবাই বেঁচেছে।

ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা ফেনিয়ে উঠছে এখানকার হাওয়ায়। সেই বিষে জ্বলে যাচ্ছে সুদাস। বড়ো তৃষ্ণা তার। দু' ফোঁটা জল। ওগো, অন্ততঃ দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলো তোমরা আমার চিরবিদায়ের পথে—চিৎকার করে বলছে বিদেহী সুদাস কিন্তু কেউ তার গলা শুনতে পাচ্ছে না।

ওঃ, বড় তৃষ্ণা! তৃষ্ণায় জ্বলে যাচ্ছে সুদাস।

নাঃ, কারও চোখে এক ফোঁটা জল নেই। সুদাসের শেষ তৃষ্ণা কি তাহলে মিটবে না? এই বুকফাটা তেষ্টা নিয়ে তাকে চলে যেতে হবে?

একপাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলো একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের কিশোরী। কিছুদিন আগে তার বাবা মারা গিয়েছিলো। দেখতে দেখতে সেই কথা মনে পড়ে গেলো তার। বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো।

আঃ, যেন মলয়চন্দন। সুদাসের তাই মনে হলো। সুদাস যেন জুড়িয়ে গেলো। কিন্তু তেষ্টা যে মেটে না। ওরে মেয়ে, দু' ফোঁটা চোখের জল ফ্যাল্ না। শুধু দু'ফোঁটা।

নাঃ, মেয়েটি চলে গেলো।

বাঁধাছাঁদা শেষ। এবার খাটিয়া তোলা হবে। এমন সময় কে আসছে ঐ ছুটতে ছুটতে। একটি কম বয়সী বৌ। হাতে একখানা শাদা ফুলের মালা। ভিড় ঠেলে এগোতে এগোতে আর্তস্বরে বললো—ওগো, তোমরা আমাকে ওর কাছে একটু যেতে দাও। ওকে আমি যে কতোদিন দেখি না।

ভিড় সরে সরে মেয়েটিকে যাবার রাস্তা করে দিলো। বিদেহী সুদাস অবাক্ হয়ে দেখলো—আরে, এ যে তার বৌ মুকুল। কিভাবে খবর পেয়ে এসেছে।

মুকুল খাটিয়ার কাছে গিয়ে একটু সময় মৃতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর মালাটা সুদাসের গায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হুমড়ি খেয়ে মৃতের পায়ের উপর পড়ে কেঁদে উঠলো। কাঁদতে লাগলো ফুলে ফুলে। দু'ফোঁটা নয়। চোখের জলের ধারায় ধারায় বন্যা নামলো। ভিজে গেলো মৃতের দুটি পা। পায়ের কাছে বিছানা।

আঃ কি শান্তি! কি তৃপ্তি! অঞ্জলি অঞ্জলি জলে সুদাসের আত্মার তৃষ্ণা মিটলো।

মর্ত্যের বাঁধন ছিঁড়ে চলে যাবার সময় দু'ফোঁটা শোকের অশ্রুর তর্পণ না হলে চলে? কে চায় ভালোবাসাহীন নিষ্ঠুরতার মধ্যে চিরবিদায় নিতে?

আহা, এমন বৌকে সুদাস কত্তো কষ্ট দিয়েছে। এমন ভালোবাসাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এখন বড়ো মায়া হচ্ছে। বুকে তুলে নিতে ইচ্ছে করছে বৌটাকে। আজ তার বলতে ইচ্ছে করছে—বৌ, আমাকে ক্ষমা কর ক্ষমা কর। আমি তোকে কোনোদিন কিছু দিইনি। কিন্তু আজ তোরই চোখের জলের পাথেয় নিয়ে আমি চললাম এই পৃথিবী ছেড়ে মহাপ্রস্থানের পথে অনন্ত যাত্রায়।

শুভদৃষ্টি

দারুণ বিয়ের ধুম পড়েছে, রোজই শোনা যায় শাঁখ উলু মাইক আর সানাইয়ের আওয়াজ। রাস্তাঘাটে চলতে গিয়ে দেখা যায় ফুল-সাজানো গাড়িতে বর আর বরযাত্রীর মিছিল, আর জমকালো শাড়ি গয়না-পরা মাথায় বেলফুলের মালা-জড়ানো নিমন্ত্রিতার দল, ফিনফিনে ধুতি ও সিল্ক বা আদ্দির পাঞ্জাবি পরা বশংবদ সঙ্গীটি শাড়ির বাক্‌স হাতে নিয়ে কাছেই দাঁড়ানো।

সুপর্ণারও বিয়ে।

উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের দুটি কন্যার মধ্যে সুপর্ণা কনিষ্ঠা। বড়ো অপর্ণার বিয়ে হয়ে গেছে পাঁচ বছর আগে। তাই এবার সাধ্যাতিরিক্তই ঘটাপটা হচ্ছে। সারাদিন বাড়িতে শুধু শাড়ি জামা কেনাকাটা গয়নার ডিজাইন পছন্দ করার তোড়জোড়। নিমন্ত্রিতদের লিস্ট, বর ও বরযাত্রী আনার ব্যবস্থা, মাছ মাংস দই মিষ্টির অর্ডার ইত্যাদি ব্যস্ততার মধ্যে দেখতে দেখতে বিয়ের দিন এসে গেলো। মাঝে আর মাত্র দুটো দিন। কিন্তু চারদিকে যা অবস্থা! অপর্ণা দ্রুতহাতে নতুন কেনা শাড়ি কাপড়ের ডাঁই আলমারিতে তুলতে তুলতে বললো—এবার ভালোয় ভালোয় চার চোখ এক হয়ে গেলে বাঁচি।

ওদিকে পাত্রের বাড়িতেও ব্যস্ততা কম নেই। মেয়ের বাড়িতে উৎসব তো একদিনের। বিয়ের রাতটি পোহালেই বর-কনে বিদায়ের পালা, আর তারপরই উৎসব গেল জুড়িয়ে। কিন্তু ছেলের বাড়িতে উৎসব বলতে গেলে কয়েক দিন ধরেই চলে। বিয়ের দিন বরযাত্রীর মিছিল নিয়ে বর যাবে বিয়ে করতে। বিশেষ করে মেয়ে বরযাত্রীদের সাজগোজ —বেলা দুটো থেকেই —সে এক তুলকালাম কাণ্ড। যা-তা ব্যাপার নয় তো! বরযাত্রী বলে কথা! তারপর দিন নববধূ নিয়ে বাড়ি ফেরা। আর নতুন বৌ বাড়ি এলেই তো উৎসব জমজমাট। তাকে ঘিরে কমবয়সী,

বেশি বয়সী বৌ ঝি, তরুণ, যুবক নানা আত্মীয়দের যত্তো ভীড়। ঠাকুমা দিদিমাদের রস-চটচটে পরিহাস। ফুলশয্যা, বৌভাত। অবিচ্ছিন্ন উৎসব।

পাত্র জয়ন্ত এ বাড়ির বড়ো ছেলে। এই প্রথম বৌ আসছে ঘরে। তার মা সুলোচনা প্রথম শাশুড়ি হবার গৌরবে ও আহ্লাদে ডগমগ করছেন। দু' হাতে দশ হাতের কাজ সামলাচ্ছেন। জিনিস-পত্র ভাঁড়ারে তুলতে তুলতে তিনি আপনমনে বললেন—এখন ভালোয় ভালোয় শুভদৃষ্টি হয়ে গেলে বাঁচি।

কিন্তু বাঁচা গেল না। বিয়ের দিন সকালবেলাই দেখা গেল জয়ন্তর দু'চোখ ফুলে ডবডব করছে। রক্তবর্ণ, অনবরত জল গড়াচ্ছে। তাকাতে পারে না এমন যন্ত্রণা। চোখে যেন ছুঁচ বেঁধাচ্ছে। 'জয় বাংলা' হয়েছে।

ওদিকে বিয়ের দিন সকালবেলা সুপর্ণা ঘুম থেকে উঠেই বললো—চোখ খুলতে পারছি না রে দিদি, কি যন্ত্রণা।

অপর্ণা বললো—সেরেছে! যা আশঙ্কা করেছিলাম। বিয়ের কনে, পাত্রপক্ষ না জানি কি মনে করবে। একটা কেলেঙ্কারী না হয় শেষকালে। সুপর্ণারও জয় বাংলা।

সন্ধ্যাবেলা যথারীতি বেনারসী শাড়ি, গয়না, আলতা, কুমকুম, কনে-চন্দন গোড়েমালা দিয়ে কনে সাজানো হলো। সেইসঙ্গে চোখে পরানো হলো কালো চশমা। কি করবে! চোখে আলো একদম সহ্য হচ্ছে না যে!

ওদিকে জয়ন্তও বর সেজে এলো। ফিনফিনে ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি কপালে চন্দন, মাথায় টোপর আর চোখে কালো চশমা। আলোর দিকে মোটে তাকাতে পারছে না যে। সপ্ত-প্রদক্ষিণ, মালাবদল ইত্যাদি হয়ে গেলে এবার শুভদৃষ্টির পালা। সবাই বললো—চশমা খুলে ভালো করে তাকাও—ভালো করে।

অতি কষ্টে চোখ মেলে তাকালো সুপর্ণা—ওরে বাপ! লাল লাল ড্যাবডেবে দুটো চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। সুপর্ণা ভয়েই চোখ বন্ধ করে ফেললো।

জয়ন্তও কোনো রকমে চোখ খুলে তাকিয়েছে। কিন্তু বড়ো বড়ো ফুলো ফুলো টকটকে লাল দুটো চোখ দেখে সে শিউরে উঠলো।

সবকিছু চুকে গেলে অপর্ণা নিরিবিলিতে সুপর্ণাকে বললো—কি

রক্তচক্ষু শুভদৃষ্টিই না হলো তোদের! জানিস, আমাদের শুভদৃষ্টির সময় তোর জামাইবাবু কি মধুর দৃষ্টিতে যে আমার দিকে তাকিয়েছিলো, কিন্তু এই পাঁচ বছরে দ্বিতীয়বার আর তেমনটি দেখলাম না। এখন তো কথায় কথায় রক্তচক্ষু। দাম্পত্য জীবনের কেত্তনে অষ্টপ্রহর ঝাঁঝর কাঁসর তাসা বাজছে। ঝনঝন খনখন আওয়াজ হয়েই চলেছে সানাই বাঁশি সেতার ওসব বে-পাত্তা। আর তোরা প্রথম-দিনই দুজনের দিকে দুজনে চোখ লাল করে তাকালি। তোদের জীবন-বীণায় কোন সুর বাজবে, কে জানে!

সকালের চিন্তা ও সন্ধ্যার স্বপ্ন

প্রবালকে ভালো লাগে চন্দনার। যে অফিসের টাইপিস্ট চন্দনা সেই অফিসেই আপার ডিভিশান ক্লার্ক প্রবাল।

আসতে-যেতে দেখাশুনো, চেনা পরিচয়। সেই থেকে আলাপ ঘনিষ্ঠতা। মাঝে মাঝে অফিস ছুটির পর দু'জনে মিলে 'লেকে' গিয়ে বসা। চিনে বাদাম আর আইসক্রিম খাওয়া। ভালো লাগে চন্দনার প্রবালের কথা, প্রবালেব হাসি। ভালো লাগে সন্ধ্যেটা প্রবালের সাহচর্যে।

এমনি এক ভালো-লাগা সন্ধ্যায় প্রবাল বললো—চন্দনা, এই একটু দেখা, একটু কাছে পাওয়া এতে আর মন ভরে না। চলো আমরা দু'জনে মিলে ঘর বাঁধি।

মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে চন্দনা বললো—তা হয় না প্রবাল।

কেন? তুমি কি আমাকে চাও না চন্দনা?

চন্দনা দৃঢ় মুঠিতে প্রবালের এক খানা হাত চেপে ধ'রে বললো—না না তা নয়। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।

তবে—

নতকণ্ঠে চন্দনা বললো— তোমাকে পাবো সে তো আমার ভাগ্য। কিন্তু আমার উপর যে বিরাট দায়িত্ব প্রবাল। একটা গোটা পরিবার আমার মুখ চেয়ে আছে। সেই দায়িত্ব এড়িয়ে এ বিলাস কি আমার শোভা পায়?

কেন, বিয়ের পরেই বা তোমার দায়িত্ব পালনে বাধাটা কোথায়? আমাদের এই শর্ত থাকবে—তোমার সংসার যথারীতি তুমি চালাবে আমার সংসার আমি। তারপর মৃদু হেসে হালকা সুরে বললো—অবশ্যি খরচ আমার বাড়বে। এতোদিন একা ছিলাম এরপর দু'জনের খরচা বইতে হবে। তা তোমায় পাবো এই লাভের কাছে ঐ ক্ষতিটাকে স্বীকার করেই নেবো আর কি!

প্রবাল বললো—তোমার লাভ কিন্তু ষোলো আনা।

কি রকম?

আমাকে পাওয়া যদি লাভ বলে মনে করো তবে সে তো রইলোই, তার উপর খরচাও কমে যাবে না! একজন মেম্বার কমে যাবে যে তোমার সংসারে।

চন্দনা হেসে উঠলো।

প্রবাল হাসিমুখে বললো—তা হলে রাজি?

প্রায় বারো আনা রাজি হয়ে চার আনা হাতে রেখে হাসিমুখে চন্দনা বললো—কাল জানাবো।

প্রতিদিনকার মতো চন্দনাকে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে নিজের গন্তব্য পথে চলে গেলো প্রবাল। আর চন্দনার মনে হতে লাগলো—এই সন্ধ্যায় কলকাতার আকাশের রংটা বুঝি গেছে বদলে। নিত্যদিনের যাতায়াতের পথটায় যেন নতুন রঙ লেগেছে। হাল্কা লাগছে চন্দনার দেহটা। পাখির মতো উড়তে চাইছে মন। গানের কলি গলায় উঠতে চাইছে গুনগুনিয়ে।

লঘু পায়ে বাড়ি ঢুকলো চন্দনা। কলঘরে গিয়ে সাবানের পর্যাপ্ত নরম ফেনায় গা মেজে খুব জল ঢেলে চান করলো। একটা অদ্ভুত তৃপ্তিতে ছেয়ে আছে দেহ-মন। ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু প্রসাধনের প্রলেপ বুলালো মুখে। চুলগুলোকে বিনুনীতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলো পিঠে। নাঃ, প্রবালকে ফেরাতে পারবে না চন্দনা। সে তো তার পরিবারের স্বার্থে হাত দিতে চায় নি। সবকিছু বজায় রেখে যদি ওরা পরস্পরকে পেয়ে সার্থক হতে পারে তবে চন্দনা তাতে বাধা দেবে কেন?

বন্দনা চা নিয়ে এলো। বললো—দিদি চা খেয়ে নে।

তোর চা?

এই যে, আনছি।

দু'বোন একসঙ্গে বসে চা খেলো। খানিকক্ষণ আগডুম-বাগডুম গল্প করলো। তারপর বন্দনা গেল পড়ার টেবিলে আর চন্দনা গেল ছাতে। একটা মাদুর বিছিয়ে দু'হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে তারা ভরা আকাশটার দিকে তাকিয়ে কল্পনায় কল্পনায় রোমাঞ্চিত হতে লাগলো।

চন্দনা ও বন্দনা দুই বোন। এক মাত্র ভাই নীলাঞ্জন সবার ছোটো। মাথার উপর অভিভাবক বলতে বিধবা মা। পরিবারে উপার্জনকারী একমাত্র চন্দনা। বাবা মারা গেছেন বছর পাঁচেক। সেই থেকে—মাত্র কুড়ি বছর বয়স থেকে সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়েছে চন্দনা। নিজের বিয়ের কথা চিন্তা করবারও অবকাশ পায় নি। মানে, ইচ্ছে করেই ভাবে নি। জানে ভেবে কোনো লাভ নেই। তাই এ ভাবনাটাকে যথাসাধ্য এড়িয়েই চলেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য। প্রবাল একি বিস্ময়কর বার্তা বয়ে নিয়ে এলো চন্দনার দুয়ারে।

না, চন্দনা ফেরাবে না প্রবালকে। তার তৃষিত প্রাণটাও কি প্রবালের ভালোবাসার ঝর্ণাধারায় স্নান করে স্নিগ্ধ হতে চাইছে না?

রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যেও পুলক রোমাঞ্চের শিহরণ অনুভব করলো চন্দনা। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতেই বন্দনা জানালো—দিদি, কাল রাত থেকে মা'র হাঁপানির টানটা খুব বেড়েছে রে!

তাই না কি! আচ্ছা, আমি দেখছি।

চোখে-মুখে জল দিয়ে এক কাপ চা খেয়ে নিয়ে চন্দনা মা'র বিছানার পাশে এসে বসলো। মমতাসিক্ত কণ্ঠে বললো—খুব কষ্ট হচ্ছে মা?

ঘন ঘন টানা-টানা নিঃশ্বাসে মা বললেন—হ্যাঁরে, বড় কষ্ট। ভগবান যে আর কতো ভোগাবেন। নিজেও কষ্ট পাচ্ছি তোদেরকেও কষ্ট দিচ্ছি। কি অসহ্য শ্বাসকষ্ট! 'হিমরডসু'-এর ধোঁয়া নিলে একটু কমে। ঐ একটা না আনলে যে আর বাঁচিনে মা! সেই সঙ্গে একটা খাবার ওষুধ 'কুরাজল'। কতগুলো টাকা লাগবে আবার। কিন্তু কি করবো! তোর জন্য কিছুই করতে পারলাম না মা। শুধু জ্বালিয়েই মারছি তোকে—

মা'র দু'চোখে জল গড়িয়ে পড়লো।

চন্দনা সযত্নে মা'র চোখ মুছে দিলো আঁচল দিয়ে। বললো—এতো কাতর হচ্ছো কেন মা! আমি আজই তোমার ওষুধ নিয়ে আসবো। ছেলে মায়ের জন্য করে না? মেয়ে হয়েছি বলে বুঝি পর?

মাকে সান্ত্বনা দিয়ে উঠে পড়লো চন্দনা। চান-খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। কলঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে, নীলাঞ্জন এসে দাঁড়ালো—দিদি, কালকেই আমার স্কুলের মাইনে দেবার শেষ তারিখ। এরপর 'ফাইন' লাগবে।

ঠিক আছে। কাল নিয়ে যাস মাইনে।

চান করে পোশাক-প্রসাধন সেরে খেতে গেল চন্দনা। বন্দনা ভাত বেড়ে দিলো চন্দনাকে, নীলাঞ্জনকে।

চন্দনা বললো—তোর কলেজ নেই আজ ?

আছে, একটায়। মা'র শরীর খারাপ। তাই এদিকটা গুছিয়ে যেতে হবে। শোন্ দিদি, আমার কলেজ যাওয়ার দু'টো শাড়িই ভীষণ ছিঁড়ে গেছে রে! আর চলছে না!

এ সপ্তাহটা চালিয়ে নে কোনোরকমে। মাইনেটা পেলেই আগে তোর শাড়ি এনে দেবো।

সময় হয়ে গেছে। দ্রুতপায়ে বাসরাস্তায় এসে দাঁড়ালো চন্দনা, যাত্রী বোঝাই বাসটা এসে থামে। একজনও নামে না কিন্তু আরো গোটা পনেরো যাত্রী ওঠে। ওঠে চন্দনাও। ঠেসেঠুসে ঢুকে পড়তেই লেডিস সিটে একটা সিটও জুটে যায় জানালার পাশে।

যাক। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্য নিশ্চিন্দি।

মনের মধ্যে আবার চিন্তার হুটোপুটি। কি জবাব দেবে আজ প্রবালকে! বলবে—হ্যাঁ, আমি রাজি!

কিন্তু মা'র অসুখ ওষুধ, নীলুর স্কুলের বেতন, বন্দনার কলেজে যাওয়ার শাড়ি! সংসারের আরো অসংখ্য চাহিদা! শুধু আজকেই নয়, আরো দীর্ঘদিন।

আজ না হয় প্রবাল বলেছে চন্দনার উপার্জনের টাকা সে চায় না। কিন্তু বিয়ের ছ'মাস, বছর, দু'বছর পরে ? তখনো কি প্রবালের মনটা এমনি থাকবে ? এমনি উদার!

তাছাড়া—ওদের সংসার বাড়বে না ? একটি দু'টি ছেলেপুলে হলে খরচও বাড়বে। তখন কি প্রবাল স্বকৃত বিধান নির্বিবাদে মেনে নিতে পারবে ?

না, চন্দনার জীবনে অতোটা বিলাসের স্বপ্ন দেখা চলে না।

অফিসে ঢুকবার মুখেই প্রবালের সঙ্গে দেখা, হাসিমুখে দু'চোখে একটি প্রশ্ন তুলে ধরে প্রবাল চন্দনার মুখের দিকে তাকালো।

চন্দনা মুখ নত করে একটু সময় নীরব থেকে বললো—না প্রবাল, অনেক চিন্তা করে দেখলাম। রাজি হতে পারলাম না। তুমি আমায় ক্ষমা করো।

কোন্ কৌতুকে

কলকাতায় মাসীমার বাড়িতে বেড়াতে এসে সুকান্তি যেন তোপের মুখে পড়ে গেল। আর মাত্র সতেরো দিন পরেই মাসতুতো বোন মলয়ার জন্মদিন। এখন থেকেই তার তোড়জোড় চলছে।

মলয়া অষ্টাদশী। কলেজে পড়ে। মাসীমা মেসোমশায়ের তিন ছেলের পর একমাত্র কন্যা। তায় রূপসী এবং লেখাপড়ায় ভালো। কাজেই এ বাড়িতে তার আদর একেবারে কানা উপচে পড়ছে।

মলয়া বললো—কান্তিদা, খুব সময়মতো এসে পড়েছো। ক'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছো বলো ?

পনেরো দিনের ছুটি নিলাম।

উঁহু উঁহু, ছুটি আর এক সপ্তাহ বাড়াতে হবে।

কেন ? ব্যাপার কি ?

আর সতেরোদিন পর আমার জন্মদিন। তুমি তার দু'দিন আগে চলে যাবে, সে কি হয় !

সুকান্তি ঈষৎ অবজ্ঞার সুরে বললো—ওঃ, জন্মদিন ! বিয়ে হলে না হয় একটা কথা ছিলো। জন্মদিন তো ফি বছরে একটা করে আসে। তার আবার অতো কি যে ছুটি বাড়িয়ে জন্মদিন দেখে যেতে হবে !

মলয়া ঝঙ্কার দিয়ে বললো—ও তুমি বুঝবে না কান্তিদা। বেহারে থেকে থেকে তুমি কেমন কাঠখোট্টা হয়ে গেছো। থাকো না এই ক'টা দিন, দ্যাখো কি ঘটা হয় আমার জন্মদিনে।—তারপর গলায় কৌতুক এনে এবং চোখে ঝিলিক এনে বললো—ঐদিন আমার অনেক বন্ধুকে দেখতে পাবে। চাই কি এই উপলক্ষে তোমার জন্য পাত্রী নির্বাচন-পর্বটাও হয়ে যেতে পারে। এমন ভালো চাকরি করো, এবার বিয়ে-থা কর।

এই তো বললি আমি কাঠখোট্টা লোক। তোর বন্ধুরা নিশ্চয় তোর মতোই আহ্লাদী। কাজেই এমন ঘটকালি করা কি তোর উচিত হবে ?

মলয়া সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পায়ের গোড়ালির উপর

পুরো এক পাক ঘুরে নিয়ে বললো—ইস্, তা আর হয় না। আমার মতো আহ্লাদী কি সবাই হয় না কি! সবার কি এমন কপাল! আমি তিন ভায়ের এক বোন, মা-বাবার একমাত্র মেয়ে তায় সবার ছোটো। ক'জনার কপালে এমন ত্র্যহস্পর্শ যোগ থাকে বলো।

তাছাড়া তুমি রূপসী, লেখাপড়ায় ভালো সেই অহঙ্কারও তোমার কম নাকি!

যাক্‌গে, অতো কথা বলতে পারি না। তুমি আর এক সপ্তাহ ছুটি বাড়াও। এর আগে তোমাকে ছাড়া হচ্ছে না। বুঝলে মশাই?

পরদিন সকালবেলা প্রাতরাশ শেষ হতেই মলয়া কাছে এসে দাঁড়ালো। বললো—কান্তিদা, বন্ধুদের নেমন্তন্ন করতে বেরোবো। মা একা যেতে দিচ্ছে না। তুমি চলো আমার সঙ্গে।

ধ্যাৎ, তুই যাবি তোর বন্ধুর বাড়ি। আমি যাবো কোন্ সুবাদে?

চলো না কান্তিদা, নইলে মা আমাকে একা যেতে দেবে না। বলবে—ডাকে চিঠি ছেড়ে দে।

তাই দে না মলি, সে তো ভালোই।

না না, চলো না কান্তিদা, প্লিজ। বাড়ি গিয়ে নিজে নেমন্তন্ন করার মধ্যে একটা আলাদা আনন্দ আছে। লক্ষীটি চলো।

অগত্যা। না গেলে এবার তুই কেঁদে ফেলবি মনে হচ্ছে। চল্ তাহলে।

সেই যে শুরু হলো, রোজ দু'বেলা চললো নেমন্তন্ন পর্ব, মানে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানো। আর নেমন্তন্ন তো উপলক্ষ। ঘণ্টা দু'তিন গল্পগুজব না করে কোনো বাড়ি থেকে ওঠে না মলয়া। প্রতিদিন সুকান্তি মলয়ার সঙ্গী। সুকান্তি সঙ্গে থাকাতেই মাসীমার ঢালাও অনুমতি মিলেছে। জন্মদিন আসার আগেই সুকান্তি মলয়ার সব বন্ধুদের প্রায় চিনে ফেলেছে। পাপড়ি, সুমিলিতা, নয়না, রত্না, শ্যামলী, ঈশিতা সবাইকে। এক এক বাড়িতে দু'বারও গেছে। কারণ নেমন্তন্ন করে ফেরার সময় ভুল করে কোনো বাড়িতে ব্যাগ ফেলে এসেছে মলয়া। কোনো বাড়িতে রুমাল, সেগুলো সংগ্রহ করতে আবার যেতে হয়েছে।

সুকান্তি বলে—তুই জন্মদিনেই যা কাণ্ড দেখালি মলি। বিয়ের সময় কি করবি?

মলয়া আদুরে গলায় বলে—তখন তুমি একমাসের ছুটি নিও কান্তিদা। এবার বলো, আমার বন্ধুদের মধ্যে কাকে তোমার বেশি ভালো লেগেছে।

বেশি-কম তো কিছু বুঝিনি। সবাইকে তো একই রকম দেখলাম।

সবাই এক রকম?

হ্যাঁ। রঙ সবার একরকম। মানে আসল রঙ তো বোঝার জো নেই। সব ক'টা পুরু পেইন্টকরা মুখের রঙ তো একই রকম দেখায়। সেই আঁকা ভুরু ঠোঁট টকটকে লাল। ফলস্ চুলের ভেজাল দিয়ে হয় ইয়া লম্বা বেণী নয় পাখির বাসা ঢাউস খোঁপা। বলু, একরকম মনে হবে না কেন?

ইঃ, সবারই ফলস্ চুল! তাই না! খুব জানো তুমি। আমার দু' তিনটে বন্ধুর মাথায় যা দারুণ চুল!

বাঃ, আসল নকল বুঝবো কি করে। তাহলে তো টেনে দেখতে হয়।

উৎসবের দিন সন্ধ্যে থেকেই বাড়ি জমজমাট। আত্মীয়-স্বজন অনেক এসেছে। মলয়ার বন্ধুরাও সংখ্যায় নেহাৎ কম নয়। প্রজাপতির মতো সেজেগুজে এসেছে সবাই।

মলয়া নিজেও দারুণ সেজেছে। নতুন লাল শাড়ি পরেছে। কপাল ঘিরে চন্দনের পত্রলেখা আঁকা। দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

সুকান্তি ঠাট্টা করলো—যা সেজেছিস্! এবার একটি বর নিয়ে এলেই হয়।

মলয়া বললো—এমন কি সেজেছি বলো। সেদিন এর থেকে আরও অনেক বেশি সাজবো দেখো।

মলয়া মুখে হাসি ছড়িয়ে উচ্ছ্বসিত ভাবে আত্মীয়-স্বজনকে অভ্যর্থনা করছে। কাউকে হাত ধরে টেনে এনে ঘরে বসাচ্ছে।—আরে এসো এসো ফুলমাসী—কাকিমা এসেছো বসো বসো।—এই যে মামীমা, ও মা, দেখো কে এসেছেন—ইত্যাদি টুকরো টুকরো খুশি চারপাশে ঠিকরে পড়ছিলো।

মলয়ার বন্ধুদের নিয়ে বসানো হলো আলাদা ঘরে।

সুকান্তিকে হাত ধরে টানতে টানতে এনে সেখানে বসিয়ে দিয়ে মলয়া বললো—আমার এদিক-ওদিক দেখতে হচ্ছে। তুমি বসে গল্প করো আমার বন্ধুদের সঙ্গে।

ঠাণ্ডা পানীয় গরম চা যেখানে যেমন প্রয়োজন যথাযোগ্য পরিবেশিত হলো। প্রচুর জলযোগের আয়োজন। উপহারে উপহারে ঘর ভরে গেছে। হঠাৎ মলয়া বন্ধুদের বললো—ছাতে আমার বাগানের টবে অনেক ফুল ফুটেছে। চল্, তোদের দেখিয়ে আনি।

একটা হুজুগ পেলেই হলো, বন্ধুরা হৈ-হৈ করে উঠে পড়লো—চল্, চল্, দেখে আসি।

দুড়দাড় করে ছাতে চললো সবাই। মলয়া সুকান্তিকেও টেনে নিয়ে গেলো।

খানিকক্ষণ ঘুরে দেখে নীচে নামার জন্য সিঁড়িতে সবে পা রেখেছে এমন সময়—ফুস্—লোডশেডিং। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে গেলো ছাত সিঁড়ি গোটা বাড়ি। আর ঠিক সেই সময়ে একটি মেয়েলি নরম হাত সুকান্তির বাঁ হাতের আঙুলগুলি জড়িয়ে ধরলো। সুকান্তি ভাবলো মলয়া। শুধু বলতে যাচ্ছিলো—কে? মলি? তক্ষুণি খানিকটা দূর থেকে মলয়া হেঁকে বললো—কান্তিদা, খুব সাবধানে পা টিপে টিপে নামো। দেখিস রে, তোরা যেন কেউ পড়ে টড়ে যাস না। দাঁড়া, আমি আগে আগে গিয়ে একটা আলোর ব্যবস্থা করি।

অন্ধকারে সবাইকে পাশ কাটিয়ে মলয়া নীচে নেমে যাচ্ছে বোঝা গেলো। সুকান্তির বুকের মধ্যে বিদ্যুৎচমক। তাহলে এ কে?

ফিসফিস করে বললো—কে?

চুপ! কথা বলো না।—প্রত্যুত্তরে আরও মৃদু ফিসফিসানি।

সুকান্তির হাতে নরম নরম গরম গরম ঈষৎ ঘামে ভেজা কয়েকটি আঙুলের ছোঁয়া। বাহুমূল ছুঁয়ে যাচ্ছে কার সুরভিত ঘন নিশ্বাস। ওরা এক পা এক পা করে নামছে সবাই। সুকান্তির সারাদেহে বিদ্যুৎ। সারা মনে শিহরণ। সিঁড়িতে নামতে নামতে কাঁধে কাঁধ ঠেকে যাচ্ছে। বাহুতে বাহু। অন্ধকারে মুখ ফিরিয়ে তীক্ষ্ন চোখে তার মুখ দেখতে চেষ্টা করলো সুকান্তি। কিন্তু কিছুই দেখা গেলো না। সুকান্তির আঙুলে আঙুল জড়িয়ে সেও নামছে। সামনে পেছনে টুকরো টুকরো

কথা টুকরো টুকরো হাসি টুপ-টাপ করে ঝরে পড়ছে। এমন সময় দূরে দেখা গেলো মলয়া হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে এগিয়ে আসছে।

চট্ করে সুকান্তির আংগুল থেকে আংগুলের বাঁধন খসে পড়লো, তার পাশ থেকে সাঁৎ করে সরে গেলো সে। অন্যদের ভিড়ে মিশে গেলো। ওরা সবাই নীচে নামলো। আবার ঘরে গিয়ে বসলো। একটু পরেই আলো এলো। মেয়েরা কেউ কলকল করে হাসছে, কথা বলছে। কেউ মুখে মৃদু হাসির রেখা টেনে শুধুই শ্রোতা। সুকান্তির চোখ একে একে সব ক'টি মুখের উপর ভেসে ভেসে বেড়ালো। একটু আগে কে তাকে এমনি করে রোমাঞ্চিত আচ্ছন্ন করে তুলেছিলো।' কে ? পাপড়ি-সুমিলিতা-নয়না-রত্না নাকি শ্যামলী কিংবা ঈশিতা ?

সুকান্তি এখনও এই প্রশ্নের জবাব পায়নি। কিন্তু সেই নরম নরম গরম গরম ক'টি আংগুলের ছোঁয়া এখনও তার আংগুলে জড়িয়ে রয়েছে। সেই সুরভিত ঘন নিশ্বাসের স্পর্শ লেগে রয়েছে বাহুমূলে। আর তার চুলের মিষ্টি গন্ধ অবসর মুহূর্তে আজও সুকান্তিকে উন্মনা করে দেয়।

কেন সেদিন সে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সুকান্তির হাত ধরেছিলো ? কি ছিলো তার মনে ? এ কি শুধুই কৌতুক খেলা অথবা অন্য কিছু ? সুকান্তির কাছে আজও তা রহস্য হয়ে আছে।

আশ্রয়

বাসটার পেটে মানুষে মানুষে বোঝাই। ফুট বোর্ড ছাপিয়ে যেন উপচে পড়ছে। স্টপেজ-এ এসে দাঁড়াতেই একটা হুড়োহুড়ি লেগে গেল। যতো ওঠার ততো নামার। অসম্ভব ভীড়ের চাপে ওঠা এবং নামা দুই-ই অসাধ্য। দু'তিনটি যুবকের সঙ্গে এক তরুণী বাস থেকে নামছিলো। বাস স্টপ-এ দাঁড়িয়ে থাকা এক সুদর্শন যুবক লাফিয়ে বাসে উঠতে গিয়ে সেই তরুণীর পা ভীষণভাবে মাড়িয়ে দিলো। আর্তনাদ করে৷ উঠলো তরুণী। অপ্রস্তুত হয়ে সেই যুবক ফের লাফ দিয়ে নেমে পড়লো বাস থেকে। নামলো তরুণী ও তার তিন সঙ্গী। নেমেই সেই যুবককে এই মারে তো সেই মারে।

দেখে উঠতে পারেন না ?

নামা শেষ না হতেই উঠতে গেলেন কেন ?

যুবক বারবার বলতে লাগলো—আপনারা ভীড়ের আড়ালে ছিলেন তাই আমি দেখতে পাইনি। আমি দুঃখিত।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। প্রতিযোগিতা করে চললো হম্বিতম্বি। যেন তরুণীর সামনে সবাই 'হিরো' হতে চায়।

যুবক এবার রেগে গিয়ে বললো—আমি কি ইচ্ছে করে পা মাড়িয়ে দিয়েছি ?

বটে! আবার মেজাজ দেখানো হচেছ। বলেই জামার কলারে হাত। দু'দিক থেকে দু'জন এলো ঘুষি পাকিয়ে।

বাস স্টপ-এ দাঁড়িয়েছিলো একটি মেয়ে। এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা দেখছিলো।

এবার এগিয়ে এসে বাধা দিলো—থাক্, ছেড়ে দিন।

আপনি এর মধ্যে এসেছেন কেন ? আপনার কি দরকার ? যান, সরে দাঁড়ান।

মেয়েটি শান্ত এবং দৃঢ়কণ্ঠে বললো—উনি আমার আত্মীয়। ও'র হয়ে এই অনিচ্ছাকৃত কাজের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।

কি ভেবে এবার ওরা থামলো। তারপর চলে গেল।

যুবকটি বললো—আপনার জন্য আজ বেঁচে গেছি সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমাকে 'আত্মীয়' বলাতে আমি আপনার কাছে আরও বেশি কৃতজ্ঞ।

বাধা দেওয়াকে জোরালো করার জন্য এই শব্দটা ব্যবহার করতে হয়েছিলো।

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

না না, এতো করে বলার কিছু নেই।

ইতিমধ্যে বাস এসে গিয়েছিলো, মেয়েটি বাসে উঠে পড়লো।

লেডিজ সিটে বসে আছে মেয়েটি। চোখ পড়লো সেই যুবকটিও এই বাসেই উঠেছে এবং তার সিটের পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে। চোখাচোখি হতে দু'জনেই একটু মাথা নাড়লো। এমনি সময় মেয়েটির পাশে বসা মহিলা নেমে গেলেন। সিট খালি হতেই মেয়েটি সেই যুবকটিকে তার পাশের সিট দেখিয়ে বললো—বসুন।

যুবকটি বসলো। বললো—আবার ধন্যবাদ।—তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে ধীরেসুস্থে কপাল গলা ঘাড়ের ঘাম মুছলো। মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললো—আপনার পরিচয় জানতে চাইলে কি বিরক্ত হবেন?

মেয়েটি হেসে বললো—মোটেই না। আমার নাম মল্লিকা সোম। থাকি শ্যামবাজারে। এখন যাচ্ছি সায়েন্স কলেজে। আমি সেখানে রিসার্চ করি।

আমার নাম সুখেন্দু চৌধুরী। ব্যাঙ্কে কাজ করি। থাকি টালা। এখন চলছি অফিসে।

খানিক বাদে মল্লিকার গন্তব্যস্থল এসে গেল। সুখেন্দুর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সে নেমে গেল।

মল্লিকা কালো। তার উপর সারা মুখে শিল খোদাইয়ের মত অসংখ্য বসন্তের দাগ। মল্লিকার যখন পাঁচ বছর বয়স তখন বসন্ত হয়েছিলো তার। জীবন-সংশয় হয়েছিলো সে সময়। চোখ দু'টো নষ্ট হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিলো। ভগবানের অসীম দয়ায় বেঁচে গেছে। তবে একটা চোখ একটু ট্যারা হয়ে গেছে। মল্লিকার যতো বয়স হয়েছে

আয়নায় নিজের শ্রীহীন মুখ দেখে সে বুঝতে পেরেছে কত্তো বড়ো অভিশাপ তার উপর নেমে এসেছে।

পড়াশুনোয় মল্লিকা ছোটোবেলা থেকেই দারুণ ভালো। এবং পড়াশুনো করা তার নেশা। শিক্ষাজগতের মোটামুটি সবকয়টা ধাপ সে উজ্জ্বল সাফল্যের সঙ্গে পেরিয়ে এসে এখন রিসার্চ করছে 'নানা বয়সে মানুষের দেহে প্রকৃতির প্রভাব' নিয়ে। নিজের গবেষণার বিষয় ছাড়াও সাহিত্য ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করে মল্লিকা। দিনরাত ওই নিয়েই আছে। মা-বাবা সেই কলেজে পড়ার সময় থেকেই বিয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই মাঝে মাঝেই পাত্র পক্ষের সামনে ইনটারভিউ দিতে হয় মল্লিকাকে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো পাত্রপক্ষ পছন্দ করেনি। রূপলক্ষ্মীর কাছে সরস্বতী বিদ্যেবতী বার বার হেরে গিয়ে ম্লানমুখ হয়েছেন। মা যখন মল্লিকাকে বলেন—মল্লি, আজ বিকেল একটু বাড়িতে থাকিস। দু'জন ভদ্রলোক আসবেন দেখা করতে,—তখন মল্লিকা একটু হেসে বলে—আর কেন মা, এবার ওসব পাট একেবারে চুকিয়ে দাওনা। মা ম্লানমুখে বলেন—তা কি করে হয় বলু! মা-বাপেরও একটা কর্তব্য থাকে তো। মল্লিকাও উদাস ভঙ্গিতে উত্তর দেয়—বেশ, কর্তব্য করো তবে। ঐ দৌড়ঝাঁপ করাই কিন্তু সার হবে মা।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ির কাছাকাছি সুখেন্দুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মল্লিকার। সুখেন্দুই হাসিমুখে এগিয়ে এলো—আপনি যে! কেমন আছেন?

ও, আপনি!

দু'জনে কথা বলতে বলতে হাঁটছিলো। মল্লিকা বললো—এই তো কাছেই আমার বাড়ি। এলে খুশি হবো। অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

আপত্তি কিসের? বেশ তো, চলুন।

সেদিন সুখেন্দু বেশ খানিকক্ষণ বসে গল্প করে চা খেয়ে বাড়ি ফিরেছিলো। মল্লিকার পড়ার টেবিলে গাদা-গাদা বই নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে সম্ভ্রমে ও বিস্ময়ে বলেছিলো—এতো পড়াশুনো করেন আপনি? এত্তো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে? সত্যি, অসাধারণ প্রতিভা আপনার!

একই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত, কাজেই মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যেতো দু'জনের। ফলে, পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে দেরি হয়নি। সুখেন্দু আরও দু' একদিন মল্লিকাদের বাড়ি এসেছে। পড়াশুনোর প্রতি সুখেন্দুর অগাধ শ্রদ্ধা। তাই মল্লিকার বইপত্র দেখে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। চা খেয়েছে, গল্প করেছে।

নিজের অজান্তেই মল্লিকা বুঝি একটু রঙিন হয়ে ওঠে। শুধু বাইরের চোখ দিয়েই কি মানুষ মানুষকে দেখে? অন্তর্দৃষ্টি দিয়েও দেখে নাকি?

মা-বাবা নতুন কোনো বিবাহ প্রস্তাব আনলে মল্লিকা বলেছে—এসব প্রহসন আর ভালো লাগে না মা। একদম বাদ দাও।

মা ম্লানমুখে বলেছেন—কিন্তু মেয়েদের একটা আশ্রয় চাই তো। আমরা চোখ বুজলে কার কাছে থাকবি তুই? দাদা বৌদি কি চিরদিন দেখবে?

বাঃ, দেখতে হবে কেন আমাকে? আমি লেখাপড়া জানি। কিছু একটা করতে পারবো নিশ্চয়ই।

মনেরও তো একটা আশ্রয় চাই, সে আশ্রয় ছাড়া মেয়েদের জীবনটা যে বড়ো অসহায় রে!

মনের আশ্রয়! মল্লিকা টেবিলের উপর ছড়ানো তার বইগুলোকে দু'বাহু মেলে জড়িয়ে ধরলো। নীচু হয়ে বইপত্রের উপর মাথা রেখে মা'র দিকে তাকিয়ে গাঢ়কণ্ঠে বললো—এই দেখো না, এই যে বইগুলো —এরাই দেবে আমাকে মনের আশ্রয়। তুমি কিছু চিন্তা করো না। এদের মধ্যে কি অমূল্য সম্পদ। ধরে রাখা আছে সে তুমি বুঝবে না মা। আর—বিধাতার ইঙ্গিত বুঝতে পারছো না কেন তোমরা? আমাকে এই আশ্রয় দেবেন বলেই তো ছোটবেলায় অসুখের সময় আমার চোখদুটো কেড়ে নিতে গিয়েও ফিরিয়ে দিয়েছেন। নইলে অন্ধও তো হয়ে যেতে পারতাম!

মা শিউরে উঠে বলেন—বালাই! শত্রুরও যেন এমন না হয়।

মা চলে গেলে মল্লিকা উঠে ধীরে ধীরে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের মুখখানা দেখে। বিধাতার ভাণ্ডারে এতো কালিও না ছিলো! তার সবটুকু উজাড় করে বুঝি তিনি ঢেলে দিয়েছেন মল্লিকার উপর। নিষ্ঠুর ছেনি চালিয়ে মুখের সবটুকু শ্রী ক্ষতবিক্ষত করে

দিয়েছেন। এ মুখের দিকে তাকালে মল্লিকার নিজেরই যে মন খারাপ হয়ে যায়। আর মা কি না—

হায়রে মা'র দুরাশা।

তবে একজন—একজন হয়তো শুধু বাইরের দৃষ্টি দিয়েই তাকে দেখেনি, দেখেছে মনের চোখ দিয়ে। মল্লিকার এ-ধারণা সত্যি কি না সে ঠিক জানে না, তবু এই একবিন্দু কল্পনার স্বপ্নের রঙ মল্লিকার জন্য থাক্।

মল্লিকার জন্মদিন উপলক্ষে মা বললেন—তোর দু চারজন বন্ধু-বান্ধবকে সেদিন বিকেলে চা'য়ে বল্।

মল্লিকা ভাবলো—এই সুযোগে সুখেন্দুকেও বলবে।

সুখেন্দুর বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিলো সুখেন্দু স্বয়ং। বিস্মিত অভ্যর্থনা জানালো—আরে আপনি! আসুন আসুন।

মল্লিকাকে ঘরে নিয়ে বসালো সুখেন্দু। তার আসার কারণ জেনে উচ্ছ্বসিত ভাবে বললো—নিশ্চয় যাবো, নিশ্চয় যাবো।

তারপর ডাকলো—রিনা, রিনা।

একটি মেয়ে ঘরে ঢুকলো। সুখেন্দু বললো—এই আমার বোন রিনা। রিনা, একটু চায়ের ব্যবস্থা কর্ তো।

ফেরবার মুখে আর একপ্রস্থ অনুরোধ জানিয়ে মল্লিকা বিদায় নিলো। রাস্তায় নেমে খেয়াল হলো—তাইতো, কলমটা কোথায়? ফেলে এলো নাকি সুখেন্দুর ঘরে? সেটার খোঁজ করতেই মল্লিকা আবার গিয়েছিলো। সুখেন্দুর ঘরের দরজার কাছে আসতেই কানে গেল রিনার গলা—মেয়েটার সংগে তোর কতোদিনের পরিচয় রে দাদা! একেবারে জন্মদিনের নিমন্ত্রণ।

খুব বেশিদিনের নয়। দু' চারদিন রাস্তায় দেখা, দু' একদিন ওদের বাড়িতেও গেছি।

হুঁ। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই মনে হচ্ছে। বিয়ে করবি নাকি এ মেয়েকে?

বিয়ে! তোর কি মাথা খারাপ। ঐ তো কুৎসিত চেহারা। এ মেয়েকে কি বিয়ে করা চলে? তবে মেয়েটি কিন্তু উচ্চশিক্ষিতা, যথেষ্ট পড়াশুনো আছে। তোদের মতো বি. এ. পাশ মূর্খ নয়।

কথাগুলো কানে যেতেই থর থর করে কেঁপে উঠলো মল্লিকার সারা দেহ।—থাক্‌গে পড়ে কলম। মল্লিকা দ্রুত পায়ে সরে গেল।

মল্লিকা পড়াশুনোর ভেতর নিজেকে আরও গভীর ভাবে ডুবিয়ে দিলো। সারাদিন পড়ে, রাত জেগে পড়ে। বুঝি বইগুলোর মধ্যেই সে আশ্রয় খোঁজে।

সেদিন মা বললেন—মল্লি, আজ বিকেলে একটু বাড়ি থাকিস। দু'তিনজন ভদ্রলোক আসবেন। অমনি চিরদিনের শান্ত মল্লিকা যেন ক্ষেপে গেল। চিৎকারে ফেটে পড়লো সে—কি ভেবেছো তোমরা? খেলা পেয়েছো আমাকে নিয়ে? কর্তব্য দেখাচ্ছো। যদি কর্তব্যজ্ঞান থাকতো তবে সেই অসুখের সময়ই মেরে ফেলতে আমাকে বিষ খাইয়ে। বুঝলে?

মল্লিকা হাঁফাচ্ছিলো। তার চোখদুটো যেন জ্বলছে।

মা ভয় পেয়ে গেলেন। মেয়ের হাত ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করলেন।

মা রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝনঝন আওয়াজ। ছুটে এসে দেখেন মল্লিকা ফুলদানির ঘা মেরে ড্রেসিং টেবিলের বড়ো আয়নাটা ভেঙে চুরমার করে ফেলেছে। মাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো—এসব বাজে জিনিস ঘরে রাখো কেন? সামনে এসে দাঁড়ালেই একটা কুৎসিত মুখের ছবি ফুটে ওঠে ওটার ভেতরে।—দাঁতে দাঁত পিষলো মল্লিকা।

ডাক্তার ডাকা হলো।

না, পৃথিবীর কোথাও মল্লিকার আশ্রয় মিললো না। বইয়ের মধ্যেও না।

ডাক্তার রায় দিলেন—বেশি পড়ে পড়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

বোবাপো

এক অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে বাগবাজারে এক নার্সিং হোমে গিয়েছিলাম।

অসুস্থ মানুষকে দেখতে গেলে চট্ করে উঠে আসা যায় না। রুগী ছাড়তে চায় না। সারাদিন একা রোগশয্যায় শুয়ে সময় তার কাটে না। তাই কাউকে কাছে পেলে নিঃসঙ্গতা ও রোগযন্ত্রণার মধ্যে রুগী যেন প্রাণ পায়। ছাড়তে চায় না। নিজেরও অবশ্য অসুস্থ আপন মানুষটাকে ছেড়ে আসতে মন চায় না। কাজেই বেশ খানিকটা সময় উপহার দিয়ে আসতে হয়।

সেদিনও এমনি অনেকটা সময় কাটিয়ে যখন উঠলাম তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে। রাস্তায় নেমেই দেখি—চিত্তির! লোড শেডিং। গোটা এলাকা ঘুটঘুটে অন্ধকার। যাকে বলে, নিজের হাত-পাও দেখা যায় না, তার উপর খানিকক্ষণ আগে প্রচণ্ড বর্ষণ হয়ে গেছে। রাস্তায় জল, থিকথিকে কাদা, এক হাত অন্তর গর্ত। এক-এক জায়গায় এতো বেশি কাদা যে হাঁটতে গিয়ে জুতো বসে যাচ্ছে। কখনও গর্তে পা পড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এক একটা গাড়ি একগাদা জল-কাদা গায়ে ছিটকে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। থেকে থেকে গাড়ির আলো রাস্তায় পড়ছে বটে কিন্তু সেই ছুটন্ত আলোয় আলো-আঁধারিতে আরও চোখ ধেঁধে যাচ্ছিলো। আমি মাথা ঝুঁকিয়ে অতি কষ্টে জল-কাদা-গর্ত বাঁচিয়ে পথ দেখতে দেখতে হাঁটছিলাম। গ্যালিফ স্ট্রীট ট্রাম ডিপোতে গিয়ে ট্রাম ধরবো। অনেকটা রাস্তা হাঁটতে হবে। কি করে এই রাস্তা পাড়ি দেবো ভেবে শঙ্কিত হচ্ছিলাম। এমন সময় পায়ের গোড়ালি সুদ্ধ বসে গেলো কাদার ভেতরে।

ইস্! কি কাণ্ড! পুরো পা কাদায় মাখামাখি।

হঠাৎ পাশেই শুনতে পেলাম—মাসীমা একটু ডানদিকে চেপে চলুন। বাঁদিকে গর্ত আছে। কাদা বেশি।

থমকে দাঁড়ালাম, ঘুটঘুটে অন্ধকারে মুখ দেখা গেলো না। শুধু

বোঝা গেলো, আমার খুব কাছেই কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। গলার আওয়াজে কম বয়েসী বলেই মনে হলো। বললাম—কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ভারি মুশকিলে পড়েছি।

কোন্ দিকে যাবেন?

ডিপোতে গিয়ে ট্রামে উঠবো।

চলুন, আমি আপনাকে এগিয়ে দি'।

বলেই সে আমার বাঁ হাতখানা ধরলো, তারপর সন্তর্পণে জল-কাদা-গর্ত বাঁচিয়ে খুব যত্ন করে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো।

এতোক্ষণ আমি যেন অথৈ সমুদ্রে পড়েছিলাম. বড়ো অসহায় বোধ হচ্ছিলো। ছেলেটিকে পেয়ে বেঁচে গেলাম। মনে একটু ভরসা হলো।

এমনিতেই একা চলাফেরা করতে পারি না। আজ নেহাৎ উপায় ছিলো না বলেই একা বেরিয়েছিলাম। একই সংগে বর্ষা এবং লোডশেডিং হবে কে জানতো!

বললাম—আলো থাকলে এতো অসুবিধে হতো না।

আর বলবেন না। লোড শেডিং যেন একটা লাগাতার ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। যখন খুশি হচ্ছে যতোক্ষণ খুশি থাকছে। সাধারণ মানুষের কি দুর্ভোগ। আমি খানিকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিলাম আপনি খুব এলোমেলো পা ফেলে চলেছেন। রাস্তাটা খুব বাজে তো, কলকাতা শহরে রাস্তার এই হাল! যদি পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেংগে ফেলেন, সংগেও দেখছি কেউ নেই, তাই ভাবলাম—

তুমি আমার বড়ো উপকার করলে বাবা! ঈশ্বর তোমার মংগল করুন। সত্যিই বড়ো অসুবিধেয় পড়েছিলাম। ভয়ও পেয়েছিলাম এই অন্ধকারে পথ চলতে। দিনকাল তো ভালো না।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা ট্রামের কাছাকাছি আলোয় এসে পড়েছিলাম। এবার ছেলেটির মুখের দিকে তাকালাম, ভারি সুন্দর চেহারা, চোখে চশমা, টিপটপ পোশাক, এতোক্ষণ মনে হচ্ছিলো. যে আমার এতো উপকার করছে তাকে প্রতিদানে কিছু দেওয়া যায় কি না। অর্থাৎ দুঃস্থ অবস্থার লোক হলে গোটা দুই টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বলবো—তুমি আমার এতো করলে, মিষ্টি খেয়ো।

এ পর্যন্ত তো চেহারা দেখিনি। এবার আলোয় এসে চেহারা দেখে

বুঝলাম ওর সংগে এসব চলে না। ও বখশিশ নেবার লোক নয়, দেবার লোক।

ছেলেটি বললো—ঐ তো ট্রাম দাঁড়িয়ে। উঠে পড়ুন মাসীমা।

তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দেবো বাবা। ঈশ্বর তোমার মংগল করুন।

না না, ও কিছু না। এমন কি আর করেছি, আচ্ছা চলি—বলে ছেলেটি যে রাস্তা দিয়ে এসেছিলো পেছনের সেই অন্ধকার রাস্তায় মিলিয়ে গেলো।

আমি ট্রামে উঠে বসলাম। ভাবতে লাগলাম—আজকালকার ছেলেদের সম্বন্ধে আমরা কতো বিরূপ সমালোচনা করি। ওরা অবিনয়ী, ভদ্রতা জানে না, বষীয়ানদের সম্মান দেয় না, গুরুজনকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে না, সবাই যে একরকম নয় এই ছেলেটিই তার নজির। দেশে ওরা যেমন আছে, এরাও আছে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হবার মতো কিছু নেই। মানবতার ঐতিহ্য এরাই বহন করে নিয়ে যাবে ভবিষ্যৎ কালে। আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে আমরা যে ভয় পাচ্ছি—সেই অন্ধকারে আলোর শিখা এরাই জবালাবে।

টিকিট!

কন্ডাক্টরের হাঁকে তন্ময়তা ভেংগে গেল। তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে একটি টাকা বের করে তার হাতে দিলাম। কন্ডাক্টর একটি পঁচিশ পয়সার টিকিট এবং বাদবাকি খুচরো পয়সা আমার হাতে ফিরিয়ে দিলো। আমি পয়সাগুলি ব্যাগে রাখতে গিয়ে হঠাৎ আমার বাঁ হাতের দিকে চোখ পড়লো।

সংগে সংগে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেলো আমার।

আন্তরিকতায় ভরা গলায় 'মাসীমা' বলে ডেকে সে আমার বাঁ হাতটাই ধরেছিলো না! বাঁ হাত ধরেই সে আমাকে পুরো রাস্তাটা পার করে দিয়েছিলো। আমিও বড়ো নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় এই হাতটা ওর জিম্মায় দিয়ে রেখেছিলাম। বুকে ভরসা পেয়েছিলাম।

কিন্তু কখন কি হলো? এতোটুকু তো টের পাইনি।

গরীব দুঃখী হলে দু'পাঁচ টাকা বখশিশ দিলেই চলে। ওতেই ওরা

কৃতার্থ হয়ে যায়। কিন্তু রাজার মতো দেখতে কাজেই রাজকীয় ভাবেই দক্ষিণাটা নিয়ে গেছে। কিছু দেওয়া হলো না বলে আমার মনে যে আক্ষেপ ছিলো সেটা হয়তো বুঝতে পেরেছিলো।

পাঁচ ভরি সোনা দিয়ে বালাজোড়া বানিয়েছিলাম। এক-একটাতে আড়াই ভরি করে সোনা ছিলো। মজুরি হিসেবে বোনপো আমার বাঁ হাতের বালাখানি খুলে নিয়ে গেছে। যেমন সতর্ক যত্নে আমাকে সে ট্রাম রাস্তায় পৌঁছে দিয়েছিলো তেমনি সযত্ন সতর্কতায় আমার হাত থেকে বালাখানি খুলে নিয়েছে। আমি বিন্দুমাত্র টেরই পাইনি।

★

মতামত

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী বলেন : জীবনের অনেক রঙই তুমি দেখিয়েছ সুখের বিষয় কালিমাখা ক্লেদাক্ত কোন রং দেখাওনি। তোমার ভাষা এত ঝরঝরে পরিচ্ছন্ন এবং প্রকাশভঙ্গী এমনই বাহুল্য বর্জিত যে পড়তে ধরলেই তরতর করে এগিয়ে যাওয়া যায়......তোমার দৃষ্টি স্বচ্ছ জীবনকে আয়নার ছায়ার মত চোখ ফেলতেই দেখতে পাও। সব থেকে সুন্দর তুমি অবাস্তব বাক্য ব্যয়ের দিকে যাও না। তোমার কলম জয়যুক্ত হোক, উত্তরোত্তর সাফল্যের পথে এগিয়ে চলুক এই কামনা। শুধু যে লেখার মানে উচ্চস্থান পেতে পারে তা নয় অঙ্গ সজ্জাতেও রীতিমত উচ্চমানের পরিচয় দিয়েছে। বরাবরই তোমার কবিতার ভক্ত ছিলাম, গল্পেরও ভক্ত হলাম। সাহিত্য জগতে তোমার আসন পাকা হলো।

ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেব প্রধান অধ্যাপক) বলেন : বেলা দেবীর গল্পে আখ্যান আছে, চরিত্র আছে, বিশ্লেষণ ধর্মও খুবই সূক্ষ্ম হয়েছে। এগুলি সাম্প্রতিক গল্পের মত কলা কৌশলের ব্যায়ামে পর্যবসিত হয়নি বা শুধু মানব মনের বিকারকেই তিনি প্রাধান্য দেননি। .....লেখিকাব মধ্যবিত্ত সমাজ ও পরিবার সম্বন্ধে নিপুণ অভিজ্ঞতা, জীবনের হাসিকান্নায় অন্তরস্পর্শী ইংগিত এবং প্রসন্নস্নিগ্ধ দৃষ্টি ভংগিমা তাঁর গল্পে স্বাদু গল্পরস সৃষ্টি করতে পেরেছে। সুতরাং তিনি পাঠক পাঠিকার কাছ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করবেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন : গল্পগুলি সুখপাঠ্য। মধুর সমাপ্তি আছে হাতটি মিঠে। পরিবেশনায় প্রকাশকও যত্নবান।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (বেতার জগৎ) বলেন : তাঁর ছোট গল্পের এই সংগ্রহে বহু বিচিত্র রঙের খেলা তিনি দেখিয়েছেন। প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনের কথা লেখার মধ্য দিয়ে সহজভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।......গার্হস্থ্য জীবনের সহজ স্বরূপকে লেখিকা অনেকগুলি গল্পে এমনভাবে রূপায়িত করেছেন যা তার পাঠক পাঠিকারা পাঠ করলে একটি কোমল স্বাদের সন্ধান পাবেন। অতি সূক্ষ্ম তুলি বুলিয়ে স্বল্প ক্ষেত্রের মধ্যে পরিমিত আবেগের সংগে তিনি কহিনী গুলিকে নিবদ্ধ কবেছেন। জীবনের সুখ, শান্তি, দুঃখ, ব্যর্থতা, কঠোরতা, ও কোমলতার আভাস গল্পগুলিতে পাওয়া যায়।